অভিজ্ঞান

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়



ডি. এম. লাইব্রেরি
৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা-৬

প্রথম সংস্করণ—আশ্বিন ১৩৪৩

পুনর্মুদ্রণ—চৈত্র ১৩৫২, ভাদ্র ১৩৫৭

পাঁচ টাকা মাত্র

৮৩

উ.স.৭৫অ

৩৫.২

৪২নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬, ডি. এম. লাইব্রেরির পক্ষে শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও ৮৩-বি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬, "বাণী-শ্রী" প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত

অভিজ্ঞান

প্রতিষ্ঠান্বিত কথাসাহিত্যিক

লালগোলার রাজা রাও

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের

করকমলে উপহার

দিলাম

এই লেখকের বই ঃ

মায়াবতী পথে	৩॥০
স্মৃতিকথা—১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ পর্ব	৩৷০
অভিজ্ঞান (৩য় সংস্করণ)	৫৲
অনুরাগ (২য় সংস্করণ)	৪৷০
বিদুষী ভার্যা (৩য় সংস্করণ)	৪॥০
যৌতুক (২য় সংস্করণ)	৪৲
শশিনাথ (৩য় সংস্করণ)	৪॥০
অমলা (২য় সংস্করণ)	৩৷০
সোনালী রঙ (২য় সংস্করণ)	৪॥০
রাজপথ (৫ম সংস্করণ)	৪৲
ছদ্মবেশী (৩য় সংস্করণ)	৩৲
অমূলতরু (৩য় সংস্করণ)	৩৲
দিক্‌শূল (২য় সংস্করণ)	৪॥০
আশাবরী (২য় সংস্করণ)	৪৲
রাতজাগা (২য় সংস্করণ	১॥০
রাজপথ (নাটক)	২৲
নাস্তিক	৩৲
কমিউনিস্ট্‌ প্রিয়া	২৸০
নবগ্রহ	১॥০
বৈতানিক	১॥০
গিরিকা	১॥০
ভারত-মঙ্গল (নাটিকা)	১৷০

অভিজ্ঞান

এক

মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম রেল-স্টেশনের প্রায় দশ মাইল উত্তরে কাঁসাই নদীর অপর পারে পীরনগর নামে একটি ছোট গ্রাম আছে। গ্রামের পূর্বপ্রান্তে এ অঞ্চলের জমিদার রায় চৌধুরীদের দ্বিতল অট্টালিকা। অট্টালিকার চতুর্দিকে বাগান পুষ্করিণী, দক্ষিণ দিকে বারখণ্ড, তার পশ্চিম দিকে বৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপ; সদর-দেউড়ির দুই দিকে পাইক-বরকন্দাজদের মহল। বহির্বাটির সুবৃহৎ তোরণের উপর পাকা নহবৎখানা। দেখলে বেশ বোঝা যায়, জমিদাররা যখন গ্রামে বাস করতেন বিশেষ সমারোহের সহিতই করতেন। কলিকাতায় বাড়ি নির্মাণ হওয়ার পর থেকে বিশ-পঁচিশ বৎসর গ্রামের বসবাস প্রায় উঠে গেছে বললেই চলে। নিতান্ত ক্রিয়াকর্ম কিংবা আদায়-পত্রের সময়ে বর্তমান বারো-আনী শরিক জহরলাল রায় চৌধুরী গ্রামের বাটিতে পদার্পণ করেন—কিন্তু সে মাত্র দু দশ দিনের জন্য। গৃহিণী মমতাময়ী সপুত্রকন্যা কোনোবার সঙ্গে আসেন, কোনোবার আসেন না। পীরনগরে দশ দিনের বাস কলিকাতার দশ দিনের আয়ু হরণ করে ব'লে তাঁর মনের বিশ্বাস। পীরনগরের ম্যালেরিয়া-দূষিত খোলা হাওয়া কলিকাতার কলের জলের কাছে সম্পূর্ণভাবে পরাভব স্বীকার করেছে।

এবারকার দেশে আসা জহরলালের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিয়লালের বিবাহ উপলক্ষে ঘটেছিল। মমতাময়ীর একান্ত ইচ্ছা ছিল কলিকাতার ইলেক্‌ট্রিক লাইট, ফ্যান, মোটর কার, কলের জল ইত্যাদির মধ্যে বিবাহের উৎসব সম্পন্ন করেন; কিন্তু জহরলাল তাঁর গ্রামবাসী জ্ঞাতি কুটুম্ব এমন কি নায়েব গোমস্তা প্রজা-মণ্ডলীর সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়িয়ে উঠতে পারেন নি। তা ছাড়া, দেশের

বাড়ির সুবিস্তৃত পরিসরের মধ্যে দীর্ঘকাল ধ'রে তাঁর নিজ বিবাহের যে বিরাট উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার আনন্দের নিশ্চিন্ত-অলস মূর্তি স্মরণ ক'রে পুত্রের বিবাহ-উৎসব কলিকাতার দশ কাঠার উপর অবস্থিত বাড়ির মধ্যে কয়েক ঘণ্টায় নিঃশেষিত করবার কল্পনা তাঁর নিজের কাছেও ভাল লাগে নি। যেখানে কাজের কল চালাতেই সকলে দিবারাত্র ব্যস্ত, সেখানে উৎসবের বাঁশি বাজায়ই বা কে, আর শোনেই বা কে? পীরনগরের বাড়ি থেকে বিবাহের কথায় মমতাময়ী সম্মত হয়েছিলেন এই শর্তে যে, পীরনগরের উৎসব শেষ হওয়ার পর কলিকাতার গৃহে আগমন ক'রে যথোপযুক্ত ভাবে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হওয়ার পর বধূ পিত্রালয়ে যাবে, তার আগে নয়। সন্ধির প্রলোভনে জহরলাল পত্নীর এই শর্তে সম্মতি দিয়েছিলেন।

বিবাহের পর কয়েকদিন ধ'রে অবিশ্রান্ত যাত্রা, থিয়েটার, ম্যাজিক, বায়স্কোপ, আতশবাজি ইত্যাদি চলেছে। ভোজের তো কথাই নেই, চার-পাঁচ দিন গ্রামবাসীদের গৃহে হাঁড়ি চড়ে নি। দূরদেশ থেকে আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবের আসা-যাওয়া, পাইক বরকন্দাজদের ছুটোছুটি, চাকর-চাকরাণীদের হাঁক ডাক, আমলা প্রজাদের বিধি-ব্যবস্থা—সমস্ত মিলে গ্রামটা যেন আনন্দের যজ্ঞশালায় পরিণত হয়েছে। মানভূম থেকে একজন জমিদার দুটি হাতী নিয়ে নিমন্ত্রণ রাখতে এসেছিলেন, বিদায়কালে একটিকে রেখে গেছেন, কাজের বাড়িতে অতিথি-অভ্যাগতের যাওয়া-আসার ব্যাপারে যদি কোনো কাজে লাগে। সেই হাতী জমিদার-বাড়ির উত্তর-পশ্চিম কোণে বড় একটা বটগাছের তলায় শিকল দিয়ে বাঁধা, সর্বক্ষণ তার চতুর্দিকে গ্রামের ছেলেমেয়েদের ভিড় লেগে আছে, আর সে মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে তার ছোট ছোট চোখের নিরুৎসুক দৃষ্টি তাদের উপর ফেলে সমস্ত দিন একমনে অবিশ্রাম ডালপালা চিবিয়ে চলেছে। উৎসবের উপকরণ তালিকায় এই হাতীটির স্থান নিতান্ত নগণ্য নয়, বিশেষত সকাল-বিকালে মাহুতের প্ররোচনায় সে যখন নানাবিধ কৌশল কসরৎ দেখায়।

উৎসব-আনন্দ হয়তো আরো কয়েকদিন এই ভাবেই চলত, কিন্তু হঠাৎ একদিন গ্রামে কলেরা দেখা দিলে। দু-তিন ঘণ্টার আগু-পিছু পাশাপাশি দু বাড়িতে একেবারে দুজনে ঐ রোগে আক্রান্ত হ'ল, এবং মৃত্যুও হ'ল তাদের অল্পক্ষণের মধ্যে দু-তিন ঘণ্টারই আগু-পিছু। সমস্ত গ্রামের মধ্যে একটা নিবিড় আতঙ্কের ছায়া ঘনিয়ে উঠল,—উৎসবের স্রোতে ভাঁটা দেখা দিলে।

একবাড়ি লোক নিয়ে এরূপ অবস্থায় কি করা উচিত, জহরলাল তাই মনে মনে চিন্তা করছিলেন, এমন সময় সন্ধ্যার পর যখন খবর পাওয়া গেল যে, দু-চার বার ভেদবমির পরই এক ঘণ্টার মধ্যে কেদার চাটুজ্জের নাড়ী ব'সে গেছে, তখন তিনি আর নিশ্চিন্ত থাকতে পারলেন না, অন্দরে এসে কথাটা মমতাময়ীকে জানালেন।

জহরলালের কথা শুনে মমতাময়ী ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বললেন, "সকাল থেকে এই কথা শুনে তুমি এতক্ষণ পর্যন্ত দিব্যি নিশ্চিন্ত রয়েছ? তখন বলেছিলাম এমন বিদেশে বিভুঁয়ে কাজকর্ম ক'রো না,—শুনলে না তো! গরিবের কথা বাসি হ'লে তবে মিষ্টি লাগে! এখন চল, আজ রাত্রেই বেরিয়ে পড়া যাক।"

মৃদু হেসে জহরলাল বললেন, "তোমার মতো গরিবের কথা বাসি না হ'লেও মিষ্টি লাগে। কিন্তু তা ব'লেও আজ রাত্রে বেরিয়ে পড়া যায় না।"

"কেন যায় না? গাড়ি তো রাত দুটোয়, এখন তো সবে সন্ধ্যে। সাত ঘণ্টায় পাঁচ কোশ রাস্তা যাওয়া যায় না?"

জহরলাল মাথা নেড়ে বললেন, "পাঁচ কোশ নয় মমো, পঁচিশ কোশ। মধ্যে কাঁসাই নদী আছে সে কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ। লোকে কথায় বলে—একা নদী বিশ কোশ। তা ছাড়া, পাল্কী বেয়ারাদের খবর দেওয়া নেই।"

"খবর দেওয়া নেই তা জানি,—খবর দাও।"

"খবর দিলেই কি এত রাত্রে তারা যেতে রাজী হবে?"

দৃপ্তস্বরে মমতাময়ী বললেন, "তা যদি না হয়, তা হ'লে কিসের জমিদার তুমি?"

জহরলালের মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল। মমতাময়ীর কলিকাতা-প্রীতিকে ঈষৎ আঘাত দেবার অভিপ্রায়ে তিনি বললেন, "কলকাতায় থাকলে কি আর জমিদার আগেকার মতো কেউটে সাপ থাকে?—ঢোঁড়া সাপ হয়ে যায়। তার না থাকে বিষ, না থাকে চক্কোর।"

"আচ্ছা, তা হ'লে তোমার নায়েবকে ডেকে হুকুম দাও,—সে তো আর কলকাতায় থাকে না।"

জহরলালের মুখে আবার হাসি দেখা দিল; বললেন, "শুধু নায়েবকে হুকুম দিলেই হবে না, সময়ের স্রোতকে এই সাতটার সময়ে আটকে ফেলবার জন্যে বিধাতাপুরুষকেও হুকুম দিতে হবে। সাত ঘণ্টা থেকে যাবার ব্যবস্থা করবার জন্যে মাত্র এক ঘণ্টা খরচ হ'লেও ঝাড়গ্রামে গিয়ে ট্রেন ফেল ক'রে বারো ঘণ্টা ব'সে থাকতে হবে। তাতে যদি রাজী থাক তো চলো, আপত্তি নেই। কিন্তু বেশি রাত্রে স্টেশনের পথ একেবারে নিরাপদ নয়; মাঝে মাঝে রাহাজানির কথা শোনা যাচ্ছে।"

এই শেষোক্ত কারণটাই মমতাময়ীর মনে সর্বাপেক্ষা অধিক ক্রিয়াশীল হ'ল। একটু চিন্তা ক'রে বললেন, "আচ্ছা, তা হ'লে কাল সকালে যাতে আমরা বেলা সাতটার মধ্যে বেরিয়ে পড়তে পারি, তার ব্যবস্থা এখন থেকে কর। কাল আর রাত্রের গাড়ি নয়, কাল বিকেলের গাড়িতে যাওয়া ঠিক রইল।"

জহরলাল বললেন, "ব্যবস্থা করবার দিক থেকে ধরলে আজ রাত্রে যাওয়া আর কাল সকালে যাওয়ার বিরুদ্ধে একই রকম আপত্তি দাঁড়ায়। সকালে গিয়ে আর দরকার নেই—কাল সকালে উঠে যাবার ব্যবস্থা ক'রে ফেলে বিকেলের দিকে শীঘ্র শীঘ্র বেরিয়ে পড়লেই হবে।" তারপর উৎকর্ণ হয়ে কি

শোনবার চেষ্টা ক'রে বললেন, "কে কাঁদে না! তবে এর মধ্যেই কেদার-খুড়োর শেষ হয়ে গেল না-কি ?"

আশঙ্কাটা যে অমূলক নয় তা একটু পরেই সঠিক জানা গেল—এবং সঙ্গে সঙ্গে সকলের মনে আবার নূতন ক'রে আতঙ্কের একটা ঘন ছায়া বিস্তার করলে। যাওয়ার ব্যবস্থার কথা পরদিন প্রাতঃকালের জন্য অপেক্ষা না ক'রে অবিলম্বে আরম্ভ হয়ে গেল। শুভদিন দেখতে গিয়ে দেখা গেল যে, পরদিন বৈকালের গাড়িতে রওনা হ'লে সন্ধ্যার সময়ে কলিকাতায় পৌঁছে গৃহ-প্রবেশের সময়টা জ্যোতিষের মতে অত্যন্ত অশুভ সময় পড়ে,—শুভ সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হ'লে রাত্রি একটার পূর্বে তার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে না। কিন্তু রাত্রের গাড়িতে রওনা হ'লে তার পরদিন সকালে গৃহ-প্রবেশের সময়ে একেবারে অমৃত-যোগ !

বহুদিন থেকে বহুবার যারা কলিকাতার বাড়িতে যাতায়াত করছে তাদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম প্রবেশ করবে সে অশুভক্ষণে প্রবেশ করলে তাকে যে গৃহদেবতা কখনই ক্ষমা করবেন না, তদ্বিষয়ে মমতাময়ীর বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। সুতরাং স্থির হ'ল, পরদিন সকালে মমতাময়ী তাঁর অল্পবয়স্ক পুত্রকন্যাদের নিয়ে কলিকাতা রওনা হবেন এবং তৎপরদিন প্রাতঃকালে পুত্র এবং পুত্রবধূকে গৃহে বরণ ক'রে নেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকবেন ; বৈকালে জহরলাল, প্রিয়লাল এবং নববধূ সন্ধ্যা রওনা হবে। পাঁচখানা পাল্কী, আটখানা গোরুর গাড়ি এবং কয়েকটা ডুলির ব্যবস্থা হয়ে গেল। তা ছাড়া হাতী তো আছেই। সমাগত আত্মীয়-কুটুম্বগণকেও পরদিনই নিজ নিজ গৃহে প্রেরণ করবার ভার নায়েবের উপর পড়ল।

রাত্রি তখন এগারোটা। সন্ধ্যা প্রিয়লালের ঘরে পালঙ্কের উপর শুয়ে ছিল, নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ ক'রে প্রিয়লাল সন্ধ্যার পাশে ব'সে তার একখানা হাত নিজ হাতের মধ্যে টেনে নিলে।

পদশব্দে সন্ধ্যা প্রিয়লালের আগমন বুঝতে পেরেছিল, প্রিয়লাল হাত ধরাতে সে ধীরে ধীরে শয্যার উপর উঠে বসল। হাতখানা কিন্তু প্রিয়লালের অধিকারেই র য়ে গেল।

প্রিয়লাল একটু অবনত হয়ে ভাল ক'রে সন্ধ্যার মুখখানা দেখবার চেষ্টা ক'রে স্নিগ্ধকণ্ঠে ডাকলে, "সন্ধ্যা।"

একবার মুহূর্তের জন্য প্রিয়লালের প্রতি চকিত দৃষ্টি স্থাপন ক'রে সন্ধ্যা পুনরায় মুখ নত ক'রে মৃদুকণ্ঠে বললে, "কি?"

ঈষৎ হাসিমুখে প্রিয়লাল বললে, "কি জানি কি। কি মনে হয় জানো সন্ধ্যা? মনে হয়, তুমি উষা তো নওই, সন্ধ্যাও নও,—তুমি গভীর রজনী। সত্যি, এ কয়েক দিনে তোমাকে একটুও বুঝতে পারলাম না। পাঁচজনের মধ্যে দেখলে বোধ হয় চিনতেও পারি নে। আচ্ছা, চাও তো একবার ভাল ক'রে আমার দিকে।" প্রিয়লাল সযত্নে সন্ধ্যার মুখখানি ধ'রে নিজের দিকে ফিরিয়ে দেখলে।

সে মুখে সন্ধ্যার মতই অনির্বচনীয় স্তিমিত শোভা। এই সুন্দর মুখের জোরেই এত বড় জমিদার-গৃহে তার প্রবেশ। সন্ধ্যার মুখের দিকে তাকিয়ে স্মিতমুখে প্রিয়লাল বললে, "আচ্ছা, মুখখানি মনের মধ্যে ধ'রে রাখতে চেষ্টা করব। কিন্তু তোমার জন্যে আরও একটা সহজ উপায়ের ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।" পকেট থেকে একটা আংটি বের ক'রে বললে, "এটা প্ল্যাটিনমের আংটি। এটা চোখের কাছে আলোর বিরুদ্ধে ধরলে এর মধ্যে একজনের সন্ধান পাবে। তাতে খুশি হবে কি-না তা অবশ্য বলতে পারি নে।" ব'লে সন্ধ্যার আঙুলে প্রিয়লাল আংটিটি পরিয়ে দিলে।

আঙুল থেকে আংটি খুলে নিয়ে সন্ধ্যা চোখের নিকট আলোর বিরুদ্ধে ধ'রে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে সহসা এক সময়ে আরক্ত হয়ে উঠল। তারপর সযত্নে সেটি আবার ধীরে ধীরে আঙুলে পরিয়ে নিলে।

অভিজ্ঞান

"খুশি হয়েছ ?"

উত্তর না দিয়ে সন্ধ্যা শুধু প্রিয়লালের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে। প্রিয়লাল দেখলে সে দৃষ্টির মধ্যে খুশি মূর্তি ধারণ ক'রে হাসছে।

"সন্ধ্যা !"

সন্ধ্যা প্রিয়লালের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে।

"কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলা পড়েছ ?"

"পড়েছি।"

"রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলার আঙুলে অভিজ্ঞান আংটি পরিয়ে দিয়েছিলেন মনে আছে ?

"আছে।"

"আমিও তোমার আঙুলে সেইরকম অভিজ্ঞান আংটি পরিয়ে দিলাম।—কিন্তু কোনো অবস্থাতেই আমি তোমাকে ভুলে যাব না সন্ধ্যা, এ নিশ্চয় জেনো।"

সন্ধ্যা তার ভীতিকাতর দৃষ্টি প্রিয়লালের প্রতি স্থাপিত ক'রে বললে, "তবুও ও-সব কথা বলতে নেই।"

"আমাদের মধ্যে তো কোনো দুর্বাসা মুনিরই শাপ নেই সন্ধ্যা,—তবে তোমার অত ভয় কেন ?" ব'লে প্রিয়লাল হাসতে লাগল।

দুই

পরদিন প্রাতে প্রিয়লালের যখন ঘুম ভাঙল, তখন ছ'টা বাজে। নববধূর সহিত প্রেমালাপের মত্ততায় অনেকখানি রাত্রিই জাগরণে কেটে গিয়েছিল, সুতরাং যে সময়ে সে সাধারণত শয্যা পরিত্যাগ করে আজ তার চেয়ে কতকটা বিলম্ব হয়ে গিয়েছে। নিদ্রাভঙ্গের পর সন্ধ্যা কখন্ উঠে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেছে, টের পায় নি। তার ব্যবহৃত শয্যাংশের কুঞ্চনে দেহভারের ছাপ মুদ্রিত, বালিসে সুগন্ধি তৈলের মৃদু সৌরভ, মাথার একগাছা ছিন্ন চুল দু-তিন পাকে কুঞ্চিত হয়ে বাতাসে অল্প-অল্প নড়ছে। সুন্দরী কিশোরী পত্নীর এই চিহ্নগুলি প্রিয়লালের মনে একটি সুমধুর আনন্দের বিলাস জাগিয়ে তুললে। মনে প'ড়ে গেল, গত রজনীর কাব্য-জীবন-যাপনের কথা,—দুটি মিলনপ্রয়াসী হৃদয়ের সে কি অধীরোন্মত্ত ব্যাকুলতা, অথচ তারই মধ্যে সঙ্কোচের সে কি সুমিষ্ট অনতিক্রমণীয় বাধা! ক্ষণকাল প্রিয়লাল নিশ্চল ভাবে সেই বিগত সম্ভোগের তরল চিন্তায় মগ্ন হয়ে রইল, তারপর ধীরে ধীরে শয্যার উপর উঠে ব'সে পাশের জানালাটা খুলে দিল।

শ্রাবণ মাস। কিছু পূর্বে বৃষ্টি হয়ে গেছে, তার প্রমাণ তরু-লতা-গুল্মে তখনো বর্তমান। গৃহ-প্রাঙ্গণের পরেই সুবৃহৎ ফলের বাগান, তার পরে বিস্তৃত মাঠ, মাঠ ভেদ ক'রে চ'লে গেছে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কাঁচা সড়ক ঝাড়-গ্রামের দিকে, মাঠের শেষে শালবনের অনির্বচনীয় শোভা। প্রিয়লাল এ সকল কিছুই দেখলে না। দৃষ্টি তার একেবারে মেঘলিপ্ত মলিন আকাশের উপর প'ড়ে সমস্ত মন সহসা এক অজ্ঞাত অনির্ণেয় ঔদাস্যে ঘুলিয়ে উঠল। গতরাত্রির সমুজ্জ্বল চিত্রের সকল রঙগুলি যেন এক মুহূর্তে সেই বর্ষাদিনের মলিনতার মধ্যে সমাধি লাভ করলে। মনে হ'ল, এ যেন শুধু সেই দিনটিরই

নয়, তার জীবনেরও এক নূতন অঙ্কের সূচনা, যার সঙ্গে তার পূর্ব-জীবনের কোনো মিল নেই।

বিরক্তিভরে জানলাটা ভেজিয়ে দিয়ে প্রিয়লাল ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দায় রেলিঙের ধারে দাঁড়াল। চেয়ে দেখলে, নীচে প্রবলভাবে কর্মের স্রোত চলেছে,—বাঁধাবাঁধি, কষাকষি, হাঁক ডাকের অন্ত নেই;—সুনির্মম ভাঙনের উপদ্রবে সংসারের জমাট অস্তিত্বটি একবারে খ'সে পড়েছে,—সুটকেস, হোল্‌ড-অল্, ট্রাঙ্ক, বাক্স, বিছানা—সংসারের যাবতীয় দ্রব্য—নিরুপায় নিশ্চিন্ততায় চট এবং দড়ির কবলে আত্মসমর্পণ করছে। সে বুঝলে এই ঐকান্তিক কর্ম-তৎপরতার সঙ্গে একমাত্র তারই এ-পর্যন্ত কোনো যোগ নেই, কিছুক্ষণ আগেও পরম নির্ভাবনায় সে তার সুখনীড়ের মধ্যে নিদ্রিত ছিল। মনে মনে একটু অপ্রতিভ হয়ে অগ্রসর হতেই সিঁড়ির মুখে দেখা হ'ল সুধারাণীর সঙ্গে।

সুধারাণী পাঁচ-পয়সা শরিকদের মেজবউ,—সম্পর্কে প্রিয়লালের বউদিদি। তার স্বামী জামসেদপুরে বড় চাকরি করে। বিবাহোপলক্ষে সে পীরনগরে এসেছে এবং জহরলালের গৃহেই বাস করছে। শিক্ষিতা ব'লে সুধারাণীর খ্যাতি এবং অভিমান আছে, তার উপর সে সুরসিকা। প্রিয়লালকে দেখে মৃদু হেসে বললে, "কি ঠাকুরপো, ঘুম ভাঙল? সন্ধ্যার খাতিরে তুমি যে উষার মুখদর্শন করবে না ব'লে পণ করেছ!"

সুধাময়ীর রহস্যের অর্থ উপলব্ধি ক'রে স্মিতমুখে প্রিয়লাল বললে, "প্রেমে যে একনিষ্ঠ সে তো সন্ধ্যার খাতিরে উষা উপস্থিত হ'লে চোখ বুজে থাকবেই বউদিদি। কিন্তু আমার এ সুনাম সকলেরই কাছে রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছে, না, একা তুমিই জানতে পেরেছ?"

সুধারাণী সহাস্যমুখে বললে, "তোমাদের দিকে যাদের চোখ-কান খোলা আছে তাদের কারুই জানতে বাকি নেই।"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে প্রিয়লাল বললে, "সর্ব্বনাশ! আমাদের দিকে চোখ-কান খোলা তো দেখতে পাই বাড়ির বারো-আনা লোকের! কিন্তু কি করি বল বউদি,—সন্ধ্যা যদি তাঁর প্রভাব রাত বারোটা পর্যন্ত বিস্তার করেন তা হ'লে ভোর পাঁচটায় কি ক'রে উষাকে স্বীকার করা যায়?"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে সুধারাণী বললে, "রাত বারোটা কি রকম? রাত দুটো বল!"

কপট বিরক্তির সহিত প্রিয়লাল বললে, "সে গুণও তা হ'লে আছে দেখছি তোমার! আড়িপাতা হয়েছিল?—ছি ছি, বউদিদি, তুমি শহরের শিক্ষিত মেয়ে, পাড়াগাঁয়ে এসে তোমার নৈতিক অবনতি ঘটেছে। স্বামী-স্ত্রীর ঘরে তুমি আড়ি পাতো?"

আরক্তমুখে খিল্‌খিল্‌ ক'রে হেসে উঠে সুধারাণী বললে, "স্বামী-স্ত্রী কি রকম! বিয়ের আটদিন পর্যন্ত তো বর-কনে।" তারপর একটা ঘরের দিকে অগ্রসর হয়ে পিছন ফিরে বললে, "শীগগির নীচে যাও ঠাকুরপো, মেজ-কাকিমা তোমার খোঁজ করছিলেন।"

নীচে এসে মমতাময়ীর নিকট উপস্থিত হয়ে প্রিয়লাল জিজ্ঞাসা করলে, "মা, তুমি আমাকে ডাকছিলে?"

মমতাময়ী বললেন, "ওমা, ডাকব না? আর কি সময় আছে? আমাদের তো বেরিয়ে পড়লেই হয়। তুমি যত শীঘ্র পার তয়ের হয়ে নিয়ে চা-টা খেয়ে বাইরে যাও। কর্তা তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন,—কোথায় তোমাকে কি মামলা নিষ্পত্তি করতে যেতে হবে।"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে প্রিয়লাল বললে, "মামলা নিষ্পত্তি আবার কি মা?"

মমতাময়ী বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, "কে জানে বাপু! যত হাঙ্গামা উনি বাধাতে পারেন! কোথায় প্রজায়-প্রজায় কি বিবাদ বেধেছে—তা এই

পালাই-পালাই গোলযোগের মধ্যেও নিষ্পত্তি ক'রে যেতে হবে! তাও আবার নিজে করবেন না, তোমাকে দিয়ে করাবেন!"

সহাস্যমুখে প্রিয়লাল বললে, "সে তো ভাল কথাই মা, বাবা আমাকে উপযুক্ত পুত্র ব'লে মনে করেন তাই আমাকে মামলা নিষ্পত্তি করতে পাঠাচ্ছেন। তুমি আমাকে উপযুক্ত মনে কর না, তাই কোথাও পাঠাতে চাও না।"

পিছনে পিছনে সুধারাণী এসে কখন্ নিকটে দাঁড়িয়ে ছিল; হাসতে হাসতে বললে, "এ তোমার অন্যায় কথা ঠাকুরপো,—মেজকাকিমা তোমাকে উপযুক্ত পুত্র মনে ক'রেই তো সেদিন বিয়ে করতে শ্বশুরবাড়ি পঠিয়েছিলেন। এরই মধ্যে সে কথা ভুলে গেলে না-কি?"

নিকটে যারা উপস্থিত ছিল সুধারাণীর কথা শুনে সকলেই হেসে উঠল। প্রসন্নস্মিতমুখে মমতাময়ী বললেন, "আমার উকিলের মুখ থেকে উত্তর শুনলে তো?—এখন যাও, তাড়াতাড়ি তয়ের হয়ে নাও।"

প্রিয়লাল মাথা নেড়ে বললে, "তোমার উকিল নয় মা, মোক্তার! এ উত্তর উকিলের মুখ থেকে বেরোয় না।"

পুনরায় একটা হাসির কলরব উঠল।

কিছুক্ষণ পরে প্রিয়লাল বহির্বাটীতে উপস্থিত হয়ে দেখলে, বৈঠকখানার বারান্দায় টেবিল চেয়ারে ব'সে জহরলাল খাতাপত্র পরিদর্শন করছেন, পাশে একটা বড় তক্তপোশেব উপর ব'সে কয়েক ব্যক্তি নীরবে অপেক্ষা করছে। প্রিয়লাল উপস্থিত হতেই তারা সসম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে অভিবাদন করলে।

বিবাদ তাদেরই মধ্যে। বিবাদের বস্তু অকিঞ্চিৎকর,—দশ-বারো কাঠা জমি মাত্র। কিন্তু উভয় পক্ষ প্রবল, এবং সামান্য জমির টুকরা উভয়ের বসত-বাটীর মধ্যস্থলে পড়ায় বিবাদের প্রাবল্য বিবাদী বস্তুর মূল্যকে অপরিমিত ভাবে

অতিক্রম ক'রে গেছে। ইতিমধ্যেই দু-তিন নম্বর ফৌজদারি হয়ে গেছে, পুনরায় একটা খুব জমকালো ভাবে হবার উপক্রম করছিল, এমন সময়ে জমিদার পুত্রের বিবাহ উপস্থিত হওয়ায় আপাতত স্থগিত আছে। বিবাদী জমির পূর্ববর্তী প্রজা গ্রাম ত্যাগ ক'রে নিরুদ্দেশ হওয়ার পর উভয় পক্ষই এক-একটি কোবালা বার ক'রে জমি দখল করতে উদ্যত হয়েছে। প্রত্যেকেই অপরের কোবালাকে জাল ব'লে অভিহিত করছে। বিবাদকে জটিলতর করেছে জহরলালের নায়েব। সে বলে, দুটো কোবালাই জাল, প্রকৃতপক্ষে জমিটি পলাতকা জমা, সুতরাং আইনত আপাতত জমিদারের প্রবেশের যোগ্য; তারপর পরে ইচ্ছামতো বা সুবিধামতো বিলি-বন্দোবস্তই করা হোক কিংবা জমিদারের খাস দখলেই থাক্। এই নূতন জটিলতার সৃষ্টি কোনো পক্ষকেই কিছুমাত্র শান্ত করতে সক্ষম হয় নি, কিন্তু প্রিয়লালের বিবাহোপলক্ষে জহরলাল গ্রামে আগমন করার পর উভয় পক্ষই বিবাদ ভঞ্জনের জন্য তাঁর শরণাপন্ন হয়েছে। জহরলাল এই শর্তে বিবাদ মিটিয়ে দিতে রাজী হয়েছেন যে, পুত্রবধূর মঙ্গলকামনায় তিনি তাঁর পলাতকা জমার দাবি উপেক্ষা করবেন, কিন্তু বিবাদী জমি তিনি যেভাবে উভয় পক্ষের মধ্যে ভাগ ক'রে দেবেন বিনা আপত্তিতে তাতে উভয় পক্ষকে সম্মত হতে হবে; অন্যথা তিনি জমিতে প্রবেশের জন্য কালেক্টারিতে দরখাস্ত দেবার জন্য নায়েবকে আদেশ দিয়ে যাবেন। প্রজারা এ শর্তে সম্মত হয়ে যথাবিধি সোলেনামা লিখে দিয়েছে।

প্রিয়লালের নিকট সংক্ষেপে বিবাদের কাহিনী বিবৃত ক'রে জহরলাল বললেন, "সবই প্রায় ঠিক হয়ে আছে, তুমি গিয়ে বিবাদী জমিটুকু উভয়ের প্রয়োজন এবং সুবিধামতো উভয়ের মধ্যে ভাগ ক'রে দেবে।"

মাথা নেড়ে প্রিয়লাল বললে, "আচ্ছা।"

"আর দেখ, চকদীঘি এখান থেকে তিন পো রাস্তা। পাল্কী ক'রে যাবে, যেতে-আসতে বড় জোর এক ঘণ্টা, সেখানে থাকবে এক ঘণ্টা। দশটার মধ্যে

এখানে ফিরে আসা চাই। বারোটার মধ্যে রওনা না হ'লে ঝাড়গ্রামে পৌঁছতে রাত্রি হয়ে যাবে। আমিই যেতাম, কিন্তু আমি এখানে না থাকলে অসুবিধে হবে। আরও দু-তিনটে বিবাদ নিষ্পত্তি করবার আছে. যাবার গোছ-গাছ ঠিক করারও অনেক বাকি। তা ছাড়া, তোমার বিয়ে উপলক্ষ ক'রে এ বিবাদ মেটানো হচ্ছে, সুতরাং আমার ইচ্ছে—তুমিই এ বিবাদ নিষ্পত্তি কর।"

প্রজারা উচ্চৈঃস্বরে ব'লে উঠল, "হ্যাঁ মহারাজ, আমাদেরও ইচ্ছে যে, ছোট-বাবুর হাত থেকেই এবার আমরা বিচার পাই।" তারপর প্রিয়লালকে পাল্কীতে চড়িয়ে নিয়ে "জয়! ছোটবাবুর জয়!" বলতে বলতে তারা পাল্কীর সঙ্গে ছুটে চলল। আটজন বেহারা পাল্কী নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে চকদীঘির অভিমুখে অগ্রসর হ'ল।

তিন

চকদীঘি থেকে দশটার মধ্যে ফেরা হয়ে উঠল না। প্রিয়লাল যখন ফিরে এল, তখন এগারোটা বেজে গিয়েছে। গৃহ প্রায় জনশূন্য। কলিকাতা এবং অন্যান্য স্থানের অভ্যাগতেরা সকলেই স্টেশনের অভিমুখে রওনা হয়েছে। জিনিসপত্র বহু পূর্বেই গরুর গাড়িতে চালান দেওয়া হয়েছে। বাড়িতে আছেন শুধু জহরলাল, সন্ধ্যা এবং এমন দু-চার জন আত্মীয় যাঁরা পীরনগরেই থাকবেন।

প্রিয়লালের বিলম্ব দেখে জহরলাল একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, প্রিয়লালকে দেখতে পেয়ে বললেন, "কি হ'ল প্রিয়,—কাজ মিটল ?"

প্রিয়লাল বললে, "মিটেছে।"

"খুশি হয়েছে তারা ?"

প্রিয়লাল অল্প হেসে বললে, "খুশি হয়েছে কি-না বলতে পারি নে বাবা, রাজী হয়েছে।"

জহরলাল বললেন, "খুশি কেউ হয় না,—উভয় পক্ষ তো হয়ই না, সময়ে সময়ে কোনো পক্ষই হয় না। আচ্ছা যাও, একটু জিরিয়ে নিয়ে আহারাদি ক'রে প্রস্তুত হও।—একটার মধ্যে রওনা হওয়া চাই, তা হ'লে সন্ধ্যার সময়ে ঝাড়-গ্রামের বাসায় পৌঁছে চা-টা খাওয়া চলবে। আমি এখনি রওনা হচ্ছি, ঝাড়-গ্রামে পৌঁছে একবার উকিলের সঙ্গে দেখা করতে হবে, একটা জরুরী পরামর্শ আছে, সেটা সেরে যেতে পারলেই ভাল হয়। যাও, আর দেরি ক'রো না।"

প্রিয়লাল অন্দরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, জহরলাল ডাক দিয়ে বললেন, "আর শোন প্রিয়, তোমাদের সঙ্গে জল আর খাবার থাকবে,—বউমাকে মাঝে মাঝে ক্ষিদে-তেষ্টার কথা জিজ্ঞাসা ক'রো। ছেলেমানুষ, এতখানি পথ যেতে দুই-ই প্রয়োজন হবে। জিজ্ঞাসা ক'রো।"

মৃদুস্বরে প্রিয়লাল বললে, "করব।" তারপর জহরলালের নিকট এগিয়ে এসে বললে, "বাবা, তুমি কিসে যাবে?"

"হাতীতে।"

"রোদ-বৃষ্টিতে কষ্ট হবে তো?"

জহরলাল বললেন, "না, তা হবে না। নায়েব মশায়কে তোমাদের সঙ্গে দিলেই ভাল হ'ত; কিন্তু আমার সঙ্গে তিনি না গেলে উকিলের কাছে অসুবিধায় পড়তে হবে।"

প্রিয়লাল বললে, "না না, আমাদের সঙ্গে নায়েব মশায়ের যাবার কোনো দরকার নেই, তোমার সঙ্গেই তিনি যান।"

দূরে ঘণ্টার শব্দ শোনা গেল। জহরলাল বললেন, "হাতী আসছে; এখন নায়েব মশাই এলেই বেরিয়ে পড়া যায়।" সঙ্গে সঙ্গেই হাতী এবং নায়েবকে একযোগে দেখা গেল। জহরলাল বললেন, "পাকা লোক, একেবারে বাহনটি সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসছেন।" তারপর প্রিয়লালের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, "যাও, তুমি আর দেরি ক'রো না, একটার মধ্যে যাত্রা করা চাই। রাত্রে যে-রকম বৃষ্টি হয়েছে, নদীতে যদি ঢল নেমে থাকে তা হ'লে সেখানে পার হতে অনেক বিলম্ব হয়ে যাবে। সন্ধ্যার সময়ে ঝাড়গ্রামে পৌঁছনো চাই।"

গৃহমধ্যে প্রবেশ ক'রে প্রিয়লাল সজোরে তাড়া লাগিয়ে দিলে। আধ ঘণ্টা হাতে রেখে বললে, "সাড়ে বারোটার মধ্যে বেরোনো চাই-ই।"

অদূরে বিমলা, প্রিয়লালের খুড়তুতো বোন, দাঁড়িয়ে ছিল; নিকটে এসে সে হাসিমুখে বললে, "নিজে তো গিয়েছিলে চকদীঘিতে হাকিমি করতে, তাড়া দিচ্ছ কাকে দাদা?—বউকে? সে তো সেজে-গুজে তৈরি হয়ে ব'সে আছে;—শুধু দুটো ভাত মুখে দিয়ে নিলেই হয়।"

বিমলা প্রিয়লালের চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট, কিন্তু বিবাহ যদি মানুষের নাবালকত্ব মোচন ক'রে একটা নূতন জীবনের সূত্রপাত করে, তা হ'লে সে

প্রিয়লালের চেয়ে অন্তত বছর আষ্টেকের বড়। বিবাহিত জীবনের সেই প্রবীণত্বের জোরে সে প্রিয়লালের সহিত পরিহাস করতে সঙ্কুচিত হয় না; বললে, "এত দেরি করলে কেন দাদা? বউয়ের তোমার জন্যে ভারি মন-কেমন করছিল।—বিশ্বাস হচ্ছে না?"

গম্ভীর মুখে প্রিয়লাল বললে, "বিশ্বাস না হবার তো কোনো কারণ দেখছি নে। রূপে গুণে এমন একটি কামনার বস্তুর জন্যে মন না কেমন করাই তো আশ্চর্য!"

বিমলা বললে, ইশ্, নিজের বিষয়ে গর্বও তো কম দেখছি নে!"

"গর্বের বনেদ যখন খাঁটি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সে গর্বকে কি বলে জানো বিমলা?"

ফুল্লকোজ্জ্বল মুখে বিমলা বললো "কি বলে?"

"আত্মোপলব্ধি।"

প্রিয়লালের কথা শুনে বিমলা হেসে ফেললে; বললে, "আচ্ছা বেশ, পাল্কী চ'ড়ে ঝাড়গ্রাম যেতে যেতে সমস্ত পথ আত্মোপলব্ধি ক'রো,—এখন তাড়াতাড়ি চারটি খেয়ে নেবার ব্যবস্থা দেখ দেখি। একটার মধ্যে রওনা হতে হবে, সে কথা মনে আছে?"

আহারাদি সেরে একটার মধ্যে প্রিয়লাল এবং সন্ধ্যা প্রস্তুত হ'ল বটে, কিন্তু রওনা হতে পারলে না। পাল্কীতে উঠতে যাবে এমন সময়ে হুড়তে-পুড়তে এসে পড়ল চকদীঘির সেই দুই দল বিবাদী প্রজা। নিষ্পত্তির কোন্ এক অজ্ঞাত গোপন কোণ থেকে সহসা মতভেদের এমন একটা তীক্ষ্ণ খোঁচা উঠেছে যে, সমস্ত ব্যাপারটাই গোলমাল হয়ে যাবার উপক্রম করেছে। এ কথাটা তখন ওঠে নি তা সত্য, উঠলে হয়তো সেই সময়েই অন্যান্য কথার সঙ্গে এরও একটা মীমাংসা সহজেই হয়ে যেতে পারত। তর্ক এবং যুক্তির গোলাগুলি যখন চলছিল তখন এক আঘাতেই যে পরাভূত হতে পারত, সন্ধির নিরস্ত্রতার মধ্যে হঠাৎ সে দুর্দান্ত হয়ে উঠেছে।

এক ব্যক্তি চকদীঘি থেকে সঙ্গে এসেছিল, ঝাড়্গ্রামে তার ভাইপো মোক্তারি করে। নিরপেক্ষতার দাবি তারই সকলের চেয়ে বেশি। সে বললে, "বিপদের কাঁটা রেখে যাবেন না হুজুর। ও-আমগাছটা মনিরুদ্দীনকেই দিয়ে যান, নইলে তার ছেলেপিলে বৎসরান্তে একটা আমও খেতে পাবে না।"

মোক্তারের খুড়োর কথা শুনে অপর পক্ষ হাঁ-হাঁ ক'রে উঠল, বললে, "বেশ তো কও মুখুজ্জে মশায়। কাঁটা মেরে সড়কি বানাবার সল্‌লা দিচ্ছ! আমগাছটা মনিরুদ্দীনকে দিলে আম পাড়বার জায়গা তাকে দিতে হবে না?"

দেখতে দেখতে বিবাদ জ'মে উঠল এবং প্রিয়লালও ধীরে ধীরে তার মধ্যে জড়িয়ে পড়ল। যুক্তি-তর্কের জাল বিস্তার ক'রে একটা বিরোধকে শান্ত করবার মাদকতা তো আছেই,—তা ছাড়া, ছাড়েই বা তাকে কে? মোক্তারের খুড়ো হাতে পৈতে জড়িয়ে বললে, "আদালতে গেলে শুধু পয়সার শ্রাদ্ধ হবে হুজুর,—আপনি গরিবের মা-বাপ, বিবাদটা মিটিয়ে দিয়ে যান। আমগাছটা—"

অপর পক্ষ আগুন হয়ে জ্ব'লে উঠল; কথাটা মুখুজ্জেকে শেষ করতে না দিয়ে বললে, "ফের আমগাছটা? তুমি দেখছি মুখুজ্জে মশায়, এক নম্বর না বাধিয়ে ছাড়বে না।" তারপর প্রিয়লালের দিকে চেয়ে বললে, "হুজুর, ওনার এক ভাইপো ঝাড়গ্রামে মোক্তারি করে।"

শুনে মুখুজ্জে প্রশান্তমুখে বললে, "সে তো বাপু, ফেল কড়ি মাখ তেল। সে মনিরুদ্দীনেরও কেনা নয়, তোমারও কেনা নয়। যদি এক নম্বর বাধেই, তুমিই না হয় তাকে নিযুক্ত ক'রো, সে তোমারই গুণগান গাইবে।"

হাতের রিস্টওয়াচের দিকে একবার দৃষ্টিপাত ক'রে প্রিয়লাল বললে, "মুখুজ্জে মশায়!"

"হুজুর?"

"আপনি যদি একটু চুপ করেন, তা হ'লে আমি একটু চেষ্টা দেখতে পারি।"

হাত জোড় ক'রে মুখুজ্জে বললে, "যে আঁজ্ঞে, আমি আর একটি কথাও উচ্চারণ করব না ; কিন্তু এ কথা ব'লে রাখলাম হুজুর, আমগাছটা মনিরুদ্দীন না পেলে সুবিচার হবে না।"

বহুক্ষণ বিচার-বিতর্কের পর নবজাত বিবাদের এক রকম রফা হ'ল। আমগাছ সম্বন্ধে এই স্থির হ'ল যে, গাছটা মনিরুদ্দীনের ভাগেই থাকবে কিন্তু জমি থাকবে পতিতপাবন বিশ্বাসের। যতদিন গাছটা ফলদান করবে ততদিন পতিতপাবন কাঁচা এবং পাকা আম মনিরুদ্দীনের বাড়ি পৌঁছে দেবে, গাছ শুকিয়ে গেলে মনিরুদ্দীন গাছ কাটিয়ে নিয়ে যাবে।

মুখুজ্জে বললে, "পুকুর সম্বন্ধে বিচার খাশা হয়েছে হুজুর, কিন্তু গাছ সম্বন্ধে হ'ল না। ও জমিও রইল পতিতপাবনের, গাছও রইল পতিতপাবনের, আমও রইল তারই—কাঁচা পাকা দুই-ই। প্রতি বছর আমের মরশুমে দু তিন নম্বর ফৌজদারি হতে থাকবে।"

মৃদু হেসে প্রিয়লাল বললে, 'আপনি আছেন, তখন তার ব্যবস্থা আপনি করবেন।" তারপর হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, "উপস্থিত আমি চললাম, আর একটুও অপেক্ষা করতে পারি নে। দুটো বেজে গিয়েছে অনেকক্ষণ।"

একতলায় একটা বসবার ঘরে সন্ধ্যা প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছিল, পরিচারিকা এসে বললে, "চলুন বউরাণী, দাদাবাবু পাল্কীতে উঠছেন।"

প্রণম্যদের প্রণাম ক'রে সন্ধ্যা অন্দরের প্রবেশ-দ্বারে এসে উপস্থিত হ'ল, সেইখানে তার জন্যে পাল্কী অপেক্ষা করছিল। পাল্কীটি সাবেক কালের সম্পদ, সাধারণত ক্রিয়াকর্মেই ব্যবহৃত হয় ; সুনির্মিত, প্রশস্ত, প্রিয়লালের বিবাহ উপলক্ষে ভাল ক'রে রঙ করা হয়েছে ; পাল্লায় পাল্লায় বিবাহের মাঙ্গলিক চিত্র অঙ্কিত, দুই দিকের দরজায় ঘন নীল রঙের আভাময় রেশমের পরদা, তার ধারে ধারে একই রঙের পুরু ক'রে পাকানো রেশমী সুতোর সার-গাঁথা স্তবক। এই

পাল্কী ক'রেই সে কয়েকদিন আগে ঝাড়গ্রাম রেল-স্টেশন থেকে পীরনগরে এসেছিল।

পাল্কীতে ওঠবার আগে সন্ধ্যা বিমলার হাত ধ'রে মৃদুস্বরে বললে, "চললাম বিমলাদি, মনে রেখো, ভুলো না যেন।"

বিমলার চোখ ভ'রে অশ্রু নেবে এল; হাসি-অশ্রু-মাখা মুখে সে বললে, "তোমার এই চাঁদের মত সুন্দর মুখখানি কি ক'রে ভুলে যেতে হয় তা হ'লে সে কথাও শিখিয়ে দিয়ে যাও সন্ধ্যা। এ ক'দিন পীরনগরের এ বাড়িখানা আলো ক'রে ছিলে ভাই, আজ সে আলো নিজের হাতে নিবিয়ে দিয়ে যাচ্ছ।"

শুনে সন্ধ্যার লাবণ্যময় মুখমণ্ডল আরক্ত হয়ে উঠল, চোখ এল সজল হয়ে। বিমলার দিকে একবার চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে সে পরদা ঠেলে তাড়াতাড়ি পাল্কীর ভিতর গিয়ে প্রবেশ করলে।

সদর-দেউড়ীর মুখে প্রিয়লাল তার পাল্কীতে অপেক্ষা করছিল। সন্ধ্যার পাল্কী সেখানে উপস্থিত হতেই উভয় পাল্কী দ্রুতবেগে ঝাড়গ্রামের পথে অগ্রসর হ'ল।

পাল্কীতে পাল্কীতে আটজন ক'রে বেহারা, ছজন পাল্কী বহন করছে, বাকি দুজন হাতে একটা ক'রে কেরোসিন তেলের লণ্ঠন নিয়ে সঙ্গে চলেছে, প্রয়োজন হ'লেই কাঁধ বদল দেবে। সন্ধ্যার পাল্কীর আগে-পিছে দুজন পাইক চলেছে; একজনের কাঁধে বন্দুক, অপরজনের কটিতে তরবার। তার পশ্চাতে প্রিয়লালের পাল্কী, এবং সর্বশেষে একটা ডুলিতে সন্ধ্যার পরিচারিকা মতি। তারই কাছে খাবার এবং জল।

গ্রাম ছাড়িয়ে মাঠের পথে পড়তেই সন্ধ্যা দু দিকের পরদা সরিয়ে দিলে। চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ প্রান্তর, দূরে দূরে ঘন-নিবদ্ধ শালবন, মাঠের সর্বত্র ছোট ছোট ঝোপঝাড়,—অধিকাংশই শিয়াকুল আর মনসা কাঁটায় ভরা, পথের ধারে ধারে কত নাম না-জানা গাছ, তাদের শাখায় শাখায় কত নাম-না-জানা পাখী, কি অপূর্ব তাদের কাকলী! আকাশ মেঘমেদুর, বায়ু সুশীতল, মাঝে মাঝে তাতে

অজানা ফুলের গন্ধ পাওয়া যায়। পাল্কী-বেহারারা মন্থর তুলকি চালে ছুটে চলেছে, মুখে তাদের পথশ্রান্তিহরা ছড়ার মৃদু ভনভনানি; পাইকদের কড়া নাগরা জুতার মচমচানির শব্দ, মাঝে মাঝে তাদের মুখে 'হুঁশিয়ার' 'হুঁশিয়ার' ডাক। পথের বাঁকে বাঁকে প্রিয়লালের পাল্কী নজরে পড়ে, কখনো তার মুখের কিয়দংশ দৃষ্টিগোচর হয়, কখনো বা চোখে চোখে দৃষ্টিবিনিময়ও হয়ে যায়। মুখে মুখে ফুটে ওঠে এক পক্ষে আনন্দের এবং অপর পক্ষে লজ্জার সুমিষ্ট হাসি।

সন্ধ্যার মনে হ'ল, সে চলেছে কোনো স্বপ্নরাজ্যের অপরিচিত পথে যার সহিত নিত্যকার বাস্তব জীবনের কোনো যোগ নেই। সে ধীরে ধীরে ভুলে গেল যে, সে পীরনগর থেকে আসছে, ভুলে গেল কলকাতায় যাচ্ছে, সে তার বাপ-মাকে ভুলে গেল, এমন কি স্বামীকেও। শুধু মনে হতে লাগল সে, যেন চলেছে কোনো এক স্বপ্নের রাজ্যে, স্বপ্নের নগরে, এক অজানিত স্বপ্ন-পুরীতে। এমনি একটা স্বপ্নের মদিরা তার মনকে সমস্ত পথটাই আচ্ছন্ন ক'রে রইল। সে মোহ ভাঙল যখন পাল্কী এসে নামল কাঁসাই নদীর তীরে। তখন সন্ধ্যা আসন্ন, পশ্চিম আকাশে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে দিনের চিতা জ্ব'লে উঠেছে।

প্রিয়লাল সন্ধ্যার পাল্কীর পাশে এসে ডাকলে, "সন্ধ্যা, বেরিয়ে এস।"

পাল্কী থেকে বেরিয়ে এসে সন্ধ্যা দেখলে, পাইক এবং বেহারারা দূরে এক জায়গায় ব'সে ভাজাভুজি বার ক'রে জল-পানের উদ্যোগ লাগিয়েছে আর মতি জলের কুঁজা এবং খাবারের পাত্র হাতে নিয়ে অদূরে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রিয়লাল বললে, "সন্ধ্যা, একটু কিছু খেয়ে নাও।"

ঘাড় নেড়ে সন্ধ্যা বললে, "এখন দরকার নেই, ঝাড়গ্রাম পৌঁছে খাব।"

"সে অনেক দেরি, এখনো ঘণ্টা তিনেকের কম নয়।"

"তবে তুমি আগে খাও।"

একটু দূরেই মতি ছিল, তাকে একবার অপাঙ্গে দেখে নিয়ে একটু মৃদু গলায় প্রিয়লাল বললে, "আগে কেন?—একসঙ্গেও তো খেতে পারি।"

প্রিয়লালের প্রস্তাবে সন্ধ্যার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল; ঘাড় নেড়ে মৃদুস্বরে বললে, "না।"

"আচ্ছা, তা হ'লে আমিই আগে খেয়ে নিই।" মতির দিকে ফিরে বললে, "মতি, খাবারটা নিয়ে এস।"

সন্ধ্যা এগিয়ে গিয়ে মতির হাত থেকে খাবারের পাত্রটা নিয়ে খুলে ফেললে, তারপর একটা প্লেটে খাবার সাজিয়ে এক গ্লাস জল নিয়ে প্রিয়লালের নিকট উপস্থিত হ'ল।

সন্ধ্যার হাত থেকে খাবারের প্লেটটা নিয়ে প্রিয়লাল বললে, "এরই মধ্যে স্বামী-সেবা আরম্ভ ক'রে দিলে সন্ধ্যা?"

সন্ধ্যা এ কথার কিছুই উত্তর দিলে না, শুধু তার মুখমণ্ডল পুনরায় আরক্ত হয়ে উঠল।

আহার শেষ ক'রে প্রিয়লাল বললে, "আমি নদীর ধারে ওই বাবলা-গাছতলায় গিয়ে বসছি, খাওয়া হয়ে গেলে তুমি ওখানে এসো। জুতো প'রে এসো সন্ধ্যা, বাবলা গাছের তলায় অনেক সময়ে শুকনো বাবলা ডালের কাঁটা থাকে।"

প্রিয়লালের প্লেটেই সামান্য কিছু খেয়ে নিয়ে বাকি খাবারটা মতিকে খেতে দিয়ে সন্ধ্যা প্রিয়লালের কাছে উপস্থিত হ'ল।

সন্ধ্যাকে নিজের পাশে বসিয়ে তার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে প্রিয়লাল বললে, "কেমন লাগছে সন্ধ্যা?"

সন্ধ্যা বললে, "খুব চমৎকার।"

"নদী পেরিয়ে ওপারে যখন আমরা পৌঁছব, তখন কিন্তু এই চমৎকার শোভা একেবারে ঘন অন্ধকারে ঢেকে যাবে।"

শুনে সন্ধ্যার মুখে চিন্তার রেখা দেখা দিল, বললে, "খুব ঘন কি?"

"খুব ঘন। কিন্তু তার জন্যে তোমার ভাবনার কোনো কারণ নেই।"

ক্ষণকাল মনে মনে কি চিন্তা ক'রে সন্ধ্যা বললে, "আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না?"

"কি কাজ?"

একটু অপেক্ষা ক'রে মুখখানা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিয়ে সন্ধ্যা বললে, "এক পাল্কীতে দুজনে গেলে হয় না?"

বাঁ হাত দিয়ে সন্ধ্যাকে বেষ্টন ক'রে ধ'রে একটু চাপ দিয়ে প্রিয়লাল বললে, "চমৎকার হয়,—কিন্তু তোমার লজ্জা করবে না সন্ধ্যা? অন্ধকারে অন্ধকারে অত লোকের মধ্যে আমার সঙ্গে যেতে?"

ক্ষণকাল সন্ধ্যা চুপ ক'রে রইল, তারপর বললে, "তবে তোমার পাল্কী আমার পাল্কীর পাশে পাশে রেখো।"

মৃদু হেসে প্রিয়লাল বললে, "পথ সরু, দুটো পাল্কী পাশাপাশি যেতে তো অসুবিধে হবে। এবার পাইক দুজন তোমার পাল্কীর দুদিকে দরজার পাশে পাশে চলবে, আর আমার পাল্কী তোমার পাল্কীর ঠিক পিছনেই থাকবে। কেমন, তা হ'লে হবে তো?"

সন্ধ্যা কোনো উত্তর দিলে না, চুপ ক'রে রইল।

আকাশে মেঘ ছেয়ে এসেছিল, টিপ টিপ ক'রে বৃষ্টি পড়তে লাগল প্রিয়লাল সন্ধ্যাকে নিয়ে উঠে পড়ল। পাইক বেহারারাও তাদের জলপান শেষ ক'রে যাবার জন্যে অপেক্ষা করছিল।

নদী পার হতে বেশ একটু বিলম্ব হয়ে গেল। এপারে এসে প্রিয়লাল তাদের বাহিনীটি, সন্ধ্যার সহিত যে ভাবে কথা হয়েছিল, ঠিক সেইমতো সাজিয়ে নিলে। তখনো অন্ধকার খুব বেশি হয় নি, তবুও লণ্ঠন চারটি জ্বেলে নিয়ে তারা দ্রুতবেগে রওনা হ'ল।

আধঘণ্টাটাক যাওয়ার পর আকাশ ভেঙে মুষলধারে বৃষ্টি নামল, অন্ধকার হ'ল দুশ্ছেদ্য, চারটি লণ্ঠনের ক্ষীণ রশ্মিরেখা নিজেদের একান্ত

অক্ষমতায় অপ্রতিভ হয়ে জ্বলতে লাগল অন্ধকারকেই বিশেষভাবে প্রকট ক'রে।

বাহিনীটি ধীরে ধীরে প্রবেশ করলে একটি শালবনের মধ্যে। এ অরণ্যটি অত্যন্ত ঘন এবং বিস্তৃত। এক মাইল পথ যাওয়ার পর বন থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়া যায়। পথ অত্যন্ত পিচ্ছিল, দ্রুতবেগে চলা নিরাপদ নয়, বেহারারা পা চেপে চেপে চলেছে এবং পাইকরা ঘন ঘন 'হুঁশিয়ার' 'হুঁশিয়ার' হাঁকছে।

ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে সন্ধ্যা তার পাল্কীর মধ্যে ব'সে ছিল। একবার একটু পরদা সরিয়ে দেখলে বাহিরে মসীর সমুদ্র, আর তার মাঝে মাঝে দু-একটা জোনাকির ঝিকিমিকি,—তা ছাড়া অন্য কিছুই দেখা যায় না। নদীর ওপার যা ছিল, নদীর এপার ঠিক তার বিপরীত। সে আলো সে ছায়া নেই, সে পাখী সে ফুল নেই, সে আকাশ নেই বাতাস নেই, আছে শুধু ঘন জমাট অন্ধকার আর বৃষ্টির ঝরঝর শব্দ। কোথায় ওপারের সেই স্বপ্নরাজ্য আর স্বপ্নপুরী, এ যেন চলেছে কোন্ পাতালপুরীর পথে! একবার তার একটু কাঁদতে ইচ্ছে হ'ল, একবার ইচ্ছে হ'ল চিৎকার ক'রে প্রিয়লালকে ডাকে। কিন্তু ভয়ে মুখ দিয়ে কান্নাও বেরোল না, কথাও না।

প্রায় অর্ধেক বন-পথ অতিক্রম করা হয়ে গিয়েছে, এমন সময় পথের বাম দিকে একটা খস্‌খস্ শব্দ শোনা গেল। সন্ধ্যার পাল্কীর একজন বেহারা শুনতে পেয়ে চুপি চুপি বললে, "মানুষ না কি গো?"

শব্দটা একজন পাইকেরও কানে গিয়েছিল, সে সজোরে চিৎকার ক'রে উঠল, "খবরদার!"

কিন্তু তার পরই অকস্মাৎ আরম্ভ হয়ে গেল একটা পৈশাচিক নৃশংসতার লীলা! একটা বিকট হল্লায় সমস্ত বন থরথর ক'রে কেঁপে উঠল, সঙ্গে সঙ্গেই দশ-বারোজন লোক বড় বড় লাঠি নিয়ে ভীমবেগে এসে পড়ল প্রিয়লালের দলের উপর। সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে লেগে গেল একটা ভয়ঙ্কর

মারামারি আর চেঁচামেচি, তার মধ্যে একটা বন্দুকের আওয়াজও শোনা গেল; কিন্তু পর-মুহূর্তেই বিকট আর্তনাদ ক'রে বন্দুকধারী পাইক ভূমিশায়ী হ'ল, কোথায় ছিটকে পড়ল তার হাতের অস্ত্র তা কেউ জানলে না। পাল্কী-বেহারাদের পিঠের উপর দু-চার ঘা লাঠি পড়তেই তারা প্রাণভয়ে ভীত হয়ে পাল্কী ফেলে যে যে-দিকে পারে পালিয়েছে। ভয়ে এবং বিস্ময়ে প্রিয়লাল প্রথমটা বিমূঢ় হয়ে গেল, তারপর 'সন্ধ্যা' 'সন্ধ্যা' ক'রে চিৎকার করতে করতে পাল্কী থেকে পা বাড়াতেই সজোরে পায়ের উপর এসে পড়ল একটা লাঠি,—যন্ত্রণায় আর্তনাদ ক'রে পাল্কীর মধ্যে শুয়ে প'ড়ে সে অচৈতন্য হয়ে গেল।

তখন দুজন ভীমকায় লোক সন্ধ্যার পাল্কীর নিকট উপস্থিত হয়ে তার মূর্ছিত শিথিল দেহ পাল্কীর ভিতর থেকে টেনে বার করলে, তারপর মতির ডুলির নিকট উপস্থিত হয়ে মতিকে টেনে বার ক'রে ফেলে দিয়ে তাতে সন্ধ্যার বিবশ দেহ স্থাপিত করলে। জন পাঁচ-সাত লোক লাঠি হাতে পাহারা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, বাকি চারজনে সন্ধ্যার ডুলি কাঁধে নিয়ে দ্রুতপদে অরণ্যের নিবিড় অংশে অন্তর্হিত হ'ল। যারা পাহারা দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ক্ষণকাল অপেক্ষা ক'রে তারা যখন দেখলে যে, বিপক্ষ দলের কোনো ব্যক্তিরই ওঠবার কোনো লক্ষণ নেই, এবং বুঝলে যে ইত্যবসরে ডুলি অনেকটা এগিয়ে গেছে, তখন তারাও ডুলি যে-দিকে গিয়েছিল সেই পথে নিঃশব্দে অদৃশ্য হ'ল।

চার

কিছু পূর্বে চলেছিল নিদারুণ নির্মমতার অট্টরোল, সহসা সে স্থান মগ্ন হ'ল সুগভীর স্তব্ধতায় এবং অন্ধকারে। বৃষ্টি তখন থেমে গিয়েছিল, শুধু ফোঁটা ফোঁটা পাতা-ঝরা জল পড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। সঙ্গে চারটে লণ্ঠন ছিল যার কোনো অস্তিত্বই দেখা যাচ্ছিল না। দুটো হাতে নিয়ে দুজন পাল্কী-বেহারা পালিয়ে গিয়েছে, অপর দুটো দুর্বৃত্তেরা লাঠির আঘাতে ভেঙে দিয়েছে অন্ধকারকে আরও গাঢ় করবার অভিপ্রায়ে।

পাল্কীর ভিতর প্রিয়লালের যখন চৈতন্য হ'ল তখন প্রথমে সে মনে ভাবলে, স্বপ্নেরই জের চলেছে। ঘুম তখনো সম্পূর্ণ ভাঙে নি,—কিন্তু শরীরটাকে একটু নাড়া দিতেই আহত পায়ের তীব্র বেদনার মধ্য দিয়ে ফিরে এল সমস্ত ঘটনার পরিপূর্ণ স্মৃতি। সন্ধ্যার খবর নেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পাল্কী থেকে নামতে গিয়েই দেখলে পায়ের বর্তমান অবস্থায় একেবারে তা অসম্ভব। একটা নিদারুণ হতাশা এবং দুশ্চিন্তার তাড়নায় সমস্ত দেহ অবশ হয়ে এল। পরক্ষণেই মনের সমস্ত শক্তি সঞ্চয়পূর্বক জড়তাকে অতিক্রম ক'রে সে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার ক'রে উঠল—সন্ধ্যা! তমসাবৃত শুব্ধ অরণ্য সেই সহসা-উচ্চারিত শব্দের আঘাতে চকিত হয়ে উঠল, কিন্তু উত্তরে কোনো দিক থেকেই কিছু সাড়া পাওয়া গেল না। আরও তিন-চার বার সন্ধ্যাকে উচ্চকণ্ঠে ডেকে কোনো ফল লাভ না ক'রে সে স্থির করলে, সন্ধ্যা নিশ্চয় তার পাল্কীতে ভয়ে মূর্ছিত হয়ে প'ড়ে আছে। অতি কষ্টে কোনো রকমে পাল্কী থেকে একটু মুখ বার ক'রে প্রিয়লাল উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার ক'রে ডাকলে, "রূপণ সিং!" তলোয়ারধারী পাইকের নাম রূপণ সিং।

নিকটবর্তী ঝোপের মধ্যে একটা খস্‌খস্‌ শব্দ শোনা গেল এবং তার পরেই সে দিক থেকে অতি ক্ষীণ কণ্ঠস্বর পাওয়া গেল—"মহারাজ!"

"তুম্ কীধর হ্যায় ?"

"ঈধর্ মহ্‌রাজ !"

নিরর্থক উত্তর। বিরক্তিভরে প্রিয়লাল বললে, "সাম্‌নে আও।"

ঝোপের মধ্যে রূপণ সিং খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল, তার পর সন্তর্পণে প্রিয়লালের পাল্কীর সামনে এসে ব'সে প'ড়ে করজোড়ে আর্তস্বরে বললে, "হুকুম মহ্‌রাজ !"

ব্যগ্রকণ্ঠে প্রিয়লাল বললে, "বহুমায়জীকা কিয়া হাল হ্যায় ?"

ঝোপের ভিতর থেকে রূপণ সিং সমস্ত ব্যাপারই নিরীক্ষণ করেছিল, কিন্তু নিদারুণ দুঃসংবাদের কথা নিজমুখে প্রকাশ করতে সে ভয় পেলে ; বললে, "বেগর্ বত্তি অব্ কা কহা যায় মহ্‌রাজ ! সুঝৎ কুছ নইখে নু।"

উত্তর শুনে প্রিয়লাল ক্রোধে আগুন হয়ে উঠল। কঠিন স্বরে তর্জন ক'রে বললে, "নিকালো, ঢুঁড় কর্ বত্তি !"

সেই গভীর অন্ধকারে বন-জঙ্গলের মধ্যে লণ্ঠন খুঁজে বার করা কঠিন কাজ, কিন্তু প্রভুর কঠোর আদেশে সে কাজে রূপণ সিংকে প্রবৃত্ত হতেই হ'ল। সে ব'সে ব'সে চতুর্দিক হাতড়ে হাতড়ে লণ্ঠন খুঁজতে লাগল।

প্রিয়লাল চিৎকার ক'রে ডাকলে, "ক্ষীরোধর সিং ! ক্ষীরোধর সিং অপর পাইকের নাম।

ক্ষীরোধর সিংয়ের পক্ষ থেকে কোনো উত্তর পাওয়া গেল না, কিন্তু উত্তর দিলে রূপণ সিংই। বললে, "ক্ষীরোধর সিংকো ডাকুলোগ জান্‌সে মার্ দিয়া মহ্‌রাজ।"

শুনে প্রিয়লাল দুঃখে এবং আতঙ্কে শিউরে উঠল। অনেক দিনের প্রভু-ভক্ত পুরাতন ভৃত্য, অবশেষে এমন ভাবে অপঘাত মৃত্যুতে প্রাণ হারাল ! সন্ধ্যাই বা এখন কি অবস্থায় কোথায় আছে কে জানে ! দুশ্চিন্তায় প্রিয়লালের সমস্ত দেহ-মন আলোড়িত হয়ে উঠল, কিন্তু অপরের সাহায্য

ব্যাতরেকে পাল্কী থেকে বেরিয়ে আসবার ক্ষমতা তার ছিল না, পায়ে এত অসহ্য বেদনা। সে ব্যগ্রস্বরে রূপণ-সিংকে জিজ্ঞাসা করলে, "জান্‌সে মার্ দিয়া সো তুমকো কৈসে মালুম হুয়া ?"

রূপণ সিং বললে, "উয়ো খুদ আপ্‌হি কহা মহ্‌রাজ।"

রূপণ সিংয়ের কথার অপূর্ব সঙ্গতিতে প্রিয়লাল বিরক্তিতে গর্জন ক'রে উঠল, "মুরদা তুমকো আপসে কহা যো মর্ গিয়া ?"

প্রিয়লালের বোধশক্তির শোচনীয় অভাব দেখে রূপণ সিংয়ের বিস্ময় এত বেশি হ'ল যে, তার তাড়নায় সে ধীরে ধীরে অন্ধকারের মধ্যে উঠে দাঁড়াল। কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব কোমল ক'রে বললে, "গিরতেহি ক্ষীরোধর সিংনে কহা, জান্ লিয়া; পিছে, পুকারনেসে হর্‌গিজ্‌ বোলৎ নৈখন্। অব্‌ ইস্‌সে দুসরা বিচার ক্যা কিয়া যায় মহ্‌রাজ ?"

রূপণ সিংয়ের যুক্তির বিরুদ্ধে প্রিয়লালের কি বলবার ছিল তা বলা যায় না; কিন্তু তার আর অবসর হ'ল না, অন্ধকারের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক টলতে টলতে এসে তার পাল্কীর সম্মুখে আছড়ে প'ড়ে চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠল, "সর্বনাশ হয়েছে দাদাবাবু—"

উন্মত্তের মত প্রিয়লাল চিৎকার ক'রে উঠল, "কি হয়েছে মতি ?"

"ওগো দাদাবাবু, বউরাণীকে ডাকাতরা ডুলি ক'রে নিয়ে পালিয়ে গেছে।"

কোথায় রইল প্রিয়লালের আহত পায়ের বেদনা, কোথায়ই বা রইল তার ত্রস্ত মনের জড়তা,—একটা বিকট আর্তনাদ ক'রে সে মুহূর্তের মধ্যে পাল্কীর বাইরে এসে দাঁড়াল। তার পর ব্যগ্র-ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, "কোন্ দিকে মতি, কোন্ দিকে তারা গেছে ?"

কাঁদতে কাঁদতে হাত দিয়ে দিক নির্দেশ ক'রে মতি বললে, "ঐ বাঁ দিকে গো দাদাবাবু।"

পাগলের মতো প্রিয়লাল পথ-পার্শ্বের নাল অতিক্রম ক'রে ঘন বনের মধ্যে

প্রবেশ করলে। মুখে তার 'সন্ধ্যা' 'সন্ধ্যা' ডাক, পায়ে অসংযত অনির্ণীত চপল গতি, বুদ্ধির একটা দিক দিয়ে সে বেশ বুঝতে পারছে যে ঐই অজানা অন্ধকার অরণ্যের মধ্যে সন্ধ্যার সন্ধান খুঁজে বার করা তার পক্ষে অসম্ভব; কিন্তু মনের মধ্যে এমন একটা অস্থিরতার আগ্নেয়গিরি নিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে ব'সে থাকাও তো একই রকম অসম্ভব।

পাল্কী-বেহারাদের মধ্যে একজন ছিল, নাম তার মোহন। মাথায় চোট খেয়ে সে অচেতন হয়ে পথের পাশে প'ড়ে ছিল, প্রিয়লাল এবং রূপণ সিংয়ের কথার শব্দ পেয়ে তার চেতনা ফিরে আসে। বয়স তার ষাট বৎসর অতিক্রম ক'রে গেছে, মাথায় আধাআধি কাঁচা-পাকা চুল, কিন্তু শুধু ঐ পর্যন্তই;—তার বেশি এক ইঞ্চিও জরা তার শরীরে অধিকার বিস্তার করতে পারে নি। মোহনের গায়ে পঁচিশ বৎসরের যুবাপুরুষের বল; শরীরের গঠন দীর্ঘ অনবনত, যেন ইস্পাত দিয়ে গড়া; পাল্কী বইবার সময় লোকাভাব হ'লে স্বেচ্ছায় সে একাই দুজনের কাঁধ দেয়। জাতে সে গয়লা, সাবেককেলে লোক, জহরলালের পিতার সঙ্গে সকালে-বিকালে কুস্তি লড়া ছিল তার যৌবনকালের কাজ। সে দৌড়ে গিয়ে দু হাত দিয়ে প্রিয়লালকে আটকে ধ'রে দাঁড়াল; বললে, "ও-কাজ ক'রো না ছোটবাবু, রেতের বেলা মিছিমিছি বনের মধ্যে সেঁধিয়ো না,—বর্ষাকাল, পোকা-মাকড়ের ভয় আছে। এই পরশুদিন এই পথেই একটা লোক পোকার কামড়ে ম'রে গেছে।"

মোহনকে ঠেলে সরিয়ে দেবার চেষ্টা ক'রে প্রিয়লাল বললে, "মোহন, ছেড়ে দাও আমাকে, আমি যাবই।"

দু হাতে প্রিয়লালকে জড়িয়ে ধ'রে মোহন বললে, "কোথা যাবে ছোটবাবু, তারা কি এখানে ব'সে আছে? এতক্ষণে কোশ খানেক রাস্তা চ'লে গেছে। তাদেরও পাবে না, নিজেও পথ হারাবে। তার চেয়ে তুমি পাল্কীতে বসবে চল, আমরা দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ি। তাতে কাজ হবে।"

"কিন্তু সে সময়ে তোমরা অত সহজে পাল্কী ফেলে পালিয়ে গেলে কেন মোহন ?"

"পালাই নি ছোটবাবু। কি করব বল ? পিছন থেকে হঠাৎ এসে মাথায় দিলে চোট, মাথা ঘুরে লুটিয়ে পড়লাম। সমুখ দিক থেকে এলে তাদের নিদেন পাঁচটাকে না সাবড়ে মোহন গয়লা ভুঁই নিত না। কি বলব বল হুজুর, একেবারে বোকা বানিয়ে দিয়ে চ'লে গেল। মহারাজের কাছে কি ক'রে মুখ দেখব জানি নে। এখন চল, তোমাকে পাল্কীতে বসিয়ে একটা সল্লা ক'রে বেরিয়ে পড়ি।"

"শুধু হাতে যাবে ?"

"শুধু হাতে নয়,—সকলের লাঠি আছে পাল্কীর নীচে বাধা।"

ব্যগ্রস্বরে প্রিয়লাল বললে, 'আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব মোহন ''

প্রিয়লালের কথা শুনে মোহন একটু যেন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল ; বললে, "এ সময়ে বাজে কথা ব'লে সময় নষ্ট ক'রো না ছোটবাবু, তুমি কি আমাদের সঙ্গে এই আঁধারে বন-বাদাড় ভেঙে চলতে পারবে ? এখনো ছুটে গেলে যদি কোনো রকমে তাদের ধরতে পারি। এ বন ছেড়ে অন্য বনে ঢুকলে আর কিনারা লাগাতে পারব না।'

মোহনের কথা শুনে প্রিয়লাল আর কোনও কথা না ব'লে তার কাঁধে ভর দিয়ে পাল্কীর কাছে ফিরে এল। এসে দেখলে, ক্ষীরোবর সিং মরে নি, পাল্কীর কাছে উবু হয়ে ব'সে রয়েছে। প্রিয়লালকে দেখে সে উঠে দাঁড়িয়ে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠল, বললে, "হামি জিন্দা আছি—এ বহুৎ শরমের মহ্‌রাজ! বহুরাণীকে হামি রবৃছা করতে পারলাম না, হামার জান্ গেলে ভালো ছিলো।"

প্রিয়লাল উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তাকে বাধা দিয়ে মোহন বললে, "তোমার বন্দুক কোথায় সেপাইজী ?"

বন্দুকটি ক্ষীরোধর্ সিং খুঁজে বার করেছিল; বললে, "বন্দুক ঈ কা আছে।"

"বহুরাণীর তল্লাসে আমরা যাচ্ছি, তুমি আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে?"

"বহুরাণীর ওয়াস্তে জান দিতে পারে, আর তল্লাসে যেতে পারবে না?—আলবাৎ যেতে পারবে।"

তখন মোহন সহসা সমস্ত অরণ্য কম্পিত ক'রে অতিশয় উচ্চৈঃস্বরে একটা হুঙ্কার দিয়ে উঠল। উত্তরে দূর থেকে মনুষ্যকণ্ঠের সাড়া পাওয়া গেল।

তেমনি উচ্চৈঃস্বরে মোহন চিৎকার ক'রে উঠল, "হা—আ—জিব্।"

দেখতে দেখতে পাল্কী বেহারারা সকলেই এসে উপস্থিত হ'ল, শুধু রঘু নামে একজনের কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। সে সকলের অগোচরে সোজা ঝাড়গ্রাম চ'লে গিয়েছিল জহরলালকে ডাকাতির সংবাদ দেবার জন্যে।

মিনিট দুই-তিনের মধ্যে সকলের সঙ্গে একটা মোটামুটি পরামর্শ ক'রে নিয়ে ডাকাতরা যে-দিকে গিয়েছিল সেই পথে মোহন সদলে বেরিয়ে পড়ল। সকলের হাতে লাঠি, ক্ষীরোধর সিংয়ের হ'তে বন্দুক। রূপণ সিংকে এবং একজন বেহারাকে তারা রেখে গেল প্রিয়লাল এবং মতির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। লণ্ঠনও রেখে গেল তাদের নিকট।

লণ্ঠন নিয়ে মতির কাছে রূপণ সিং আর পাল্কী-বেহারাকে বসতে ব'লে প্রিয়লাল ধীরে ধীরে সন্ধ্যার পাল্কীর ভিতর প্রবেশ করলে। কিছুক্ষণ পূর্বেও এই শয্যা সন্ধ্যাকে ধারণ ক'রে ছিল। সন্ধ্যা,—তার সুখ-সৌভাগ্যলক্ষ্মী সন্ধ্যা,—তার অন্তরের অমূল্য সম্পদ সন্ধ্যা! এখনো যেন শয্যার মধ্যে তার মধুময় স্পর্শটুকু লেগে রয়েছে। উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়ে প্রিয়লাল সমস্ত শরীর বিস্তার ক'রে শয্যার উপর শুয়ে প'ড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। নিরুপায় দুর্ভাগ্যের এ কি মর্মন্তুদ গ্লানি!—বিগত কয়েক দিনের অপূর্ব সুখসম্ভোগের কথা মনে পড়ল,—মনে পড়ল নদীর ওপারের সুদীর্ঘ পথের কাব্য-যাপনার স্মৃতি! যে

অদৃষ্ট-দস্যু নিমেষের মধ্যে সে-সকল এমন ক'রে অপহরণ করলে সমস্ত মন তার বিরুদ্ধে বিষিয়ে উঠল।

রাত্রি দশটার সময়ে দূরে মনুষ্যকণ্ঠধ্বনি শোনা গেল। পাল্কী থেকে মুখ বাড়িয়ে প্রিয়নাথ পাঁচ-সাতটা আলো দেখতে পেলে। অবুঝ মন মনে করলে, সন্ধ্যাকে নিয়েই বা তারা ফিরে আসছে। এসে উপস্থিত হলেন জহরলাল—পুলিস আর লোকজন নিয়ে, সঙ্গে রঘু বেহারা।

নিরতিশয় ব্যগ্রতার সহিত উদ্বিগ্ন মুখে জহরলাল জিজ্ঞাসা করলেন, "বউমার কোনো সন্ধান পেয়েছ প্রিয় ?—পাওয়া গেছে তাঁকে ?"

মাথা নেড়ে প্রিয়লাল বললে, "না।"

"লোকজনেরা কোথায় ?"

"খুঁজতে বেরিয়েছে।"

নূতন দল অবিলম্বে আর এক দিকে বেরিয়ে পড়ল। সমস্ত রাত ধ'রে চলল সারা অরণ্য তোলপাড় ক'রে অধীর অন্বেষণের পালা। দেখতে দেখতে রাত্রি প্রভাত হয়ে গেল, কিন্তু কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। তখন পুনরায় নূতন উদ্যমে তারা চতুর্দিকে সন্ধ্যার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। নদীর ধারে ধারে, বনের ঝোপে ঝাড়ে, দু তিন মাইল দূরান্তরের গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে চলল অন্বেষণ। কিন্তু কোনো ফল হ'ল না। সমস্ত পরিশ্রম পণ্ডশ্রম হ'ল।

অবশেষে পুলিসের হাতে অন্বেষণের ভার সমর্পণ ক'রে বধূহীন ভাগ্যহীন অস্নাত অভুক্ত প্রিয়লালকে সঙ্গে নিয়ে জহরলাল হাওড়াগামী দ্বিপ্রহরের রেল-গাড়িতে এসে উঠলেন।

অচিন্তনীয় দুর্ঘটনা!—পীরনগরের চৌধুরী-বংশের অম্লান গৌরব-পটে কলঙ্কের কুৎসিত রেখা!

গাড়ি চলতেই জহরলাল শয্যা গ্রহণ করলেন।

পাঁচ

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের গালুডি স্টেশনের মাইল দশেক দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি বৃহৎ শালবনের প্রান্তদেশে তিরোবিয়া নামে একটি অতিক্ষুদ্র গ্রাম আছে। গ্রামের ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ ঘর অধিবাসীর মধ্যে ঘর পাঁচেক মুসলমান ও দুই ঘর হিন্দু গোয়ালা ভিন্ন বাকি সমস্তই কোল, ভীল প্রভৃতি অসভ্য জাতি। চক্রধরপুরের বনে লাক্ষা সংগ্রহ এবং সিংভূমের অভ্র ও লোহার খনিতে কুলিগিরি ছাড়া অর্থোপার্জনের জন্যে এরা মাঝে মাঝে যে দু-চার রকমের উপায়ান্তর অবলম্বন ক'রে থাকে তার একটির নমুনা পীরনগর থেকে ঝাড়গ্রামের পথে সন্ধ্যা-হরণের দিন দেখা গেছে। অবশ্য সে ব্যাপারে পীরনগর অঞ্চলের বীরগণই প্রধান উদ্যোক্তা; কিন্তু পুলিসের দুরতিক্রম অন্বেষণ থেকে মাল এবং মানুষকে নিরাপদে রাখবার জন্য সুদূর স্থানের সহধর্মীদের সহযোগিতার প্রয়োজনও তাদের কম নয়। সুতরাং সেদিনকার ডাকাতির দলপতি রঘু গয়লা পীরনগরের নিকটবর্তী স্থানের অধিবাসী হ'লেও প্রায় মাসাবধিকাল সন্ধ্যা পঞ্চাশ মাইল দূরবর্তী তিরোবিয়া গ্রামের একটি গৃহে অবরুদ্ধ আছে। রঘু বেয়ারারূপী এই রঘু গয়লাই ডাকাতির দিনে ঝাড়গ্রামে উপস্থিত হয়ে জহরলালকে ডাকাতির সন্ধান দিয়েছিল, এবং প্রভুভক্ত ভৃত্যের অবয়ব ধারণ ক'রে পুলিসকে সেদিন সমস্ত রাত এবং পরদিন বৈকাল পর্যন্ত অবিরত ভুল পথে প্রবর্তিত ক'রে পরিশ্রান্ত ক'রে মেরেছিল।

তিরোবিয়া গ্রামে যাদের গৃহে সন্ধ্যা বাস করছে তারা দু ভাই,—গফুর ও মহবুব। ডাকাতির দিনে এরা দুজনেই দলে ছিল, এবং তিন দিন শুধু রাত্রি-কালে পথ দেখিয়ে দেখিয়ে বন বাদাড়, পর্বত প্রান্তর অতিক্রম ক'রে সন্ধ্যাকে তিরোবিয়ায় নিয়ে আসে। পুলিসের সন্দেহে যাতে না পড়ে সেজন্য রঘু সঙ্গে

আসে নি, কিন্তু সন্ধ্যার দেহে যে সকল অলঙ্কার ছিল তার তালিকা এবং ওজন নির্ধারিত করবার জন্য তার ভগ্নীপতি নিতাইকে দলের সঙ্গে পাঠিয়েছিল।

ঘটনার দিন সকালবেলা যখন রঘু নিতাইকে তার কর্তব্য-কার্যের বিষয়ে গোপন উপদেশ দিচ্ছিল তখন কৌতূহলী হয়ে নিতাই জিজ্ঞাসা করেছিল, "ভাগ-বাঁটরার কিছু ঠিক হয়েছে রঘু?"

রঘু বলেছিল, "সে কথা আগে ঠিক না হ'লে, পরে কি আর হয় রে? পরে ঝগড়াই হয়। ঠিক হয়েছে।"

"কি ঠিক হয়েছে?"

"ঠিক হয়েছে আধা-আধি। আধা গহনা তারা পাবে, আধা পাব আমি।"

একটু নীরব থেকে কি একটা কথা মনে মনে ভেবে নিতাই বলেছিল, "আর যারা খাটবে তাদের মেহনতয়ানা কি দেবে, তাও ঠিক হয়েছে নাকি?"

"তাও হয়েছে। গফুরদের এলাকার লোকেরা গফুরদের হিস্‌সা থেকে দু আনা পাবে, আমিও আমার এলাকার লোকদের মধ্যে আমার হিস্‌সা থেকে দু আনা বেঁটে দেব।"

"আর, মেয়েটার ভাগাভাগি কি রকম হবে রঘু?"

"মেয়েটার আবার ভাগাভাগি কি হবে? সে আমার ভাগে থাকবে।"

"তোমার ভাগে থাকবে? কোথায় রাখবে তাকে? বাড়িতে রাখলে তো পুলিসের হাতে ধরা পড়বে।"

নিতাইয়ের কথা শুনে রঘু হেসে উত্তর দিয়েছিল, "সে কি বাড়ির বউ যে বাড়িতে রাখব? কিছুদিন বনে-বাদাড়ে আমার ভোগে থাকবে, তার পর ঠাণ্ডা হয়ে গেলে কলকাতায় বাগান-বাড়িতে চড়া দামে বড়লোকের হাতে বেচে দোব?

"গফুরদের বাড়ি থেকে তাকে নিয়ে আসবে কবে?"

"মাস দুই তো নয়। পুলিসের তল্লাস জুড়িয়ে গেলে তারপর তাকে বালুডির

পাহাড়ে নিয়ে যাব। সেখানে পুলিস তো পুলিস, চন্দোর্‌ সূয্যি সেঁদোবার উপায় নেই।"

তিরোবিয়ায় পৌঁছে সন্ধ্যার অলঙ্কারের ফিরিস্তি এবং ওজন ক'রে নিয়ে পরদিন রাত্রেই নিতাই গ্রামে ফিরল। গালুডি হয়ে ট্রেনে ফিরে যাবারই তার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু রেলে স্টেশনে. স্টেশনে পুলিসের নজর থাকতে পারে, সেই আশঙ্কায় গফুর তাকে ট্রেনে যেতে না দিয়ে বনপথেই ফেরত পাঠালে,—সঙ্গে দিলে মহবুবকে অজানা পথের প্রান্ত পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসবার জন্যে।

যত দিন নিতাই সঙ্গে ছিল, মাত্র শাসনে রাখবার জন্য যেটুকু প্রয়োজন, তার বেশি উৎপীড়ন সন্ধ্যার প্রতি কেউ করে নি। কিন্তু নিতাই চ'লে যাওয়ার পর মহবুবের দিক থেকে নির্যাতনের মাত্রা অল্পে অল্পে দিনে দিনে বেড়ে উঠতে লাগল। অবশেষে যেদিন সে গভীর রাত্রে মদ খেয়ে বাড়ি ফিরে সন্ধ্যার ঘরের দ্বার জবরদস্তি ক'রে খুলিয়ে ভিতরে প্রবেশ ক'রে অর্গল লাগিয়ে দিলে, সেদিন গফুরের অসহ্য হ'ল। দ্বারে ঘন ঘন করাঘাত ক'রে সে মহবুবকে ডাকতে লাগল।

পাশের একটা ছোট জানলার পাল্লা ঈষৎ উন্মুক্ত ক'রে বিরক্তিপূর্ণ স্বরে মহবুব বললে, "হল্লা করছিস কেন?"

গফুর বললে, "আমার কথা শোন্‌,—দোর খুলে বেরিয়ে আয়।"

গফুরের কথা শুনে মহবুব উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল,—সে হাসি আর কিছুতেই থামিতে চায় না। গফুর তার বড় ভাই, কিন্তু তখনকার মত সে সম্পর্ক সম্পূর্ণ-ভাবে অগ্রাহ্য ক'রে একটা বিকট সম্বোধন প্রয়োগ ক'রে সে একটা কুৎসিত রসিকতা করলে। তার পর জানলাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে সহসা একটা প্রচণ্ড হুঙ্কার দিয়ে উঠল, সম্ভবত সন্ধ্যার মনে সন্ত্রাস জাগিয়ে তোলবার অভিপ্রায়ে।

মহবুবের উদ্দেশ্যে একটা গালি বর্ষণ ক'রে গফুর গৃহ-প্রাঙ্গণে তার পরিত্যক্ত খাটিয়ায় এসে শুয়ে পড়ল; কিন্তু ঘুম আর কিছুতেই আসে না। বর্ষণহীন

মেঘময় শ্রাবণ-দিনের ভাপসা গরম, তার উপর সন্ধ্যার ঘরে থেকে থেকে চাপা কণ্ঠের আর্তনাদ। কিছুক্ষণ শয্যায় এ-পাশ ও-পাশ ক'রে মহবুবের উদ্দেশে আবার একটা গালি পেড়ে গফুর খাটিয়াটা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে গিয়ে শয়ন করল।

সকালে মহবুব যখন সন্ধ্যার ঘর থেকে বেরিয়ে এল তখনো তার দুই চক্ষু রক্তাভ; খোঁয়াড়ির ঠিক অব্যবহিত পূর্বের অবস্থা, অপচীয়মান নেশার মৃদু আবেশে মন তখনো ঈষৎ প্রদীপ্ত।

মহবুবের দিকে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে গফুর তাকিয়ে বললে, "কাজটা ভাল করলি নে মহবুব।"

পিছন ফিরে থমকে দাঁড়িয়ে মহবুব বললে, "কি মন্দ করলাম শুনি ?"

"সেটা তুই বুঝতে পারছিস নে ?"

সজোরে মাথা নেড়ে মহবুব বললে, "না।"

গফুর বললে, দেখ্ মহবুব, ইমান শুধু ভাল লোকের জন্যেই নয়, চোর ডাকাতকেও ইমান বাঁচিয়ে চলতে হয়, নইলে তাদের নিজেদেরই সর্বনাশ। চোর-ডাকাতেরা যদি নিজেদের মধ্যে ইমান রেখে না চলত তা হ'লে তাদের আর ক'রে খেতে হ'ত না, সকলকেই জেলখানায় ঘানি টানতে হ'ত।"

অধীরভাবে তর্জন ক'রে উঠে মহবুব বললে, "বেশ, তাই যেন হ'ল, কিন্তু বেইমানিটা কি করলাম তাই খুলে বল্ না ?"

"বেইমানি নয় ? এ কাজে আমরা হাত দিয়েছিলাম এই শর্তে যে, মেয়েটা পড়বে শুধু রঘু গয়লার ভাগে। আর তুই কি ক'রে তার ওপর এ রকম জুলুম করছিস ?"

"জুলুম করছি, না, তার ভাল করছি ? আমি তো তাকে সাদী ক'রে জোরু বানাব, কিন্তু রঘু কি করবে জানিস ? তাকে কলকাতার বাজারে বিক্রি ক'রে পয়সা করবে। জুলুম তো সে-ই করবে।"

"এ তুই কি ক'রে জানলি ?"

মহবুব বললে, "যাবার পথে নিতাই আমাকে ব'লে গিয়েছে। তা ছাড়া, দোসরা আর কি হতে পারে বল্ তো গফুর? মেয়েটার জাত আছে, না, ইজ্জৎ আছে, না, আর কিছু যে হিঁদুর ঘরে তার ঠাঁই হবে? এ কি মুসলিম ঘরের কথা যে, জাত মারতেও যেমন জানে, দিতেও তেমনি পার?"

মহবুবের এ যুক্তি গফুরকে একটু দমিয়ে দিলে। এ কথা সত্যই অস্বীকার করা চলে না যে, যে-ব্যাপার ঘ'টে গেল তারপর শ্বশুরগৃহে অথবা পিতৃগৃহে সন্ধ্যার স্থান হওয়া কঠিন হবে। মনে মনে একটা-কি সে চিন্তা করলে, তার পর বললে, "আচ্ছা, রঘু এখানে এলে তখন যা-হয় করা যাবে, কিন্তু সে যতদিন না আসছে সবুর ক'রে থাক্।"

মাথা নাড়া দিয়ে মহবুব বললে, "কেন সবুর করতে যাব? রঘুর সঙ্গে এ কথা কি আছে যে, সে আসা পর্যন্ত সবুর ক'রে থাকতে হবে? এ আমি ব'লে রাখছি গফুর, এ মেয়ে আমার চাই-ই,—সে জন্যে যদি আমার জান্ দিতে হয় সোভি আচ্ছা।" ব'লে সদর্পে বড় বড় পা ফেলে প্রস্থান করলে।

সমস্ত দিনের কাজ সেরে মহবুব যখন বাড়ি ফিরল, তখন রাত্রি প্রায় আটটা। আট মাইল দূরে জেরোবার বনে সে গিয়েছিল লাক্ষা সংগ্রহের কাজে।

গফুর আজ কাজে যায় নি, সমস্ত দিনই বাড়ি আছে। এখন সে তার খাটিয়ার শুয়ে আকাশ-পাতাল অনেক কথাই মনে মনে চিন্তা করছিল। মনটা তার কিছু দিন থেকে ভাল যাচ্ছে না, বিশেষত গত রাত্রি থেকে একেবারেই না। বয়স তার চল্লিশ উত্তীর্ণ, মাথার বাঁ দিকে জুলফির উপরে একগোছা চুল সাদা হয়ে এসেছে, কিন্তু দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহে শক্তি এবং সামর্থ্যের কোন হ্রাস হয়েছে ব'লে মনে হয় না, যৌবন তার সমস্ত সম্পদ প্রৌঢ়ত্বকে সমর্পণ ক'রে দিয়েছে। কিন্তু মনের মধ্যে এমন একটা নূতন অজানা হাওয়া প্রবেশ করেছে যে, মন এখন স্থির হয়ে দাঁড়ায়, চিন্তা করে, এমন কি সময়ে

সময়ে যেন বিগত জীবনের গতিধারাকে প্রতিবাদ করবারও উপক্রম করে। বিবাহ সে পর পর দুবার করেছিল, কিন্তু দুটি স্ত্রীই তাকে দাম্পত্য জীবনের সুখ বেশি দিন ভোগ করতে দেয় নি; এমন কি ইহলোক পরিত্যাগ ক'রে পরলোকে প্রস্থানের পূর্ব্বে উক্ত দাম্পত্য-জীবনের কর্তব্যমোচন-স্বরূপ একটি সন্তানও স্বামীকে উপহার দিয়ে যায় নি। মানুষের ভাগ্যলিপিতে পুত্র-কলত্রের যেখানে স্থান, সেখানে গফুরের অশুভ গ্রহের দৃষ্টি। জীবনের প্রেরণাই বল আর তাড়নাই বল, কোনো খোঁটাতেই কোথাও সে বাঁধা ছিল না, কিন্তু তবুও একান্ত নিষ্ঠার সহিত সমস্ত সদসৎ কায বরাবর ক'রে এসেছে। এখন সময়ে সময়ে মনে হয়, আর কেন!

মহবুব গফুরের চেয়ে বছর দশেকের ছোট। তার স্ত্রী কিছুদিন থেকে পুত্রকন্যাসহ পিত্রালয়ে বাস করছে। মহবুবের দেহ এবং মন দুই-ই কঠিন। কার্য বিষয়ে সে ঘোরতর সাম্যবাদী, অর্থাৎ কাযের মধ্যে শ্রেয় হেয় এমন কোনো শ্রেণী বিভাগ আছে ব'লে সে একেবারেই মনে করে না। তার মতে এমন কোনো কাজ নেই যার সংস্পর্শে মানুষ দেহে-মনে অশুচি হতে পারে। তবে একমাত্র সেই সকল কাজ আভিজাত্যের দাবি করতে পারে, যেগুলি সমাধা করবার জন্য অত্যধিক শক্তি এবং সাহসের প্রয়োজন হয়। কাজের মধ্যে জাত ব'লে যদি কিছু মানতে হয় তা হ'লে মানুষের জীবন নেওয়া সকলের চেয়ে বড় জাতের কাজ, কারণ সে বিষয়ে কোন রকম ত্রুটি ঘটলে নিজের জীবনও দিতে হতে পারে।

মহবুব গিয়েছিল পুকুরে মুখ-হাত-পা ধুতে। সেই অবসরে গফুর তার শয্যা পরিত্যাগ ক'রে সন্ধ্যার ঘরের সামনে এসে দরজাটা একটু খুলে ধীরে ধীরে ডাকলে, "হামিদা!"

সন্ধ্যা তার নিজের নাম গফুরদের কাছে প্রকাশ করতে স্বীকৃত না হওয়ায় বেশি পীড়াপীড়ি না ক'রে গফুর বলেছিল, "আমি তোমার নাম দিলাম—

হামিদা। যতদিন আমাদের বাড়ি থাকবে আমরা তোমাকে হামিদা ব'লে ডাকব—সাড়া দিয়ো।" সন্ধ্যা কিন্তু কোনোবারেই সে নামে সাড়া দেয় নি—এবারও দিল না।

গফুর বললে, "হামিদা, মহবুব বাড়ি এসেছে। জান তো ওর অসাধ্য কোন কাজই নেই। উঠে এসে কিছু খাও।"

ঘরের মেঝেতে সন্ধ্যা উপুড় হয়ে প'ড়ে ছিল, মাথা নেড়ে বললে, "না।"

"কিন্তু মহবুব তো সহজে ছাড়বে না, সে একটা অনর্থ বাধিয়ে বসবে।"

এ কথার সন্ধ্যা কোন উত্তর দিল না,—যেমন প'ড়ে ছিল তেমনই প'ড়ে রইল। গফুর অনেকক্ষণ পীড়াপীড়ি করলে, কিন্তু কোনো ফল হ'ল না। অবশেষে পুকুর থেকে হাত-মুখ ধুয়ে মহবুব সেখানেই এসে পড়ল। গফুরকে সন্ধ্যার ঘরের দ্বারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলে, "কি হয়েছে?"

গফুর বললে, "হামিদা সমস্ত দিন কিছু খায় নি,—এমন কি জলস্পর্শ পর্যন্ত করে নি। তাকে খাবার জন্যে বলছিলাম।"

"জোর ক'রে খাওয়াস নি কেন?"

একটু হেসে গফুর বললে, "জোর ক'রে একটা এক বছরের বাচ্চাকে খাওয়ানো যায় না, আর সতেরো আঠোরো বছরের একটা সমত্ত মেয়েকে জোর ক'রে খাওয়াবি?"

"কেমন খাওয়ানো যায় না আমি একবার দেখছি!" ব'লে বিকট স্বরে হুঙ্কার দিয়ে মহবুব ছুটে তাঁর নিজের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে, তারপর প্রকাণ্ড একটা চকচকে ছোরা নিয়ে সন্ধ্যার ঘরে দ্রুতবেগে প্রবেশ ক'রে পদাঘাতে তাকে চিৎ ক'রে দিয়ে ছোরাটা একেবারে বুকের উপরে ধ'রে বললে, "শীগগির উঠে আয়, নইলে সমস্ত ছোরাটা তোর বুকের মধ্যে সেঁদিয়ে দোব।"

সন্ধ্যার সমস্ত শরীরের মধ্যে কোথাও একটু মৃদু স্পন্দন পর্যন্ত দেখা গেল না,—মহবুবের মুখে দৃষ্টিপাত ক'রে স্থির অবিচলিত কণ্ঠে বললে, "দাও।"

গফুর দৌড়ে এসে মহবুবের হাত থেকে ছোরাটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তাকে টেনে বাহিরে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে বললে, "তুই কি পাগল হ'ল মহবুব? যে মরবার জন্যে একেবারে পুরোপুরি তৈরি হয়েছে, তাকে তুই ছোরা দিয়ে ভয় দেখাতে যাস? ও যে মরবার জন্যে মরিয়া হয়েছে রে!"

"তা ব'লে না খেয়ে মরবে?"

"তাই ব'লে ছোরা মেরে মারবি?"

মারবে যে কত তা বুঝতে আর বাকি নেই। ধপ ক'রে মহবুব ভূমির উপর ব'সে পড়ল। তার শরীরের সমস্ত স্নায়ু এবং পেশীগুলো অকস্মাৎ যেন ঢিলা হয়ে গিয়েছিল। দাঁড়িয়ে থাকবার মতোও ক্ষমতা তার ছিল না। মানুষ যখন সহসা তার শক্তির সীমান্তে উপস্থিত হয়ে দেখে যে, সেইখানেই তার শেষ. আর এক ইঞ্চিও বাড়াবার উপায় নেই, তখন তার এমনি অবস্থাই হয়। ভয় দেখিয়ে যখন ভয় পাওয়ানো যায় না, তখন সে নিজেই ভয় পেয়ে যায়। সেই জন্য বুদ্ধিমানেরা শেষ অস্ত্র সহজে ছাড়তে চায় না।

সন্ধ্যার উপর মহবুবের ক্রোধ আবার জেগে উঠল। কিন্তু সে ক্রোধের প্রকাশ যে কি ভাবে করবে তা ভেবে পেলে না। বুকের উপর ছোরা বসানো ব্যর্থ হ'লে মাথার উপর লাঠি ঘুরিয়েও লাভ নেই। সে গফুরের দিকে বিহ্বল-ভাবে দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "তা হ'লে যা হয় একটা উপায় কর্।"

"করছি, তুই একটু আড়ালে যা।" ব'লে গফুর সন্ধ্যার ঘরের দিকে অগ্রসর হ'ল।

কিন্তু উপায় তো সেদিন হ'লই না—অধিকন্তু তারপর দু দিনেও হ'ল না। অথচ অবস্থা এ রকম হয়ে এল যে, মৃত্যু যেন আসন্ন। হাত পা শীতল, চক্ষু মুদ্রিত, নিশ্বাস এত ক্ষীণ যে ভাল ক'রে নিরীক্ষণ না করলে বোঝাই যায় না যে পড়ছে, না, বন্ধ হয়েছে। আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, উপরোধ, ভয়প্রদর্শন, বলপ্রকাশ সবই ব্যর্থ হয়েছে। কোনো ঔষধেই কিছুমাত্র ফল পাওয়া যায় নি।

এখন একমাত্র উপায় হচ্ছে পুলিসে খবর দেওয়া,—কিন্তু সে তো একরকম গর্দান দেওয়ারই সামিল।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যার পর দুই ভাইয়ে ব'সে চিন্তায় আকুল হয়ে উঠেছে, এমন সময়ে হাসতে হাসতে প্রবেশ করলে বাইশ-তেইশ বছরের একটি যুবতী এবং তার পিছনে পিছনে একটি যুবক।

যুবতীকে দেখে গফুরের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল; বললে, "আমিনা, এলি না কি রে?—আয় বোন, আয়।"

মহবুবের মুখ কিন্তু কঠিন হয়ে উঠল; বললে, "খবর-টবর না দিয়ে হঠাৎ এ রকম এসে পড়লি যে?" কথায় অপ্রসন্নতার সুর।

হাসতে হাসতে আমিনা বললে, "বা রে, বাপের বাড়ি আসব, ভাইয়ের বাড়ি আসব, তা আবার খত লিখে খবর পাঠিয়ে আসতে হবে না কি?"

গফুর বললে, "না, না, বেশ করেছিস এসেছিস। আমরা ভারি একটা ফ্যাসাদে পড়েছি—দেখি তুই যদি কোনো উপায় করতে পারিস।"

চিন্তিত-মুখে আমিনা বললে, "কি ফ্যাসাদ দাদা? মা ভাল আছে তো?"

গফুর বললে, "মার আর ভাল থাক-থাকি কি? বাতে পঙ্গু হয়ে পাথরের মত প'ড়ে আছে।"

"ছোট বউ? তার ছেলেপিলে?"

"তারা সব মহবুবের শ্বশুর-বাড়ি।"

"তবে ফ্যাসাদ কিসের?"

গফুর বললে, "বলছি। ইয়াসিন ভাই, পুকুর থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এস, তোমাকেও সব কথা বলব।"

গফুর এবং মহবুবের আমিনা সহোদরা ভগ্নী, এবং ইয়াসিন তার স্বামী। মাইল দশেক দূরে একটা গ্রামে ইয়াসিনরা সম্পন্ন গৃহস্থ।

ইয়াসিন প্রস্থান করলে গফুরের সম্মুখে ব'সে প'ড়ে আমিনা বললে, "কি বল শুনি?"

সংক্ষেপে সমস্ত ব্যাপারটা ব'লে গফুর বললে, "তুই একটু বিশেষ রকম চেষ্টা ক'রে দেখ্ যদি তাকে কিছু খাওয়াতে পারিস। একটু গরম দুধ খেলে এখনো বোধ হয় বাঁচে।"

সব শুনে আমিনা স্তব্ধ হয়ে একটু ব'সে রইল; তারপর বললে, "আমি এখনি চললাম,—কিন্তু এ সব ব্যাপার তোমরা ছেড়ে দাও দাদা।"

মহবুব বললে, "তা হ'লে মরদের পোশাকও ছাডতে হয়—ঘাগরা আর ওড়না পরতে হয়।"

আমিনা বললে, "ঘাগরা ওডনা না পরলে যদি এ সব ছাড়তে না পার তা হ'লে ঘাগরা ওডনাই প'রো।" ব'লে হাসতে হাসতে প্রস্থান করলে।

ছয়

পরদিনের কথা।

ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি। সকাল থেকে মাঝে মাঝে লঘু মেঘের হালকা বর্ষণ হয়ে গেছে,—অপরাহ্ণের দিকে আকাশ নির্মল, বায়ুতে মৃদু শৈত্যের স্পর্শ। আমিনা গফুরের অনুমতি নিয়ে সন্ধ্যাকে তার কারাকক্ষ থেকে বার ক'রে বাড়ির পিছন দিকে একটা ঝোপের আড়ালে এসে বসেছে। তিরোবিয়ায় এসে পর্যন্ত সন্ধ্যার এই প্রথম বায়ু সেবন করবার জন্য বাইরে এসে বসা। গফুর বারম্বার আমিনাকে সতর্ক ক'রে দিয়েছে যে, সন্ধ্যা যেন কোনো গ্রামবাসীর দৃষ্টিতে না পড়ে,—আর একান্তই যদি কেউ তাকে দেখে ফেলে তো তার দূরসম্পর্কীয়া ননদ ব'লে যেন পরিচয় দেয়—দু দিনের জন্য তিরোবিয়ায় বেড়াতে এসেছে।

সন্ধ্যাকে লক্ষ্য ক'রে গফুর বলেছিল, "আমি তোমাকে ভাল মেয়ে ব'লেই জানি হামিদা, কিন্তু তবু তোমাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি যে, হঠাৎ যদি কোনো লোকজনের সামনে পড তো চেঁচামেচি ক'রে ছেলেমানুষি ক'রো না। তাতে কোনো ফল হবে না, লাভের মধ্যে আমি তোমাকে মহবুবের হাতে একেবারে ছেড়ে দোব—তার পর সে তোমাকে বনের মধ্যেই নিয়ে যাক বা আর কোথাও লুকিয়ে রাখুক। চেঁচামেচি করলে ফল হবে না কেন বলছি জান? আমাদের এ গাঁয়ে যে কয়েকজন লোক বাস করে সব এক বাড়ির মতো,—সকলেই এক পেশা, এক পরামর্শ। কেউ কারোর শক্রতা করবে সে উপায় নেই।"

অন্য দিকে দৃষ্টি স্থাপিত ক'রে সন্ধ্যা মৃদুস্বরে উত্তর দিয়েছিল, আমি তো বাইরে যেতে চাচ্ছি নে।"

"চাচ্ছ না, কিন্তু যাচ্ছ তো? সেই জন্যে হুঁশিয়ার ক'রে দিলাম।"

উত্তরে আমিনা বলেছিল, "তুমি মিছে ভয় করছ ভাইজান, হামিদা ভারি ভাল মেয়ে।"

গফুর হেসে উত্তর দিয়েছিল, "আমিই কি হামিদাকে মন্দ বলছি! বাঘের মুখ থেকে হঠাৎ ছাড়ান পেলে হরিণ তড়বড়িয়ে পালিয়েই থাকে,—তাই ব'লে কি তাকে মন্দ বলবি আমিনা? আচ্ছা, তোবা যা, একটু ফাঁকায় গিয়ে ব'স,—আমি এখানে আছি, কোনো ভয় নেই।"

দূরে তালবনের পাশে ঘন নীলবর্ণের গিরিশ্রেণী দেখা যাচ্ছিল,—সেই দিকে চেয়ে চেয়ে সহসা সন্ধ্যার দুই চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে এল। তার পর ধীরে ধীরে টপ্ টপ্ ক'রে দু-চার ফোঁটা চোখের জল গাল বেয়ে মাটিতে পড়ল।

ব্যস্ত হয়ে আমিনা বললে, "তুমি কাঁদ হামিদা? কাঁদ কেন তুমি?"

তাড়াতাড়ি বস্ত্রাঞ্চলে চোখ মুছে সন্ধ্যা বললে, "কেন তুমি আমাকে অমন ক'রে কাল বাঁচালে আমিনা? কাল যদি আমাকে না বাঁচাতে, তা হ'লে আজ হয়তো এতক্ষণে একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারতাম।"

চক্ষু কুঞ্চিত ক'রে আমিনা বললে, "নিশ্চিন্তই যে হতে তা কি ক'রে বলছ হামিদা? তোমাদের হিন্দুদের শাস্তরে বলে—আত্মহত্যা মহাপাপ। পাপীরা মারা গেলে কোথায় যায় তা জান তো?"

"জানি, নরকে। কিন্তু সে কি এর চেয়েও খারাপ জায়গা?"

"কিন্তু এখানেই যে চিরকাল তুমি থাকবে তা কেমন ক'রে জানলে?"

আমিনার প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে সন্ধ্যা সজোরে তার দু হাত চেপে ধরলে; উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললে, "এখান থেকে আমি উদ্ধার হব আমিনা? বল, বল, সত্যি ক'রে বল,—হব?"

"খোদাতালার মর্জি হ'লে হতে পার।"

এবার দুই হাত দিয়ে সন্ধ্যা আমিনার দেহ জড়িয়ে ধরলে; বললে, "কে আমাকে উদ্ধার করবে ভাই? তুমি?"

সন্ধ্যার আকুলতা দেখে আমিনার চক্ষু সজল হয়ে উঠল, মুখে কিন্তু মৃদু হাসিও দেখা দিলে; বললে, "আমি সামান্য মেয়েমানুষ, আমি তোমাকে কি ক'রে উদ্ধার করব হামিদা?"

প্রবল ভাবে মাথা নাড়া দিয়ে সন্ধ্যা বললে, "না আমিনা, তুমি সামান্য মেয়েমানুষ নয়—একমাত্র তুমিই আমাকে উদ্ধার করতে পার। তোমার দাদারা তো দস্যু—জানোয়ারের মতো; তাদের কাছ থেকে কখনো দয়া প্রত্যাশা করতে পারি নে।"

কপট কোপ প্রকাশ ক'রে আমিনা বললে, "বেশ মেয়ে তো তুমি? আমার দাদাদের দস্যু জানোয়ার ব'লে গালি দেবে আর আমি তোমাকে উদ্ধার করব?" তার পর সহসা কণ্ঠস্বর কোমল ক'রে নিয়ে বললে, "মহবুবের কথা তুমি যাই বলতে চাও বল, কিন্তু গফুর তো একেবারে নির্দয় নয় হামিদা?"

তা যে নয়, সে কথা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। নিমেষের মধ্যে গত মাস খানেকের ঘটনাবলী মনে মনে ভেবে নিয়ে সন্ধ্যা দেখলে, গফুর তার প্রতি মাঝে মাঝে সদয় ব্যবহার করেছে। মহবুবের উৎপীড়ন থেকে তাকে রক্ষা করবার অভিপ্রায়ে মহবুবের সঙ্গে সে বচসা করেছে, অনশনজনিত মৃত্যুর হাত থেকে তাকে বাঁচাবার জন্য বলপ্রয়োগ না ক'রে সুমিষ্ট বচনেই তাকে আহার করাতে চেষ্টা করেছে, এবং শেষ পর্যন্ত আমিনার নির্বন্ধে সে যে আহার করতে বাধ্য হয়েছিল তার মূলে গফুরের আগ্রহই বর্তমান ছিল—সে কথা জানতেও তার বাকি নেই। মাঝে মাঝে গফুর প্রয়োজনের অনুরোধে বজ্রনাদ করেছে বটে, কিন্তু তাই ব'লে বজ্রপাত করে নি।

অনুতপ্ত কণ্ঠে সন্ধ্যা বললে, "আমাকে মাপ ক'রো আমিনা, গফুরের বিষয়ে আমার ও কথা বলা অন্যায় হয়েছে।" তারপর হঠাৎ মনের মধ্যে একটা কথা উদয় হতে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে, "অ চ্ছা আমিনা, কখনো যদি তেমন দরকার হয় তো গফুরকে আমার কি ব'লে ডাকা উচিত?"

একটু ভেবে আমিনা বললে, "গফুর ব'লেই ডাকতে পার; আর, বয়সের জন্যে কিংবা অন্য কোনো কারণে বুড়োমানুষকে একটু যদি খাতির করতে ইচ্ছে হয় তা হ'লে গফুর মিঞা ব'লে ডেকো।"

"গফুর মিঞা? মিঞা মানে কি?"

"তোমাদের যেমন বাবু, আমাদের তেমনি মিঞা।"

মিঞা কথাটা সন্ধ্যার একেবারে অপরিচিত না হ'লেও তার যথার্থ প্রয়োগ সে জানত না। আমিনার মুখ থেকে শোনবার পর বার পাঁচ-সাত মনে মনে আবৃত্তি ক'রে রাখল

আমিনা বললে, "হামিদা, আমার একটি অনুরোধ রাখবে ভাই?"

"কি বল?"

"তোমার নাম আমাকে বলবে?"

আমিনার কথা শুনে সন্ধ্যার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল; বললে, "কি হবে ভাই, আমার নাম জেনে? সে মানুষও আমি এখন নই, সে নামেও আর দরকার নেই। এখন আমার হামিদা নামই ভাল।"

"কিন্তু হামিদা তো আর তোমার আসল নাম নয়—জোর ক'রে দেওয়া নাম। তোমার আসল নাম তুমি আর-কাউকে না বলতে চাও—শুধু আমাকে বল। আমি শপথ ক'রে বলছি, কাউকে আমি তোমার সে নাম বলব না। কাল থেকে যতবারই তোমাকে হামিদা ব'লে ডাকছি মনে ঠিক তৃপ্তি পাচ্ছি নে।"

"তৃপ্তি পাচ্ছ না? কেন, আমি তো হামিদা ব'লে ডাকলেই সাড়া দিচ্ছি?"

স্মিতমুখে আমিনা বললে, "তা দেবে না কেন। এই ধর, আমার নাম তো আমিনা, কিন্তু আমার আসল নাম জানতে না পেরে তুমি যদি আমাকে যশোদা ব'লে ডাকতে তা হ'লে আমিও হয়তো সাড়া দিতুম, কিন্তু তাই ব'লে আমাকে যা-তা একটা নামে ডেকে পুরোপুরি তৃপ্তি পেতে কি? তা ছাড়া হামিদা, তোমার আসল নাম বলতে ভয়ের তো কোনো কারণ নেই। আমরা তো আর

তোমার নাম টের পেলে পুলিসে গিয়ে লিখিয়ে দিয়ে আসছি নে। বরং সে ভয় আমাদেরই আছে যে, তুমি কোনোদিন ছাড়া পেলে আমাদের নাম পুলিসে লিখিয়ে দিতেও পার। অথচ আমরা তো তোমার কাছে আমাদের আসল নাম লুকোচ্ছি নে।”

আমিনার কথা শুনে সন্ধ্যার মুখ পুনরায় আরক্ত হয়ে উঠল। ম্লান হাসি হেসে সে বললে, “ভয়-টয় কিছু নয় আমিনা, তোমাকে এখনি বললাম তো ভাই, মনে হয়, যখন আগেকার জীবনে আর আমার অধিকার নেই, তখন আগেকার নামেও নেই। তোমাদের এই জেলখানায় আমাকে সে নামে তুমি নাই ডাকলে ভাই!” কথা শেষ করবার সঙ্গে সঙ্গেই সন্ধ্যার দুই চক্ষু থেকে টপ টপ করে পুনরায় কয়েক ফোঁটা জল ঝ’রে পড়ল।

সন্ধ্যার পিঠের উপর সযত্নে একটি হাত রেখে আমিনা বললে, “কষ্ট যদি হয়, থাক, ব’লে কাজ নেই।”

বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছে সন্ধ্যা বললে, “না, তুমি যখন জানতে চাইছ তখন বলছি। আমার নাম সন্ধ্যা।”

আমিনার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল; সহাস্য মুখে বললে, “সন্ধ্যা? চমৎকার নাম তো! ও মা, যেমন স্বভাব তেমনি নাম!”

আমিনাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধ’রে সন্ধ্যা বললে, “তা নয় ভাই, যেমন অদৃষ্ট তেমনি নাম।”

এ কথাও সত্য। আমিনার দুই চক্ষু সজল হয়ে এল। সেও দুই হাতে সন্ধ্যাকে জড়িয়ে ধ’রে নীরবে ব’সে রইল। দূরে গিরিমালা এবং তালবন ঘনায়মান সন্ধ্যার অস্পষ্টতায় ধূসর হয়ে আসছিল; একদল গো মহিষ অন্য গ্রাম থেকে এ অঞ্চলে চরতে এসেছিল, গলায় বাঁধা ঘণ্টায় সন্ধ্যার আগমনী বাজিয়ে তারা ফিরে চলেছিল গৃহাভিমুখে, তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে চলেছিল দুটি ভীল বালক মিহি সুরের বাঁশি বাজিয়ে। বহুক্ষণ কেটে গেল,—বেদনা-সমবেদনার

যুক্ত ক্রিয়ায় সন্ত-মিলিত দুইটি নারী ভাষা হারিয়ে পরস্পর বাহুবদ্ধ হয়ে নিঃশব্দে ব'সে রইল।

মৌন ভঙ্গ করলে সন্ধ্যা। আমিনার বাহুবন্ধন থেকে সহসা নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে তার মুখের উপর অবিচল দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "আমিনা, একটা কথার সত্যি উত্তর দেবে?"

"দোব,—কি কথা বল?"

"তুমি আমাকে ভালবেসেছ,—না?"

সন্ধ্যার কথা শুনে আমিনা যেন ধপ ক'রে আকাশ থেকে পড়ল;— সবিস্ময়ে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বললে, "শোন কথা। দেখা তো মোটে কাল থেকে, এর মধ্যে আবার ভালবাসলাম কখন?"

আমিনার কথা শুনে সন্ধ্যার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল,—অধীর কণ্ঠে বললে, "বাস নি? সত্যি বলছ—বাস নি?"

"র'সো, একটু ভেবে দেখি।" ব'লে ক্ষণকাল মনে মনে কি যেন তলিয়ে দেখে আমিনা বললে, "তোমার দুরবস্থা দেখে মনের মধ্যে একটু দয়া হয়েছে বটে,—কিন্তু ভালবাসা?—কই, না।"

সন্ধ্যার চোখ মুখ কঠিন হয়ে উঠল। সবলে মাথা নেড়ে সে বললে, "দয়া নয়, দয়া নয়। সে যদি হয়ে থাকে তো তোমাদের ঐ গফুর মিঞার হয়েছে। তারপর সহসা আমিনার উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তার বক্ষের মধ্যে মুখ ঘসতে ঘষতে বললে, "আমাকে শুধু দুধ খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না আমিনা, কখনই পারবে না; ভালবেসে হয় তো পারবে।"

দু হাতে সন্ধ্যার মুখ তুলে ধ'রে আমিনা বললে, "আচ্ছা, তা হ'লে না হয় ভালবাসাই যাবে। এখন চল, তোমাকে ঘরে পুরে তালা দিই,—মহবুব কখন এসে পড়ে কিছু বলা যায় না তো!" তারপর উঠে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে মৃদুস্বরে বললে, "বেসেছি সন্ধ্যা। খোদা-কসম, ভালবেসেছি।"

সাত

রাত্রে যখন মহবুব ফিরল, তখন নটা বেজে গেছে। হাত-মুখ ধুয়ে এসে দেখলে, আমিনা তার জন্ত আহার্য সাজিয়ে ব'সে রয়েছে। টপ ক'রে খাবারের সামনে ব'সে প'ড়ে বললে, "এ-সব খাবার তুই রেঁধেছিস না কি রে আমিনা?"

আমিনা বললে, "আমি দুদিনের জন্যে এসে,তোমাদের ব্যবস্থায় গোল বাধাব কেন? রহিমের মা খাবার দিয়ে গেছে—আমি শুধু বেড়ে দিয়েছি।"

আর বাক্যব্যয় না ক'রে মহবুব আহারে নিবিষ্ট হ'ল। প্রথমে সে ক্ষুধার্ত পশুর মতো এক রাশ খাদ্য উদরসাৎ করলে, তারপর জঠরাগ্নি কিঞ্চিৎ প্রশমিত হ'লে আমিনার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, "কেমন হালচাল আমিনা?"

"কিসের হালচাল?"

মহবুবের কণ্ঠস্বর রুক্ষ হয়ে উঠল—"কিসের আবার? হামিদার?"

সহজ ভাবে আমিনা বললে, "হামিদার আবার হালচাল কি?—যেমন আমরা রেখেছি তেমনই আছে। খাওয়া-দাওয়া করছে—"

"সে কথা জিজ্ঞেস করছি নে,—পোষ-টোষ মানলে কি-না তাই জিজ্ঞেস করছি।"

আমিনার মুখে কৌতুকের হাসি দেখা দিলে,—বললে, "তোমার বয়স হ'ল, কিন্তু বুদ্ধি হ'ল না মহবুব ভাই, কি যে বল তার ঠিক নেই।"

মহবুব গর্জন ক'রে উঠল, "চুপ কর্, চুপ কর্। ভারি ফাজিল হয়েছিস। ছেলেবেলায় শ্বশুরের কাছে ছাই-পাশ কি দুখানা বই পড়েছিলি, তাই তোর বুদ্ধির শেষ নেই—আর আমরা সব মুখ্খু!"

পূর্বের মতোই হাসতে হাসতে আমিনা বললে, "মুখ্খু তো নও, কিন্তু বুদ্ধিমানের মতো কথা বল না কেন? আচ্ছা, একটা জঙ্গলের জানোয়ারকে

পোষ মানাতে কত দিন লেগে যায়, আর একটা মেয়েমানুষ একদিনে পোষ মানবে ?"

মহবুব তর্জন ক'রে উঠল, "তা ব'লে পাঁচ দিনের বেশি আমি সবুর মানবো না তা ব'লে রাখছি। তার মধ্যে তোর চিড়িয়া পোষ মানলে তো ভাল, নইলে আমি তার সুরুয়া ক'রে তবে ছাড়ব।"

আমিনা হাসিমুখে বললে, "একবার তো সুরুয়া করতে গিয়েছিলে,—পেরেছিলে কি ? ওই তো তোমাকে কাবাব ক'রে ছেড়েছিল। আমি যদি হঠাৎ না আসতাম, এতদিন পুলিসের হাতে পড়তে।" তারপর সহসা মুখ গম্ভীর ক'রে গাঢ় স্বরে বললে, "না, না ভাইজান, ছেলেমানুষি ক'রো না। তুমি হামিদাকে চেনো না—ও একেবারে কেউটে সাপের জাত—সব ভাল মেয়েই তাই—ওকে ভয় দেখিয়ে বশে আনতে পারবে না। তুমি যদি ওকে সাদি করতে চাও,—বেশ তো ওকে খুশি কর, রাজী করাও, আমার ওজোর নেই। কিন্তু জুলুম ক'রে তুমি ওকে পাবে না।"

মনে মনে আমিনার মুণ্ডপাত ক'রে মহবুব বাকি আহারটা শেষ করলে। তারপর অঙ্গনের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "গফুরকে দেখছি নে যে ? গফুর কোথায় গেল ?"

"তার তবিয়ৎ ভাল নেই, ঘরের ভিতর শুয়েছে।"

"হামিদার ঘরের চাবি কার কাছে ?"

"আমার কাছে।"

বাঁ হাত বাড়িয়ে দিয়ে মহবুব বললে, "কই, দে আমাকে।"

ঈষৎ দৃঢ় স্বরে আমিনা বললে, "চাবি নিয়ে এখন তুমি কি করবে ?"

মহবুব উষ্ণ হয়ে উঠল; বললে, "সে কৈফিয়ৎও তোকে দিতে হবে না-কি ?"

"কৈফিয়ৎ আবার কি ? এমনি জিজ্ঞেস করছি।"

"হামিদাকে রাজী করাব।"

সজোরে মাথা নেড়ে আমিনা বললে, "কখনো না। তুমি হামিদাকে রাজী করাবে, আর আমি সমস্ত রাত সেখানে দাঁড়িয়ে পাহারা দোব, তা কিছুতে পারব না। দেখ ভাইজান, সমস্ত দিন খেটেখুটে এলে, এখন সারা রাত আগুনে শুয়ে ঘুমোও গে। শরীরটাকে বজায় রাখতে হবে তো? কাল সমস্ত রাত হামিদাকে নিয়ে কেটেছে, আমার নিজের শরীর ভাল নেই—আমি আজ সমস্ত রাত ঘুমোতে চাই।"

"তুই ঘুমোগে, মর্‌গে, যা ইচ্ছে হয় কর্‌গে। কিন্তু পাহারা দিবি কেন শুনি?"

সহাস্যমুখে আমিনা বললে, "শোন কথা! বাঘ যাবে হরিণকে রাজী করাতে আর আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোব?—পাহারা দোব না?"

মহবুব তার ডান পাটা সজোরে মাটিতে ঠুকে একটা চাপা হুঙ্কার দিয়ে উঠল। বললে, "খালি পেটে বাড়ি ফিরেছি ব'লে তোর ভারি সাহস হয়েছে দেখছি! চললুম খেয়ে আসতে। আগে তোকে খুন ক'রে তারপর তালা ভেঙে হামিদাকে খুন করব।"

আমিনা আবার হাসতে লাগল। বললে, "বেশ তো, আমিও চললাম হামিদার ঘরের দরজার সামনে শুতে। তুমি এসে দেখবে নিশ্চিন্ত হয়ে আমি ঘুমিয়ে আছি। দেখি, কত বড় মুরোদ তোমার, কেমন তুমি আমাদের খুন কর! কেন, মহবুব ভাই, খালি পেটে বোনের ওপর তোমার ছোরা চলে না না-কি?"—ব'লে খিল-খিল ক'রে হেসে উঠল।

আমিনার মুখের সম্মুখে ডান হাতের বদ্ধ-মুষ্টি একবার আস্ফালিত ক'রে বিড়-বিড় ক'রে কি বলতে বলতে মহবুব প্রস্থান করলে; তার পর হাত মুখ ধুয়ে একটা বড় লাঠি কাঁধে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

আমিনও তাড়াতাড়ি আহার সমাপন ক'রে সন্ধ্যার ঘরের সামনে একটা

মাদুর পেতে শুয়ে পড়ল। একবার ভাবলে, সন্ধ্যাকে ডেকে একটু তার সাড়া নেয়; কিন্তু ঘর একেবারে নিঃশব্দ; নিশ্চয়ই সে ঘুমিয়ে পড়েছে মনে ভেবে আর তাকে বিরক্ত করলে না।

সন্ধ্যা কিন্তু তখনো ঘুমোয় নি; শুব্ধ হয়ে ঘরের মেঝেয় ব'সে একটি গবাক্ষের দিকে চেয়ে ছিল। তার অন্ধকার কক্ষের সেই ক্ষুদ্র গবাক্ষ দিয়ে বহির্জগতের সামান্য একটি অংশ দেখা যাচ্ছিল—একখণ্ড আকাশ এবং তার মধ্যে জ্যোৎস্নাকিরণে মৃদু-হিল্লোলিত কয়েকগাছা তরুশির। গবাক্ষটি উচ্চে অবস্থিত, সুতরাং পাশে ব'সে বাহিরের দৃশ্য অবলোকন করবার সুবিধা ছিল না, ঘরের মেঝেয় ব'সে যতটুকু দেখা যায় নির্নিমেষ নেত্রে সন্ধ্যা তাই দেখছিল। তার মনের ভিতরকার অবস্থাও আজ কতকটা সেই ধরনের। সেখানেও আজ অতি ক্ষুদ্র ছিদ্রপথ দিয়ে ক্ষীণ একটি আলোকের রেখা নিবিড় অন্ধকাররাশির মধ্যে আশা জাগিয়ে তুলেছে। যেখানে ছিল শুধু অত্যাচার, উৎপীড়ন, নিযাতিত মনুষ্যত্বের চরম লাঞ্ছনা—মৃত্যু ভিন্ন যা থেকে উদ্ধারের উপায়ান্তর ছিল না—সেখানে আমিনা এনেছে মুক্তির কল্পনা। স্পষ্ট ক'রে সে কিছু বলে নি, কোন অঙ্গীকার করে নি, তবু মনে হয় সে তাকে উদ্ধার করবে, কেননা সে তাকে ভালবেসেছে!

জীবন-ধারার একটা অতি আকস্মিক প্রচণ্ড পরিবর্তনে হৃদয়ের স্বাভাবিক অনুভূতিগুলো স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল, পূর্ব-জীবনের মধ্যে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনায় আজ আবার তারা ধীরে ধীরে জেগে উঠল। আবার নূতন ক'রে নূতন ভাবে মনে পড়ল বাপ-মাকে, মনে পড়ল ভাই-বোনকে, মনে পড়ল শ্বশুর-শ্বাশুড়ীকে। তার পর যাকে মনে পডল তার কথা মনে করতে তার অঙ্গ বিকল হয়ে এল, চক্ষে বইল অশ্রুধারা। তার বিরহ-পীড়িত চিত্ত বলতে লাগল—ওগো, তুমি অত অল্প সময়ের মধ্যে এত যাকে ভালবেসেছিলে তাকে হারিয়ে কি ক'রে দিনাতিপাত করছ? ঘুরে বেড়াচ্ছ কি 'সন্ধ্যা সন্ধ্যা' ক'রে

বনে-বনে, পাহাড়ে-পাহাড়ে, নদীর তীরে-তীরে? রাত্রি কাটছে কি জেগে জেগে তার কথা স্মরণ ক'রে? দিন কাটছে কি সে অভাগিনীর ব্যাকুল প্রতীক্ষায়, আকুল অন্বেষণে?

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে নিবিড়তরভাবে সেটা চিন্তা করবার অভিপ্রায়ে সন্ধ্যা ধীরে ধীরে মেঝের উপর শুয়ে পড়ল। চিন্তাবিলাসে সে তখন আত্মহারা। মনে হ'ল, যেন মুক্তি লাভ ক'রে কলিকাতায় উপস্থিত হয়েছে, সমস্ত দিন কাটল বাইরে বাইরে আকুল প্রতীক্ষায়, রাত্রে প্রিয়লালের সহিত দেখা! ঘরে প্রবেশ করতেই দুটি উদ্যতব্যাকুল বাহুর মধ্যে সহসা বন্দী! উঃ! অত উগ্র উল্লাসের প্রকোপ সহ্য হবে কি? দু হাত দিয়ে সন্ধ্যা তার দ্রুতস্পন্দিত বুকটা সজোরে টিপে ধরলে।

তার পর সহসা কোন্ এক মুহূর্তে অতর্কিতে নিদ্রা এসে জাগ্রৎ স্বপ্নকে টেনে নিয়ে গেল স্বপ্নেরই বাস্তব জগতে।

আট

মনের মধ্যে একটা লঘু সুখের হিল্লোল বহন ক'রে প্রত্যুষে সন্ধ্যার ঘুম ভাঙল। নিদ্রায় দেখা সুখস্বপ্নের অস্পষ্ট স্মৃতির চেয়ে খুব যে এমন কিছু বেশি তার মূল্য, তা নয়; কিন্তু তবু যেন জমাট দুঃখের কঠিন আবরণ ভেদ ক'রে ঝিরঝিরে একটু হাওয়া প্রবাহিত হয়েছে,—যেন ঈষদুন্মুক্ত কারাদ্বারের ফাঁক দিয়ে বাহিরের লতাপুষ্পময়ী প্রকৃতির সামান্য একটু অংশ দেখা গিয়েছে। তালা খুলে আমিনা যখন আহ্বান করলে—'বেরিয়ে এস সন্ধ্যা', তখন সে লঘুপদে আমিনার নিকট উপস্থিত হয়ে উচ্ছ্বসিত পুলকে তাকে জড়িয়ে ধরলে; বললে, "রাত্রে ভাল ঘুম হয়েছিল আমিনা?" অর্থাৎ যে প্রশ্নটা আমিনারই তাকে করবার কথা, মনের প্রসন্নতায় সে প্রশ্ন সে নিজেই আমিনাকে ক'রে বসল।

আমিনা স্মিতমুখে বললে, "কোথায় হয়েছিল? তোমার ভাবনায় সমস্ত রাত ঠায় জেগে ব'সে ছিলাম।"

কথাটা যে রসিকতা তা অনুমান ক'রে সন্ধ্যা মৃদু হেসে বললে, "রাত্রে বেশ ঠাণ্ডা ছিল, না?"

"সে ছিল তোমার ঘরে, বাইরে তো বিষম গুমোট ছিল।"

এটাও যে রসিকতাই হতে পারে অতখানি ভাববার সাহস না পেয়ে সন্ধ্যা সবিস্ময়ে বললে, "সে রকমও হয় না কি?"

সন্ধ্যার হৃদয়ের এই অকুণ্ঠিত সরলতায় মুগ্ধ হয়ে আমিনার চক্ষু সজল হয়ে এল; বললে, "সব হয়। এখন এস, তোমার কাজকর্ম সেরে দিয়ে এক রাশ বাসন নিয়ে আমাকে আবার পুকুরে যেতে হবে। কাল রাত থেকে দবিরের জ্বর হয়েছে, কাজে আসে নি।"

আগ্রহান্বিত স্বরে সন্ধ্যা বললে, "আমাকেও নিয়ে চল না আমিনা, আমরা দুজনে মিলে বাসনগুলো মেজে ফেলি।"

একটু কৌতুক করবার উদ্দেশ্যে আমিনা ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বিস্ময়ের স্বরে বললে, "শোন কথা! হিন্দু ঘরের মেয়ে হয়ে তুমি মুসলমানের এঁটো বাসন মাজবে কি গো?"

আমিনার ধমকে, অপ্রতিভ হয়ে সন্ধ্যা বললে, "আচ্ছা, তা হ'লে না হয় শুধু আমার আর তোমার বাসনগুলো আমাকে দিয়ো—আমি সেইগুলোই মাজব।"

এবার আমিনা সজোরে হেসে উঠল; বললে, "এ কিন্তু বেশ কথা বলেছ সন্ধ্যা! তুমি আমি এক জাত, সেই জন্যে আমাদের দুজনের বাসন তুমি মাজবে; আর মহবুব গফুর এরা সব অন্য জাত, তাই তাদের বাসন মাজব আমি—না?"

আমিনার কথা শুনে সন্ধ্যা ক্ষণকাল নিঃশব্দ স্মিতমুখে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল; তার পর বললে, "তুমি বিশ্বাস করবে কি-না বলতে পারিনে আমিনা, তোমার বাসন মাজতে আমার মনে কিন্তু একটুও বাধা নেই।"

আমিনা বললে, "আচ্ছা, তা হয়তো নেই, কিন্তু তাই ব'লে আমি তোমাকে বাসন মাজতে দোব কেন? ও কি তোমার কাজ? তুমি বড়লোকের মেয়ে, বড়লোকের বউ,—তুমি কি ও-কাজ কখনো করেছ? তার চেয়ে চল, পুকুরঘাটে ব'সে তুমি আমার সঙ্গে গল্প করবে, আর আমি তোমার গল্প শুনতে শুনতে বাসনগুলো মেজে ফেলব। বল তো আমি গফুর ভাইয়ের মত নিয়ে আসি।"

অগত্যা সন্ধ্যা বললে, "আচ্ছা, তাই তা হ'লে চল।"

"কিন্তু কেউ তোমাকে পুকুরঘাটে দেখে ফেললে তুমি আমার কে হও বললে, বল তো?

সলজ্জ হাস্যের সহিত সন্ধ্যা মৃদুস্বরে বললে, "ননদ।"

"ননদ কেন? ননদ তো পর হয়ে অন্য বাড়ি চ'লে যায়। তার চেয়ে 'জা' ব'লো। তবু পাতানো সম্পর্কে মনে মনেও একসঙ্গে থাকা যাবে।"

ক্ষণকাল একটু কি চিন্তা ক'রে সন্ধ্যা বললে, "কিন্তু জা তো বিয়ে না হ'লে হয় না,—ননদ আইবুড়োও হতে পারে।"

জা কথাটা সন্ধ্যার মনে কোন্‌খানে বাধছে বুঝতে পেরে আমিনা বললে, "কিন্তু তোমার স্বামীকে আমার স্বামীর ছোট ভাই ব'লে ধরলেও তো কোনো ক্ষতি হয় না সন্ধ্যা।"

আমিনার কথায় সন্ধ্যার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল; মৃদু স্বরে বললে, "না, তা হয় না।"

হাসিমুখে আমিনা বললে, "বেশ, তা হ'লে কারো সামনে প'ড়ে গেলে দুজনেই দুজনের জা হব—কেমন?" তার পর সন্ধ্যার সীমন্তের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "ননদ হ'লেও তো তুমি আইবুড়ো ননদ হতে পারতে না সন্ধ্যা। সিঁথেয় সিঁদুর রয়েছে যে!"

অপহৃত হবার পর থেকে কোনো দিনই সন্ধ্যা নূতন ক'রে সীমন্তে সিঁদুর দিতে পারে নি, কিন্তু যেটুকু সিঁদুর তার মাথায় ছিল সেটুকুকে সে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছে। ধুয়ে যাবার আশঙ্কায় স্নান করবার সময়ে মাথার সম্মুখ দিক জলে ভিজতে দেয় নি, ঝ'রে যাবার ভয়ে চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ায় নি, তা ছাড়া কেশগুচ্ছের মধ্যে সর্বদা তাকে প্রচ্ছন্ন রেখে সর্বপ্রকার বাহিরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছে। এই সিঁদুরের বিন্দুটি তার বিবাহিত জীবনের পরিচিতি,—তার দাম্পত্য-দলিলপত্রের সীল-মোহর, তার আয়তির সঙ্কেত।

আমিনার কথা শুনে নিরুদ্ধ কণ্ঠে সন্ধ্যা বললে, "এখনো দেখা যায়?"

সন্ধ্যার সীমন্তে পুনরায় দৃষ্টিপাত ক'রে আমিনা বললে, "ঠাওর ক'রে

দেখলে বোঝা যায়। কিন্তু অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। সিঁদুর পরবে সন্ধ্যা? জোগাড় ক'রে দেব?"

শুনে সন্ধ্যার চোখে জল দেখা দিল; বললে, "যদি কোনো দিন এখান থেকে মুক্তির জোগাড় ক'রে দিতে পার, সেদিন সিঁদুরও জোগাড় ক'রে দিয়ো ভাই, এখন থাক্।"

গফুরের অনুমতি পেতে বিলম্ব হ'ল না, বাসন-পত্র নিয়ে আমিনা ও সন্ধ্যা পুকুর-ঘাটে গিয়ে বসল। সন্ধ্যার নির্বন্ধ সত্ত্বেও আমিনা কিছুতেই তাকে বাসন স্পর্শ করতে দিলে না; বললে, "বেশি যদি দুষ্টুমি কর, ঘরে তালা বন্ধ ক'রে রেখে আসব। আমার পাশে ব'সে লক্ষ্মী হয়ে গল্প কর।"

বাসন মাজার কাজে অংশীদার হবার কোনো আশা নেই দেখে অগত্যা সন্ধ্যা বললে, "তা হ'লে তুমিই গল্প বল আমিনা।"

"কিসের গল্প বলব বল?"

"তোমার স্বামীর গল্প।"

বিস্ময়ের সুর টেনে আমিনা বললে, "স্বামীর গল্প? স্বামী বাঘ না ভালুক, ভূত না প্রেত যে, স্বামীর গল্প করব? তার চেয়ে একটা ভূতের গল্প বলি।"

সন্ধ্যা বললে, "ভূতের গল্প রাত্রে বলো, ভাল লাগবে।"

"তা হ'লে রাজকুমারীর গল্প বলি শোন।" ব'লে সন্ধ্যার মতামতের জন্য অপেক্ষা না ক'রে বলতে লাগল, "এক ছিল পরমা সুন্দরী রাজকন্যা, তার বিয়ে হ'ল এক দেশের এক রাজকুমারের সঙ্গে।, অল্প সময়ের মধ্যে দুজনের মধ্যে খুব ভাব হয়ে গেল। রাজকুমারীকে নিয়ে রাজকুমার তার বাড়ি ফিরে চলেছে, এমন সময়ে পথে ডাকাতের দল প'ড়ে রাজকুমারীকে হরণ ক'রে নিয়ে গেল বন-জঙ্গল পাহাড়-পর্বতের মধ্যে দিয়ে অনেক দূরের দেশে। সেখানে ডাকাতদের বাড়ি বাস ক'রে দুঃখে-কষ্টে রাজকুমারী একদিন প্রাণ দিতে তৈরি

হয়েছে, এমন সময়ে সে বাড়িতে অন্য গ্রাম থেকে একটি মেয়ে এসে হাজির।—"

আমিনাকে আর কিছু বলবার অবসর না দিয়ে সন্ধ্যা বললে, "সে মেয়েটির নাম আমিনা। আর সেই হরণ-ক'রে-আনা হতভাগিনী রাজকন্যার নাম সন্ধ্যা। প্রাণ বিসর্জন দেবার জন্যে সন্ধ্যা একেবারে দৃঢ়সঙ্কল্প, এমন সময় যাদুকরী আমিনা তার কানে এমন সব মন্ত্র ঝাড়লে যে, দেখতে দেখতে সন্ধ্যা পোড়ারমুখীর মুখে বড় এক বাটি দুধ একেবারে শেষ হয়ে গেল। তার পর এক নিশীথ রাত্রে কি রকম অদ্ভুত উপায়ে ডাকাতের বাড়ি থেকে উদ্ধার ক'রে আমিনা সন্ধ্যাকে তার শ্বশুরবাড়ি পাঠালে—সে গল্প শুনবে ভাই?"

সকৌতুকে আমিনা বললে, "বেশ তো বল, শুনব।"

বলা কিন্তু হয়ে উঠল না। পদশব্দে উভয়ে পিছন দিকে চেয়ে দেখলে, মহবুব আসছে। মহবুবকে দেখে সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি দেহের বস্ত্র সংযত ক'রে নিয়ে পুষ্করিণীর জলের দিকে চেয়ে নিঃশব্দে ব'সে রইল। নিমেষের মধ্যে স্বপ্নরাজ্যের আলো গেল মিলিয়ে—চোখে-মুখে ফুটে উঠল অকরুণ কাঠিন্য।

নিকটে এসে মহবুব বললে, "হামিদাকে এখানে এনেছিস যে আমিনা?"

আমিনা স্মিতমুখে বললে, "তা হামিদা চিরকালই তালাচাবির মধ্যে বন্ধ থাকবে না-কি?"

আমিনার কথায় আশ্বাস পেয়ে খুশি হয়ে মহবুব বললে, "না, তাই জিজ্ঞাসা করছি।" তারপর একটু কেসে আমিনার মনোযোগ আকৃষ্ট ক'রে মুখ-চক্ষুর বিশেষ ভঙ্গী এবং মস্তকের বিশেষ সঞ্চালনের দ্বারা আমিনাকে যে নিঃশব্দ প্রশ্ন করলে, তার অর্থ—পোষ মেনে এল?

উত্তরে আমিনা তার দক্ষিণ হস্তের তর্জনীর একটুখানি অগ্রভাগ দেখিয়ে যে কথা ব্যক্ত করলে, তার অর্থ—সামান্য একটু।

তর্জনীর অতটুকু অংশ দেখে মহবুবের পিত্ত উঠল জ্বলে। মুহূর্তের মধ্যে

মিলিয়ে গেল মুখের প্রসন্ন কোমল ভাব। দক্ষিণ পদ সজোরে মাটিতে ঠুকে কঠোরস্বরে গর্জন ক'রে উঠল, "তোর বদমায়সী আমি সব বুঝতে পেরেছি, তুই আসল শয়তান।"

আমিনার চক্ষু-কণিকা জ্ব'লে উঠল। হাতের বাসনটা একটু ঠেলে দিয়ে পিছন ফিরে ব'সে বললে, "তোমার যখন বোন, তখন ও-কথা তুমি বলতে পার, কিন্তু মনে রেখো মহবুব ভাই, আমি আমার শ্বশুরের পুত্রবধূ।"

ব্যঙ্গভরে মহবুব বললে, "ওঃ, ভারি শ্বশুর। একেবারে দবীপুরের নবাব!"

"না, দবীপুরের নবাব নয়, কিন্তু দবীপুরের ডাকাতও নয়,—ভদ্রলোক।"

"খানদানি বংশ!"

কঠোরস্বরে আমিনা উত্তর করলে, "খানদানি বংশ তো বটেই, তা ছাড়া তাঁর ইজ্জতের জ্ঞান এত বেশি যে, আমাকে শয়তান বলেছ শুনলে তাঁর বাড়িতে তোমার তলব পড়বে।"

আমিনার অগ্নিমূর্তি দেখে মহবুব তার সঙ্গে আর কোনও কথা না ব'লে সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে চিৎকার ক'রে উঠল, 'হামিদা!"

সন্ধ্যা বিবর্ণমুখে ফিরে দেখলে।

মহবুব বললে, "আজ রাতে আমি দারু পিয়ে বাড়ি ফিরব। তুমি তৈয়ার হয়ে থাকবে। সেদিনের মত আজ আমি তোমার ঘরে শোব। দরজা খুলতে গোল করলে ঘরে আগুন লাগিয়ে দোব। বুঝলে?"

উত্তর দিলে আমিনা। দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "বুঝলাম।" তার পর সন্ধ্যার দিকে ফিরে বললে, "তুমি খেয়ে দেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ো হামিদা, আমি সারারাত তোমার দরজায় পাহারা দোব। দেখি, কে কি করে!"

মহবুব গর্জন ক'রে উঠল, "আচ্ছা, আমিও দেখব তুই কত বড—" সেই শয়তান কথাটাই পুনরায় মুখে আসছিল, কিন্তু ও-কথাটা উচ্চারণ করায় আমিনার শ্বশুর-বাড়িতে তলব পড়বার কথা উঠেছে—সুতরাং ওটা

মুখেই আটকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে এমন কোনো কথাও মনে এল না যাতে উষ্মা প্রকাশ হয়, অথচ আমিনার শ্বশুর-বাড়িতে তলব পড়বার কথা ওঠে না। অগত্যা আমিনার প্রতি তীব্র দৃষ্টির একটা অগ্নিবর্ষণ ক'রে বকতে বকতে মহবুব প্রস্থান করলে।

আমিনা আবার পূর্বস্থানে উপবেশন ক'রে বাসন হাতে নিয়ে সহজ কণ্ঠে বললে, "নাও সন্ধ্যা, এবার তোমার মুক্তির গল্প আরম্ভ কর।"

সন্ধ্যা কোনো উত্তর দিলে না, শুধু তার মুখে একটা বিশীর্ণ হাসি ফুটে উঠল। আমিনা বুঝতে পারলে, যে-স্বপ্ন নিষ্ঠুর আঘাতে বিলুপ্ত হয়েছে সে আর শীঘ্র ফিরে আসবে না।

নয়

দ্বিপ্রহর। মহবুব সকাল সকাল খেয়ে কাজে বেরিয়েছে, আমিনাও তার কোন্ এক বাল্যসঙ্গিনীর বাড়ি বেড়াতে গেছে ; যাবার সময়ে সন্ধ্যাকে ব'লে গেছে, ফিরতে বিলম্ব হবে না, ফিরে এসে তাকে নিয়ে পুকুর-ঘাটে গিয়ে বসবে।

সন্ধ্যার ঘরের দরজায় বাইরে থেকে শিকল টানা। ঘরের ভিতর ভূমির উপর শুয়ে সে নিজের অদৃষ্ট চিন্তা করছিল। ভদ্র গৃহস্থ ঘরের মেয়ে সে, কলিকাতার কমলা গার্লস স্কুলের ছাত্রী, ধনী ও বনেদী বংশের বধূ—এ কী তার দুর্দশা! চিরদিন আদরে যত্নে পবিত্র আবহাওয়ার মধ্যে সে মানুষ,—পিতামাতার আদরিণী কন্যা, স্কুলে প্রধান শিক্ষয়িত্রীর প্রিয়তমা ছাত্রী, শ্বশুর-গৃহে সকলের আদরের বউ,—সহসা কোন্ মহাপাপে সে বন্দিনী হ'ল ডাকাতের ঘরে? সেখানে তার সদ্যঃবিকশিত নারীত্ব কি ঘৃণিতভাবে অপমানিত হ'ল, বিমর্দিত হ'ল! কিন্তু, কেন? কোন্ অপরাধে? যে প্রায়শ্চিত্ত এত ভীষণ ভাবে প্রকট হয়ে উঠল, চোখে তার পাপ দেখা যায় না কেন? সহসা অন্তরের সমস্ত দুঃখ-বেদনাকে অতিক্রম ক'রে একটা তীব্র ক্রোধ জাগল, অভিমানে সমস্ত শরীরটা যেন বিষিয়ে উঠল। চোখ ফেটে জল বেরোবার উপক্রম হ'ল।

আচ্ছা, মৃত্যু হয় না কেন? প্রাণটা কি এতই কঠিন বস্তু যে, কিছুতেই দেহ ছেড়ে বার হবে না? এত দুঃখ অপমান বেদনাতেও না? একজন সন্ধ্যা ম'রে গেলে পৃথিবীর কি এমন ক্ষতি হবে?—কিছুই না। কিন্তু সে নিজে একেবারে বেঁচে যাবে। দুঃখ-লাঞ্ছনার এই কণ্টকাকীর্ণ পথ দিয়ে জীবনটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার কি কোনো অর্থ আছে? কিছু না। একবার

তো সে জীবনটাকে শেষ করবার পথে যাত্রা করেছিল, কিন্তু আমিনা তার মধ্যে এসে বিঘ্ন হয়ে দাঁড়াল। সে যদি না আসত তা হ'লে এতদিনে হয়তো সন্ধ্যা এই অপবিত্র কারাগার হতে চিরদিনের জন্য মুক্তি লাভ করতে পারত। আমিনা বলে বটে—সে সন্ধ্যাকে হয়তো একদিন মুক্ত করবে; কিন্তু সে তার মনের সদিচ্ছা মাত্র। হরিণী হয়ে বাঘের মুখ থেকে শিকার ছিনিয়ে নেবার শক্তি তার কোথায়? এ বাড়িতে এসে পর্যন্ত সে তাকে অনেকখানি আশ্রয় দিয়েছে সত্য, কিন্তু কতদিন এমন ক'রে আমিনা তাকে আগলে থাকবে? একদিন হয়তো হঠাৎ তাকে শ্বশুর-বাড়ি চ'লে যেতে হবে। সেই দিনই সন্ধ্যার আশ্রয় ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে। সুতরাং যে আশ্রয় পাকা, যে আশ্রয় কোনো অবস্থাতে ভেঙে পড়বার কিছুমাত্র আশঙ্কা নেই, সেই আশ্রয়ের শরণ নিতে হবে। সে মৃত্যু।

আচ্ছা, দুঃখ-বেদনার পীড়ন সহ্য করতে না পেরে যারা আত্মহত্যা করে, তাদের দুঃখ কি সন্ধ্যার দুঃখের চেয়েও বেশি? কখনই নয়। এর চেয়ে বেশি দুঃখ আর কি হতে পারে! এই ঘরের মধ্যেই এমন কোনো উপায় আছে কি-না যার সাহায্যে জীবনটাকে শেষ ক'রে ফেলা যেতে পারে, তা দেখবার জন্যে উঠে ব'সে ইতস্তত দৃষ্টিপাত করতেই সন্ধ্যা দেখলে, বাহিরের বারান্দায় জানলার সামনে দাঁড়িয়ে গফুর।

গফুর বললে, "এ সময়ে একটু ঘুমিয়ে নিলে না কেন হামিদা? রাত্রে তো নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমতে পার না। তাড়াতাড়ি উঠে বসলে কেন? শরীর ভাল আছে তো?"

সন্ধ্যা মৃদুস্বরে বললে, "আছে।"

"আচ্ছা, তা হ'লে এই বেলা একটু ঘুমিয়ে নাও।" ব'লে গফুর পিছন ফিরতেই শুনতে পেলে সন্ধ্যার কণ্ঠস্বর, "গফুর মিঞা!"

ফিরে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যার প্রতি সকৌতুক দৃষ্টিপাত ক'রে গফুর বললে, "গফুর মিঞা! এ ডাক তোমাকে কে শেখালে? আমিনা?"

সন্ধ্যা কোনো উত্তর না দিয়ে আরক্তমুখে দৃষ্টি নত করলে।

গফুর বললে, "আচ্ছা, কি বলবে বল ?"

সন্ধ্যা গফুরের প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "একবার ভেতরে এস।"

"ভেতরে ?"

"হাঁ।"

মোটামুটি ব্যাপারটা বুঝতে পারলেও গফুরের কৌতূহলও কম হ'ল না। ভিতরে কেন ? সে কথা তো জানলা দিয়েও অনায়াসে বলা যেতে পারত ! শিকল খুলে ভিতরে গিয়ে সন্ধ্যার নিকট দাঁড়াতেই চক্ষের নিমেষে যে ব্যাপারটা ঘটল তাতে গফুরের মত শক্ত লোকেরও বিস্ময়ে মুখ দিয়ে বাক্যস্ফুরণ হ'ল না। ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রী ঠিক যেমন ক'রে দ্রুতবেগে শিকারের উপর লাফিয়ে পড়ে, তেমনি ক'রে সন্ধ্যা গফুরের উপর লাফিয়ে প'ড়ে দুই বাহু দিয়ে সজোরে তার দুই পা এমন জড়িয়ে ধরলে যে, সাধ্য কি তার সেই সুদৃঢ় বাহুবন্ধন থেকে সহজে পা মুক্ত ক'রে নেয় ? তার পর গফুরের পদদ্বয়ের উপর বিস্রস্তকেশ মাথা আকুলভাবে ঘষতে ঘষতে উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলতে লাগল, "আমাকে বাঁচাও গফুর মিঞা—আমাকে দয়া ক'রে ছেড়ে দাও। আমি জানি, তোমার মনের মধ্যে দয়া আছে—আমাকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। আমি এমন ক'রে বেশিদিন বাঁচব না,—গফুর মিঞা, আমাকে ছেড়ে দাও।"

জীবনে গফুর অনেককে বিপন্ন করেছে, কিন্তু এমন বিপন্ন নিজে কখনো হয় নি। পা টেনে নিতে গিয়ে দেখলে, বজ্রের মত দৃঢ়। বললে, "ছি হামিদা, পা ছাড়, ছেলেমানুষি ক'রো না।"

গফুরের পায়ের উপর মাথাটা আর একটু জোরে ঘ'ষে সন্ধ্যা বললে, "তুমি আগে বল, আমাকে ছেড়ে দেবে ?"

"সে কথা আমি কি ক'রে বলব হামিদা ? আমার তো সে এখতিয়ার নেই।"

"আছে-আছে, গফুর মিঞা, তোমার সব আছে। তোমার দয়া আছে,

মায়া আছে। আমি তোমার মেয়ের মতন, বাঁচাও আমাকে।” ব'লে আরও দৃঢ়ভাবে সন্ধ্যা গফুরের পা আঁকড়ে ধরলে। যে শক্তি সে প্রয়োগ করলে তা স্বাভাবিক শক্তি নয়, উত্তেজিত স্নায়ুর শক্তি।

“আরে, টেনো না, টেনো না। ফেলে দেবে না-কি?” ব'লে গফুর পেছিয়ে যেতে উদ্যত হ'ল; কিন্তু দেখলে এমন দৃঢ়ভাবে সন্ধ্যা তার পদদ্বয়ের সহিত সংলগ্ন যে, পেছিয়ে গেলে সন্ধ্যাকে সঙ্গে নিয়েই পেছিয়ে যেতে হয়। তখন অগত্যা ভূমির উপর ব'সে প'ড়ে দুই হাত দিয়ে ধীরে ধীরে সন্ধ্যার দুই হাত বলপূর্বক ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, “ভাল ফাসাদ দেখতে পাই! এমন জানলে কোন্ আহাম্মক তোমার ঘরে ঢুকত!”

ভূলুণ্ঠিত হয়ে সন্ধ্যা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদতে লাগল। “তা হ'লে আমাকে মেরে ফেল গফুর মিঞা—বিষ খাইয়ে হোক, ছোরা মেরে হোক, যেমন ক'রে পার মেরে ফেল। তাতেও তোমার পুণ্য হবে। মেরে ফেলতে তো তোমার কোনো বাধা নেই গফুর মিঞা?”

গফুর বললে, “তুমি অবুঝ হয়ে যদি খালি ‘গফুর মিঞা’ ‘গফুর মিঞা’ই করতে থাক, তা হ'লে আমি তোমাকে কেমন ক'রে বোঝাই বল? আমার কথা শোন হামিদা, তোমাকে মেরে ফেলবার এখ্‌তিয়ারও আমার নেই। তুমি আমার কাছে গচ্ছিত আছ। রঘু তোমাকে আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছে। তুমি তার জিনিস, সে ইচ্ছে করলে তোমাকে ছেড়েও দিতে পারে, মেরেও ফেলতে পারে। আমি পারি নে, আমি শুধু পারি যতদিন আমার বাড়িতে তুমি আছ সাধ্যমত তোমাকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখতে, জুলুম-জবরদস্তির হাত থেকে তোমাকে রক্ষে করতে।”

উঠে ব'সে সন্ধ্যা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে, “রঘু কে?”

“তোমার উপর যে ডাকাতি হয়েছে, রঘু সে ডাকাতির সর্দার। চুক্তিমত তুমি তার হিস্‌সায় পড়েছ।”

মনে মনে একটু কি চিন্তা ক'রে সন্ধ্যা বললে, "তা হ'লে আমাকে রঘুর কাছেই নিয়ে চল না?"

"রঘুর কাছে তোমাকে নিয়ে যাওয়ায় বিপদ আছে, তাই রঘুকেই আমি খবর পাঠিয়েছি; সে দু-তিন দিনের মধ্যেই এসে পড়বে। তোমার হাঙ্গামা আমি জলদি জলদি চুকিয়ে ফেলতে চাই। রঘু আসা পর্যন্ত আমিনা শ্বশুর-বাড়ি যাবে না—সে কথা আমাদের হয়েছে। কিন্তু সেও বেশি দিন এখানে থাকতে পারবে না, তার শ্বশুরের কাছে দিন আষ্টেকের কথা ব'লে এসেছে। আমিনা থাকতে থাকতে আমি তোমার যা হয় কিছু ব্যবস্থা ক'রে ফেলতে চাই।"

গফুরের কথা শুনে সন্ধ্যা উৎফুল্ল হয়ে উঠল। আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করলে, "কি ব্যবস্থা করবে গফুর মিঞা? তুমি যে ব্যবস্থাই করবে তাতে আমার ভাল হবে তা আমি জানি!"

শুনে গফুর হাসতে লাগল। বললে, "এ বেশ কথা! এই দেখ না, তোমাকে ডাকাতি ক'রে নিয়ে এসে বন্দী করে রেখেছি, তাতে তোমার কত ভাল হচ্ছে!"

"সে তুমি দলে প'ড়ে করেছ। আমার জন্যে একা তুমি যা করবে তাতে আমার কখনই মন্দ হবে না।"

"এ বিশ্বাস তোমার কি ক'রে হ'ল হামিদা?"

"তা বলতে পারি নে, কিন্তু এ আমার বিশ্বাস। এখন তুমি বল গফুর মিঞা, রঘু এলে তুমি কি উপায় করবে?"

পুনরায় গফুরের মুখে হাসি দেখা দিলে; বললে, "সে কথাও তোমাকে বলতে হবে নাকি? এই ধর, তোমাকে ছেড়ে দেবার জন্যে রঘুকে খুব বেশি রকম পীড়াপীড়ি করব।"

চিন্তিতমুখে সন্ধ্যা বললে, "কিন্তু সে যদি না ছাড়ে?"

"তখন কিছু টাকা দিয়ে তোমাকে কিনে নেবার চেষ্টা দেখব।"

নিরুদ্ধ নিশ্বাসে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "যদি না বেচে—তখন ?"

"তখন আর কি ? তখন তোমার তকৃদির,—অদৃষ্ট।" ব'লে গফুর তার দক্ষিণ হস্তের তর্জনী নিজের কপালে ঠেকালে।

সন্ধ্যার মুখে উৎকট বিহ্বলতার গ্লানি ফুটে উঠল। বললে, "অদৃষ্ট ? অদৃষ্ট আমার ভাল নয় গফুর মিঞা। তার চেয়ে তুমি আমাকে রঘু আসবার আগে ছেড়ে দাও। আমাকে দয়া কর। আমি তোমার মেয়ের মতন।"

অসম্মতিসূচক ভাবে গফুর একবার মাথা নাড়লে, তার পর ঈষৎ দৃঢ়ভাবে বললে, "বুঝলাম তুমি আমার মেয়ের মতন, কিন্তু তুমি যদি সত্যি-সত্যি আমার মেয়েই হাতে তা হলেও তোমাকে ছাড়তে পারতাম না। এ যে আমাদের পেশার ইমান হামিদা। আমার শরিকদার তোমাকে আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছে, আর আমি তোমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে ছেড়ে দোব! এটা কি বেইমানি হবে না ? যে কাজ এতটা বয়সে একদিনের জন্যেও করি নি, সে কাজ করব ? যা হবার নয় হামিদা, তার জন্যে অনুরোধ ক'রো না।"

"বুঝে ছ, তা হ'লে মরণ ভিন্ন আমার আর উপায় নেই।" ব'লে সন্ধ্যা উচ্ছ্বসিত হয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

অপরূপ শোভা! বর্ষাধারায় সিক্ত অবনমিত শ্বেতকমল কখনো দেখেছ ? কিংবা ঝঞ্ঝাবাতে ভেঙে-পড়া করবীগুচ্ছ ? তা হ'লে সন্ধ্যার এ সময়কার কমনীয় সৌন্দর্য কতকটা উপলব্ধি করতে পারবে। সুন্দরী স্ত্রীলোক যখন হাসে তখন তাতে বসন্তের শোভা, যখন কাঁদে তখন বর্ষার মাধুরী।

মুগ্ধ নির্নিমেষ নেত্রে গফুর ক্ষণকাল সন্ধ্যার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল; তার পর নিকটে উপস্থিত হয়ে সন্ধ্যার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিয়ে সদয়কণ্ঠে বললে, "অত অস্থির হ'য়ো না হামিদা। দেখ না, রঘু এলে কি দাঁড়ায়! সে আমার অনেক দিনের দোস্ত, আমার কথা সহজে টলতে পারবে না।

এখন তুমি একটু ঘুমোবার চেষ্টা দেখ, আমি চললাম।" তার পর দু পা এগিয়ে গিয়ে পুনরায় ফিরে এসে বললে, "তুমি আমার মেয়ে হ'লে যা করতাম হামিদা, রঘুর কাছে তোমার জন্যে ঠিক তা-ই করব।"

সন্ধ্যার মুখ কৃতজ্ঞতায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল, সে নিঃশব্দে যুক্তকরে গফুরকে নমস্কার জানালে।

বাইরে গিয়ে দরজার শিকল টেনে দিয়ে জানলার সম্মুখে এসে গফুর বললে, "আমার কথা শোন, এখন একটু ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা কর।"

ঘাড় নেড়ে সন্ধ্যা বললে, "আচ্ছা।"

সকালে মহবুব যে কথা শাসিয়ে গিয়েছিল আমিনার মুখে গফুর তা শুনেছিল। নেশায় উন্মত্ত মহবুবের উপদ্রবে রাত্রে নিদ্রার ব্যাঘাত হতে পারে সেই আশঙ্কায় সে সন্ধ্যাকে ঘুমিয়ে নেবার জন্য অনুরোধ করছিল। রাত্রি কিন্তু নিরুপদ্রবেই কেটে গেল। মহবুব ফিরল নেশা ক'রেই বটে, কিন্তু এত বেশি রাত্রে এবং নেশায় এত বেশি বিবশ হয়ে যে, গফুর এবং আমিনাকে দু-চারটে গালিগালাজ ক'রেই সেই যে শয্যা গ্রহণ করল ঘুম ভাঙল একেবারে সূর্যোদয়ের পরে।

কিন্তু ঘুম ভাঙার পরই তৎক্ষণাৎ সে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠল। দ্রুতপদে গফুরের নিকট উপস্থিত হয়ে চিৎকার ক'রে ডাকলে, "গফুর!"

শান্তভাবে মহবুবের দিকে তাকিয়ে গফুর বললে, "কি?"

"রঘুকে আসবার জন্যে তুই খবর পাঠিয়েছিস?

"পাঠিয়েছি।"

"কেন?"

"আমি কিছুদিন বেনোডিতে গিয়ে থাকব। তার আগে রঘুর সঙ্গে দেনা-পাওনা মিটিয়ে নিতে চাই।" বেনোডিতে গফুরের প্রথম পক্ষের শ্বশুর-বাড়ি।

মহবুব হুঙ্কার দিয়ে উঠল, "তুই বেনোডিতেই যাস আর জাহান্নমেই

যাস, কিন্তু আমাকে না ব'লে রঘুর কাছে লোক পাঠিয়েছিস কেন তার জবাব দে।"

"আমার খুশি।"

"খুশি? দেখাচ্ছি খুশি। যত সব শয়তান আর শয়তানী মিলে সল্লা চলেছে। দিচ্ছি সব একসঙ্গে শেষ ক'রে।"

ধীরে ধীরে গফুর তার শয্যার উপর উঠে বসল, তার পর মহবুবের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে গভীর অনুত্তেজিত কণ্ঠে বললে, "আচ্ছা, দিস শেষ ক'রে, কিন্তু তার আগে একটা কথা শোন্। কয়েকগাছা চুলে পাক ধরেছে ব'লে মনে করেছিস বুঝি হাতের তাকৎ কিছু কমেছে? একবার তাকতের পরখটা হয়ে যাবে নাকি?" তার পর ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "ভুলে গেছিস যে, সব রকম কসরৎ আমার কাছেই শিখেছিলি। একবার হাতভাঙার কসরৎটা মনে পড়িয়ে দোব নাকি—চিরদিনের জন্যে ডান হাতটা জখম ক'রে দিয়ে? বাঁদর কোথাকার, তুই আমাকে শয়তান বলতে সাহস পাস? বেরো আমার সামনে থেকে—"

মহবুবের মুখে এতক্ষণ চলেছিল পটপটির আওয়াজ, তার কাছে এ যেন বোমা। তবু তো এখনো ফাটে নি, ফাটবার উপক্রম করেছে মাত্র। গফুরের জলনোন্মুখ ক্রোধের ভূমিকা দেখে তাকে আর অপমান করতে মহবুবের সাহস হ'ল না; বললে, "আজ রাতে একটা ভারি কাজ প'চে ফেলেছি, তাই আজ আর কিছু হ'ল না,—কাল সকালে এসে হামিদাকে কলমা পড়িয়ে সাদি করব। সঙ্গে থাকবে বৈজু মাঝির আটজন তীরন্দাজ, কেউ বাধা দিতে এলে, লুঠ ক'রে নিয়ে যাব হামিদাকে।"

গফুর হাঁক দিলে, "আমিনা!" স্বর কি গভীর! যেন শ্রাবণ মাসের আকাশের মেঘগর্জন!

আমিনা নিকটে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। সামনে এসে বললে, "ভাইজান?"

"আমার ঘর থেকে ইস্পাতের তার জড়ানো লাঠিখানা এনে দে তো।"

"কেন?—কি করবে?" আমিনার মুখে গভীর উৎকণ্ঠার ছায়া।

গফুরের মুখে হাসি দেখা দিল; বললে, "ভয় নেই তোর। লাঠি আজকে ব্যবহারের জন্যে নয়। কাল তীর ধনুক নিয়ে আটজন অতিথ্ আসবে, তাদের খাতিরের জন্যে লাঠিটা একটু ঘুরিয়ে-ঘারিয়ে রাখতে হবে তো।"

মহবুব বললে, "কিন্তু হুঁশিয়ার গফুর! সাদা তীর নয়,—তাতে জহর মেশানো থাকবে।"

গফুর বললে, "তা হ'লে তো আরো জবর। আমিনা, একটু খাট্টা-টাট্টা কিছু জোগাড় ক'রে দে, লাঠির তারগুলো চকচকে ক'রে ফেলতে হবে।"

গফুরের এই বেপরোয়া লঘু ব্যবহারে অপমানিত বোধ ক'রে মহবুব বিরক্ত হয়ে সে স্থান পরিত্যাগ করলে। যাবার সময়ে আরক্ত নয়নে ফিরে তাকিয়ে ব'লে গেল, "এর জবাব কাল সকালে দোব।"

দ্বিপ্রহরে খাওয়া-দাওয়ার পর আমিনার নিকট উপস্থিত হয়ে গফুর বললে, "আমি একটু বেরোচ্ছি আমিনা, ফিরতে হয়তো দেরি হতেও পারে। তুই একটু হামিদার উপর নজর রাখিস।"

এ সময়টা সাধারণত গফুর বাড়িতে থেকেই বিশ্রাম করে, বাইরে যায় না। তা ছাড়া কিছুদিন থেকে সে প্রায় সর্বদাই বাড়িতে থাকছে। তাই একটু কৌতূহলী হয়ে আমিনা জিজ্ঞাসা করলে, "এমন সময়ে কোথায় যাচ্ছ ভাইজান?"

মৃদু হেসে গফুর বললে, "শুনলি তো কাল সকালে মহবুব লোকজন নিয়ে আসছে। আমিও একটু ব্যবস্থা ক'রে রাখি। একা-একা আটজনের সঙ্গে হয়তো এখনও আমি পারি, কিন্তু একসঙ্গে আটজনের সঙ্গে পেরে ওঠা কঠিন। তাই দু-চার জনকে ব'লে আসছি,—কাছে কাছে থাকবে, দরকার হ'লে মদদ্ দেবে।"

চিন্তিত মুখে আমিনা বললে, "কাল তোমরা সত্যি-সত্যিই একটা খুনোখুনি কাণ্ড করবে নাকি ভাইজান?"

"তা কি করব বল? সে যে আমার সামনে হামিদার উপর জুলুম করবে, কিংবা তাকে লুঠ ক'রে নিয়ে যাবে, এ তো আমি হতে দিতে পারি নে। এ জুলুম তো শুধু হামিদার উপরই নয়,—এ আমার উপরও জুলুম।"

"আর কোনো উপায়ই কি এর নেই?"

মাথা নেড়ে গফুর বললে, "না, আর কোনো উপায়ই নেই।"

এ 'আর-কোন-উপায়ে'র অর্থ যে কি, তা মনে মনে উভয়েই বুঝলে এবং এ বিষয়ে বাদানুবাদ নিরর্থক হবে তা-ও বুঝতে পেরে উভয়েই সে আলোচনায় নিরস্ত হ'ল।

গফুর প্রস্থান করলে সন্ধ্যার নিকট উপস্থিত হয়ে আমিনা বললে, "সন্ধ্যা, কি করছ?"

সন্ধ্যা বললে, "তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি।"

উদ্বেগে কণ্ঠস্বর কম্পিত নয়, দুশ্চিন্তায় মুখ বিরস নয়—লক্ষ্য ক'রে আমিনা বিস্মিত হয়ে গেল। বললে, "সকালে বাড়িতে যে সব কথা হয়েছিল শুনেছ সন্ধ্যা?"

"শুনেছি।"

"তবে?"

"তবে কি বল?"

সন্ধ্যার এ প্রতি-প্রশ্নে আমিনা মনে মনে অপ্রতিভ হ'ল। সত্যিই তো 'তবে' বলবার কথা তো আমিনারই, সন্ধ্যার নয়। যে বন্দিনী, যে সম্পূর্ণভাবে অসহায়, সে 'তবে'র কি জানে? কথাটা ঘুরিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে বললে, "কাল সকালে বাড়িতে একটা খুনোখুনি ব্যাপার হবে, কি ক'রে যে সামলাব, তা ভেবে পাচ্ছি নে।"

শান্ত স্বরে সন্ধ্যা বললে, "তুমি নিশ্চিন্ত থেকো ভাই, এই সামান্য একটা মেয়েমানুষের জন্যে তোমাদের বাড়িতে খুনোখুনি হবে, তা আমি কিছুতেই হতে দোব না। কালকের ব্যাপার আমি সামলে নোব।"

সবিস্ময়ে আমিনা বললে, "তুমি সামলে নেবে? কি ক'রে সন্ধ্যা?"

"যদি অন্য কোন উপায় না করতে পারি, কাল সকালে মহবুব এলে তার হাতে আমি নিজেকে সমর্পণ করব। বাবার মুখে প্রায়ই শুনতাম, যে-অবস্থাকে কিছুতেই আটকানো যায় না তাকে জীবনের মধ্যে সহজ-ভাবে গ্রহণ করতে হয়। আমিও ঠিক করেছি, অদৃষ্টের সঙ্গে আর যুদ্ধ করব না।"

চকিতে একবার ঘরের চারিদিকে দেখে নিয়ে আমিনা মনে মনে শিউরে উঠল। জানলায় উঠে একটা নীচু বাঁশের আড়ায় শাড়ি বেঁধে ফাঁস দিয়ে ঝুলে পড়লেই উদ্বন্ধনের আর কোন আটক নেই। উদ্বিগ্ন মুখে বললে, "অন্য কোনো উপায়ের কথা কি বলছিলে সন্ধ্যা?"

সন্ধ্যা বললে, "ও কথার কথা। বন্দী ক'রে যাকে একেবারে নিরুপায় ক'রে রেখেছে সে অন্য উপায় আর কি করবে ভাই? আচ্ছা আমিনা, আমাকে বাঁচাবার তো অনেক চেষ্টা করলে, পারলে না; এখন মরবার জন্যে একটু সাহায্য করতে পার না? এমন একটু বিষ এনে দিতে পার না, যা খেলে তখনি মৃত্যু?' তেমন উগ্র বিষ তো কোল-ভীলেরা সঞ্চয় ক'রে রাখে শুনেছি।"

একটু বিরক্তিমিশ্রিতস্বরে আমিনা বললে, "যা-তা কথা ব'লো না সন্ধ্যা।"

নির্বন্ধসহকারে সন্ধ্যা বললে, "যা-তা কথা কেন ভাই? একজন পুরুষ-মানুষকে এ কথা বললে সে হয়তো যা-তা কথা বলতে পারত; কিন্তু আমিনা, তুমি মেয়েমানুষ হ'য়ে মেয়েমানুষের দুঃখ বুঝবে না ভাই? জীবন কি এতই মূল্যবান জিনিস যে, যে-কোনো অবস্থাতেই তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে? তবে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে এত লোক আত্মহত্যা করেছে কেন?"

অন্যমনস্ক হয়ে আমিনা মনে মনে কি ভাবছিল, হয়তো সন্ধ্যার সমস্ত কথা শুনতেই পায় নি, হঠাৎ তন্দ্রামুক্ত হয়ে বললে, "শোন সন্ধ্যা, আজ রাত্রে তোমাকে আমি এখান থেকে উদ্ধার করব মনে করছি। শুধু মনে করছি কেন, সে বিষয়ে অনেকটা ব্যবস্থাও করেছি, কিন্তু তার আগে এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে একটা শর্ত আছে।"

হায় রে, জীবন-মরীচিকার মোহময় দীপ্তি। কোথায় গেল নিজের দুরবস্থার প্রতি দুর্জয় অভিমান, কোথায় গেল দৃঢনিবদ্ধ সঙ্কল্পের অবিচল স্থৈর্য! অধীরভাবে আমিনার দুই হাত দৃঢভাবে ধ'রে সন্ধ্যা বললে, "আমি রাজী ভাই, তোমার শর্তে রাজী। আমি জানি তোমার শর্ত আমার পক্ষে অমঙ্গলের হবে না। এখন বল, আমার উদ্ধারের কি উপায় করেছ?"

আমিনা বললে, "উদ্ধারের উপায় জেনে তোমার বিশেষ কোনো লাভ নেই, আমি তোমাকে তোমার স্বামীর কাছে পৌঁছে দোবই। কিন্তু শর্তটা তোমার জানা উচিত।"

"কি সর্ত বল?"

"তোমার স্বামী, বাপ-মা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ী, তোমাকে ফিরিয়ে নিলে আমি যে কত খুশি হব তা তোমাকে বলবার দরকার নেই সন্ধ্যা,—কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউ যদি তোমাকে ফিরিয়ে না নেন, বাড়িতে স্থান না দেন, তা হ'লে তোমাকে আমার কাছে আমার শ্বশুরবাড়িতে ফিরে আসতে হবে। পিঁজরে-পোলে যেতে পারবে না।"

আমিনার কথা শুনে সন্ধ্যার হাসি পেল। এই শর্ত! সে ফিরে গেলে যারা তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরবে, এক মুহূর্তের জন্যে ছাড়তে চাইবে না, তাদের সম্বন্ধে এই শর্ত! আনন্দের সঙ্গে সন্ধ্যা বললে, "আমি তোমার শর্তে রাজী আমিনা, কিন্তু পিঁজরেপোল বলছ কাকে?"

আমিনা বললে, "গরু, মোষ, ঘোড়া—এই সব গৃহপালিত জীব-জন্তু

বুড়ো হয়ে অচল হয়ে গেলে তাদের পিঁজরেপোলে দেওয়া হয় তা তো জান?”

“হ্যাঁ, তা জানি।”

“সেখানে তারা যতদিন বেঁচে থাকে জীবন-ধারণের মত দানা-পানি পায়। আমার শ্বশুর বলেন, তোমাদের হিঁদুদের মাতৃমন্দির অবলা-আশ্রম নামে যে-সব ব্যাপার আছে, সবই ঐ সব হিন্দু মেয়েদের পক্ষে পিঁজরেপোলের মতন। যারা কোনো-না-কোনো কারণে সমাজের মধ্যে আশ্রয় পায় না, যতদিন বেঁচে থাকে সেখানে তারা ভাত-কাপড় পায়, হয়তো কিছু লেখাপড়া শেখে, হয়তো কিছু কাজ-কর্মও করে, কিন্তু তা ছাড়া তাদের ও-জীবন মরণেরই সমান। মেয়েমানুষ যদি ছেলেপিলের মা হয়ে সংসার না করলে—তা হ'লে কি করলে বল তো?”

অন্যমনস্ক হয়ে সন্ধ্যা বললে, “তা সত্যি।”

আমিনা বললে, “আমার শর্তের কথা আর একবার তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি সন্ধ্যা। ফিরে গিয়ে তোমার শ্বশুরবাড়িতে কিংবা বাপের বাড়িতে যদি তুমি স্থান না পাও, তা হ'লে তোমাকে আমার শ্বশুরবাড়িতে ফিরে আসতে হবে। আমার শ্বশুরকে তুমি জান না, অমন উদার লোক আমি আর-একটি দেখি নি। তুমি সেখানে একেবারে পুরোপুরি নিজের ইচ্ছামত থাকতে পারবে। যদি সে বাড়িতে একটা পাকাপাকি ঠাঁই ক'রে নিতে ইচ্ছা কর, আমি আমার দেওর নাসীরের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিইয়ে তাও ক'রে দিতে পারব। ভারি ভাল ছেলে, কলকাতায় কলেজে পড়ে, একটি রত্ন। কিন্তু এ সবই তোমার ইচ্ছেমত হবে। এখন বল, তুমি রাজী কি-না?”

সন্ধ্যার মন তখন মুক্তির স্বপ্নে তন্দ্রিত; বললে, “রাজী।”

“তা হ'লে তোমার উদ্ধারের জন্যে আমি যে ব্যবস্থা করেছি তা শোন। মহবুবের কথা শুনে তখনি আমি একটি বিশ্বাসী লোককে আমার শ্বশুরবাড়ি

পাঠিয়েছি। রাত্রে গরুর গাড়ি নিয়ে আমার স্বামী আসবেন। কোন রকমে গফুরের চোখ এড়িয়ে তোমাকে তাঁর সঙ্গে পাঠিয়ে দোব আপাতত আমার শ্বশুরবাড়ি। তার পর সেখান থেকে ব্যবস্থা ক'রে তোমাকে তোমার নিজের শ্বশুরবাড়ি পাঠাব।"

ব্যগ্রকণ্ঠে সন্ধ্যা বললে "আর তুমি সঙ্গে যাবে না আমিনা?"

আমিনা হেসে বললে, "আমি কাল সকালে দুই ভায়ের লড়াই দেখে সন্ধ্যার সময়ে যাব। মহবুব এসে যখন দেখবে—চিড়িয়া পালিয়েছে, তখন আমি না থাকলে গফুরকে মহবুবের রাগ থেকে বাঁচাব কে?"

"আর তোমাকে কে বাঁচাবে?"

আমাকে যে বাঁচাবে সে সন্ধ্যেবেলা তোমার কাছে পৌঁছে তোমাকে দুই ভাইয়ের লড়ায়ের গল্প শোনাবে।" ব'লে আমিনা হাসতে লাগল।

রাত্রি তখন দশটা। পঞ্চা মাঝি এসে আমিনাকে জানালে যে, ইয়াসিন গাড়ি নিয়ে এসে ধুরিয়ার মোড়ে, অর্থাৎ আমিনাদের বাড়ি থেকে আধ মাইলটাক দূরে অপেক্ষা করছে। আমিনা দেখলে, গফুর আহার ক'রে তার খাটিয়ায় শুয়ে আছে; একটু কাছে গিয়ে লক্ষ্য ক'রে মনে হ'ল, নিদ্রিত। তখন গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে ত্বরিত পদে সে ইয়াসিনের নিকট উপস্থিত হ'ল।

ইয়াসিন বললে, "কি হুকুম আমিনা বিবি?"

মৃদু হেসে আমিনা বললে, "হুকুম, আমাদের বাড়ি হামিদা নামে যে মেয়েটি আছে, আপাতত তাকে বাড়ি নিয়ে যাও।"

"তা তো আন্দাজে বুঝেছি, কিন্তু তোমার দাদাদের লাঠি মাথায় পড়বে না তো?"

"লাঠির ভয় করতে গেলে বিপদ থেকে মানুষকে উদ্ধার করা যায় না।"

"তা যেন হ'ল, তুমি?"

"আমি? আমার জন্যে কাল গাড়ি পাঠিয়ে দিয়ো।, আমি ঠিক বেলা এগারোটার সময়ে রওনা হব।"

"তোমার নিজের মাথার কথা মনে আছে?"

স্মিতমুখে আমিনা বললে, "আছে। সে বিষয়ে কোনো ভয় নেই, কাল সন্ধ্যাবেলা আস্ত মাথাই পাবে।। আমি চললাম, এখন হামিদাকে নিয়ে আসছি।"

আধঘণ্টাটাক পরে সন্ধ্যাকে নিয়ে ফিরে এসে আমিনা বললে, "হামিদা, ইনি আমার স্বামী। এঁর সঙ্গে নির্ভয়ে যাও, কোনো অসুবিধা হবে না।"

সন্ধ্যা যুক্তকরে ইয়াসিনকে নমস্কার করলে।

প্রতি-নমস্কার ক'রে ইয়াসিন বললে, "আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আপনি আমাদের বাড়ি যাচ্ছেন।"

আমিনা বললে, "ও-সব আদব-কায়দা তোমরা গাড়িতে উঠে ক'রো। আমি এখন ফিরে চললাম। গফুরভাই জেগে ওঠবার আগে তোমাদের খুব খানিকটা এগিয়ে যাওয়া দরকার।" ব'লে প্রস্থানোদ্যত হ'ল।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই এমন একটা অচিন্তনীয় কাণ্ড ঘটল যে, যে যেখানে ছিল বিস্ময়ে এবং ত্রাসে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। পাশের বনের ঘন অন্ধকারের ভিতর থেকে মনুষ্যকণ্ঠের ধ্বনি শোনা গেল, "গফুরভাই জেগেই আছে।" এবং পর-মুহূর্তে এক দীর্ঘাকৃতি মনুষ্যমূর্তি বেরিয়ে এসে আমিনার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বললে, "কি রে আমিনা, এ যে চুরির উপর বাটপাড়ি দেখতে পাই!" কণ্ঠস্বরে এবং আকৃতিতে সকলেই গফুরকে চিনতে পারলে।

প্রথমে আমিনার গলা ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। তার পর কতকটা সাহস সঞ্চিত ক'রে সে বললে, "আমাকে মাপ কর গফুরভাই।"

গফুর একটু হাসলে; তার পর মৃদুস্বরে বললে, "মাফ আর কি করব! যা

করেছিস এক রকম ভালই করেছিস, অনেকগুলো ভাবনার হাত থেকে মুক্তি দিলি। কিন্তু তুই যে এদের সঙ্গে যাচ্ছিস নে, ফিরে চলেছিস ?”

আমিনা বললে, “কাল সকালে মহবুব যখন আসবে তখন আমি তোমার কাছে থাকতে চায় ভাইজান।”

“কেন ? আমার হেফাজতে নাকি ?”

আমিনা কোনো কথা না ব’লে চুপ ক’রে রইল।

এক ধমক দিয়ে গফুর বললে, “ভারি জ্যাঠা হয়েছিস দেখতে পাই। শীগ্‌গির ওঠ্ গাড়িতে। এতটা কাল লাঠি-ছোরা চালিয়ে এসে এখন ছোট ভাইয়ের ভয়ে বোনের আঁচলের আড়ালে লুকোতে হবে।” তার পর ইয়াসিনকে লক্ষ্য ক’রে বললে, “তুমিও তো আচ্ছা লোক ইয়াসিনভাই, নিজের মাথাটি বাঁচিয়ে স্ত্রীকে পিছনে ফেলে পালাচ্ছ !”

ইয়াসিন হাসতে হাসতে বললে, “কি করি বলুন, বাগ মানে কি ? আপনাদের বাড়িরই মেয়ে তো !”

আমিনার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিয়ে গফুর বললে, “আমার জন্যে কোনো ভয় নেই। যা, গাড়িতে গিয়ে ওঠ্।” তার পর সন্ধ্যার দিকে লক্ষ্য ক’রে বললে, “অনেক কষ্ট পেয়েছ হামিদা, সে সব ভুলে যেয়ো ; কিন্তু গফুর মিঞাকে একেবারে ভুলো না।” ব’লে উচ্চৈঃস্বরে হাসতে লাগল।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে একেবারে নত হয়ে সন্ধ্যা গফুরের পদধূলি গ্রহণ করলে। কেউ তাকে আটকাতে পারলে না, গফুরও নয়, আমিনাও নয়। তার পর সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে কম্পিত কণ্ঠে বললে, “তোমার দয়ার কথা জীবনে কখনো ভুলব না গফুর মিঞা।”

সন্ধ্যার মাথাটা নেড়ে দিয়ে গফুর বললে, “দয়া নয়, দয়া নয় বেটী। খোদা তোমার ভাল করবে। এখন যাও, গাড়িতে গিয়ে ওঠ।”

আরও দু চার কথার পর ইয়াসিন, আমিনা ও সন্ধ্যা গফুর গাড়িতে উঠে দুর্ভেদ্য অন্ধকারের ভিতর দিয়ে গ্রাম্য মেঠো পথ ভেঙে দবীপুরের দিকে অগ্রসর হ'ল। গাড়ি অদৃশ্য হয়ে গেল, কিন্তু চাকার কঁ্যাচ-কঁ্যাচ শব্দ বহুক্ষণ ধ'রে শোনা যেতে লাগল। অবশেষে তাও যখন মিলিয়ে এল, তখন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গফুর গৃহাভিমুখে প্রস্থান করল। অনেকগুলো দুশ্চিন্তার হাত থেকে রক্ষা পেলে বটে; কিন্তু বাড়ি পৌঁছে তার মনে হ'ল, বাড়িটা যেন কোন একটা সম্পদ থেকে সহসা রিক্ত হয়েছে। মনে মনে ভাবলে, জীবনে সে এই প্রথম দুর্বলতার বশীভূত হ'ল। হয়তো বা এ কোন নবতর পথেরই সূচনা!

দশ

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়ে সকাতর ক্যাঁচ ক্যাঁচ ধ্বনি কানে প্রবেশ করতেই সন্ধ্যার মনে পড়ল, গরুর গাড়ি ক'রে সে আমিনাব শ্বশুরবাড়ি চলেছে এবং সুদীর্ঘ পথের এখনও শেষ হয় নি। গাড়ি ছাড়ার পর চাকার শব্দের এবং গাড়ির ঝাঁকানির তাড়নায় কথাবার্তা বেশি কিছু আর হতে পারে নি। তার পর আদি-অন্তহীন চিন্তার মধ্যে মগ্ন থাকতে থাকতে কখন অতর্কিতে নিদ্রাকে আশ্রয় ক'রে অচেতন দেহ শয্যার উপর লুটিয়ে পড়েছে সে কথাও মনে পড়ে না। বিচালি, তোষক এবং চাদর দিয়ে রচিত শয্যা নরমই ছিল এবং বায়ুও ছিল সুশীতল। সুতরাং ঘুমটা এমনই প্রগাঢ় হয়েছিল যে, এর আগে আর একবারও ভেঙেছিল কি না তাও মনে পড়ে না। আকাশে প্রত্যুষের স্তিমিত আলোক, প্রভাতের সুশীতল জোলো বায়ু ঝিরঝির ক'রে বইছে। ছইয়েব জন্য গাড়ির দু-পাশ দিয়ে দৃশ্য দেখা যায় না, কিন্তু সম্মুখের ফাঁক দিয়ে পথপার্শ্বের গাছ-পালা বন-জঙ্গল পাহাড়-প্রান্তর সবই কিছু কিছু দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে গাছে গাছে যেন দু-চারটে পাখীর কাকলীও শোনা যায়।

মুক্তি! মুক্তি! মুক্তি! সহসা ধড়মড় ক'রে সন্ধ্যা উঠে বসল। রাত্রির ঘন অন্ধকারের মধ্যে মুক্তির যে পরিপূর্ণ মূর্তি সে দেখতে পায় নি, প্রত্যুষের আলোকে গাছ-পালা পাহাড় পর্বতের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে তাকে সম্পূর্ণ-ভাবে উপলব্ধি করলে। এ-ই তো মুক্তি! একেই তো বলে মুক্তি! এ তো মহবুবের শিকল লাগানো কারাকক্ষ নয়, এ যে বিশ্বপ্রকৃতির মুক্ত প্রাঙ্গণ! এখানে পশু পক্ষীর সঙ্গে তার মিতালী, তরু-পল্লবের সঙ্গে আত্মীয়তা! ইচ্ছা করলেই সে যে-কোনো গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে, যে-কোনো লতা থেকে ফুল তুলতে পারে, যে-কোনো পাখীর গান শুনতে পারে! ঐ যে দূরে

বন্ধুর প্রান্তরের একটুখানি অংশ দেখা যাচ্ছে, ইচ্ছা করলে ওখানে গিয়ে সে কাঁটাগাছে দু-পা ক্ষতবিক্ষত করতে পারে। এমন কি কাছাকাছি যদি-কোনো বন্যা-উদ্বেল পার্বত্য নদী থাকে, তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করতেও বাধা নেই। এ-ই তো মুক্তি! একেই তো বলে মুক্তি! মুক্তি যে কত মধুর আগে কে তা জানত!

কি আশ্চর্য! সে গতি লাভ করেছে! অবিশ্রান্ত চলেছে সে,—বাধা নেই, আটক নেই! এ চলার শেষ হবে কলকাতায়, যেখানে তার বাপ মা আছে, স্বামী আছে। সন্ধ্যার ইচ্ছা হ'ল, লাফ দিয়ে পথের উপর প'ড়ে একটা ছুট দেয়। এমনই মন্থর গতি এই গরুর গাড়ির, যেন চলতেই চায় না।

পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলে আমিনা তখনো শুয়ে ঘুমুচ্ছে, কিন্তু ইয়াসিন গাড়ির ভিতরে নেই। আমিনার গায়ে হাত দিয়ে একটু ঠেলা দিয়ে সন্ধ্যা ডাকলে, "আমিনা! আমিনা!"

নিদ্রালস চক্ষু উন্মীলিত ক'রে আমিনা বললে, "কি?"

সন্ধ্যা বললে, "এবার ওঠ। সকাল হয়েছে."

চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে ব'সে সহাস্য মুখে আমিনা বললে, "তা তো হয়েছে, কিন্তু তোমার সকাল কখন হয়েছে শুনি? একটু আগেও তো তোমাকে ঘুমন্ত দেখেছি!"

অপ্রতিভ হয়ে সন্ধ্যা বললে, "সত্যি ভাই. এমন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম যে, এক ঘুমে রাত কাবার হয়ে গেছে। কিন্তু ইনি কোথায়?"

"কিনি?"

সন্ধ্যা ইয়াসিনের নাম ভুলে গিয়েছিল, স্মিতমুখে বললে, "কেন, বুঝতে পারছ না না-কি?"

"না, পাচ্ছি নে।"

"তোমার—তোমার স্বামী ?" ব'লেই সন্ধ্যার মুখ লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠল।

নিষ্প্রভ আলোকেও আমিনা তা লক্ষ্য ক'রে বললে, "আমার স্বামী, তা তোমার এত লজ্জা কেন ?" রাত্রে গাড়িতে উঠে ইয়াসিন গাড়ির পিছন দিকে পা ঝুলিয়ে বিপরীত দিকে মুখ ক'রে ব'সে ছিল। সেদিকে দৃষ্টিপাত ক'রে আমিনা ব'লে উঠল, "ওমা, তাই তো! আমার স্বামী কোথায় গেল ? ডাকাতে হরণ ক'রে নিয়ে গেল না তো ?"

আমিনার কথা শুনে সন্ধ্যা খিলখিল ক'রে হেসে উঠল; বললে, "সবাই কি হতভাগিনী সন্ধ্যা যে ডাকাতে হরণ ক'রে নিয়ে যাবে ?" তার পর সাগ্রহে হাত চেপে ধ'রে বললে, "না ভাই, সত্যি ক'রে বল, কোথায় গেলেন তিনি ?"

স্মিতমুখে আমিনা বললে, "তিনি লাফ দিয়ে রাস্তায় গেলেন "

"তার মানে ?"

"তার মানে, কাল রাত্রে ঢুলতে ঢুলতে তুমি যেই শুয়ে পড়লে, উনিও ওদিকে একটি পরিষ্কার লাফ মেরে রাস্তায় প'ড়ে গাড়ির পিছনে পিছনে পথ চলতে আরম্ভ করলেন।"

সবিস্ময়ে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "কেন ?"

"তা হ'লে তোমার শোবার জায়গার আর-একটু সুবিধা হয়, বোধ হয় সেই ভেবে। তা ছাডা—"

ঔৎসুক্যের সহিত সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "তা ছাড়া কি ?"

"তা ছাড়া, তুমি ঘুমিয়ে থাকলে এক গাড়িতে ওঁর জেগে ব'সে থাকা উচিত হয় না, বোধ হয় সে কথাও ভেবে।"

দুঃখিত কণ্ঠে সন্ধ্যা বললে, "তাতে কি হয়েছিল ? না, না, এ ভারি অন্যায়। আচ্ছা, তাই যদি, তুমি আমাকে তুলে দিলে না কেন আমিনা ?"

হাসতে হাসতে আমিনা বললে, "তা বটে, সেইটেই ভুল হয়ে গিয়েছিল।"

"আচ্ছা, এখন তো ওঁকে উঠে আসতে বল।"

"কেন, তুমি নিজে বল না ?—ভদ্রতা তো তুমিই করতে চাচ্ছ।"

"ভদ্রতা নয় আমিনা,—করুণা। আহ, দেখ দিকিনি, সমস্ত রাতটা মুখ বুজে পথ হাঁটছেন!" তার পর আমিনার হাত চেপে ধ'রে বললে, "নাও, গাড়ি থামাও।"

আমিনার আদেশে গাড়ি স্থির হয়ে দাঁড়াল। ইয়াসিন গাড়ির পাশে পাশেই চলছিল, গাড়ি থামতে পিছন দিকে এসে দেখলে, গাড়ির ভিতর আমিনা এবং সন্ধ্যা দুজনেই জেগে ব'সে রয়েছে। সন্ধ্যাকে সেলাম ক'রে হাসিমুখে বললে, "উঠে পড়েছেন ? রাত্তিরে ঘুম বোধ হয় একটুও হয় নি ?"

প্রতি-নমস্কার ক'রে লজ্জিত মুখে সন্ধ্যা বললে, "আপনি সমস্ত রাত হেঁটে এসেছেন, আর আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এসেছি। ছি ছি, কি লজ্জার কথা! আপনি উঠে আসুন।"

সন্ধ্যার অপ্রতিভ ভাব দেখে ব্যস্ত হয়ে ইয়াসিন বললে, "না, না, তার জন্যে আপনি একটুও লজ্জিত হবেন না। এ-সব রাস্তা তো আমরা মরদরা হেঁটেই শেষ করি। শুধু আপনাদের জন্যেই গাড়ি আনা।"

"আচ্ছা, এখন উঠে আসুন।"

স্মিতমুখে ইয়াসিন বললে, "আপনি ব্যস্ত হবেন না, কিচ্ছু প্রয়োজন নেই। আর তো সবে পোন ক্রোশটাক পথ বাকি। একেবারে কাছে এসে পড়েছি; ঐ যে দবীপুরের গাছপালা মালুম দিচ্ছে।"

আমিনা বললে, "মালুম দিলেই কি কাছে হতে হয় ? এই তো আমিও এখান থেকে মালুম দিচ্ছি, তাই ব'লে কি তোমার খুব কাছে আছি বলতে চাও ?"

আমিনার পরিহাসে ঈষৎ লজ্জিত হয়ে সন্ধ্যার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে ইয়াসিন দেখলে, নিঃশব্দ হাস্যে সন্ধ্যার মুখ উচ্ছলিত। বললে, "একটু না-হয় শুয়ে পড়ুন, এখনো খানিকটা ঘুমোতে পারবেন।"

মৃদুস্মিত মুখে সন্ধ্যা বললে, "না, আর ঘুমোবার দরকার নেই।"

"ঘুম একটু হয়েছিল ?"

"বেশ ভালই হয়েছিল।"

"আচ্ছা, আমি পাশেই রইলাম। আপনারা ততক্ষণ কথাবার্তা করুন।" ব'লে ইয়াসিন গাড়ির পাশে গিয়ে গাড়ি চালাবার আদেশ দিলে।

গাড়ি চলতে আরম্ভ করতেই সন্ধ্যা আমিনাকে দুই বাহুর দ্বারা দৃঢ় আবদ্ধ ক'রে ধরলে, তারপর মিনতি-করুণ স্বরে বললে, "ভাই আমিনা, আজই আমাকে কলকাতা পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রো।—কেমন, করবে তো ?"

সন্ধ্যার ব্যাকুলতা দেখে মনে মনে দুঃখিত হ'লেও হাসিমুখে আমিনা বললে, "কেন, সবুর সইছে না না-কি ?"

কাতরস্বরে সন্ধ্যা বললে, "সয় কি ? তুমিই ভেবে দেখ আমিনা। বন্দী যখন ছিলাম তখন এক রকম ছিলাম, এখন তোমার দয়ায় মুক্তি পেয়ে সত্যিই সবুর সইছে না। মনে হচ্ছে কি জান, গাড়ি থেকে নেবে প'ড়ে ছুট দিই। আজই আমাকে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রো ভাই। কেমন ? লক্ষ্মীটি !"

আমিনা বললে, "আমি কি তোমার মনের কথা বুঝতে পারছি নে সন্ধ্যা ? খুবই বুঝছি। আজকেই তোমাকে পাঠাবার বিশেষ চেষ্টা করব, তবে আমার শ্বশুর সব দিক বিবেচনা ক'রে যেমন করবেন তাই হবে তো ভাই। তোমাকে পাঠাবার মধ্যে ভাববার অনেক কথা আছে, শুধু তোমার দিক দিয়েই নয়, আমাদের দিক দিয়েও।"

আগ্রহসহকারে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "তোমাদের দিক দিয়ে আবার কি ?"

"আমাদের দিক দিয়ে পুলিস। তোমার শ্বশুর বড়মানুষ, পুলিসের পাহারা চারি দিকে ছড়িয়ে রেখেছেন। যে তোমাকে নিয়ে যাবে সে যদি ধরা পড়ে তা

হ'লে শেষ পর্যন্ত গফুর-মহবুবরাও ধরা পড়বে। জান তো ভাই, কান টানলে মাথাও আসে।"

"কিন্তু এ বিশ্বাস তো আছে আমিনা, আমার দ্বারা তোমাদের কখনো কোনো বিপদ হবে না? আমার মুখ দিয়ে কেউ কখনো কিছু বলিয়ে নিতে পারবে না—এ বিশ্বাস তো কর?"

সন্ধ্যার কথা শুনে আমিনা হেসে ফেললে; বললে, "সে বিশ্বাস না করলে তোমাকে কি ঘরে এনে ঢোকাতাম সন্ধ্যা? তোমার কোনো ভাবনা নেই, যত শীঘ্র তোমাকে কলকাতায় পাঠানো সম্ভব তার চেয়ে এক মিনিটও দেরি হবে না। আমার শ্বশুর অত্যন্ত দয়ালু লোক।"

"তা তো তাঁর ছেলেকে দিয়েই বুঝতে পারছি ভাই। তোমার শাশুড়ী আছেন আমিনা?"

"না।"

"বাড়িতে আর কে কে মেয়েমানুষ আছেন?"

আমিনা হেসে বললে, "আর কেউ না। আমিই একমাত্র।"

সন্ধ্যা হেসে উত্তর দিলে, "তাই এত আদরের বউ!"

আমিনা হাসিমুখে বললে, "হ্যাঁ গো, তাই।"

কিছুক্ষণ পরে একটা বাড়ির প্রাঙ্গণে গাড়ি প্রবেশ করল। আমিনা বললে, "এইটে আমাদের বাড়ি, আর ঐ দেখ বারান্দায় আমার শ্বশুর ব'সে রয়েছেন।"

আগ্রহভরে সন্ধ্যা তাকিয়ে দেখলে, একটি দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠ বৃদ্ধলোক লুঙ্গি প'রে অনাবৃত দেহে মোড়ায় ব'সে তামাক খাচ্ছেন।

গাড়ি নিকটে উপস্থিত হতে আমিনার শ্বশুর মহীউদ্দিন গাত্রোত্থান ক'রে নেমে এসে বললেন, "কি, বউমা এলে না-কি?"

গাড়ি থেকে নেমে প'ড়ে অবনত হয়ে শ্বশুরকে সেলাম ক'রে হাসিমুখে আমিনা বললে, "হ্যাঁ আব্বা, এলুম।"

আমিনার পিছনে পিছনে সন্ধ্যাও নেমে এসে আমিনার মত মহীউদ্দিনকে সেলাম ক'রে নতমুখে দাঁড়াল।

সন্ধ্যাকে দেখে মহীউদ্দিন বিস্মিত হয়ে বললেন, "ও মেয়েটি কে বউমা?"

"এটি আমার একটি বন্ধু আব্বা। বিপদে প'ড়ে আপনার কাছে এসেছে।"

"তোমার বন্ধুর যখন বিপদ তখন তোমারও বিপদ বউমা। আর তোমার যখন বিপদ তখন আমিও দেখছি বিপদে পড়েছি!" ব'লে মহীউদ্দিন হাসতে লাগলেন। তার পর সন্ধ্যার দিকে চেয়ে বললেন, "এস, মা, এস। বউমার যখন সুপারিশ, তখন তোমার এ বুড়ো চাচার দ্বারা যা কিছু হবার সবই হবে। পরে সব কথা শুনব, এখন বাড়ির ভিতর গিয়ে প্রথমে একটু ঠাণ্ডা হও। লজ্জা ক'রো না, এ তোমার আপন বাড়ি।"

এবার হিন্দু প্রথায় যুক্তকরে মহীউদ্দিনকে নমস্কার ক'রে সন্ধ্যা আমিনার সঙ্গে গৃহে প্রবেশ করল।

এগার

বেলা তখন আটটা। স্নান এবং কিছু জলযোগ সমাপন ক'রে সন্ধ্যা আমিনার ঘরে ব'সে ছিল। একদল কৌতূহলী বালিক-বালিকা দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে প্রত্যুষের এই সহসা-আবির্ভূত অপরিচিত অতিথিটিকে নিবিষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করছিল। অতিথির নাম হামিদা এবং সে আমিনার বাপের বাড়ির দিক দিয়ে তার একজন দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়া, সে কথা সহজেই জানা গিয়েছিল; কিন্তু এ গৃহের সহিত তার কি সম্পর্ক, কি জন্যে এখানে সে এসেছে, কতদিন এখানে অবস্থান করবে—এই সব অবশ্য-জ্ঞাতব্য তথ্যের কিছুই জানা যাচ্ছিল না। এজন্যে তাদের মনে ঔৎসুক্যের অন্ত ছিল না, কিন্তু আমিনাকে জিজ্ঞাসা করলে সে ধমক দেয়; বলে, "ও আমার বহিন্, সব দিন এখানে থাকবে। যা, এখন পালাঃ।"

ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কি ক'রে একটু আলাপ আরম্ভ করবে সন্ধ্যা মনে মনে তাই জল্পনা করছিল, এমন সময় সেখানে আমিনা উপস্থিত হওয়ায় ছেলের দল দুদ্দাড় ক'রে স'রে পড়ল। আমিনা ঘরে প্রবেশ করল, এবং তার পিছনে পিছনে প্রবেশ করল তার দেবর নাসীর,—দীর্ঘ সুগঠিত দেহ, কান্তিমান যুবক।

সহাস্যমুখে আমিনা বললে, "ভাই হামিদা, এটি আমার দেওর নাসীরউদ্দিন, যার কথা তোমাকে বলেছিলাম।"

আমিনার কথা শুনে সন্ধ্যা দাঁড়িয়ে উঠে একবার নাসীরের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে যুক্তকরে তাকে নমস্কার করলে।

তাড়াতাড়ি সম্মুখে এগিয়ে এসে সন্ধ্যাকে প্রত্যভিবাদন ক'রে স্মিতমুখে নাসীর বললে, "আপনার বহুৎ মেহেরবানি যে, আমাদের বাড়ি পায়ের ধুলো দিয়েছেন। সত্যিই আমাদের এ সৌভাগ্যের কথা।"

মাস দুই পূর্বে হ'লে একজন অপরিচিত যুবকের মুখ থেকে উচ্চারিত এই ভদ্রতার বাক্যের উত্তরে সন্ধ্যা হয়তো একটি কথাও বলতে পারত না, আরক্ত-মুখে নতনেত্রে দাঁড়িয়ে থাকত; কিন্তু জীবনধারার নিদারুণ বিপর্যয়ের কাছে তালিম নিয়ে নিয়ে তার প্রকৃতিও অনেকটা পরিবর্তিত হয়ে গেছে; বললে, "সৌভাগ্যের কথা আমারই বলতে হবে। আপনারা তো আমাকে আশ্রয় দান করেছেন।"

সন্ধ্যার কথা শুনে নাসীরের মুখে মৃদু হাসির রেখা দেখা দিল; অল্প একটু মাথা নেড়ে বললে, "আশ্রয়দানের কথা আমরা জানি নে, সে আপনার বন্ধু বলতে পারেন, কিন্তু আপনি দয়া ক'রে আসায় সত্যিই আমরা খুশি হয়েছি।"

হাসিমুখে আমিনা বললে, "আশ্রয় পাওয়ার কথাটা একেবারে বাজে মেজ মিঞা। আচ্ছা, আশ্রয় পেয়ে সেই দিনই যদি আশ্রয় ভেঙে কলকাতায় পালাবার জন্যে কেউ ব্যস্ত হয়ে ওঠে তো সে কি রকম আশ্রয় পাওয়া তা তুমিই বিচার কর!"

নাসীর হাসতে হাসতে বললে, "না, তাকে কিছুতেই আশ্রয় পাওয়া বলা যায় না।"

এক মুহূর্তের জন্য নাসীরের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "কিন্তু কলকাতায় যদি যেতে পাই তো সে আপনাদের দয়াতেই যাব। কলকাতার আশ্রয় তো আপনাদেরই আশ্রয় হবে।"

শুনে আমিনা খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে উঠল; বললে, "এ ঠিক কি রকম কথা হ'ল জান হামিদা?—একটা খাঁচার পাখী যদি বলে, দয়া ক'রে যদি খাঁচার দোরটা খুলে দেন তো দেশান্তরে উড়ে যাই—দেশান্তরে আশ্রয় তো আপনাদেরই আশ্রয় হবে।—অনেকটা সেই রকম।"

আমিনার উপমার যৌক্তিকতায় খুশি হয়ে নাসীর মৃদু মৃদু হাসতে লাগল, কিন্তু আশঙ্কায় সন্ধ্যার মুখ শুকিয়ে উঠল। শ্বশুর কিংবা পিতৃগৃহের আশ্রয়

অবিলম্বে ফিরে পাবার জন্য তার মনে এমন একটা দুর্বার উত্তেজনা জেগে উঠেছে যে, তার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট পরিহাসের মিথ্যা কথাও যেন সে বরদাস্ত করতে পারে না। মহবুবের গৃহে প্রথম দিকে যখন পরিত্রাণের বিশেষ কোনো সম্ভাবনা ছিল না, তখন উত্তেজনাও এতটা ছিল না; কিন্তু সম্ভাবনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চিত্তের চাঞ্চল্য বহুগুণিত পরিমাণে বেড়ে গিয়েছে। দুস্তর সাগরের প্রায় সবটাই পেরিয়ে এসে এখন অতি অল্পের জন্য মন ধৈর্য মানছে না, মনে হচ্ছে তরী ভেড়বার পূর্বেই তীরে লাফিয়ে পড়ি।

সন্ধ্যার মুখে চিন্তার কুজ্ঝটিকা লক্ষ্য ক'রে আমিনা তার মনের উদ্বেগ বুঝতে পারলে। বললে, "ভয় নেই তোমার হামিদা, খাঁচার দোর তো খুলে দোবই, তা ছাড়া দেশান্তরে তোমার সত্যিকার আশ্রয়ে তোমাকে রেখে আসব। এখন একটু ধৈর্য ধ'রে মেজ মিঞার সঙ্গে গল্প-টল্প কর, আমি ততক্ষণে একটু কিছু মুখে দিয়ে আসি।"

আমিনার কথা শুনে সন্ধ্যা ব্যস্ত হয়ে উঠল; বললে, 'এখনো তুমি কিছু খাও নি ভাই আমিনা?—যাও, যাও, আর দেরি ক'রো না।"

"এই এখুনি এলুম—বেশি দেরি হবে না।" ব'লে আমিনা লঘু ক্ষিপ্রপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমিনা যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ তাকে মধ্যস্থ ক'রে সন্ধ্যা এবং নাসীরের মধ্যে এক-আধটা কথাবার্তা চলছিল, কিন্তু সে চ'লে যাওয়ার পর এই সদ্য-পরিচিত দুটি তরুণ-তরুণীর পক্ষে কথাবার্তা চালানো কঠিন হয়ে উঠল। নবপরিচয়ের সঙ্কোচ কথোপকথনের মধ্য দিয়েই তরল হয়ে ভেসে চ'লে যায়, নীরবতা তার পথে বাধা সৃষ্টি ক'রে তাকে বাড়িয়ে তোলে। সুতরাং একটা মামুলী কথোপ-কথনের সূত্রপাত ক'রে নাসীর এই অস্বস্তিকর মৌনের অবসান করবার চেষ্টা করলে। বললে, "কাল রাত্রে গরুর গাড়িতে আসতে আপনার খুবই কষ্ট হয়ে থাকবে।"

মাথা নেড়ে সন্ধ্যা মৃদুস্বরে বললে, "মোটেই না, আমি খুবই আরামে এসেছিলাম। কষ্ট হয়েছিল আপনার দাদার; তিনি প্রায় সমস্ত রাতই গাড়ির পিছনে পিছনে হেঁটে এসেছিলেন।"

সন্ধ্যার কথা শুনে নাসীর হাসতে লাগল; বললে, "আমরা পাড়াগেঁয়ে মানুষ, একটু পথ হাঁটতে, বিশেষত রাত্রে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায়, আমাদের কোনো কষ্টই হয় না। গাড়ি-পাল্কী জেনানাদের জন্যেই ব্যবহার হয়। আমরা পুরুষেরা গাড়ির আগে-পিছে তো চলিই, আবার সময়ে সময়ে গাড়ির ওপর উঠে গরুর ল্যাজ মলতে মলতেও চলি।" ব'লে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল। তারপর ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে বললে, "আপনারা বড়মানুষ, জুড়ি গাড়ি মোটরকার চড়া অভ্যেস,—গরুর গাড়ি চড়তে নিশ্চয়ই আপনাদের কষ্ট হয়।"

শুনে সন্ধ্যা অবরুদ্ধ বেদনার দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করলে। হায় রে! কোথায় বা জুড়ি গাড়ি, আর কোথায়ই বা মোটরকার! সে সব তো একরকম ভুলেই গেছে। সম্পদে-সম্মানে নন্দিত তার পূর্বকার সহজ সুন্দর জীবন, সে তো এখন অতীতের স্মৃতি! যে কলুষিত গ্লানিকর অস্তিত্বের মধ্যে তার দেহ-মন পলে পলে গলিত হয়ে উঠছিল, গরুর গাড়ি ক'রে তা থেকে দূরে পলায়ন, সে তো একটা অচিন্তিত সৌভাগ্যের কথা। আমিনা যদি তার হাতে-পায়ে দড়ি বেঁধে বন-বাদাড় কাঁটা-কাঁকরের মধ্য দিয়ে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসত তা হ'লেও দুঃখ ছিল না। মুখে তার কাতরতার ছায়া ঘনিয়ে এল; দুঃখার্ত কণ্ঠে বললে, "আমি বড়মানুষ নই,—অতি দুর্ভাগিনী।"

সন্ধ্যার কথা শুনে এবং আকৃতির আকস্মিক পরিবর্তন দেখে নাসীর গভীর ঔৎসুক্যের সহিত বললে, "কিন্তু আপনি বড়লোকের মেয়ে, বড়-ঘরের বউ, এ কথা তো আমি ভাবীর মুখে শুনেছি।"

"শুধু সেই কথাই শুনেছেন, না, আরও কিছু শুনেছেন?"

"আর বিশেষ-কিছু শুনি নি, তবে আপনার বিষয়ে সব কথা আমাকে পরে বলবেন বলেছেন।"

সন্ধ্যা বললে, "যখন সব কথা শুনবেন তখন বুঝতে পারবেন, আমি তখন পরিহাস করছিলাম না,—সত্যিই আমি আপনাদের আশ্রিত, আপনাদের শরণাগত।" একটু চুপ ক'রে থেকে কতকটা যেন আপন মনে অন্যমনস্কভাবে বললে, "যে গরুর গাড়ি ক'রে আমিনা আমাকে উদ্ধার ক'রে আনলে, সে গরুর গাড়ি তো চিরদিনের জন্যে আমার মনে পুষ্পকরথ হয়ে রইল।" কথাটা ব'লে ফেলে নাসীরের দিকে চেয়ে হাসতে গিয়ে অকস্মাৎ ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেললে। ঠিক যেন সূর্যকিরণের মধ্যে শরৎকালের অতর্কিত লঘুমেঘের বর্ষণ-লীলা!

নিজের এই আকস্মিক বিহ্বলতার অভিনয়ে অপ্রতিভ হয়ে সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি বস্ত্রাঞ্চলে চোখ মুছে পুনরায় একবার নাসীরের দিকে চেয়ে দৃষ্টি নত করলে।

দুঃখিত স্বরে নাসীর বললে, "আমি বড়ই অন্যায় করেছি এ সব কথা তুলে। আমি আগে জানতাম না—"

নাসীরকে আর অধিক কথা বলবার অবসর না দিয়ে সন্ধ্যা বললে, "আপনি তো কোনো কথাই তোলেন নি। এ কথা আপনিই ওঠে,—আমার জীবনে উপস্থিত এর চেয়ে বড় কোনো কথাই আর নেই,—সুখেরও নয়, দুঃখেরও নয়।"

কী সে এমন কথা যার চেয়ে এই সুন্দরী তরুণী নারীর উপস্থিত আর কোনো কথাই বড় নেই, তা শুনতে ইচ্ছা করে; কী সে এমন বিপদ যা থেকে তাকে উদ্ধার ক'রে আমিনা এ বাড়িতে নিয়ে আসার ফলে সামান্য গরুর গাড়ি পুষ্পকরথ হয়ে রইল, তা জানবার আগ্রহও মনে কম নয়; কিন্তু যে প্রসঙ্গের অবতারণা মাত্রেই এক পশলা চোখের জলের বর্ষণ হয়ে যায় সে প্রসঙ্গ নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া করতে সহৃদয়তায় বাধে। পিছন দিকের বাগানে বহুক্ষণ থেকে একটা কাঠ-ঠোক্‌রা পাখী সমানে শব্দ ক'রে চলেছিল, সেই একটানা শব্দের মদিরতায় নিজের কল্পনাবৃত্তিকে নিমজ্জিত ক'রে নাসীর তার সম্মুখে উপবিষ্ট এই

অপরূপ রূপসী নারীর রহস্যাবৃত জীবনের সুখদুঃখের সমস্যা অনুমাননে প্রবৃত্ত হ'ল। কোথা থেকে সে এসেছে, কোথায় সে যাবে, কি তার অভিপ্রায়—কিছুই সে আমিনার কাছ থেকে জানতে পারে নি; শুধু এইটুকু মাত্র জেনেছে যে, সে তাদের গৃহে ক্ষণস্থায়ী অতিথি এবং জাতিতে হিন্দু। বিবাহিত কি অবিবাহিত—সে কথা জিজ্ঞাসা করবারও অবকাশ হয় নি। চোখে দেখে ঠাহর করবার কয়েকবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু তাও ঠিক বোঝা যায় না। সীমন্তের প্রান্তভাগে রক্তাভ দাগটুকু সিঁদুরের, কি সিঁদুরের নয়, তাও যেন একটা রহস্য! এ যেন ঠিক রূপকথার অলৌকিক ব্যাপার! রূপকথার নায়িকার মতো সোনার কাঠির স্পর্শে হঠাৎ এক সময়ে আবির্ভূত হয়েছে, আবার রূপার কাঠির স্পর্শে হঠাৎ কখন অদৃশ্য হবে! রূপকথা নয় তো কি? দবীপুরের মতো অজ পাড়াগাঁ জায়গায় তাদের বাড়িতে এমন একটি অভিজাত বংশের রূপসী মেয়ে, রূপকথার পরীর মতোই বিস্ময়ের বস্তু!

"নাসীর মিঞা!"

সহসা নিদ্রোত্থিতের মতো চকিত হয়ে নাসীর বললে, "জী আজ্ঞে!"

"আপনি তো কলকাতায় পড়েন?"

"জী।"

"এখন আপনি এখানে রয়েছেন, কলেজ কি বন্ধ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আমাদের একটা পরব পড়েছে, সেই জন্য কলেজ পাঁচ দিন বন্ধ।"

"কবে আপনি কলকাতায় ফিরবেন?"

মনে মনে একটু চিন্তা ক'রে নাসীর বললে, "দিন তিনেক পরে।"

নাসীরের কথা শুনে সন্ধ্যার মুখে চিন্তার রেখা দেখা দিল; বললে, "আজ তবে আমাকে কে কলকাতায় নিয়ে যাবে? বোধ হয় আপনার দাদা?"

"তা তো বলতে পারলাম না। আপনার যাওয়ার কোনো কথাই আমি শুনি নি।"

উৎকণ্ঠিত মুখে সন্ধ্যা বললে, "কিন্তু আজ আমাকে কলকাতা যেতেই হবে। আপনি যদি দয়া ক'রে সে বিষয়ে ব্যবস্থা করবার জন্যে আপনার বাবাকে একটু অনুরোধ করেন!"

নাসীর বললে, "আপনি আদেশ করলে নিশ্চয়ই করব, কিন্তু তার কোনো প্রয়োজন হবে না, সে বিষয়ে আপনার সমস্ত ব্যবস্থা বউদিদি—আমার ভাবী করবেন। বাবার কাছে তাঁর কথার চেয়ে বেশি জোর আর কারো কথার নেই—আমারও নয়, দাদারও নয়। কিন্তু আজই আপনার কলকাতায় যেতে হবে? দু-চার দিন পরে গেলে হ'ত না? দিন তিনেক পরে আমিও তো আপনাকে নিয়ে যেতে পারি।"

মৃদু মৃদু মাথা নাড়তে নাড়তে সন্ধ্যা বললে, "আজ আমাকে যেতেই হবে। সব কথা শুনলে আপনি বুঝতে পারবেন যে, আজ আমার না গেলেই নয়।" একটু অপেক্ষা ক'রে নাসীরের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা, এখান থেকে রেল-স্টেশন কত দূরে?"

নাসীর বললে, "বেশি নয়, মাইল চারেক পথ!"

"যেতে কতক্ষণ সময় লাগে?"

"তাও বেশি নয়, ঘণ্টা দেড়েক।"

"স্টেশনের নাম কি?"

"গালুডি।"

"গালুডি!" সন্ধ্যার মুখ উৎফুল্ল হয়ে উঠল। অবশেষে একটা পরিচিত জায়গার কাছাকাছি উপনীত হয়েছে তা হ'লে! বছর চারেক আগে মাস-খানেকের জন্যে গালুডিতে সে তার মাসির বাড়ি বেড়াতে আসে। স্ত্রীর ভগ্ন-স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য তার মেশোমশাই গালুডিতে বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন।

নাসীর বললে, "গালুডি তা হ'লে আপনি জানেন?"

"হ্যাঁ, জানি। পাশেই বোধ হয় জামসেদপুর?"

"ঠিক পাশেই নয়, গোটা দুই স্টেশন পরে। জামসেদপুর গেছেন না-কি কখনো?"

"হ্যাঁ, গেছি।"

"আত্মীয় কেউ সেখানে আছেন?"

গালুডিতে অবস্থানকালে লোহার কারখানা দেখবার জন্যে সন্ধ্যারা একবার জামসেদপুর গিয়েছিল। সেখানে তার মাসিমার বড় জামাই কারখানায় বড় চাকরি করেন। তিনিই আগ্রহ ক'রে সকলকে নিয়ে গিয়ে চার-পাঁচ দিন নিজের গৃহে রেখেছিলেন। তাঁর কথা মনে ক'রে সন্ধ্যা বললে, "হ্যাঁ, আছেন। আমার মাসিমার জামাই সেখানে চাকরি করেন।" বিবাহের সময়ে পীরনগরে পরিচিত সুধারাণীর স্বামীও জামসেদপুরে চাকরি করে, এ কথা সে শুনেছিল। কিন্তু সুধারাণীর স্বামীর নাম তার মনে পড়ল না, হয় তো কখনো শোনেই নি।

নাসীর বললে, "বোনের বাড়ির এত কাছাকাছি যখন এসেছেন তখন কলকাতা যাওয়ার আগে একবার জামসেদপুরে গিয়ে দেখাটা ক'রে এলে ভাল হ'ত না? না গেলে, পরে শুনলে তিনি হয়তো দুঃখ করতে পারেন।"

এ কথার উত্তর দেওয়ার সময় হ'ল না, মহীউদ্দীনকে সঙ্গে নিয়ে আমিনা সহাস্যমুখে ঘরে প্রবেশ ক'রে বললে, "বেশি দেরি হয়েছে কি সন্ধ্যা?"

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে সন্ধ্যা বললে, "একটুও না, খুব শীগগির এসেছ।"

মহীউদ্দিন বললেন, "ব'সো মা, বোসো। তুমিও ব'সে পড় বউমা, এখন অনেকক্ষণ কথাবার্তা করবার দরকার হবে।" তার পর নাসীরের দিকে

দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন, "নাসীর, তুমি গিয়ে ইয়াসিনকে ডেকে নিয়ে এস,—পরামর্শের মধ্যে আমাদের সকলেরই থাকা দরকার।"

ইয়াসিন উপস্থিত হ'লে অবিলম্বে কথাটার আলোচনা আরম্ভ হয়ে গেল।

সংক্ষেপে সমস্ত ব্যাপারটা পুত্রদের কাছে বিবৃত ক'রে মহীউদ্দিন সন্ধ্যাকে বললেন, "এ কথাতে কোনো ভুল নেই মা, যে, যত শীঘ্র সম্ভব তোমার এখান থেকে চ'লে যাওয়া দরকার,—তাতে তোমার পক্ষেও মঙ্গল; আমাদের পক্ষেও মঙ্গল। কিন্তু গোয়েন্দা-পুলিসের দৃষ্টি এড়িয়ে কলকাতায় তোমাকে নিয়ে যাওয়া যে খুব সহজ হবে তা আমার মনে হয় না, কারণ কলকাতার দিকে, বিশেষত হাওড়া স্টেশনে, তারা ওৎ পেতে ব'সে আছেই। এ কথা তারা খুবই জানে যে, এ সব ব্যাপারের বদমাইশেরা শেষ পর্যন্ত কলকাতায় গিয়ে আশ্রয় নেয়; আর ধরা পড়বার ভয়ে টাটকা-টাটকি যায় না, দু-চার মাস পরেই গিয়ে থাকে। তোমাকে নিয়ে আমার ছেলেরা যদি ধরা পড়ে তা হ'লে বউমার ভাইদের ধরা পড়তেও বিলম্ব হবে না—আর, তা হ'লে তার চোটটা শেষ পর্যন্ত বউমার ওপরই গিয়ে পড়বে তা বুঝতেই পারছ। শুনেছি, বউমার খাতিরে তুমি তাঁর ভাইদের এইটুকু ক্ষমা করেছ যে, তাদের আর অনিষ্ট কামনা কর না। এ কথা সত্যি কথা কি মা?"

ঘাড় নেড়ে সন্ধ্যা তার সম্মতি জানালে; বললে, "সত্যি।"

মহীউদ্দিন বললেন, "ভালো কথা। ক্ষমার উপর কোনো শিকায়েৎ চলে না, বিশেষত যেখানে ক্ষমা একটা উপকারের প্রত্যুপকার। তা হ'লে কাছাকাছি কোনো জায়গায় যদি তোমার এমন কোনো আত্মীয়স্বজনের বাস থাকে যেখানে রাতারাতি তোমাকে রেখে আসা যেতে পারে, তা হ'লে গফুর-মহবুবের সঙ্গে নেতুড়টা কেটে যায়। তার পর সেখান থেকে তুমি অনায়াসে কাউকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় চ'লে যেতে পার। এমন কেউ

আছেন কি মা? তা যদি থাকেন তো আজই তোমাকে সেখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করি।”

উৎসুকনেত্রে নাসীর সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে। সন্ধ্যাও একবার নাসীরের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, “আছেন। জামসেদপুরে আমার এক ভগ্নীপতি আছেন, টাটা আয়ারন্ ওয়ার্কসে চাকরি করেন।”

মহীউদ্দীন উৎফুল্ল হয়ে বললেন, “আল্লা! তা হ'লে তো সুবিধেই হয়েছে। নাম কি মা তাঁর?”

“প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।”

“ঠিকানা কি জান?”

মনে মনে একটু চিন্তা ক'রে সন্ধ্যা বললে, “বোধ হয় নদারন্ টাউন।”

“তা হ'লে বড চাকরি করেন?”

“হ্যাঁ, বড চাকরিই করেন।”

“সেখানে তোমার যেতে কোনো আপত্তি নেই তো মা? তা যদি না থাকে তো আজ রাত্রেই তোমাকে জামসেদপুরে পাঠিয়ে দিই। কলকাতা পৌছতে তাতে তোমার একটা দিন বিলম্ব হয়ে যাবে, কিন্তু উপায় কি?”

সকৃতজ্ঞনেত্রে সন্ধ্যা মহীউদ্দিনের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, “এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আমার পক্ষে আর কিছুই হতে পারে না। কি ব'লে আপনাকে যে আমি—” সে আর অধিক কিছুই বলতে পারলে না, অশ্রুতে চক্ষু আচ্ছন্ন হয়ে এল, কণ্ঠস্বর গেল জড়িয়ে।

স্নিগ্ধকণ্ঠে মহীউদ্দিন বললেন, “কিছুই তোমাকে বলতে হবে না মা, আমি সব বুঝতে পাচ্ছি। অনেক কষ্ট পেয়েছ তুমি, এবার খোদা তোমার মঙ্গল করুন।”

তার পর কি ক'রে সন্ধ্যাকে জামসেদপুরে পাঠানো হবে তার আলোচনা হয়ে গেল। স্থির হ'ল, বেলা আড়াইটার গাড়িতে ইয়াসিন জামসেদপুর গিয়ে প্রথমে সন্ধ্যার ভগ্নীপতির গৃহের সন্ধান ক'রে রাখবে, তার পর কাসেম নামে

তাদের একজন পরিচিত এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তির ট্যাক্সি নিয়ে রাত্রি চারটার সময়ে স্টেশনে অপেক্ষা করবে। রাত্রি তিনটার গাড়িতে গালুডি থেকে সন্ধ্যা ও নাসীর রওনা হয়ে জামসেদপুর পৌঁছলে ইয়াসিন সন্ধ্যাকে নামিয়ে নিয়ে প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গৃহে পৌঁছে দেবে। নাসীর সেই গাড়িতেই চক্রধরপুর চ'লে গিয়ে দিন দুই-তিন তার এক মাসির বাড়িতে অবস্থান করবে এবং ইয়াসিন মধ্যাহ্নের গাড়িতে দবীপুর ফিরে আসবে।

আমিনাকে সম্বোধন ক'রে মহীউদ্দিন বললেন, "তা হ'লে বউমা, বারোটার সময়ে তোমার বন্ধুকে নাসীরের সঙ্গে রওনা করিয়ে দিয়ো। তার আগে যেটুকু সময় হাতে আছে গরিবের ঘরে যতটুকু সম্ভব তাঁর খাতির-যত্ন কর।" তার পর হাসতে হাসতে বললেন, "যে শর্তে তোমার বন্ধুকে মুক্তি দিচ্ছ বউমা, সে শর্ত কিন্তু তুমি তুলে নিয়ো। খাঁচার দরোজা যখন খুলে দিচ্ছ তখন পাখীর পায়ে আর জিঞ্জির বেঁধে রেখো না।"

সহাস্যমুখে মৃদুকণ্ঠে আমিনা বললে, "আপনার যখন হুকুম আব্বা, তখন তাই হবে।"

"হুকুম নয় বেটী, অনুরোধ।" তার পর সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে মহীউদ্দিন বললেন, "খোদার কৃপায় সে প্রয়োজন যেন না হয়; কিন্তু যদিই হয়, তা হ'লে কিছুমাত্র সঙ্কোচ না ক'রে তুমি ফিরে এসো মা। যখনি তুমি আসবে তখনি বউমার এ বাড়ির দরোজা তোমার জন্যে খোলা পাবে—এ জেনে রেখো।"

শুনে সন্ধ্যার চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এল; বললে, "তা আমি জানি আব্বা।"

কম্পিতকণ্ঠে মহীউদ্দিন বললেন, "আরো একটা কথা ব'লে রাখি। বি. এ. পাস করলেই আমি নাসীরের সাদি দেব। তোমার কাছে নেওতা যাবে, জামাইকে সঙ্গে নিয়ে আমার একটি মেয়ের মত তখন তোমাকে আসতে হবে।"

সন্ধ্যার গৌরবর্ণ মুখে লজ্জার একটা গোলাপী আভা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল; মৃদুকণ্ঠে বললে, "নিশ্চয় আসব।"

বারো

বেড্‌সুইচ টিপে ঘর আলোকিত ক'রে পার্শবর্তী নিদ্রিত স্বামীর গা নাড়া দিয়ে সবিতা ডাকলে, "ওগো, ওগো, শুনছ ?"

ধড়মড় ক'রে শয্যার উপর উঠে ব'সে উৎকণ্ঠিত স্বরে প্রকাশ বললে, "কি ?"

অবরুদ্ধ স্বরে সবিতা বললে, "অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন ? চোর ডাকাত নয়। তুরৎ সিং বলছে, কে একজন মেয়েমানুষ কলকাতা থেকে এসেছে।"

"মেয়েমানুষ ? কোথায় ?"

"কি আশ্চর্য ! কোথায় আবার ? আমাদের বাড়িতে।"

তুরৎ সিং বাহিরের বারান্দা থেকে প্রভু এবং প্রভুপত্নীর কথোপকথনের মৃদু গুঞ্জন শুনতে পেয়ে প্রকাশ জাগ্রত হয়েছে বুঝতে পেরে কপট কাশির শব্দ দ্বারা নিজের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করলে।

ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ ডাক দিলে, "তুরৎ সিং !"

"হুজুর !"

"কিয়া হ্যায় ?"

"হুজুর, এক্‌গো মায়ী লোক কলকত্তেসে আয়ী হৈঁ।"

"কাঁহা হৈঁ ?"

"বরন্দে পর খড়ী হৈঁ।"

'কলকত্তে সে আয়ী হৈঁ'—এ তুরৎ সিংয়ের অনুমানের কথা, কেউ তাকে বলে নি। বহুদর্শিতার ফলে সে জানে যে, রাত চারটার সময় রেল থেকে কেউ এলে কলকাতা থেকেই এসে থাকে;—এ স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপারে অনুসন্ধান নিষ্প্রয়োজন।

তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ ক'রে হল-ঘর পেরিয়ে এসে ঔৎসুক্যের সহিত দোর

খুলে প্রকাশ দেখলে, সিঁড়ির নিকট বারান্দায় উপরে দাঁড়িয়ে একটি স্ত্রীলোক এবং তার নিকটেই নিম্নে গাড়ি-বারান্দায় একজন পুরুষ। কম্পাউণ্ডের প্রান্তে রাজপথে একটা মোটরের অস্তিত্ব এঞ্জিন চলার মৃদু ধক্ ধক্ শব্দে বোঝা যাচ্ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে সবিতাও স্বামীর পিছনে এসে দাঁড়িয়ে ছিল।

প্রকাশ এবং সবিতা আবির্ভূত হতেই ইয়াসিন সন্ধ্যাকে জিজ্ঞাসা করলে, "ঠিক চিনতে পারছেন? এঁরাই তো?"

তুরৎ সিং পূর্বেই বারান্দার বিজলী-বাতি জ্বেলে দিয়েছিল, সুতরাং ভাল ক'রে দেখতে পাওয়ার পক্ষে কোনো অসুবিধা ছিল না। মৃদুস্বরে সন্ধ্যা বললে, "হ্যাঁ।"

"আচ্ছা, তা হ'লে এখন আসি,—নমস্কার।" ব'লে যুক্তকরে সন্ধ্যাকে নমস্কার ক'রে ইয়াসিন ত্বরিতপদে অন্তর্হিত হ'ল, এবং পর-মুহূর্তে বিকট শব্দ ক'রে রাজপথের মোটরকার দ্রুতবেগে প্রস্থান করলে।

সন্ধ্যার কাছে এগিয়ে এসে সবিতা বললে, "আপনি কে, চিনতে পারছি নে তো!"

"চিনতে পারছ না সবিদিদি, পোড়ারমুখীকে চিনতে পারছ না?" ব'লে সন্ধ্যা একেবারে ঝাঁপ দিয়ে সবিতার দেহের উপর প'ড়ে দু হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলে।

তাড়াতাড়ি এক হাতে সন্ধ্যাকে জড়িয়ে ধ'রে অপর হাত দিয়ে তার মুখ আলোয় তুলে ধ'রে দেখে গভীর বিস্ময়ে সবিতা ব'লে উঠল, "ওমা, ওমা, সন্ধ্যা যে! তুই কোথা থেকে এলি রে সন্ধ্যা? তুই কোথা থেকে এলি?"

কিন্তু সন্ধ্যার তখন সবিতার প্রশ্নের উত্তর দেবার মতো অবস্থা একেবারেই ছিল না,—তার মুখ হয়ে গিয়েছিল পাংশু, চোখ আসছিল বুজে, দেহ আসছিল এলিয়ে!

"ওগো, ওগো, শীগগির ধর, সন্ধ্যা প'ড়ে যাচ্ছে।" ব'লে সবিতা সন্ধ্যাকে সজোরে চেপে ধরলে।

দ্রুতপদে এগিয়ে এসে প্রকাশ দুই বাহুর উপর সন্ধ্যার বিবশ দেহ তুলে নিলে; তার পর ধীরপদক্ষেপে হল-ঘর অতিক্রম ক'রে শয়ন-কক্ষে পৌঁছে তাদের শয্যার উপর সন্তর্পণে তাকে শুইয়ে দিল।

ভয়ার্তকণ্ঠে সবিতা বললে, "ওমা, কি হবে গো! শীগগির ডাক্তার ডাকতে পাঠাও।"

প্রকাশ বললে, "কিছু ভয় নেই, মানসিক উত্তেজনায় এ রকম হয়েছে। তুমি শীগগির একটু জল নিয়ে এস,—আর তোমার স্মেলিং সল্টের শিশিটা।"

মুখে চক্ষে কিছুক্ষণ জল-হাত বুলিয়ে দিয়ে প্রকাশ স্মেলিং সল্টের শিশিটা নেড়ে নিয়ে ছিপি খুলে সন্ধ্যার নাকের কাছে ধরলে। তীব্র অ্যামোনিয়ার গন্ধে নাসিকা কুঞ্চিত ক'রে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সন্ধ্যা পাশ ফিরে শুল।

প্রকাশ বললে, "আর ভাবনা নেই, খানিকটা ঘুম হ'লে শরীর ঠিক হয়ে যাবে। তুমি পাশে শুয়ে পড়, আমি ততক্ষণ ও-ঘরে গিয়ে একটা শোফা-টোফায় আশ্রয় নিই।"

কিন্তু হল-ঘরে গিয়ে সোফার মধ্যে আশ্রয় নিতে ইচ্ছা হ'ল না। পূর্বদিকের আকাশে অন্ধকার তরল হয়ে এসেছে, খোলা দোর-জানলার মধ্য দিয়ে ঝিরঝির ক'রে যে বায়ু প্রবেশ করছে তার মধ্যে প্রত্যুষের লঘুতা। দূরে কম্পা-উণ্ডের সীমানায় একটা কিংশুক গাছের ভিতর পাখীর ঝাপট শোনা যাচ্ছে। অতি-প্রত্যুষের এই কমনীয় শোভা উপভোগ করবার সুযোগ কদাচিৎ ঘ'টে থাকে। ঘটনাচক্রে যদিই বা সে সুযোগ উপস্থিত হ'ল, তাকে প্রত্যাখ্যান করতে প্রকাশের ইচ্ছা হ'ল না। সিগার-কেস, অ্যাশ-ট্রে এবং দেশলাই নিয়ে

সে বাইরে বারান্দায় গিয়ে একটা ঈজি-চেয়ারে বসল। তার পর কেসের ভিতর থেকে একটা মোটা চুরুট বার ক'রে ভাল ক'রে ধরিয়ে নিয়ে সমস্ত দেহ এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল।

নিদ্রার খানিকটা প্রয়োজন যে একেবারে ছিল না তা নয়, কারণ মামুলী বরাদ্দ পূর্ণ হতে তখনো ঘণ্টা দেড়েক বাকি ছিল। কিন্তু রাত্রিশেষের এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার বিস্ময় মনকে তখনো এমন নাড়া দিচ্ছিল যে, নিদ্রা তাকে পরাজিত করতে পারলে না। দস্যু-অপহৃতা এই মেয়েটি তার গৃহে সহসা এসে উপস্থিত হ'ল কেন, কোথা থেকে সে এখন আসছে, কে তাকে রেখে গেল, মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না ক'রে ত্বরিতবেগে সে কেনই বা প্রস্থান করলে, ইত্যাদি নানাবিধ প্রশ্ন তার মনকে আচ্ছন্ন ক'রে রইল।

কিছুক্ষণ পরে ঘরের ভিতর কথাবার্তার শব্দে প্রকাশ বুঝতে পারলে, সন্ধ্যা সুস্থ হয়ে জেগে উঠেছে; কিন্তু সেখানে না গিয়ে চুপ ক'রে চেয়ারেই প'ড়ে রইল। মনে মনে ভাবলে, নারীর মনের গভীর দুঃখের এবং লজ্জার কথা একজন নারীরই কাছে প্রথমে ব্যক্ত হয়ে কতকটা সহজ হয়ে যায়, সেই ভাল। এ কথাও সে মনে মনে স্থির করলে যে, সন্ধ্যার বিগত দুঃখময় জীবনের বিষয়ে বিশেষ কোনো ঔৎসুক্যই সে তার কাছে কখনো প্রকাশ করবে না,—যেটুকু সে নিজে বলবে অথবা সবিতার কাছে শুনতে পাবে তাই যথেষ্ট।

মূর্ছিতা সুন্দরী সন্ধ্যার অপূর্ব স্তিমিত শ্রী মনে ক'রে প্রকাশের মন সমবেদনায় সিক্ত হয়ে উঠল। নিজের শয্যার উপর সে যখন তাকে শুইয়ে দিয়েছিল, তখন তাকে কমলেরই মত সুন্দর মনে হয়েছিল বটে: কিন্তু সে কমলের উপর যেন গন্ধক-ধূমের মলিন পীতাভ অবলেপ।

"এখানে রয়েছ তুমি? আমি ভেবেছিলাম, হল-ঘরে হয়তো ঘুমুচ্ছ!"

চেয়ারে উঠে ব'সে প্রকাশ পিছন ফিরে চেয়ে দেখলে, সবিতা আসছে এবং তার পিছনে পিছনে সন্ধ্যা। তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে স্নিগ্ধকণ্ঠে সে সন্ধ্যাকে

আহ্বান করলে, "এস সন্ধ্যা, এস।" একটা চেয়ার তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, "ব'স এখানে।"

এগিয়ে এসে নত হয়ে সন্ধ্যা প্রকাশের পদধূলি গ্রহণ করলে। শশব্যস্তে স'রে গিয়ে প্রকাশ বললে, "আহা-হা, পায়ে হাত দিয়ো না। আমার পাটা এমন কিছু অপূর্ব বস্তু নয় যে, তার ধুলো কারো মাথায় চড়তে পারে। আচ্ছা, তোমরা এক-একটা চেয়ার নিয়ে ব'সে পড।"

সন্ধ্যা এবং সবিতা উপবেশন করলে প্রকাশ নিজের আসন গ্রহণ ক'রে বললে, "একটু ঘুমোলে না কেন সন্ধ্যা? শরীরটা সুস্থ হয়ে যেত।"

সবিতা বললে, "ঘুমোবে কি, কেঁদে কেঁদেই তো প্রাণটা বার করছে। তুমি চ'লে এলে, তার ঠিক পাচ মিনিট পরে উঠে বসল, সেই থেকে কান্না। আহা, ওর কষ্টের কথা শুনলে পাষাণও বোধ হয় গ'লে যায়। কিন্তু ওকে যে শেষ পর্যন্ত ফিরে পাওয়া গেল, এই আমাদের পরম ভাগ্য বলতে হবে।"

প্রকাশ জিজ্ঞাসা করলে, "সন্ধ্যা যে মুক্তি পেয়েছে, সে খবর কলকাতায় সকলে জেনেছেন কি?"

মাথা নেড়ে সবিতা বললে, "কেউ জানে না, মুক্তি পেয়ে প্রথমে ও তোমার কাছেই ছুটে এসেছে।"

প্রফুল্ল মুখে প্রকাশ বললে, "সে আমার পরম সৌভাগ্য ব'লে মনে করলাম। তোমাকে ফিরে পাওয়ার আনন্দের বোধনটি যে আমাদের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হ'ল, এ সত্যই আমার সৌভাগ্যের কথা সন্ধ্যা। এখন আজকের দিনের উৎসবটি কি ক'রে জাগিয়ে তুলতে হবে, তাই হচ্ছে চিন্তার বিষয়।"

সবিতা বললে, "উৎসব তুমি কি বলছ? সন্ধ্যা তো আজই কলকাতা যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছে; যদি সম্ভব হয়, আজ সকালের গাড়িতেই।"

একটু বিস্ময়ের সুরে প্রকাশ বললে, "আজ সকালের গাড়িতেই? কেন, এত তাড়া কিসের? আমি কলকাতায় তার ক'রে খবর দিচ্ছি, তাঁরা

এসে সন্ধ্যাকে নিয়ে যান। খবর পেয়ে তাঁরা এসে নিয়ে যান, সেইটেই তো ঠিক।"

প্রকাশের কথার শেষাংশ শুনে সন্ধ্যার মুখ দুশ্চিন্তায় বিবর্ণ হয়ে উঠল। আমিনা তার মনের মধ্যে যে আশঙ্কার বীজ নিক্ষেপ করছিল, তা থেকে উৎপন্ন কাঁটা মুক্তির আনন্দের মধ্যেও মাঝে মাঝে তাকে বিদ্ধ করেছে। মনে হয়েছে, আমিনা যা বলেছিল তা যদি মিথ্যে না হয়! তা ছাড়া সে নিজেও তো কতকটা সেই হিন্দু সমাজকে চেনে, যে সমাজ শুধু দ্বার রুদ্ধ করতেই জানে, খুলতে জানে না; যে শুধু বলতে পারে 'যাও',—'এস' বলবার শক্তি যার নেই। যে অবস্থা থেকে সে চ্যুত হয়েছে, সেই অবস্থা ফিরে পাওয়া ছাড়া সন্ধ্যার জীবনের আর কোন কাম্য, কোন চিন্তাই নেই; তাই অসঙ্কোচে সে আর্তস্বরে প্রকাশকে বললে, "কেন মুখুয্যে মশাই, আমি নিজে গেলে কি এমন ক্ষতি হতে পারে? আপনি কি মনে করেন, তাঁরা আমাকে না নিতেও পারেন?"

সে আশঙ্কা যে প্রকাশের মনে একেবারে ছিল না তা নয়, এমন কি সেই কথারই ইঙ্গিত বোধ হয় অজ্ঞাতসারেই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল,—কিন্তু সন্ধ্যাকে সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে সে বললে, "না না, আমি সে সব কিছুই মনে করছি নে সন্ধ্যা। আমার বলবার অর্থ, তুমি গিয়ে এখন কোথায় উঠবে? —বাপের বাড়িতে, না, শ্বশুরবাড়িতে? শ্বশুরবাড়ি যদি যাও, মেশোমশাই মাসিমা হয়তো একটু ক্ষুণ্ণ হবেন; বাপের বাড়ি যদি যাও, তোমার শ্বশুর-শ্বাশুড়ী হয়তো অপমানিত বোধ করবেন। তার চেয়ে খবর দিয়ে গেলে তোমার আর কোনো দায়িত্ব থাকে না। তাঁরা সেখান থেকে একটা যা হয় স্থির ক'রে এখানে এসে তোমাকে নিয়ে যান সেই তো ভাল।"

"কিন্তু তাঁরা যদি এখানে না আসেন?"

প্রকাশ বললে, "তা হ'লে অবশ্য তোমাকেই যেতে হবে। পাহাড় যদি মহম্মদের কাছে না আসে তো মহম্মদ পাহাড়ের কাছে যাবে—এ আপ্ত বাক্য।"

অনুনয়ের করুণকণ্ঠে সন্ধ্যা বললে, "সেই যদি যেতেই হয় মুখুয্যে মশাই, তা হ'লে আগেই যাই নে কেন?"

স্মিতমুখে প্রকাশ বললে, "যুক্তি চালাবার তোমার ক্ষমতা আছে সন্ধ্যা, কিন্তু আমার যুক্তিটাও নেহাত বাজে ব'লে মনে হচ্ছে না।"

"কিন্তু আমি যে আর স্থির থাকতে পাচ্ছি নে!"

সবিতা বললে, "আহা, সত্যি, ওর কষ্ট আর দেখতে পারা যায় না! তুমি আজকেই ওকে কলকাতা পাঠাবার ব্যবস্থা কর। ব্যবস্থা আর কি করবে, নিজে গিয়ে রেখে এস।"

প্রকাশ বললে, "তথাস্তু। আজই তোমার যাওয়া স্থির। দুপুরের গাড়িতে সম্ভব হবে না, কারণ অফিসে কতকগুলো জরুরী কাজ সারতে হবে। রাত দুটোয় বম্বে মেলে রওনা হয়ে কাল সকালে কলকাতায় পৌছোনো।—কেমন? খুশি তো?"

সন্ধ্যার মুখে মৃদুহাস্যের দীপ্তি ফুটে উঠল; ঘাড় নেড়ে বললে, "আচ্ছা।"

"বেশ কথা। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি এখনি দু জায়গায় দুটো জবাবী তার ক'রে দিচ্ছি; তার ফলে যদি এই উত্তর আসে যে, বৈকালে বম্বে মেলে রওনা হয়ে তাঁরা রাত্রি দশটার সময়ে এখানে এসে পৌছবেন, তা হ'লে অন্তত পাঁচ দিন এখানে তুমি বন্দী থাকবে। অবশ্য, সে কারাগার সুখের আগারই হবে।"

সন্ধ্যার মুখে পুনরায় একটা ক্ষীণ হাসির আভা দেখা দিল। সবিতা বললে, "তা প্রিয়লাল যদি ওকে নিতে আসে, তা হ'লে কি সহজে ওদের ছাড়ব? সম্পর্ক তো আর একটা নয়,—দুটো।" তার পর সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "ওরে সন্ধ্যা, তোর শ্বশুর দূর-সম্পর্কে আমার মামাশ্বশুর হন, তা জানিস?"

সন্ধ্যা বললে, "না।"

"তোর শ্বশুর আমার শাশুড়ীর দূর-সম্পর্কের পিসতুতো ভাই। অনেক দূর হয়ে গেল বটে, কিন্তু তবু সম্পর্ক তো?" তার পর হঠাৎ প্রকাশের দিকে চেয়ে সবিতা ব'লে উঠল, "ও মা, তুমি সন্ধ্যার সঙ্গে কথা কচ্ছ কি গো! সন্ধ্যা যে তোমার ভাদ্র-বউ হ'ল।" ব'লে খিলখিল ক'রে হেসে উঠল।

হাসিমুখে প্রকাশ বললে, "ক্ষেপেছ? শালী কখনো ভাদ্র-আশ্বিন হয় না,—চিরকালই ফাল্গুন। সোনা কখনো তামা হয় না, যতই তাকে পয়সার হিসেবে গুনতে চেষ্টা কর না কেন। কি বল সন্ধ্যা?"

কোনো কথা না ব'লে সন্ধ্যা মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

চেয়ার থেকে উঠে প'ড়ে সবিতা বললে, "সোনা কখনো তামা হয় কি-না সে হিসেব পরে করা যাবে। এখন চল্ সন্ধ্যা, খানিকটা শুয়ে শুয়ে গল্প করা যাক। তোর যাবার ব্যবস্থা তো ঠিক হয়ে গেল।"

প্রকাশ বললে, "সেই ঠিক, আমিও ততক্ষণ দুটো তার লিখে ফেলে পাঠিয়ে দিই। শুভসংবাদটা যত শীঘ্র দেওয়া যায় ততই ভাল। তার পর সাতটার সময়ে সকলে মিলে ভাল ক'রে চা খাওয়া যাবে,—তোমরা তার মধ্যে তোয়ের হয়ে নিয়ো।"

সন্ধ্যা ও সবিতা চ'লে যাচ্ছিল, প্রকাশ ডেকে বললে, "সন্ধ্যা, তোমার শ্বশুরবাড়ির নম্বরটা মনে আছে? রাস্তা আমি জানি, কিন্তু নম্বরটা ঠিক মনে নেই।"

সন্ধ্যা ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "এগারো নম্বর।"

"দেখ, সুস্থ সবল চিত্তে আমি নম্বরটা ভুলে গেছি, কিন্তু এত ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যেও তুমি ঠিক মনে রেখেছ। সাধে কি আমাদের বাঙালী মেয়েদের পতিগত প্রাণ ব'লে থাকে!" ব'লে প্রকাশ হাসতে লাগল।

সবিতা বললে, "তবুও তো তোমরা কথায় কথায় আমাদের সীতাসাবিত্রী ব'লে ঠাট্টা করতে ছাড় না!"

প্রকাশ বললে, "সেটা কি জানো ?—কবির ভাষায় যাকে বলে 'তরল সুরে ঠাট্টা ক'রে শুনিয়ে দিতে চাই, আসল কথাটাই'—আমাদের ঠাট্টাও তাই।"

প্রকাশের কথা শুনে সহাস্যমুখে সবিতা ও সন্ধ্যা প্রস্থান করলে।

আর একটা চুরুট ধরিয়ে খানিকটা পুড়িয়ে বাকিটা অ্যাশ-ট্রের মধ্যে নিক্ষেপ ক'রে প্রকাশ উঠে পড়ল। অফিস-রুমে গিয়ে সন্ধ্যার পিতাকে এবং শ্বশুরকে দুটো টেলিগ্রাম লিখে ফেললে। দুটোরই এক মর্ম, এক শব্দ,—'শুভ-সংবাদ। সন্ধ্যা আজ হঠাৎ টাটানগরে উপস্থিত হয়েছে। সে আপনাদের কাছে যাবার জন্য অতিশয় ব্যস্ত। আমি নিয়ে যাব, অথবা আপনারা নিতে আসবেন, সে কথা তার ক'রে জানাবেন।' তারপর বেল্ বাজিয়ে একজন বেয়ারাকে ডেকে একখানা দশ টাকার নোট দিয়ে টেলিগ্রাম দুটো ডাকঘরে পাঠিয়ে দিলে।

বেলা তখন প্রায় দশটা, অফিস যাবার জন্যে প্রকাশ প্রস্তুত হচ্ছে, এমন সময় সন্ধ্যার পিতার তারের জবাব এল,—'শুভসংবাদে সকলেই সুখী। সন্ধ্যার শ্বশুরকে যদি সংবাদ না দিয়ে থাক তো অবিলম্বে দেবে। তাঁর ঠিকানা ১১নং দত্তপুকুর রোড। চিঠি যাচ্ছে।'

নিকটে সবিতা এবং সন্ধ্যা দাঁড়িয়ে ছিল, প্রকাশের পড়া হয়ে গেলে তারা তার হাত থেকে টেলিগ্রামটা নিয়ে একে একে প'ড়ে দেখে ফিরিয়ে দিলে। সন্ধ্যাকে নিতে আসার অথবা আনিয়ে নেওয়ার বিষয়ে টেলিগ্রামে একটিও কথা নেই,—সে বিষয়ে প্রকাশের যে প্রশ্ন ছিল সে সম্বন্ধে একেবারে নীরব। তা ছাড়া নেই শুভসংবাদের পরিমাণের হিসাবে আনন্দ প্রকাশের বদান্যতা। নেহাত যে আনন্দটুকু প্রকাশ না করলে সাধারণ সহৃদয়তার ব্যতিক্রম ঘটে, শুধু সেইটুকুই। সন্ধ্যার প্রতি নিমেষের জন্য দৃষ্টিপাত ক'রে সবিতা লক্ষ্য করলে, নৈরাশ্যের আঘাতে তার মুখ কঠোর হয়ে উঠেছে। যতটা সম্ভব তাকে সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে সে বললে, "যতই হোক, মেয়ের বাপ তো, সব দিক বিবেচনা

ক'রে না চললে চলে না। পাছে কোনো কথা ওঠে সেই জন্যে নিজের তরফ থেকে কোনো-কিছু না ক'রে আগে শ্বশুরকে খবর দিতে বলেছেন।"

সন্ধ্যা বললে, "কিন্তু আমাকে কলকাতা যাবার জন্যে অনুমতি দিলেও কি কোনো কথা উঠত সবিদি? মুখুয্যে মশাই লিখেছিলেন যে, তিনি পৌঁছে দিতে পারেন।"

এ কথার উত্তর দিলে প্রকাশ; বললে, "বাঙালী মেয়ের বাপ, সন্ধ্যা, ভয়ে আধমরা হয়েই থাকে। তোমাকে দেখবার জন্যে ছুটে আসবার সাহস যাঁর হয় নি, তোমাকে যাবার জন্যে কেমন ক'রে তিনি লেখেন, বল? সে যে আরো বেশি দায়িত্বের কথা হ'ত।"

দৃঢ়স্বরে সন্ধ্যা বললে, "কিন্তু দায়িত্ব কেন, তা আমি একটুও বুঝতে পারছি নে মুখুয্যে মশাই। কিসের দায়িত্ব?"

সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে প্রকাশ দেখলে, তার দুই চোখের মধ্যে অগ্নিকণা প্রজ্বলিত হয়েছে। সে ভয় পেয়ে গেল; শান্ত স্বরে বললে, "এ সব আলোচনা এখন বন্ধ থাক্ সন্ধ্যা। হয়তো এ সমস্ত কথাই নিরর্থক হচ্ছে। আর একটু পরে তোমার শ্বশুরের তার এলে তখন হয়তো এ সব কথা আলোচনা করবার কোনো প্রয়োজনই হবে না। এখন তোমরা যাও, খেয়ে নাওগে।"

সন্ধ্যার শ্বশুরের কাছ থেকে যখন টেলিগ্রাম এল, তখন বেলা দুটো। একটা শীট-মিলে প্রকাশ ব'সে মিলের একটা বেমেরামত অংশ পরীক্ষা করছে, এমন সময়ে তার একজন আরদালী গিয়ে তাকে তারখানা দিলে। খাম খুলে তাড়াতাড়ি টেলিগ্রামের উপর একবার চোখ বুলিয়ে প্রকাশের মুখে বিরক্তির চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে উঠল। এক মুহূর্ত কি ভাবলে, তার পর টেলিগ্রামটা ভাঁজ ক'রে খামের মধ্যে পুরে জামার বুক-পকেটে রাখলে। খানিকটা কাজ করবার পর দেখলে, একটা সম্ভাবিত দুরূহ সমস্যার চিন্তায় কাজে মন বসছে না। বিরক্ত হয়ে সেদিনের মতো সেইখানে ইতি ক'রে নিজের অফিস-রুমে চ'লে গেল।

বেলা তখন সাড়ে তিনটে। প্রশস্ত বারান্দার এক প্রান্তে একটা মার্‌বল পাথরের গোল টেবিল ঘিরে আট-দশখানা চেয়ার ছিল, তারই দুখানা অধিকার ক'রে সবিতা ও সন্ধ্যা গল্প করছিল। সন্ধ্যার চক্ষু রক্তাভ,—বোধ হয় একটু পূর্বেই কেঁদেছিল, তারই চিহ্ন।

সবিতা বললে, "ও-সব চিন্তা তুই ছেড়ে দে সন্ধ্যা। কোথাকার কে এক আমিনা তোর মাথাটি একেবারে খেয়ে দিয়েছে দেখছি!"

ম্লান হাসি হেসে সন্ধ্যা বললে, "শুধু আমিনার কথা কেন বলছ সবিদি, তুমি নিজেই কি হিন্দু সমাজের কথা জান না? গল্পে উপন্যাসে পড় নি? খবরের কাগজে দেখ নি?"

"গল্প-উপন্যাসের কথা এখন ছাড়্, উপন্যাসে সব কথা একটু বাড়িয়ে না বললে লোকের ভাল লাগবে কেন? এখন লোকের মতিগতি অনেক বদলে গেছে।"

সন্ধ্যা বললে, "মতি বদলে থাকতে পারে, কিন্তু গতি বদলায় নি। আর তাও যদি বদলে থাকে তো সে সাধারণ ভদ্রলোকদের মধ্যে, বনেদী বংশে নয়। আমার শ্বশুররা যে বনেদী বংশ।"

"আচ্ছা, দেখ্ না তোর শ্বশুরের কাছ থেকে কি জবাব আসে, তার পর যা বলতে হয় বলিস। আগে থেকেই খাঁড়া উঁচিয়ে রাখছিস কেন?"

"আমি আর খাঁড়া উঁচিয়ে কি রাখব সবিদি। কিন্তু আমার কি মনে হচ্ছে জান? বাবার কাছ থেকে তবু যা হোক একটা উত্তর এসেছে, শ্বশুরের কাছ থেকে কোনো উত্তরই আসবে না। বেলা চারটে বাজতে চলল, এখনো জবাবী এক্সপ্রেস টেলিগ্রামের উত্তর এল না,—এ তুমি বুঝতে পারছ না?"

"হয়তো অফিসে এসেছে।"

"তা যদি এসে থাকে তো খারাপ খবরই এসেছে, ভাল খবর হ'লে মুখুয্যে মশাই তখনি পাঠিয়ে দিতেন।"

দূরে একটা মোটরকারের হর্ন শুনে সবিতা বললে, "ঐ উনি আসছেন। সকাল সকাল যখন ফিরছেন, তখন নিশ্চয়ই ভাল খবর নিয়ে টেলিগ্রাম এসেছে।"

কিন্তু গাড়ি-বারান্দায় যখন মোটর এসে দাঁড়াল, তখন ভিতরে প্রকাশের উৎসাহহীন মুখে দেখে শুভসংবাদের ভরসা আর কিছু রইল না।

গাড়ি থেকে নেমে প্রকাশ বারান্দায় এলে সবিতা জিজ্ঞাসা করলে, "টেলিগ্রাম এসেছে?"

"এসেছে।"

"কি খবর?—ভাল?"

"ঐ একই রকম।" মুখখানা একটু কুঞ্চিত বোধ হয় অজ্ঞাতসারেই হয়ে গেল। সন্ধ্যা উঠে দাঁড়িয়ে ছিল, আস্তে আস্তে চেয়ারে ব'সে পড়ল।

সবিতা হাত বাড়িয়ে বললে, "কই, দেখি?"

পকেট থেকে টেলিগ্রামটা বার ক'রে প্রকাশ সবিতার হাতে দিলে।

সবিতা প'ড়ে সন্ধ্যার সামনে টেবিলের উপর রেখে দিলে। স্পর্শ না ক'রেই সন্ধ্যা টেলিগ্রামটা ধীরে ধীরে প'ড়ে নিলে।

টেলিগ্রামের মর্ম এইরূপ,—'শুভসংবাদের জন্য ধন্যবাদ। বউমা উপস্থিত এখন কিছুদিন তাঁর বাপের কাছে থাকেন—সেইটেই বাঞ্ছনীয়। তাঁকে যদি এখনো খবর না দেওয়া হয়ে থাকে তো অবিলম্বে যেন হয়। চিঠি যাচ্ছে।'

টেলিগ্রামের মধ্যে যে কঠোর কথা মৌন হয়ে বর্তমান রয়েছে, তার আঘাতে তিনটি প্রাণী ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল। কেউ তা নিয়ে কোনো আলোচনা করতে সাহস করলে না। এ যেন ঠিক বিদ্যুৎপূর্ণ তামার তার, চোখে দেখতে নিরাপদ, কিন্তু স্পর্শ করলেই ভিতরে মৃত্যুদায়ী প্রবাহ।

মৌনভঙ্গ করলে প্রকাশ; বললে, "আমি তো অফিসের কাজ গুছিয়ে প্রস্তুত হয়ে এসেছি। কিন্তু তুমি কি আজ রাত্রে কলকাতা যেতে চাও সন্ধ্যা ?"

সন্ধ্যা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল ; মৃদুস্বরে বললে, "না।"

প্রকাশ বললে, "সেই কথাই ভাল। কাল দুজনেরই চিঠি আসবে, সেই দেখে যেমন ভাল হয়, সেইরকম ব্যবস্থা করলেই হবে।"

"কিন্তু চিঠিতেও যদি আমাকে নিয়ে তাঁরা এমনি ছোঁড়াছুঁড়ি করেন, তখন আমি কোথায় যাব মুখুয্যে মশাই ?" ব'লে দুই বাহুর মধ্যে মুখ গুঁজে সন্ধ্যা নিঃশব্দে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

সন্ধ্যার পিঠের উপর দক্ষিণ বাহু রেখে সমবেদনার করুণকণ্ঠে সবিতা বললে, "তাই যদি হয়, তা হ'লে কোথায় আবার যাবি ভাই ? আমাদের কাছেই থাকবি। যতদিন দরকার, যতদিন ইচ্ছে। আমাদের তো আর ছেলেপিলে নেই যে, সমাজের ভয় করতে হবে।"

প্রকাশ বললে, "আমার আবার বোনও নেই সন্ধ্যা, সুতরাং আমি মনে করব, এতদিনে আমি একটি বোন লাভ করলাম। কিন্তু এ সব বাজে কথার কোনো দরকার নেই, কাল চিঠি এলে দেখবে, আজ তুমি যা ভয় করছ তার কোনো কারণই ছিল না।"

কিন্তু পরদিন যখন চিঠি এল তখন দেখা গেল, কারণ যথেষ্টই ছিল। দুটি চিঠিই দুখানি টেলিগ্রামের কিঞ্চিৎ বিস্তৃত সংস্করণ মাত্র,—বাহুল্যবর্জিত, উচ্ছ্বাসবিহীন, যুক্তির সারবত্তায় সুনিবিড়। উভয় চিঠিরই প্রতিপাদ্য, সন্ধ্যা এখন কিছুদিন অপর পক্ষের কাছে থাকে—সেইটেই বাঞ্ছনীয়। আনন্দ অথবা সমবেদনার বাড়াবাড়ি কিছুমাত্র নেই, পাছে তদ্দ্বারা বিবেচনার অভাব পরিলক্ষিত হয়। উভয় পক্ষের সহিত উভয় পক্ষের দেখাশুনার পর চিঠি লেখা, তার ইঙ্গিত চিঠির মধ্যে বর্তমান।

চিঠি পড়ার পর মিনিটখানেক চুপ ক'রে ব'সে থেকে সন্ধ্যা উঠে ধীরে ধীরে তার ঘরের দিকে চ'লে গেল। কাল টেলিগ্রাম এলে সে কেঁদে আকুল হয়েছিল, আজ তাকে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলতেও দেখা গেল না।

ভয়ার্তকণ্ঠে সবিতা বললে, "কি হবে গো! শেষ পর্যন্ত মেয়েটা ভেসে যাবে নাকি?"

প্রকাশ বললে, "বাংলা দেশ তো! ভেসে যেতেও পারে, ডুবে যেতেও পারে, কিছুই আশ্চর্য নয়।"

"তার পর?"

"তার পর যা, তাকেই বলে অদৃষ্ট,—এখন কেমন ক'রে বলব বল?"

সেদিন সন্ধ্যা কারো সঙ্গে বাক্যালাপ করলে না, জলস্পর্শ করলে না; বৈকাল থেকে সেই যে শয্যা গ্রহণ করেছিল, তার পর সে রাত্রি তাকে কেউ একবার ঘরের বাইরে আসতে দেখে নি। যতবারই সবিতা ওকে ওঠাবার খাওয়াবার চেষ্টায় গেছে, প্রতিবারই একই সংক্ষিপ্ত উত্তর পেয়ে ফিরেছে—'আজ আমাকে ছেড়ে দাও ভাই সবিদিদি, একেবারে একলা। কিছু ভাল লাগছে না, ভারি ক্লান্ত।' সবিতা তাকে শান্ত করবার উদ্দেশ্যে নানাপ্রকারে কথাটা উত্থাপিত করবার চেষ্টা করেছে; কিন্তু সন্ধ্যা সে কথায় কোনো দিক দিয়েই যোগ দেয় নি, না অনুযোগ-অভিযোগের দিক দিয়ে, না দুঃখ-অভিমানের দিক দিয়ে। কান্নাকাটির তো ধার দিয়েও যায় নি।

রাত্রি দশটার সময়ে সবিতা গিয়ে যখন দেখলে, ভিতর থেকে সন্ধ্যার ঘরের দ্বার রুদ্ধ, তখন প্রকাশ বললে, "আর ডাকাডাকি ক'রো না সবু, এক রাত্রি আহার না করলে কোনো অনিষ্ট হবে না। কিন্তু একটু যদি ঘুমিয়ে পড়ে তা হ'লে ওর দেহমন দুই-ই কিছু সুস্থ হতে পারবে।"

কিন্তু কোনো উপায়ে প্রকাশ যদি অবরুদ্ধ দ্বারের ভিতরকার অবস্থা একটুখানি দেখতে পেত তা হ'লে বুঝতে পারত, যে দুটি চক্ষের মধ্যে অশ্রুর পরিবর্তে অগ্নির রুদ্রলীলা চলেছিল, সেখানে ঘুমের কোনো সম্ভাবনাই থাকতে পারে না। যে বস্তুর উপর বৃষ্টিপাত হ'ল না, শুধু বজ্রপাতই হ'ল, সে জ্বলবে না তো আর কি হবে?

তিরোবিয়া থেকে দবীপুর এবং দবীপুর থেকে টাটানগর সে এই সুনিশ্চিন্ত ধারণা বহন ক'রে ছুটে এসেছিল যে, ডাকাতদের হাত থেকে মুক্তি লাভ করেছে শোনবামাত্র তার পিতা মাতা, শ্বশুর স্বামী—সকলেই বাহু প্রসারিত ক'রে

ছুটে আসবে ;—বলবে, ওরে আয়, আয়, আমাদের হারানো ধন, আমাদের হারানো মানিক, আমাদের ঘরে ফিরে আয়, আমাদের বুকে ফিরে আয়। তোকে হারিয়ে আমরা জীবন্মৃত হয়ে ছিলাম, ফিরে পেয়ে মৃতদেহে প্রাণ পেলাম। কিন্তু কোথায় বা ছুটে আসা, কোথায়ই বা বাহু-প্রসারণ! স্বপ্ন-মরীচিকা চক্ষের পলকে অন্তর্হিত হ'ল। যা এল, তা জড় নিশ্চল, তার মধ্যে পাষাণের স্থাবরতা। তার মধ্যে স্নেহ নেই, প্রেম নেই, ভালবাসা নেই, দুঃখ নেই, সমবেদনা নেই; আছে শুধু শুভবুদ্ধি। পিতৃপক্ষ এবং শ্বশুরপক্ষ,—উভয় পক্ষের মুখে একই বাক্য—অন্যত্র, অন্যত্র।

কিন্তু উভয় পক্ষই যদি অন্যত্র বলে, তা হ'লে সে 'অন্যত্র' কোথায়? পথে কি? না নদীগর্ভে, না অগ্নিকুণ্ডে? সবিতা বলে, তাদের গৃহে। কিন্তু কিছুতেই নয়। কুটুম্ববাড়িতে আশ্রিতা হয়ে করুণার উপর নির্ভর ক'রে জীবন-যাপন কোনোমতেই না। প্রতিদিন প্রত্যূষে উঠে সবিতা এবং প্রকাশের মুখের ভাব লক্ষ্য ক'রে সেই সুরে সুর মিলিয়ে দিন আরম্ভ করতে হবে, তার চেয়ে ভিক্ষা ভাল, দাস্যবৃত্তি ভাল। ঘর ঝাঁট দিয়ে, উঠান পরিষ্কার ক'রে, বাসন মেজে জীবিকা অর্জনের মধ্যে দৈন্য থাকতে পারে, কিন্তু হীনতা নেই। কিন্তু গলগ্রহ হয়ে থাকা?—না, কিছুতেই নয়।

আচ্ছা, স্কুলে মেয়েদের গান শিখিয়ে কোনো প্রকার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হয় না কি? সে তো স্কুলের মধ্যে তার সময়ে গানে সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্রী ছিল। সভা-সমিতি, পুরস্কার-বিতরণ, অভিনয়, সব তাতেই গানের প্রধান ভার পড়ত তার উপর।

মনে পড়ল তার সঙ্গীত-শিক্ষক যতীন চাটুয্যের কথা। গান শেখাতে শেখাতে যতীন চাটুয্যে একদিন তাকে বলেছিলেন, সন্ধ্যা, তোমার গলায় মালকোশের কোমল গান্ধার শুনে আমার মনে হয়, এমন কোনো রাগিণীই নেই যা তুমি ডাকলে তোমার কাছে সম্পূর্ণ মূর্তিতে এসে ধরা না দেয়। সেদিন

যতীনবাবু সন্ধ্যাকে অদারঙ্গের বিখ্যাত খেয়াল 'আজু মোরে ঘর আইলা সুমত প্যারে' শেখাচ্ছিলেন। গান শেখানো শেষ হ'লে তিনি বলেছিলেন, 'শুনছি তোমার খুব বড় বনেদী ঘরে বিয়ের কথা হচ্ছে, আশীর্বাদ করি তাই যেন হয়। সে ভারি আনন্দের কথা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার এই ভয় হচ্ছে মা, বনেদী বংশের ঘেরাটোপের মধ্যে ঢুকে শেষ পর্যন্ত তোমার গলায় না ছিপি পড়ে। তা যদি হয়, তা হ'লে আমি বুঝব, বাংলা দেশের একটি সুরেলা পাপিয়ার কণ্ঠরোধ হ'ল। সে, অন্তত আমার পক্ষে, ভারি পরিতাপের কথা হবে। আর যদি দুটো বৎসর তোমাকে শেখাতে পারতাম সন্ধ্যা, তা হ'লে তোমাকে নিয়ে গিয়ে লক্ষ্ণৌ দিল্লীর মুখে চুনকালি দিয়ে আসতে পারতাম। বাংলা দেশের একটা অপবাদ দূর হ'ত।'

ওস্তাদের মুখে এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা-বাণী শুনে সেদিন সন্ধ্যারও মনে তার বিবাহ-প্রস্তাবের উপর একটা সূক্ষ্ম প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষ উৎপন্ন হয়েছিল। সঙ্গীতের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগবশত মনে হয়েছিল, বিবাহটা আরও দুটো বৎসর পেছিয়ে গেলে সত্যই মন্দ হ'ত না; তাতে দিল্লী-লক্ষ্ণৌর মুখে চুনকালি দেওয়া না হোক, যে জিনিস থেকে চিরদিনের মতো বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা আসন্ন হয়ে উঠেছে, তার মেয়াদ আরও দুটো বৎসর বেড়ে যেত। আজ তার মনে হ'ল, হয়তো গুরু-শিষ্যার মনের গোপনতম যুক্ত-কামনার প্রভাবেই তার বিবাহ-বন্ধনে এত বড় একটা চোট এসে পৌঁছেছে,—হয়তো যতীন চাটুয্যের শরণাপন্ন হ'য়েই গানবাজনার সাহায্যে গ্রাসাচ্ছাদনের একটা ব্যবস্থার জন্য চেষ্টা করতে হবে।

হঠাৎ সন্ধ্যা চকিত হয়ে তার দুশ্চিন্তার তন্দ্রা থেকে জেগে উঠল। ছি ছি, এমন সব অশুভ কথা কেন সে এমন ক'রে চিন্তা করছে! কী এমন হয়েছে যে, চরম দুর্দশার কথা ভেবে নিয়ে তার জন্য প্রস্তুত হতে হবে? নিদ্রাভঙ্গে দুঃস্বপ্নের মতো হয়তো কালই এ সব অলীক হয়ে যাবে। তবে সে কেন মিছিমিছি এমন ক'রে আত্মনিপীড়ন করে!

কিন্তু এ ক্ষণজাগ্রত সান্ত্বনা পাঁচ মিনিটের জন্যও সন্ধ্যার মনের মধ্যে অবস্থান করলে না। নিষ্প্রভ রামধনুর মত এক মুহূর্তের জন্য ফুটে উঠে দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল। যে বিপুল প্রত্যাশা প্রথমেই এই নির্জীব অভ্যর্থনা লাভ করলে, তার মধ্যে নিশ্চয় মৃত্যু-কীট বাসা বেঁধেছে। কোনো রকমেই তাকে বাঁচিয়ে তোলা যাবে না।

পুনরায় সন্ধ্যার মন দুশ্চিন্তার চিতানলে পুড়ে পুড়ে ছাই হতে লাগল।

ধীরে ধীরে সমস্ত রাত্রি গেল কেটে। ঘুম হওয়া তো দূরের কথা, চোখের পাতাও একবার মুদিত হ'ল না। এক সময়ে জানলার ভিতর দিয়ে দেখা গেল, আকাশের ঘন তমিস্রার মধ্যে হঠাৎ কখন অতি ক্ষীণ আলোকের নিষ্প্রভ প্রলেপ পড়েছে। উঃ, দুশ্চিন্তার দীর্ঘ রাত্রি কোনো রকমে কাটল তা হ'লে! শয্যাত্যাগ ক'রে সন্ধ্যা দ্বার খুলে বাহিরে বারান্দায় এসে তার অবসন্ন দেহ একটা ঈজি-চেয়ারের মধ্যে এলিয়ে দিলে।

তখন বাড়িতে কেউ তো জাগেই নি, রাজপথেও লোক চলাচল আরম্ভ হয় নি। ঊষার শীতল বাতাস লেগে তার উত্তপ্ত মস্তিষ্ক যেন একটু স্নিগ্ধ হ'ল। বিশ্ব-প্রকৃতির চারিদিকে চেয়ে চেয়ে মনের অসহায় ভাবটা একটু তরল হয়ে গেল,—মনে হ'ল, একেবারেই হয়তো সে নিঃসহায় নয়, এত বড় জগতের মাঝে কোনো এক কোণে তার জন্যও হয়তো একটু স্থান নির্দিষ্ট আছে। কিন্তু সে স্থানের কোনো সীমানা আপাতত দেখা যাচ্ছে না,—একেবারে অজ্ঞাত, অনিশ্চিত।

খস্‌খস্ শব্দে সন্ধ্যা চেয়ে দেখলে, সবিতা আসছে।

কাছে এসে সন্ধ্যার মাথায় হাত রেখে সবিতা বললে, "কি রে সন্ধ্যা, কখন এখানে উঠে এসেছিস? ঘুম ভেঙে তাড়াতাড়ি দিয়ে দেখি, তোর ঘরের দোর খোলা। তখনি বুঝলাম, এখানে এসে বসেছিস।"

সন্ধ্যা বললে, "বেশিক্ষণ নয় সবিদি, আধঘণ্টাটাক হবে।"

সন্ধ্যার চোখের অবস্থা লক্ষ্য ক'রে সবিতা বললে, "চোখ অত লাল কেন রে? সমস্ত রাত কেঁদেছিস বুঝি?"

মৃদু হেসে সন্ধ্যা বললে, "না, কাঁদি নি তো।"

"তবে অত লাল হ'ল কেন?"

"ঘুম হয় নি, বোধ হয় সেইজন্যে।"

"সমস্ত রাত ঘুমোস নি বুঝি?"

মৃদু হেসে সন্ধ্যা বললে, "না।"

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে সন্ধ্যার পাশে উপবেশন ক'রে সবিতা স্নিগ্ধকণ্ঠে বললে, "এর মধ্যে এমনই কি হয়েছে সন্ধ্যা, যে, তুই এতটা উতলা হয়ে পড়লি? কাল জলস্পর্শ করলি নে, সারারাত ভেবে ভেবে জেগে কাটালি। এতটা ব্যস্ত হয়ে পড়বার মত কী হয়েছে?"

দুঃখার্ত কণ্ঠে সন্ধ্যা বললে, "কি হয়েছে তা কি তুমিই বুঝতে পারছ না সবিদি? তুমিই কি নিশ্চিন্ত আছ? তোমার মুখ দেখেও তো মনে হয় তোমার মনেও ভাবনা কম নেই।"

সবিতা বললে, "কিন্তু ব্যবস্থাও তো সবই হচ্ছে ভাই। তোর মুখুয্যে মশাই কাল রাত বারোটা পযন্ত জেগে মেশোমশাইকে আর তোর শ্বশুরকে বড় বড় চিঠি লিখেছেন। তিনিও কাল কিছু খান নি, শুধু এক পেয়ালা চা আর দুখানা বিস্কুট খেয়ে শুয়ে পড়েছিলেন।"

"আর তুমি?"

"তুই খেলি নে, তোর মুখুয্যে মশাই খেলেন না, আর আমার গলা দিয়ে খাবার পেটে নামত?"

সন্ধ্যার মুখে বেদনার চিহ্ন দেখা দিলে; বললে, "কত কষ্টই তোমাদের দিচ্ছি সবিদি। কত পাপই পূর্বজন্মে করেছিলাম যার জন্যে এই সব অপরাধ করতে হচ্ছে।"

সন্ধ্যাকে একটা ধমক দিয়ে সবিতা বললে, "তুই চুপ কর্ সন্ধ্যা, তোকে আর ভদ্রতা প্রকাশ করতে হবে না। যে কষ্ট তুই নিজে ভোগ করছিস, যেদিন তোকে হাসিমুখে শ্বশুরবাড়ি পাঠাতে পারব সেদিন এ দুঃখ যাবে।"

"সেদিন কি কোনো দিন হবে সবিদি?"

"হবে, হবে, নিশ্চয় হবে। তুই মনের জোর একেবারেই হারিয়েছিস দেখছি।" তার পর অন্য দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "ঐ উনি আসছেন।"

প্রকাশ নিকটে আসতেই সন্ধ্যা উঠে দাঁড়াল। বললে, "আপনি এইটেতে বসুন মুখুয্যে মশাই।"

প্রকাশ বললে, "ক্ষেপেছ? আমার বাড়িতে শ্যালিকার আসন সকলের শ্রেষ্ঠ আসন। তুমি আসনচ্যুত হ'য়ো না। আমি এইটেতে বসছি।" ব'লে একটা চেয়ার টেনে ব'সে পড়ল। তার পর স্মিতমুখে বললে, "কাল রাত থেকে তপস্যা আরম্ভ করলে নাকি সন্ধ্যা?"

প্রকাশের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "আপনারাও তো করেছেন।"

"কি করি বল? একজন আরম্ভ করলে যোগ না দিতে লজ্জা বোধ করে। তবে আমি প্রায়োপবেশন করেছিলাম আংশিক, সম্পূর্ণ নয়। তোমার দিদি বোধ হয় সম্পূর্ণ ই করেছিলেন। সেই প্রায়োপবেশনের শুভলগ্নে দুখানি লম্বা চিঠি লিখেছি—একখানি তোমার শ্বশুরকে আর একখানি মেশোমশাইকে। তুমি দেখবে?"

ঘাড় নেড়ে সন্ধ্যা বললে, "না। যা লিখেছেন, ভালই লিখেছেন, আমার দেখবার কোনো দরকার নেই।"

"মন্দ লিখেছি, তা বলছি নে, কিন্তু ভাল জিনিস দেখাও মন্দ নয়।"

সন্ধ্যা পুনরায় ঘাড় নেড়ে বললে, "না।"

প্রকাশ বললে, "আচ্ছা, তা হ'লে আমাদের বাগানে সন্ধ্যার কুঁড়িগুলি

সকালের ফুলে কি রকম পরিণত হয়েছে দেখে আসা যাক চল। আশা করি, তাতে কোনো আপত্তি নেই!"

সন্ধ্যা বললে, "তা নেই, চলুন।"

"বেশ কথা। তার পর সাতটার সময় চা ইত্যাদির দ্বারা ভাল ক'রে প্রায়োপবেশন ভঙ্গ করা যাবে,—কেমন ?"

মৃদু হেসে সন্ধ্যা বললে, "তাই হবে।"

প্রসন্নমুখে প্রকাশ বললে, "চল সবু, কাঁচি আর সাজিটা নিয়ে একবার তা হ'লে বাগানটা ঘুরে আসা যাক।"

উপকরণ দুটি সংগ্রহ ক'রে তিন জনে বাগানের দিকে অগ্রসর হ'ল।

চৌদ্দ

অফিস থেকে গৃহে ফিরে প্রকাশ দেখলে, প্রতিদিবসের নিয়মিত অপেক্ষায় আজ সবিতা ও সন্ধ্যা তার জন্যে বারান্দায় ব'সে নেই। যেখানে যে কাজেই থাকুক না কেন, প্রকাশের গৃহে ফেরবার সময় হ'লে তারা বারান্দায় ব'সে গল্প-গুজব করে।

গাড়ি থেকে নেমে বারান্দায় উঠে দেখতে পেলে আয়াকে। তাকে জিজ্ঞাসা করতে সে বললে, কানিয়া সাহেবের মেম এসে সবিতাকে ধ'রে নিয়ে গেছে নিজেদের বাড়ি। সেখানে 'তামাসা-টামাসা' ঐরকম কিছু একটা ব্যাপার আছে।

"মাসিমা?"

"মাসিমা তাঁর নিজের ঘরে আছেন।"

সন্ধ্যার ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে প্রকাশ বাইরে থেকে ডাকলে, "সন্ধ্যা।"

ঘরের ভিতর থেকে সন্ধ্যা উত্তর দিলে, "আজ্ঞে?" তার পর তাড়াতাড়ি পদা ঠেলে বাইরে এসে বললে, "আপনার আসবার সময় হয়ে গেছে মুখুয্যে মশাই?"

"তা তো হয়ে গেছে, কিন্তু তোমার চোখ দেখে সন্দেহ হয় কিছু আগে ওখানেও একটা কোনো ব্যাপার হয়ে গেছে। বোধ হয় বর্ষা-ঋতুর প্রাদুর্ভাব হয়েছিল?"

অপ্রতিভমুখে আঁচল দিয়ে তাড়াতাড়ি চোখ মুছে ফেলে সন্ধ্যা বললে, "কই, না।"

হাসিমুখে প্রকাশ বললে, "না-ই যদি, তা হ'লে ও-রকম ব্যস্ত হয়ে খপ্ ক'রে চোখ না মুছলেও তো চলত। তা ছাড়া, চোখ মুছলে জলই না-হয় যায়, চোখের লালচে রঙও কি তাতে যায়?"

সন্ধ্যা কোনো কথা বললে না, শুধু তার মুখে অল্প একটু ক্ষীণ হাসি দেখা দিলে।

প্রকাশ বললে, "বাড়িতে সবিতা নেই, সুবিধা পেয়ে অদৃষ্টের পায়ে মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করছিলে বুঝি ?"

এবারও সন্ধ্যা কোনো কথা বললে না, কিন্তু এবার আর তার মুখে দুঃখের হাসির আভাসটুকু পাওয়া গেল না, তৎপরিবর্তে চোখ দুটো সহসা চকচকিয়ে উঠল। বিপদ দেখে প্রকাশ অন্য কথা পাড়লে। বললে, "মিসেস কানিয়া এসে সবিতাকে ধ'রে নিয়ে গেছেন ?"

সঞ্চীয়মান অশ্রুকে বিন্দুতে পরিণত হতে না দেওয়ার জন্য সন্ধ্যাকে আর একবার চোখে আঁচল দিতেই হ'ল। তার পর প্রকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বললে, "হ্যাঁ, বোধ হয় সেই নামই।"

"কি আছে সেখানে ?"

"কে একজন এসেছে ওঁদের দেশ থেকে, সে নাকি খুব ভাল ম্যাজিক দেখাতে পারে।"

"তুমি গেলে না কেন ?"

"আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে দুজনেই পেড়াপিড়ি করেছিলেন, কিন্তু—", না যাওয়ার প্রকৃত কারণটা কি ভাবে বলবে সে বিষয়ে সন্ধ্যা ইতস্তত করতে লাগল।

প্রকাশ বললে, "কিন্তু যেতে ইচ্ছে হ'ল না ?"

মৃদু হেসে সন্ধ্যা বললে, "না।"

মুখের উপর একটা কপট গাম্ভীর্যের ছায়া বিস্তার ক'রে প্রকাশ বললে, "ম্যাজিক দেখতে যেতে যখন ইচ্ছে হয় না তখন বুঝতেই হবে, মনের আকাশ একেবারে মেঘাচ্ছন্ন। শুকনো ডালে পাতা গজাবে, ফুল ফুটবে, ফল ফলবে, একটা আস্ত বেগুন কাটবে আর তার ভিতর থেকে ফুড়ুৎ ক'রে বুলবুলি পা-

উড়ে যাবে—এ-সব কি সহজ কথা? এ দেখবার জন্তে আমি অফিস কামাই করতেও পেছপাও হই নে। চা খেয়েছ?"

"না।"

"আচ্ছা, তা হ'লে তোমার আর আমার দুজনের চা দিতে হুকুম ক'রে দাও, আমি ততক্ষণে মুখ ধুয়ে তয়ের হয়ে নিই।" ব'লে প্রকাশ প্রস্থানোদ্যত হ'ল।

সন্ধ্যা বললে, "মুখুয্যে মশাই, শুধু আপনার চা-ই দিতে বলি। সবিদিদি এলে আমি তাঁর সঙ্গে খাব অখন।"

ফিরে দাঁড়িয়ে প্রকাশ বললে, "সে কার্য তোমার সবিদিদি কানিয়া সাহেবের বাড়িতে উত্তমরূপে শেষ না ক'রে ফিরবেন, তা মনেও ক'রো না। সুতরাং তাঁর ভাগের খাবারটাও যদি আমরা দুজনে ভাগাভাগি ক'রে খেয়ে ফেলি, তা হ'লেও এমন কিছু অপরাধ হবে না।"

প্রকাশের দুটি মন্তব্যের মধ্যে অন্তত প্রথমোক্তটা এমনই সমীচীন যে, তার বিরুদ্ধে আর কোনো কথা বলা চলল না। অগত্যা সন্ধ্যা বললে, "আচ্ছা, আপনি তা হ'লে তয়ের হয়ে নিন।—আমি চা দিতে বলছি।"

"দুজনেরই তো?"

"হ্যাঁ, দুজনেরই।"

"বেশ কথা।" ব'লে প্রকাশ প্রসন্নমুখে প্রস্থান করল।

ভিতরের একটা বারান্দার এক প্রান্তে চা-পানের জন্য টেবিল চেয়ারের ব্যবস্থা আছে। সেখানে চা এবং খাবারের বিবিধ উপকরণ সাজিয়ে রেখে সন্ধ্যা প্রকাশের জন্য অপেক্ষা করছিল। যথাসময়ে প্রকাশ তথায় এসে উপস্থিত হ'ল এবং নানাবিধ কথাবার্তার মধ্য দিয়ে পানাহার চলতে লাগল।

খাওয়া শেষ হ'লে চেয়ার ত্যাগ ক'রে উঠে প্রকাশ বললে, "চল সন্ধ্যা, একটু খড়কাই নদীর দিকে বেড়িয়ে আসা যাক।"

একটু ইতস্তত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "সবিদিদি হয়তো একটু পরেই এসে পড়বেন। সবিদিদি এলে তারপর গেলে ভাল হয় না?"

প্রকাশ বললে, "তা তো হয়ই। কিন্তু আসতে তাঁর যে অনেক দেরি হবে না তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।"

অপ্রতিভমুখে সন্ধ্যা বললে, "শুধু তাই নয় মুখুয্যে মশাই, সবিদিদি অনেক পেড়াপিড়ি করেছিলেন, তবু আমি তাঁর সঙ্গে যাই নি, পাছে তিনি মনে করেন—"

সন্ধ্যার অসমাপ্ত কথার মধ্যে প্রকাশ উচ্চৈঃস্বরে হো-হো ক'রে হেসে উঠে বললে, "পাছে তিনি মনে করেন তাঁর কথার চেয়ে তুমি আমার কথার বেশি বাধ্য,—এই তো? তা তো তুমি নিশ্চয়ই বাধ্য। বোনের ওপর বোনের কথার চেয়ে শালীর ওপর ভগ্নীপতির কথার জোর বেশি—এ সনাতন সত্য সকলেরই জানা আছে। বরং এখনও তিনি যদি রাগ না ক'রে থাকেন তো তাঁর কথা না শুনে আবার আমার কথাও শোন নি জানতে পারলে হয়তো রেগে যেতে পারেন। জান তো প্রত্যেক পতিপ্রাণা স্ত্রীলোক নিজের অপমানের চেয়ে স্বামীর অপমানে বেশি আহত হয়। সতীর কথা মনে আছে তো?"

প্রকাশের কথা শুনে সন্ধ্যা হেসে ফেললে; বললে, "কথায় আপনার সঙ্গে পেরে ওঠবার শক্তি তো আমার নেই, কাজেই চলুন।"

প্রসন্ন হয়ে প্রকাশ সন্ধ্যার পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "বেশ-পরিবর্তনের কোনো দরকার আছে কি?"

মাথা নেড়ে সন্ধ্যা বললে, "কিছু না।"

"তবে এসো, মোটর তৈরিই আছে।"

প্রকাশের মোটর অন্তর্হিত হওয়ার মিনিট পাঁচেক পরেই কানিয়া সাহেবের গাড়ি ক'রে সবিতা গৃহে এসে উপস্থিত হ'ল। তখনো ম্যাজিক শেষ হয় নি, প্রধান দুটো খেলা তখনো বাকি। ম্যাজিকের শেষে লঘু জলপানের ব্যবস্থা

ছিল, কিন্তু প্রকাশ অফিস থেকে এসে হয়তো অপেক্ষা ক'রে থাকবে—এই কথা মনে ভেবে সে অতি কষ্টে মিসেস্ কানিয়ার নির্বন্ধাতিশয্য এড়িয়ে শুধু দু-তিন চুমুক চা এবং আধখানা বিস্কুট খেয়েই চ'লে এসেছে, কতকটা পরিশ্রান্ত ক্ষুধিত অবস্থায়। দ্রুতপদে গৃহে প্রবেশ ক'রে সামনে কাউকে দেখতে না পেয়ে চেঁচিয়ে ডাকলে, "আয়া! আয়া!"

মোটরের শব্দ পেয়ে আয়া আপনিই আসছিল, সবিতার আহ্বানে তাড়াতাড়ি সম্মুখে এসে বললে, "মেম সাহেব!"

"সাহেব অফিস থেকে আসেন নি?"

আয়া বললে, "হাঁ। মেমসাহেব, সাহেব অফিস থেকে এসে চা খেয়ে মাসি-মাকে নিয়ে বেড়াতে গেছেন।"

সবিস্ময়ে সবিতা বললে, "এরই মধ্যে বেরিয়ে গেছেন?" পর-মুহূর্তেই ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। "কতক্ষণ গেছেন?"

"কতক্ষণ?—এই পাঁচ মিনিট। বাস্!"

এক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে সবিতা জিজ্ঞাসা করলে, "কতক্ষণ সাহেব এসেছিলেন?"

মনে মনে একটু হিসাব ক'রে আয়া বললে, "আধ ঘণ্টার কিছু বেশি হবে।"

"মাসিমা চা খেয়েছেন?"

"হ্যাঁ, মাসিমাও সাহেবের সঙ্গে চা খেয়েছেন।"

"আচ্ছা, তুই যা।" ব'লে সবিতা প্রস্থানোদ্যত হ'ল।

আয়া জিজ্ঞাসা করলে, "মেম সাহেব, চা দোব আপনাকে?"

মাথা নেড়ে সবিতা বললে, "না, কিছু দিতে হবে না, আমি চা খেয়ে এসেছি।"

আক্ষরিক হিসাবে সত্য হ'লেও, বস্তুত কথাটা মিথ্যাই; কারণ দেহের

মধ্যে ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা উভয়েরই তাগিদ ছিল তখন যথেষ্ট। কিন্তু মনটা হঠাৎ কেমন গেল-বেঁকে, মনে হ'ল দূর হোক্‌গে ছাই, খেয়ে-টেয়ে আর কাজ নেই, চুপচাপ একটু শুয়ে পড়া যাক। কিন্তু বেশ-পরিবর্তন ক'রে শুতে গিয়ে শুতে ইচ্ছা হ'ল না। বা দিকের কপা'লের একটা শির দপদপ করছিল,—বোধ হয় পিত্ত পড়ারই জন্য। স্মেলিং সল্টের শিশিটা হাতে নিয়ে সবিতা পিছন দিকের বাগানে একটা সান-বাঁধানো চাতালে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

এ জায়গাটা তার ভারি প্রিয়। এর আশেপাশের প্রায় সমস্ত গাছ তার নিজের হাতে পোঁতা এবং নিজের যত্নে বর্ধিত। তাই সুখে দুঃখে সকল অবস্থাতেই এ জায়গাটা তার ভাল লাগে। কিন্তু আজ তাও লাগল না। মনের ভিতরকার তারটা সহসা একটু চ'ড়ে গিয়ে এমন একটা বেসুরায় বেঁধেছে যে, কোনো বস্তুরই সঙ্গে এখন আর সুর মিলছে না। উঠে প'ড়ে একটু ঘুরে-ফিরে অবশেষে শয়নকক্ষে গিয়ে শয্যাশ্রয় করলে। আলো নিবিয়ে চোখ বুজে স্থির হয়ে প'ড়ে রইল, কিন্তু ঘুম এল না।

প্রকাশের মোটরের হর্নের শব্দ যখন শোনা গেল, তখন রাত্রি সাড়ে সাতটা উত্তীর্ণ হয়েছে। কিছু পরেই প্রকাশ ঘরে প্রবেশ করলে। সুইচ খুলে দিয়ে সবিতাকে শয্যায় শুয়ে থাকতে দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে নিকটে এসে জিজ্ঞাসা করলে, "কি হয়েছে সবু ?—অসুখ করেছে না-কি ?"

সবিতা অন্য দিকে ফিরে শুয়ে ছিল, প্রকাশের প্রশ্নে তার দিকে ফিরে বললে, "না।"

"তবে এ সময়ে শুয়ে রয়েছ কেন ?"

"মাথাটা সামান্য ধরেছে।"

"কি আশ্চর্য। সেটা কি অসুখ নয় ?" তার পর সবিতার পাশে শয্যা-প্রান্তে ব'সে তার কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে, "তোমার মাথাধরা তো সহজ ব্যাপার নয় সবু। একটু ফুট্‌বাথ্‌ নিলে না কেন ?"

"দরকার নেই, চুপ ক'রে শুয়ে থাকলেই ক'মে যাবে অখন।"

"ম্যাজিক কেমন দেখলে ?

"ভালই।"

"ম্যাজিশিয়ান কি কানিয়াদের আত্মীয় কেউ ?"

"না, ব্যবসাদার। ওদের দেশের লোক।"

"বুঝেছি। ওদের বাড়ি প্রথম একদিন দেখিয়ে একটা সার্টিফিকেট যোগাড় ক'রে বাড়ি বাড়ি দেখিয়ে বেড়াবার ফন্দী।"

এ কথার উত্তরে সবিতা কোনো কথা বলবার প্রয়োজন বোধ করলে না। ক্ষণকাল চুপ ক'রে ব'সে থেকে প্রকাশ বললে, "আজ একটা ভারি চমৎকার জিনিস আবিষ্কার করেছি সবু। তুমি তো কোনদিন আমাকে বল নি যে, সন্ধ্যা এত ভাল গান গাইতে পারে।"

"আমি ছেলেবেলায় ওর গান শুনেছিলাম, তার পর অনেক দিন শুনি নি। কেন, তুমি ওর গান আজ শুনলে না কি ?"

"শুনলাম বইকি, তা নইলে বলছি কেমন ক'রে ? আহা, চমৎকার গাইলে! গিটকিরির দানাগুলো কি পরিষ্কার, ছোট ছোট তানগুলো দেয় এমন অদ্ভুত মিষ্টি ক'রে! আমি তো মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি!"

সন্ধ্যার গান যে বাড়িতে হয় নি, অন্য কোথাও হয়েছিল, তা অনুমান ক'রে নিতে সবিতার বিলম্ব হ'ল না। চা-পান সহ আধ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে গানের অবসর কোথায় ? সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে, "ওকে কাদের বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলে ? কোথায় ও গান গাইলে ?"

অল্প একটু হেসে প্রকাশ বললে, "কারুর বাড়িতে নয়, খড়কাইয়ের ধারে নিয়ে গিয়েছিলাম, সেইখানেই শুনলাম।"

"সেই খোলা জায়গায় লোকজনের সামনে তান গিটকিরি দিয়ে গান গাইলে ?"

"লোকজন কোথায়? একেবারে নির্জন। যেখানে নিয়ে গিয়েছিলাম সেখানে জনমানবের সাড়া নেই।"

"তা যেন নেই, কিন্তু তুমি তো ছিলে,—তোমার সামনে অমন তান-টান দিয়ে গান করবার মতো অবস্থা হয়েছে তা হ'লে?"

প্রকাশ বললে, "তুমি একটু ভুল করছ সবু। ও কি সহজে গেয়েছে? কত সাধ্যসাধনা ফন্দী-কৌশল ক'রে তবে আমি ওকে গাইয়েছি। আজ অফিস থেকে এসে দেখি কেঁদে কেঁদে চোখ দুটি রক্তজবা ক'রে রেখেছে। ওর মনের দুরবস্থার কথা ভেবে জোর ক'রে বেড়াতে নিয়ে গেলাম। তাই কি যেতে চায়, বলে—সবিদিদি এলে তার পর যাব। তুমি যে কখন আসতে পারবে তার তো স্থিরতা ছিল না, তাই আমি একলাই ওকে নিয়ে গেলাম। সেখানে গিয়ে ওর নিজের কথা উঠতে বললে—মুখুয্যে মশাই, আমার শ্বশুর আর বাবা ভাবুন না কিছুদিন আমাকে তাঁরা ঘরে নেবেন কি নেবেন না; আমি কিন্তু ততদিন অকর্মণ্য হয়ে ব'সে থাকি কেন, দিন না আমাকে কোনো স্কুলে কিংবা ভদ্রলোকের বাড়ি ভর্তি ক'রে, মেয়েদের লেখাপড়া শিল্পকর্ম গানবাজনা শিখিয়ে নিজের যৎসামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করি। আমি বললাম—লেখাপড়া শিল্পকর্মের কথা এখনি বলতে পারছি নে, কিন্তু মেয়েদের মধ্যে গানবাজনা শেখবার তাগিদটা আজকাল হঠাৎ এমন বেড়ে উঠেছে যে, আমি চেষ্টা করলে এই টাটা-নগরেই অন্তত টাকা পঞ্চাশের মতো কাজ তোমাকে সংগ্রহ ক'রে দিতে পারি, কিন্তু তুমি কি ভাল গান শেখাতে পারবে? সন্ধ্যা বললে—ছোট ছেলেমেয়েদের যা হোক একরকম শেখাতে পারব ব'লেই তো মনে করি। উত্তরে আমি বললাম, কিন্তু সেটা তো শুধু তোমার মুখের সার্টিফিকেট শুনলেই হবে না, তোমার গানও শুনতে হবে, তা নইলে আমি অন্য লোককে জোর ক'রে বলব কেমন ক'রে যে, তুমি ভাল গাও তা আমি জানি। এই কৌশলেই অবশ্য কার্যোদ্ধার হ'ল, তবে ঠিক এমনি ভাবে এই কথাগুলিতেই হয় নি, অনেক

বাক্যের জাল বেঁধে কৌশলকে যুক্তির আবরণে ঢাকতে হয়েছিল। এখন বুঝলে তো সমস্ত ব্যাপারটা ?"

মাথার বালিসটা একটু সরিয়ে নিয়ে সবিতা বললে, "বুঝলাম।"

প্রকাশ বললে, "তোমাকেও আজই গান শোনাতে হবে, সন্ধ্যাকে দিয়ে সে কড়ার করিয়ে নিয়েছি। দেখো না কি সুন্দর গায়, বোনের গুণের পরিচয় পেয়ে আশ্চর্য হয়ে যাবে।"

ঠিক এমনি সময়ে পর্দার বাহিরে মৃদু পদধ্বনি শোনা গেল এবং পর মুহূর্তেই শব্দ এল, "আসতে পারি ?"

সবিতাকে প্রকাশ বললে, "সন্ধ্যা আসছে।" তার পর একটু এগিয়ে গিয়ে উত্তর দিলে, "এস, সন্ধ্যা, এস।"

পর্দা সরিয়ে ঘরে প্রবেশ ক'রে সবিতাকে শায়িত দেখে সন্ধ্যা উদ্বিগ্ন হয়ে নিকটে গিয়ে বললে, "শুয়ে আছ কেন সবিদিদি ? অসুখ করেছে না কি ?"

সবিতা বললে, "কিছু হয় নি, সামান্য একটু মাথা ধরেছে। ব'স্ সন্ধ্যা, ওই চেয়ারটায় ব'স্।"

চেয়ারে না ব'সে সবিতার শয্যাপ্রান্তে উপবেশন ক'রে সন্ধ্যা বললে, "একটু মাথা টিপে দোব সবিদিদি ?"

সবিতা বললে, "না, না, মাথা টিপে দিতে হবে না, তুই চুপ ক'রে ব'স্।"

"বাড়ি এসে মাথা ধরল, না, আগেই ধরেছিল ?"

"বাড়ি এসে।"

"এসে চা-টা কিছু খেয়েছিলে ?"

মাথা নেড়ে সবিতা বললে, "না।"

সবিতার মুখের কাছে ঝুঁকে প'ড়ে সন্ধ্যা বললে, "একটু চা খেলে মাথাটা ছেড়ে যাবে অখন। চা দিতে বলব সবিদিদি ?"

ক্ষুধা এবং পিপাসা কিছুরই অভাব ছিল না। একটু চুপ ক'রে থেকে সবিতা মৃদুস্বরে বললে, "আচ্ছা, আয়াকে না হয় ব'লে দিয়ে আয়।"

চা এবং কিছু খাবার দেবার জন্য আয়াকে আদেশ ক'রে সন্ধ্যা ফিরে এলে প্রকাশ বললে, "এইখানে একজন পুরুষের সঙ্গে একজন মেয়ের তফাত সন্ধ্যা। পুরুষ যদি ওষুধ তো মেয়ে আহার। সবিতার মাথাধরা দেখে আমার মনে হয়েছিল ফুট্‌বাথের কথা, কিন্তু তোমার মনে পড়ল চায়ের কথা; অথচ দুটো প্রস্তাবের মধ্যে তোমারটাই যে অধিকতর সমীচীন হয়েছিল, তার প্রমাণ তো হাতে হাতে পাওয়া গেল। অনাদি কাল থেকে লালন-পালনের ভার বহন ক'রে ক'রে সেবা-ধর্মটা তোমাদের মজ্জাগত হয়ে গেছে।"

সবিতা বললে, "আজ গান গেয়ে তোর মুখুয্যে মশাইকে খব খুশি করেছিস দেখছি সন্ধ্যা।"

শুনে সন্ধ্যার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল, এরই মধ্যে সে কথাও হয়ে গেছে না কি?"

সহাস্যমুখে প্রকাশ বললে, "সবিস্তারে। তুমি যখন এলে তখনো সেই কথাই হচ্ছিল। এবার তোমার প্রতিশ্রুতি পালন কর, সবিতাকে গান শোনাও।"

সন্ধ্যা বললে, "আজ সবিদিদির মাথা ধরেছে, আজ আর গান-টান থাক্ মুখুয্যে মশাই, আর একদিন শোনালেই হবে।"

প্রকাশ বললে, "সবনাশ। ও-রকম কথা মুখেও এনো না। সবিদিদিকে গান শোনাবার আগে আমাকে গান শুনিয়েছে, তাইতে সবিদিদির মাথা ধরেছে, তার ওপর আজ যদি তাকে একেবারে গান না শোনাও তা হ'লে একটু পরে জ্বর আসবে, তখন চায়ের পরিবর্তে তোমাকে দুধসাবুর ব্যবস্থা করতে হবে।"

প্রকাশের কথায় সবিতা তর্জন ক'রে উঠল; বললে, "হঁ্যা গো হ্যাঁ, তুমি অন্তর্যামী, সব বুঝতে পার! জ্বর আসবে, না আরো কিছু!"

প্রকাশ বললে, "আহা-হা, তুমি জান না সবু, আসবে। আসতে বাধ্য।

কোনো স্ত্রীলোকের ছোট বোন যদি দিদির চেয়ে দিদির স্বামীর প্রতি বেশি মনোযোগ দেখাতে আরম্ভ করে, তখন ঈর্ষা নামক যে বস্তু সুপ্ত অবস্থায় সেই স্ত্রীলোকের অচেতন মনে—”

সবিতা গর্জন ক'রে উঠে বললে, “রেখে দাও তোমার অচেতন মনের গাঁজাখুরি।”

প্রকাশ তার অসামাপ্ত বাক্য অনুসরণ ক'রে বলতে আরম্ভ করলে, “সেই স্ত্রীলোকের অচেতন মনে অবস্থান করছিল—”

বাধা দিয়ে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে সবিতা বললে, “ফের যদি অচেতন মনের কথা মুখে আনবে, তা হ'লে সচেতন মন দিয়ে ভীষণ ঝগড়া বাধাব।”

কপট নৈরাশ্যের সুরে প্রকাশ বললে, “কি আশ্চর্য। স্ত্রীলোক চিরকালই স্ত্রীলোক থাকবে—তা সে যত লেখাপড়াই শিখুক না কেন। বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর অবিচল নিষ্ঠা কিছুতেই হবে না। ওগো, ফ্রয়েডের মেণ্টাল টপোগ্রাফি, সুপার এগো, এ সকলের বিষয়ে গবেষণা যদি একটু ভাল ক'রে করতে তা হ'লে চট্ ক'রে কথাটা উড়িয়ে দিতে পারতে না।”

সবিতা বললে, “চুলোয় যাক ফ্রয়েড। আমি ফ্রয়েডের কথা শুনতে চাই নে। তার চেয়ে চল্ সন্ধ্যা, তোর গান গোটাকয়েক শুনি।”

হাস্য কৌতুকের প্রসাদে ঘরের আবহাওয়া লঘু হয়ে গেল। স্মিতমুখে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, “তোমার চা?”

“চা ও-ঘরেই দেবে অখন।”

শয্যা ত্যাগ ক'রে সবিতা লাউঞ্জ ঘরের দিকে অগ্রসর হ'ল। পিছনে পিছনে আসছিল প্রকাশ,—ফিরে দাঁড়িয়ে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে অস্ফুটস্বরে বললে, “তুমি যে কত বড় ধূর্ত লোক তা আমিই জানি। তোমার হাতে প'ড়ে জ্ব'লে পুড়ে মরলুম।” মনে মনে বললে, মিথ্যে কথা। তোমার হাতে প'ড়ে আমার জীবন ধন্য হয়েছে। কিন্তু সর্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকি,—একমাত্র নিজেকে ছাড়া আর-কিছু দিয়ে তো তোমাকে বাঁধতে পারলাম না।

পনের

প্রত্যেক মানুষের অন্তরের মধ্যে এমন একটা-না-একটা অবলম্বনের বস্তু থাকেই যার সন্ধান খুঁজে বার করতে পারলে সুখে-দুঃখে সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থাতেই তার মধ্যে আশ্রয় লাভ করতে সে সমর্থ হয়। কতকটা সমুদ্র উপ-কূলের বন্দরের মত,—সুখের দিনে মৃদু-মন্দ সমীরণে সেখান থেকে সমুদ্রের মধ্যে পাড়ি জমানোও চলে, আবার ঝড়-ঝাপটার দিনে তার আশ্রয়ে ফিরে এসে নোঙ্গর ফেলে আত্মরক্ষা করাও সম্ভবপর হয়। সেই অবলম্বনের বস্তু কারো জীবনে সাহিত্য, কারো জীবনে শিল্প, কারো জীবনে ধর্ম। সন্ধ্যার জীবনে হয়তো তা সঙ্গীত, সে কথা যেন সে সেদিন লাউঞ্জ ঘরে গান গাইতে গাইতে সহসা কোন এক মুহূর্তে উপলব্ধি ক'রে বসল। দেখতে দেখতে গান হয়ে উঠল সজীব,—তার সুরের অপরূপ ব্যঞ্জনার মধ্যে আশ্রয় লাভ ক'রে বিগত দুঃখময় জীবনের সকল গ্লানি, সকল বেদনা ফিকে হয়ে এল। প্রত্যেকটি গান, প্রত্যেকটি রাগিণী যেন নব নব চেতনার প্রকাশ, সুখ-দুঃখের মিশ্রণের উদাস বৈরাগ্যে স্তিমিত।

বিমুগ্ধ বিস্ময়াবিষ্ট শ্রোতা দুটিও সঙ্গীতের এই অনন্যসুলভ স্পর্শ লাভ ক'রে আত্মহারা হ'য়ে গিয়েছিল। একটির পর আর একটি ক'রে দশ-বারোখানা গানের মধ্যে দিয়ে কখন যে রাত দশটা বেজে গিয়েছিল তা কেউ বুঝতেই পারে নি। একটা গানের শেষে সন্ধ্যা যখন হারমোনিয়মের ডালা বন্ধ ক'রে মৃদুস্বরে বললে, "আজ আর থাক্, তখন তাকে আর গাইবার জন্যে কেউ অনুরোধ করতে পারলে না। ও-জিনিস শেষ হওয়ার পর আর ফরমায়েস চলে না, উপরোধ-অনুরোধের দ্বারা তার মেয়াদ বাড়ানো যায় না। সে তো শুধু গানই নয়, সে যেন কতকগুলো সুরকে আশ্রয় ক'রে একটা

অবরুদ্ধ জমাট ক্ষোভের বিমুক্তি,—গানের ভাষায় সে যেন প্রাণের মর্মন্তুদ কাহিনী।

সন্ধ্যার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে সবিতা বললে, "কি চমৎকার গাস বে তুই সন্ধ্যা!! কি অদ্ভুত তোর গলা।"

সন্ধ্যার তখন চোখ ফেটে অশ্রুপাতের উপক্রম হয়েছিল, কোনো রকমে একটা নিঃশব্দ হাসির দ্বারা সবিতার কথার উত্তর দিয়ে সে আসন ত্যাগ ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দুঃখার্ত কণ্ঠে সবিতা বললে, "এমন রূপ, এত গুণ, কিন্তু অদৃষ্টে কি আছে কে জানে। হয়তো কিছুই কাজে আসবে না, সবই অসার্থক হবে।"

প্রকাশ বললে, "মানুষের জীবন কিসে সার্থক হয়, অথবা হয় না, আগে থাকতে কিছুই বলা যায় না সবু। কোনো জিনিসকে রূপ দিয়ে সার্থক করতে হ'লে আঘাত তার একটা প্রধান উপায়। যত মর্মরমূর্তি দেখে মুগ্ধ হয়েছ, সবগুলিরই উপরে ছেনি আর হাতুড়ির নির্মম আঘাত পড়েছে। রূপ দেবার জন্যে আমাদের কারখানায় আগুন আর আঘাতের কি ভীষণ রুদ্রলীলা চলে ত দেখেছ তো! সন্ধ্যার মনের উপর এই যে প্রচণ্ড আঘাত পড়েছে, এর জন্যে তার জীবন অসার্থক হবে—এ কথা জোর ক'রে বলা চলে না, হয়তো তার মনের উপর এই হাতুড়ির আঘাত তার জীবনকে সার্থকতারই দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

মতভেদের শিরশ্চালনা ক'রে সবিতা বললে, "তা কি ক'রে হবে? স্বামীর আশ্রয় হারিয়ে ওর জীবন সার্থক হতেই পারে না।" দাম্পত্য গণ্ডীর বাইরে নারী-জীবনের যে কোথাও সার্থকতা থাকতে পারে—এই কথা সবিতা বিশ্বাসই করে না। বললে, "বিয়ে হয়ে গেলে মেয়েদের স্বামীর ঘর ছাড়া আর উপায় নেই।"

প্রকাশ বললে, "কিন্তু মীরার কথা ভেবে দেখ। জীবনকে সফল করবার জন্যে তাকে স্বামীর ঘরই ছাড়তে হয়েছিল।"

"স্বামীর ঘর নয়,—শ্বশুরের ঘর।"

প্রকাশ বললে, "সে একই কথা। তা ছাড়া, এ ক্ষেত্রেও শ্বশুরেরই ঘর।"

প্রকাশের এই একান্ত অযৌক্তিক প্রসঙ্গটাকে চাপা দেবার উদ্দেশ্যে সবিতা বললে, "আচ্ছা, সে হ'ল পরের কথা। আপাতত আজ গান গেয়ে বেচারা যেন সত্যিই একটু তৃপ্তি পেয়েছে। কি আগ্রহ ভরে গান গাচ্ছিল দেখলে? মনে হচ্ছিল, প্রত্যেক গান দিয়ে যেন ওর দুঃখের বোঝা একটু একটু ক'রে হাল্কা হয়ে যাচ্ছে। শেষকালে প্রায় কেঁদে ফেলবার উপক্রম করেছিল; দেখেছিলে?"

প্রকাশ বললে, "দেখেছিলাম। ওটা শুভলক্ষণ। বর্ষণের দ্বারা আকাশ আর মন দুই-ই পরিষ্কার হয়।"

সবিতা বললে, "রোজ সন্ধ্যাবেলা ওকে একটু ক'রে গানে বসালে হয়,—গান গেয়ে তবু যদি নিজেকে খানিকটা ভোলাতে পারে।"

প্রফুল্লমুখে প্রকাশ বললে, "বেশ তো, বসালেই হবে,—তাতে আমাদের নিজেদের লাভও তো নিতান্ত কম হবে না।"

এই পরামর্শ অনুযায়ী প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা খুব উৎসাহ ভরে সন্ধ্যার গান-বাজনা চলল। প্রথম কয়েকদিন এ বিষয়ে সবিতার যথেষ্ট উৎসাহ দেখা গিয়েছিল, কিন্তু যখন সে দেখলে যে, গানের দ্বারা সন্ধ্যা নিজেকে কতটা ভোলাতে পেরেছে সে বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু তার স্বামীকে যে বিশেষরূপে ভুলিয়েছে তা নিঃসন্দেহ, তখন থেকে তার উৎসাহ দ্রুত গতিতে ক'মে আসতে লাগল। গান শোনবার আগ্রহে প্রকাশ বৈকালে বেড়ানো ছেড়ে দিয়েছে, রাত্রে বই পড়া কমিয়ে দিয়েছে, ছুটির দিনে একমাত্র গান শোনা ছাড়া আর সব-কিছুকেই ছুটি দিতে পারলে ভাল হয় এমনি মতলব। সন্ধ্যা যখন গান গায় তখন প্রকাশ এমন বিভোর হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে যে, দাম্পত্য জীবনের আদিতম যুগেও কোনও আবেগ মদির মুহূর্তে

সে এমনি ক'রে সবিতার মুখের দিকে তাকিয়েছিল ব'লে মনে পড়ে না। সন্ধ্যার গানের প্রতি প্রকাশের এই অনির্বেয় আসক্তির মধ্যে সবিতা বিপদের রক্ত-পতাকা দেখতে পেলে। এ বিষয়ে অগ্নি ও ঘৃতের প্রাচীন উপদেশ মনে পড়ল। মনে মনে স্থির করলে, এ বিপদ থেকে অচিরে উদ্ধার পেতেই হবে; সহজে যদি হয় তো ভালই, নচেৎ যেন তেন প্রকারেণ।

সন্ধ্যা তার মাসতুতো বোন সত্য, কিন্তু স্বামীর ক্ষেত্রে সবিতা এতই শক্ত যে, সন্ধ্যা সহোদরা বোন হ'লেও সে কিছুমাত্র ইতস্তত করত না। যে মহলে প্রজাবিলি চলে না সেখানে অপর ব্যক্তির প্রবেশ মানেই বেদখল হওয়া, এবং বেদখল হওয়ার আশঙ্কায় সতর্ক দৃষ্টিকে নিন্দুক ব্যক্তিরা যদি ঈর্ষা ব'লে অভিহিত করে তো করুক,—তাতে সবিতার চক্ষুলজ্জা নেই।

প্রকাশ তখন অফিসে। নিজের ঘরে শয্যার উপর শয়ন ক'রে সন্ধ্যা বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছিল, সবিতা এসে প্রবেশ করলে।

সবিতাকে দেখে সন্ধ্যা শয্যার উপর উঠে বসল। সন্ধ্যার পালঙ্কের নিকট একটা চেয়ার টেনে নিয়ে উপবেশন ক'রে সবিতা বললে, "কি বই পড়ছিলি রে সন্ধ্যা? উপন্যাস না-কি?" তার পর বইখানা টেনে নিয়ে খুলে দেখে বললে, "কবিতার বই। ভাল?"

"মন্দ না।"

"কোথায় পেলি?"

সন্ধ্যা বললে, "মুখুয্যে মশায়ের টেবিল ছিল, সেখান থেকে নিয়ে এসেছি।"

দুই-একটা অবান্তর কথার পর সবিতা আসল কথা উত্থাপিত করলে; বললে, "তোর বিষয়ে একটা ভাল রকম পরামর্শের দরকার হয়েছে সন্ধ্যা।"

সবিতার প্রতি উৎসুক জিজ্ঞাসু দৃষ্টি স্থাপিত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "কি পরামর্শ সবিদিদি?"

মনে মনে একটু চিন্তা ক'রে নিয়ে সবিতা বললে, "তোর শ্বশুরকে আর

মেসোমশাইকে উনি কত ভাল ক'রে বড় বড় চিঠি লিখলেন, তার উত্তর যা এল তা তো জানিস। তুই এখানে আমাদের কাছে আছিস সেই জন্যে উভয় পক্ষই একটু নিশ্চিন্ত হয়ে ভেবে-চিন্তে কাজ করবার সুবিধে পেয়েছেন। হঠাৎ ওঁদের মধ্যে কেউ এসে তোকে নিয়ে যাবেন, তা মনে হয় না। আমার মনে হয়, তুই যদি একেবারে হুড়মুড় ক'রে সেখানে গিয়ে পড়িস, তা হ'লে তোকে কখনই ফেরাতে পারবেন না।"

একটু চুপ ক'রে থেকে ইতস্ততসহকারে সন্ধ্যা বললে, "কিন্তু ও-রকম চিঠি পাওয়ার পর আর কি তাঁদের দোরে গিয়ে দাঁড়ানো চলে সবিদিদি?"

একটু কঠিন স্বরে সবিতা বললে, "চলে। ও তোদের আজকালকার মেয়েদের বাজে সেন্টিমেন্ট শিকেয় তুলে রাখ্ সন্ধ্যা। অভিমান যদি করতে হয় তো নিজের জায়গায় কায়েম হয়ে ব'সে তার পর করিস, এখন যেমন ক'রে পারিস দিন কিনে নে। পরের ওপর রাগ ক'রে নিজের চিরদিনকার আশ্রয়ের স্থল চিরদিনের মতো বন্ধ করিস নে।"

সন্ধ্যা বললে, "কিন্তু তারা যদি আমাকে স্থান না দেন? আশ্রয় যদি না পাই?"

ব্যস্ত হয়ে মাথা নেড়ে সবিতা বললে, "তাঁরা তো স্থান দিচ্ছেনই না। আশ্রয় তোকে যে-রকম ক'রে হোক ক'রে নিতে হবে। সাধ্য-সাধনা ক'রে, মাথামুড় খুঁড়ে, তাদের পা জড়িয়ে ধ'রে সেখানকার মাটি আঁকড়ে প'ড়ে থাকবি। এতে যদি আত্মসম্মানের হানি হয় তো এ ছাড়া যা করবি তাতে এর শত গুণ হানি হবে, তা জেনে রাখিস। এ কথা কখনও ভুলিস নে সন্ধ্যা,—স্বামীর আশ্রয় ছাড়া সধবা মেয়েমানুষের আর দ্বিতীয় আশ্রয় নেই।"

অন্তত কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত স্বামীর আশ্রয়ের প্রতি সন্ধ্যার শ্রদ্ধার এবং লোভের অন্ত ছিল না। এখনো যে নেই তো নয়; কিন্তু ঘটনার জটিলতায় অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, অনেক প্রশ্নই মনের মধ্যে আজকাল উদয়

হয়, প্রাচীন সংস্কারের জীর্ণ অট্টালিকা যেন সময়ে সময়ে ন'ড়ে ওঠে। তবুও সে-সব নিয়ে এখন আলোচনা করতে প্রবৃত্তি হ'ল না; জিজ্ঞাসা করলে, "মুখুয্যে মশাইয়েরও কি এই মত?

সবিতা বললে, "হাজার হোক তিনি পুরুষমানুষ, তাঁদের মতের সঙ্গে আমাদের মেয়েদের মত সব সময়েই যে এক হতে হবে এর কোনো মানে নেই সন্ধ্যা। আমাদের শুভাশুভ আমরা যতটা বুঝব তাঁরা ততটা কখনই বুঝবেন না—হয়তো একটা সাধারণ উদার নীতির দোহাই দিয়ে সমস্ত জিনিসটার ভুল বিচার ক'রে বসবেন। হয়তো বলবেন, 'কেন? কি এমন তাড়া পড়ছে যে, আশ্রয় ভিক্ষের জন্যে ছুটতেই হবে এখন কলকাতায়? থাক্ না ও আমাদের কাছে, যতদিন না ওরা নিজে এসে ওকে নিয়ে যায়।' এমন কথা তো আমিও প্রথম দিন আকস্মিক দুঃখের মুখে বলেছিলাম; কিন্তু মনে মনে তখন এ কথাও জানতাম যে, আদতে ওটা প্রবোধবাক্য, ওতে তোর প্রকৃত মঙ্গল নেই।"

সন্ধ্যা বললে, "আজকালের মধ্যে এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে মুখুয্যে মশাইয়ের কোনো কথা হয়েছে কি সবিদিদি?"

সবিতা বললে, "না, তা হয় নি। আমি প্রথমে তোর সঙ্গেই পরামর্শটা ক'রে নিতে চাইছিলাম। তবে আমার মনে হয়, কথা উঠলে তিনি আমার মতেই মত দেবেন, কারণ এ কথা নিশ্চয়ই যে, বেশিদিন এ রকম ছাড়াছাড়ি থাকার ফলে চক্ষুলজ্জাটা ক্রমশ কেটে গেলে তখন হয়তো তাঁরা আর সহজে তোকে ফিরে নিতে চাইবেন না। তা ছাড়া, আর একটা কথা আমি তোর মঙ্গলের জন্যে খুব স্পষ্ট ক'রে বলছি, তুই অন্য কোনো রকমই কিছু মনে করিস নে ভাই। আমার এ বাড়িও তোর পক্ষে পুরোপুরি পাকা আশ্রয় নয়। এ সংসারে একমাত্র স্ত্রীলোক আমি; আমার সঙ্গে একত্রে তুই যতদিন ইচ্ছে থাকতে পারিস, কোনো আপত্তি নেই; কিন্তু জীবনের কথা তো কিছু বলা যায় না ভাই, ধর্, হঠাৎ যদি ম'রেই গেলাম,—সে কথা ছেড়ে দিলেও, বাপের

বাড়িও তো দু-চার মাসের জন্যে মাঝে মাঝে যেতে পারি,—তখন তোর একা এ বাড়িতে ওঁর সঙ্গে থাকা চলবে কি? আমি তোর বোন, কিন্তু উনি তো সত্যি সত্যিই তোর ভাই নন।”

বিচার-বিবেচনার দিক থেকে দেখলে সবিতার কথার মধ্যে হয়তো রূঢ় কিছুই ছিল না, কিন্তু তবু একটা কোন অনির্দেশ্য কারণে আঘাত পেয়ে সন্ধ্যার দুই চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এল। তাড়াতাড়ি বস্ত্রাঞ্চলে চোখ মুছে ফেলে বললে, “আমার নিজের মত যাই হোক না কেন সবিদিদি, তোমার উপদেশেই আমি চলব। তুমি আমার আপনার জন, বয়সে বড, তুমি যা আদেশ করবে আমার পক্ষে নিশ্চয়ই তা শুভ হবে,—কলকাতায় আমি যাব। অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় তোমরা আমাকে আশ্রয় দিয়েছ,—তোমার স্নেহের কথা, মুখুয্যে মশায়ের দয়ার কথা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমার অন্ধকার মনের একটা দিক আলো ক'রে থাকবে। কিন্তু আমার অন্তরের একটা অকপট কথা শোনার পরও যদি আমাকে ক্ষমা কর তা হ'লে আমি বলি যে, তোমাদের এ আশ্রয়ও আমি ঠিক সহ্য করতে পারছি নে; এর মধ্যে আমি কিছুতেই সহজ হতে পারছি নে, এ আশ্রয় ছেড়ে যাবার জন্যে মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছি। এ যে কেন, তা হয়তো আমি তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারব না, কিন্তু একে অকৃতজ্ঞতা ব'লে এক মুহূর্তের জন্যেও ভুল ক'রো না সবিদিদি, এ অপরিসীম কৃতজ্ঞতারই একটা রূপ। অযাচিত দানের ঋণ বাড়িয়ে চলবার ক্ষমতা হয়তো আমার নেই—এ হয়তো তাই।” সহসা সন্ধ্যার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এল, দুই চক্ষু হতে ঝর ঝর ক'রে এক রাশ অশ্রু ঝ'রে পড়ল।

চেয়ার থেকে উঠে এসে সন্ধ্যার পাশে ব'সে তাকে জড়িয়ে ধ'রে সবিতা দুঃখার্দ্র কণ্ঠে বললে, “আমি তোকে কষ্ট দিয়েছি সন্ধ্যা, আমাকে তুই ক্ষমা কর্।”

অঞ্চলে চক্ষু মার্জিত ক'রে সন্ধ্যা বললে, “না সবিদিদি, তুমি সহানুভূতি দিয়ে আমার মনকে আলগা ক'রে দিয়েছ, তাই কাঁদছি। তুমি আমাকে কষ্ট দাও নি।”

"তা হ'লে তোর কলকাতা যাওয়ার কথা তাঁকে বলব ?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয় বলবে। আজই ব'লো,—আর, যত শীঘ্র যাওয়ার ব্যবস্থা হয় তা ক'রো। তোমার সুপরামর্শে আবার আমার মনকে জাগিয়ে দিয়েছ সবিদিদি।"

প্রসন্নকণ্ঠে সবিতা বললে, "সেখানে গিয়ে তোর নিজের অধিকারের জায়গা জোর ক'রে দখল করবি; কিছুতে ছাড়বি নে। নিজে শক্ত না হ'লে কেউ সহজ হবে না। জীবনের এত বড় গুরুতর ব্যাপার নিয়ে ভালমানুষি ক'রে কোনো লাভ নেই সন্ধ্যা,—চিরজীবন তার ফলে দুঃখের বোঝা বইতে হবে।"

"কবে তা হ'লে আমার কলকাতা যাওয়া হবে সবিদিদি ?"

"দিন দুই পরে অফিসের কাজে ওঁর তিন-চার দিনের জন্যে কলকাতায় যাবার দরকার আছে, সেই সঙ্গে তুই যেতে পারবি।"

সন্ধ্যা ঘাড় নেড়ে বললে, "আচ্ছা।"

সেই দিন রাত্রেই আহারের পর শয়নকক্ষে প্রবেশ ক'রে সবিতা কথাটা প্রকাশের কাছে উত্থাপন করলে। সমস্ত কথা ধীরভাবে শুনে প্রকাশ বললে, "এ পরামর্শ যে ভাল নয় তা বলছি নে, কিন্তু এতে সন্ধ্যা সত্যি সত্যিই রাজী হয়েছে তো ?"

"তার মানে ?"

"তার মানে, চক্ষুলজ্জায় প'ড়ে শুধু মুখের কথায় রাজী হয়েছে কি-না তাই জানতে চাইছি। এর মধ্যে একটা সূক্ষ্ম কথা আছে সবু। তোমার বাড়িতে যদি কোনো লোক কতকটা আশ্রিতরূপে বাস করে, যার মনে আত্মসম্মান-জ্ঞানের অভাব নেই, তার কাছে তুমি যদি এমন কোন প্রস্তাব কর যেটা পালন করলে তোমার বাড়ি ত্যাগ ক'রে তাকে যেতেই হয়, তা হ'লে সে প্রস্তাবে অস্বীকৃত হওয়া তার পক্ষে একটু কঠিন।"

প্রকাশের কথা শুনে সবিতা অসহিষ্ণু হয়ে উঠল; একটু তীব্রকণ্ঠে বললে,

"কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ যে, সন্ধ্যা আমার একেবারে পর নয়, সে আমার বোন; তার মঙ্গলের জন্যে তাকে যেমন আমি বাড়িতে আশ্রয় দিতে পারি, তেমনি বাড়ি-ছাড়া করতেও পারি।"

প্রকাশ বললে, "তুমিও ভুলে যাচ্ছ যে, সন্ধ্যা আমারও একেবারে পর নয়, সে আমার শ্যালী; সুতরাং তার নিজের আন্তরিক ইচ্ছের অভাবে তাকে বাড়ি-ছাড়া করতে আমার মনের মধ্যে আপত্তি হতে পারে।"

সবিতা একেবারে উষ্ণ হয়ে উঠল; বললে, "তবে কি তুমি বলতে চাও যে, চিরকালই সে তোমার ভাত-কাপড়ে মানুষ হয়ে তোমাকে গান শুনিয়ে এখানে প'ড়ে থাকবে? আর তা হ'লেই তার জীবন সার্থক হবে?"

প্রকাশ বললে, "না, তা আমি বলতে চাই নে। কিন্তু এ কথাও বলতে চাই নে যে, কলকাতায় তাকে নিয়ে গিয়ে বাড়ি বাড়ি অপমানিত করিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এলেই তার জীবন সার্থক হবে।"

সবিতা সজোরে গর্জ্জন ক'রে উঠল, "ফিরিয়ে তুমি তাকে আনবে না।"

বিস্মিত নেত্রে ক্ষণকাল সবিতার দিকে চেয়ে থেকে প্রকাশ বললে, "কিন্তু ওর বাপ-শ্বশুরের মধ্যে কেউ যদি ওকে না নেয় তো কোথায় ওকে রেখে আসব?"

"যেখানে হয় সেখানে। কোথাও না হয়, পথে। ওর বাপ-শ্বশুরেরা যদি ওর ভার না নেয় তো তোমারই বা কি এমন মাথাব্যথা পড়েছে শুনি?"

"কিন্তু, আমি যদি ঠিক ওর বাপ-শ্বশুরের শ্রেণীর লোক না হই সবিতা?"

"না না, তুমি নিজেকে অত অসাধারণ ব'লে মনে করো না। তোমারও সমাজ আছে, সংসার আছে,—শুধু তাদেরই নেই!"

আলোচনাটা কলহে রূপান্তরিত হয়ে আসছে দেখে প্রকাশ বললে, "রাত অনেক হয়েছে, এখন এস শুয়ে পড়া যাক। কাল সকালে উঠে যখন দেখা যাবে যে, বিশ্রাম ক'রে দুজনেরই বুদ্ধি পরিষ্কার হয়েছে, তখন আবার পরামর্শটা ভাল ক'রে চালানো যাবে। তখন মীমাংসা হতেও বিলম্ব হবে না।"

সকালে উঠে সত্যই দেখা গেল, গতরাত্রের কলহটা দাম্পত্য কলহের পরিণতিই লাভ করেছে। ফলে স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের অভিমত দ্রুতগতিতে নিকটবর্তী হয়ে আসতে লাগল এবং অচিরকালের মধ্যে স্থির হয়ে গেল যে, সন্ধ্যার কলিকাতা যাওয়াই সর্বতোভাবে যুক্তিযুক্ত।

তিন দিন পরে রাত্রি এগারোটার সময়ে প্রকাশ ও সন্ধ্যা নাগপুর প্যাসেঞ্জারের একটি প্রথম শ্রেণীর কামরা অধিকার ক'রে বসল। সে কামরায় অন্য কোনো আরোহী ছিল না।

গাড়ি ছাড়লে প্রকাশ বললে, "সন্ধ্যা, কাল সকালে তো রীতিমত যুদ্ধং দেহির মতো একটা ব্যাপার আছে। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড, বিশ্রাম নিয়ে কালকের জন্যে প্রস্তুত হতে হবে।"

উত্তরে সন্ধ্যা কিছু বললে না, শুধু একটু হাসলে। মন তার তখন সেই অবস্থায়, যেখানে ভাল মন্দ সুখ-দুঃখ উৎসাহ-আলস্যের সব অনুভূতি আসন্ন অনিশ্চিতের প্রত্যাশায় স্তব্ধ হয়ে থাকে। বাহিরের গাঢনিবদ্ধ তমিস্রের প্রতি আর একবার দৃষ্টিপাত ক'রে সে শুয়ে পড়ল।

প্রত্যূষে যখন ঘুম ভাঙল, তখন গাড়ি কোলাঘাট স্টেশন ছাড়িয়ে রূপ-নারায়ণের পুলের উপর দিয়ে গভীর শব্দ করতে করতে চলেছে।

প্রকাশ বললে, "রাত্রে ঘুম হয়েছিল সন্ধ্যা?"

সন্ধ্যা বললে, "এক রকম হয়েছিল।"

"প্রথমে কোথায় যাবে? শ্বশুর-বাড়ীতে, না, বাপের বাড়িতে?"

"আপনি কোথায় বলেন?"

"আমি বলি, প্রথমে মেসোমশায়ের বাড়ি যাওয়াই ভাল।"

এক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে সন্ধ্যা বললে, "তবে তাই।"

হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে একটা ট্যাক্সি ভাড়া ক'রে প্রকাশ যখন সন্ধ্যাকে নিয়ে তার পিত্রালয়ের সম্মুখে এসে উপস্থিত হ'ল, তখন বেলা সাড়ে সাতটা।

ঘোমটা

শেষরাত্রি থেকেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে ছিল, কিছুক্ষণ থেকে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ হয়েছে। আশ্বিন মাসের প্রথম, সুতরাং আসল বর্ষাকাল অনেকদিন হ'ল শেষ হয়ে গিয়েছে,—এ অসময়ের বাদল, আশ্বিন কার্তিক মাসে দু-চার দিনের জন্য প্রায় প্রতিবৎসরই এক-আধবার দেখা দিয়ে থাকে।

ট্যাক্সি থেকে নেমে প'ড়ে প্রকাশ বললে, "এস সন্ধ্যা, নেমে এস।"

একটু ইতস্তত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "প্রথমে একবার খবর দিলে ভাল হয় না?"

মাথা নেড়ে প্রকাশ বললে, "আরে, না না, এ তোমার নিজের বাড়ি,—এখানে আবার খবর দেবে কিসের জন্যে? এস, নেমে এস।"

প্রকাশের কথায় আর দ্বিরুক্তি না ক'রে সন্ধ্যা ট্যাক্সি হতে অবতরণ করল। গৃহদ্বারে একটি দশ-বারো বৎসরের বালক দাঁড়িয়ে ছিল, সে বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে সন্ধ্যাকে একবার ভাল ক'রে দেখেই 'ওমা মেজদিদি এসেছে!' ব'লে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার ক'রে দ্রুতপদে গৃহমধ্যে প্রবেশ করল।

সন্ধ্যার জননী স্বর্ণলতা নীচের তলায় নিকটেই গৃহকর্মে রত ছিলেন, পুত্র পরেশের কথা শুনে যুগপৎ আনন্দে এবং উদ্বেগে চকিত হয়ে উঠলেন। 'কই সে, কই?' ব'লে ফিরে তাকাতেই প্রশ্নের উত্তরের প্রয়োজন হ'ল না,—দেখলেন পর্দা সরিয়ে সন্ধ্যা প্রবেশ করছে—মুখ আরক্ত, দুই চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন। স্বর্ণলতার সহিত দৃষ্টি বিনিময় হওয়া মাত্র কিন্তু নিমেষের মধ্যে মুখের সমস্ত রক্তিমা অন্তর্হিত হয়ে মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করল, চক্ষুর দৃষ্টি স্তিমিত হয়ে এল, একবার অস্ফুট স্বরে 'মা গো' ব'লে সন্ধ্যা পাশের বারান্দার সিঁড়ির উপর ধপ ক'রে ব'সে পড়ল।

ক্ষিপ্র বেগে সন্ধ্যার কাছে উপস্থিত হয়ে তার পাশে ব’সে প’ড়ে স্বর্ণলতা ব্যাকুলভাবে দুই হস্তে সন্ধ্যার তন্দ্রাচ্ছন্ন দেহ কোলের উপর তুলে নিলেন। তার পর উপর দিকে তাকিয়ে কন্যা সাধনার উদ্দেশ্যে উচ্চৈঃস্বরে বললেন, “সাধন, শীগগির একবার নীচে নেমে আয়।”

মাতার আহ্বান কানে যেতেই সাধনা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এসে সন্ধ্যাকে দেখতে পেয়ে দ্রুতপদে নীচে নেমে এল। স্বর্ণলতা তখন সন্ধ্যাকে বুকে জড়িয়ে ধ’রে নিঃশব্দে রোদন করছিলেন; বললেন, “শীগগির একটু জল আর একখানা হাত-পাখা নিয়ে আয়।”

কিন্তু ততক্ষণে সন্ধ্যা তার অসংবৃত অবস্থা থেকে অনেকটা মুক্তিলাভ করেছিল; বললে, “দরকার নেই মা, আমি উঠছি।” তার পর সহসা দুই বাহু দিয়ে স্বর্ণলতার কণ্ঠ জড়িয়ে ধ’রে উচ্ছ্বসিত হয়ে রোদন করতে লাগল। চাপা কান্নার উগ্র তাড়নায় তার সমস্ত দেহ আলোড়িত হয়ে উঠল।

দুষ্পরাজেয় অভিমানের দ্বারা মনকে কঠিন ক’রে সন্ধ্যা জামসেদপুর থেকে কলিকাতা পর্যন্ত সমস্ত পথটা প্রস্তুত হয়ে এসেছিল। মনে মনে এই সঙ্কল্প সে বার বার স্পষ্ট ক’রে নির্ণীত ক’রে নিয়েছিল যে, যে-প্রতিশ্রুতি সে সবিতার কাছে জামসেদপুরে দিয়ে এসেছে সংযত মনের সমস্ত শক্তির সাহায্যে তা পালন করবে; কিন্তু তাই ব’লে নিজের মধ্যে নিজে কখনই ভেঙে পড়বে না, সকল সময়ে সর্বাবস্থায় চিত্তকে সে নিজের বশীভূত রাখবে। কিন্তু পিতৃগৃহে পদার্পণ করবামাত্র এক নিমেষে কি রকম ক’রে সমস্তই ওলট-পালট হয়ে গেল! যে অভিমানকে শিখিয়ে-পড়িয়ে প্রহরী-রূপে সে আত্মরক্ষার্থে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল, মাতৃমূর্তির যাদুর সম্মুখে সে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করলে যে, জননীর কণ্ঠলগ্ন হয়ে গভীর অভিমানের স্বরে সন্ধ্যা বললে, “কি ক’রে মা, তোমরা এমন ক’রে আমাকে ভুলে ছিলে? কি ক’রে এতদিন আমাকে জামসেদপুরে ফেলে রেখেছিলে?”

অভাগিনী কন্যার এই সকরুণ অনুযোগে সুবর্ণলতার অন্তর বিদীর্ণ হয়ে গেল। গভীর আবেগের সহিত প্রবলতর বন্ধনে তাকে জড়িয়ে ধ'রে বললেন, "ওরে সন্ধ্যা, এ কথা তুই আমাকে—তোর নির্বোধ মাকে—জিজ্ঞেস করিস নে। ইচ্ছে হয় তোর বাপকে জিজ্ঞেস করিস, তিনি জ্ঞানী মানুষ, অনেক বুদ্ধি বিবেচনা আছে, তিনি হয়তো তোকে এ কথার উত্তর দিতে পারবেন।"

জননীর এই বাক্যের মধ্যে বেদনার যে মর্মন্তুদ পরিচয় প্রচ্ছন্ন ছিল, সে কথা সন্ধ্যার কাছে ধরা পড়ল কি-না বলা কঠিন। মনে মনে একটু কি চিন্তা ক'রে সে বললে, "মা, বাবা কোথায়? বাবা কি বাড়ি নেই?"

সুবর্ণ বললেন, "তিনি ঘরে শুয়ে আছেন। আজ তিন দিন শয্যাগত। বসতেও পারেন না। কাঁধের কাছে একটা বড় ফোড়া অস্ত্র হয়েছে।"

পিতার অসুখের কথা শুনে সন্ধ্যা উদ্বিগ্ন হ'ল; বললে, "এত অসুখ? চল মা, বাবাকে দেখি গে," ব'লে উঠে দাঁড়াল। তার পর হঠাৎ একটা কথা মনে ভেবে বললে, "মা, আমাকে দেখে বাবা অসন্তুষ্ট হবেন না তো?"

সন্ধ্যার কথা শুনে সুবর্ণলতার মুখ বেদনায় বিবর্ণ হয়ে উঠল; দুঃখাত কণ্ঠে বললেন, "হ্যাঁ রে সন্ধ্যা, আমরা কি তোর এতই পর হয়ে গেছি বলে মনে করিস?"

সন্ধ্যার দুই চক্ষু আবার সজল হয়ে এল; বললে, "আমার মনের মধ্যে কত দুঃখ, কত ভয় তা তো তোমরা জান না মা। তা যদি জানতে তা হ'লে আমার কথা শুনে তুমি কখনই রাগ করতে না।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে সুবর্ণলতা বললেন, "তোর ওপর রাগ কেন করব সন্ধ্যা? রাগ করি আমার অদৃষ্টের ওপর, আর পোড়া সমাজের ওপর।"

চলতে চলতে সাধনা এবং পরেশের সঙ্গে এক-আধটা কথা কইতে কইতে দ্বিতলে এসে সন্ধ্যা তার পিতা বেণীমাধবের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করলে। সন্ধ্যার

আগমন-সংবাদ বেণীমাধব পরেশের মুখে পূর্বেই অবগত হয়েছিলেন। সন্ধ্যাকে দেখে তিনি শয্যার উপর উঠে বসবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না।

"তুমি উঠো না বাবা, শুয়ে থাক।" ব'লে সন্ধ্যা ত্বরিতপদে বেণীমাধবের শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত হ'ল, তার পর সহসা হাঁটু গেড়ে মেঝের উপর ব'সে প'ড়ে মুখখানা বেণীমাধবের পায়ের উপর গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

বেণীমাধব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন; দুই বাহু প্রসারিত ক'রে অধীর কণ্ঠে বললেন, "সন্ধ্যা, আয় মা, আমার কাছে আয়। শান্ত হ', কাঁদিস নে।" তার পর অর্ধোত্থিত হয়ে কোনরূপে সন্ধ্যার বাম বাহু ধারণ ক'রে তাকে নিকটে টেনে নিলেন। মাথাটা বুকের কাছে জড়িয়ে ধ'রে সহসা হু-হু ক'রে কেঁদে উঠলেন।

চোখে চোখে জল, মুখে মুখে বাষ্পাবরুদ্ধ অসম্বদ্ধ দু-চারটে বাক্য। এমনি ভাবে পাঁচ-সাত মিনিটে অশ্রুবর্ষণের পালা শেষ হ'ল। তখন হঠাৎ মনে পড়ল একটা কথা যা পূর্বেই মনে হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এরূপ গুরুতর অবস্থার আকস্মিকত্বে প্রথমটা প্রায়ই ভুল হয়ে যায়। মনে পড়ল বেণীমাধবেরই; ব্যস্ত হয়ে বললেন, "তুমি কার সঙ্গে এলে সন্ধ্যা? প্রকাশেরই সঙ্গে বোধ হয়?"

সন্ধ্যা বললে, "হাঁ, মুখুয্যে মশায়ই আমাকে নিয়ে এসেছেন।"

স্বর্ণলতা অপ্রতিভ হয়ে বললেন, "ওমা! ওঁর কথা আমরা একেবারে ভুলে আছি! কাউকে দেখতে না পেয়ে চ'লে গেলেন না তো?"

ঘাড় নেড়ে সন্ধ্যা বললে, "না, তা যাবেন না। বোধ হয় জিনিসপত্র নিয়ে ট্যাক্সিতেই ব'সে আছেন।" মনে মনে এ কথা সে ভাল ক'রেই জানে যে, অভাগিনী সন্ধ্যার গতি কি হ'ল তা সঠিক না জেনে চ'লে যাবার পাত্র প্রকাশ নয়।

সাধনার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বেণীমাধব বললেন, "সাধন, তুমি গিয়ে প্রকাশকে এখানে ডেকে নিয়ে এস।"

সাধনার সঙ্গে প্রকাশ যখন কক্ষে প্রবেশ করল তখন সকলের চোখে চোখে অশ্রু শুকিয়ে গেছে, কিন্তু কিছুক্ষণ পূর্বে সে বিষয়ে যে একটা অভিনয় হয়ে গিয়েছে তার পরিচয় চক্ষুপল্লবাদি থেকে তখনো সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয় নি। বেণীমাধব এবং সুবর্ণলতাকে প্রণাম ক'রে প্রকাশ একটা চেয়ারে উপবেশন করল। প্রথমে বেণীমাধবের অসুস্থতা এবং অপরাপর বিষয়ে দু-চারটা মামুলি কথার পর আসল কথা উঠল।

বেণীমাধব বললেন, "সন্ধ্যার আমরা বাপ-মা, কিন্তু তুমি যে আমাদের চেয়েও তার আত্মীয়, তুমি তার প্রমাণ দিয়েছ প্রকাশ।"

শুনে প্রকাশ মৃদু মৃদু হাসতে লাগল; বললে, "প্রমাণটা কিন্তু খুব পাকা নয় মেসোমশাই। সের দুই-তিন চাল, সের খানেক ডাল, আর কিছু মাছ তরকারি। এর বেশি এমন কিছু নয়—তুমি কি বল সন্ধ্যা?" ব'লে প্রকাশ সকৌতুকে সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে।

উত্তরে সন্ধ্যা শুধু একটু হাসলে, কিছু বললে না।

বেণীমাধব বললেন, "কথাটা তুমি এড়িয়ে যেতে চাও বাবাজি। তুমি যে তাকে কয়েক দিন আহার দিয়েছ সে কথা আমি মোটেই বলতে চাচ্ছি নে। অমন বিপদের দিনে তুমি যে তাকে আশ্রয় দিয়েছ, সেই কথাই আমি বলছি।"

প্রকাশ বললে, "কিন্তু আশ্রয় না দিয়েই বা কি করি বলুন? বলা নেই, কওয়া নেই, রাত দুটোর সময়ে এসে দোর ঠেলাঠেলি ক'রে ঘুম ভাঙালে। সঙ্গে একটি মুসলমান ছেলে ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। সেও একটি কথা কইবার অবসর দিলে না, সন্ধ্যাকে দিয়ে আমাদের সনাক্ত করিয়ে নিয়ে অমনি মুহূর্তের মধ্যে মোটর ক'রে ছুটে পালাল। এখন সে রকম অবস্থায় বাড়ির বার ক'রে গেট বন্ধ না ক'রে দিয়ে বেশি কিছু বাহাদুরি করেছি কি? তা যদি করতাম, তা হ'লে তো আমাকে পাষণ্ড বলতে পারতেন।"

বেণীমাধব বললেন, "কিন্তু তা হ'লে তো আমাকে তুমি পাষণ্ড বলতে পার

প্রকাশ। আমি তো তাকে জামসেদপুর থেকে নিয়ে এসে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিই নি।"

প্রকাশ বললে, "ও-কথা কেন বলছেন মেসোমশায়? আপনার আশ্রয় না দেওয়া সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার;—তার যুক্তি আছে, সদুদ্দেশ্য আছে। গুণ্ডার ছুরি আর ডাক্তারের ছুরি দুই-ই এক বস্তু, দুই-ই মানুষের দেহে রক্তপাত করে, কিন্তু উভয়ের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ পৃথক। গুণ্ডার ছুরি মানুষের জীবন নেবার চেষ্টা করে, আর ডাক্তারের ছুরি মানুষের জীবন দেবার চেষ্টা করে।"

ক্ষণকাল নীরবে থেকে বেণীমাধব বললেন, "সে কথা ঠিক, কিন্তু আমার এ বাড়িতে একটি লোক আছেন যিনি আমার ছুরিকে গুণ্ডাব ছুরি ব'লেই মনে করেন। তাঁর ধারণা বাপ-শ্রেণীর জীবেরা প্রধানত পাষণ্ডপ্রকৃতির, সঙ্গে সঙ্গে মা-শ্রেণীর জীবেরা যদি না থাকতেন তা হ'লে ছেলেমেয়েদের জীবনধারণ সঙ্কটাপন্ন হ'ত।"

বেণীমাধবের কথা শুনে প্রকাশ স্মিতমুখে বললে, "এ কথার মধ্যে সত্যি মিথ্যে দুই-ই আছে মেসোমশায়। আসলে এ হ'ল স্নেহ আর বিবেকের চিরকেলে ঝগড়া। আমার মনে হয়, ছেলে-মেয়েদের মঙ্গলের জন্য এ দুয়েরই প্রয়োজন আছে। এই দুটি বিভিন্নমুখী শক্তির টানে তাদের জীবন একটি শুভ মধ্যপথ অবলম্বন ক'রে চলে। মায়ের স্নেহের নদীকে সামলাবার জন্যে বাপের বিবেচনার বাঁধের দরকার আছে বইকি।"

প্রকাশের কথায় বেণীমাধবের মুখে হাসি দেখা দিল; বললেন, "তা হ'লে বাপ-শ্রেণীর জীবেরা সত্যি সত্যিই পাষণ্ড নয়?"

এ কথার উত্তর দিলেন সুবর্ণলতা, বললেন, "কে তোমাকে কবে পাষণ্ড বলেছে যে, তুমি ও-কথা বলছ! আমি কোনোদিন বলেছি কি?"

বেণীমাধব স্বীকার করলেন যে, উক্ত বাক্যবিশেষটি সত্য সত্যই কোনোদিন

তাঁর প্রতি প্রয়োগ করা হয় নি, কিন্তু এ কথাও বললেন যে, সন্ধ্যা সম্পর্কে তাঁর আচরণাদির বিষয়ে এমন সব মন্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে যাতে উক্ত বাক্যটি প্রয়োগ করলে এমন কিছু অপপ্রয়োগ হ'ত না। কিন্তু তাতে কিছু যায়-আসে না, কারণ সন্ধ্যার প্রকৃত মঙ্গলের জন্য কোন কার্য করার ফলে পাষণ্ড আখ্যাটি যদি সত্য সত্যই তাঁকে গ্রহণ করতে হয় তো কোনো দুঃখ নেই; কারণ তাঁর যশ-অপযশের কথা মুখ্য বস্তু নয়, মুখ্য বস্তু সন্ধ্যার হিতাহিতের কথা। এবং একমাত্র সেই মুখ্য বস্তুরই প্রতি দৃষ্টি স্থাপিত ক'রে অবিলম্বে যে কায করবার আভাস দিলেন, তাতে শুধু সুবর্ণলতাই নয়, প্রকাশ পর্যন্ত চিন্তিত হয়ে উঠলেন।

বিবর্ণমুখে সুবর্ণলতা বললেন, "তুমি এখনি সন্ধ্যাকে বিদেয় করতে চাও না-কি?"

"বিদেয় করতে চাই বললে ভুল বলা হবে, রাখতে চাই নে।"

"তার মানে?"

বেণীমাধব একটা তাকিয়ার সাহায্যে অতি কষ্টে কোনো রকমে উঠে ব'সে বললেন, "তার মানে তুমি অনেকবারই আমার কাছে শুনেছ, কিন্তু সন্ধ্যা আর প্রকাশের সামনে আর একবার ভাল ক'রে শুনলে মন্দ হয় না।" সাধনার দিকে তাকিয়ে বললেন, "সাধনা, তুমি আর পরেশ এখন এখানে থেকে একটু যাও।" তারা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে বললেন, "সন্ধ্যা, তুমি মা, আমার কথাগুলো খুব মন দিয়ে শুনো, আর সঙ্গে সঙ্গে তোমার মুখুয্যে মশায়ের ডাক্তারের ছুরির চমৎকার উপমাটি মনে রেখো; সুবিধে হবে।" তার পর প্রকাশকে সম্বোধন ক'রে বললেন, "তোমার কাছে সন্ধ্যা উপস্থিত হওয়ার পর এই সতের-আঠার দিনের মধ্যে অন্তত বার দশেক আমি জহরলালের কাছে গিয়েছি, কিন্তু কিছুতেই তাকে রাজী করতে পারি নি। ভারী চাপা লোক, কোনো কথাই স্পষ্ট ক'রে খুলে বলে না। মুখে প্রতিবারই

একটি বাঁধা গৎ—'আপনি নিয়ে এসে কিছুদিন রাখুন, আমি একটু ভেবে দেখি।' আমি কিন্তু হলফ ক'রে তোমাকে বলতে পারি প্রকাশ, যেদিন জহরলাল শুনবে আমি সন্ধ্যাকে নিয়ে এসেছি সেইদিনই তার সব ভাবনার শেষ হবে,—আর কোনোদিনই আমার সঙ্গে সে দেখা পর্যন্ত করবে না। এখন এ রকম অবস্থায় তুমি আমাকে কি করতে বল?—সন্ধ্যাকে এ বাড়িতে রেখে তোমার মাসিমাকে খুশি করতে বল?—না, সন্ধ্যাকে তোমার সঙ্গে জহরলালের বাড়িতে এখনি পাঠিয়ে তার একটা গতি করতে বল? তুমি বিদ্বান বুদ্ধিমান,—তুমি যা পরামর্শ দেবে তাই আমি করব,—এখন পরামর্শ দাও, বল, কি করা উচিত।"

গভীর ভাবে ক্ষণকাল চিন্তা ক'রে প্রকাশ বললে, "মাসিমা, আপনি কি বলেন? আপনার কি মত?"

ব্যথিত কণ্ঠে স্বর্ণলতা বললেন, "আমাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা ক'রো না বাবা, আমার না আছে বিদ্যে, না আছে বুদ্ধি,—থাকবার মধ্যে আছে একটা পোড়া অবুঝ মন, যা নিয়ে জ'লে পুড়ে মরছি। তোমরা যা ভাল বোঝ তাই কর।"

সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে প্রকাশ বললে, "তোমার কিছু বলবার আছে সন্ধ্যা?"

নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে সন্ধ্যা জানালে বলবার কিছুই তার নেই।

প্রকাশ বললে, "তা হ'লে সন্ধ্যাকে জহরমামার বাড়িই নিয়ে যাই।"

তাকিয়াতে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে উঠে বেণীমাধব বললেন, "এখুনি। জহরলাল তোমার তো আত্মীয়—যে রকম ক'রে পার মেয়েটাকে গছিয়ে দিয়ো প্রকাশ,—তোমার পুণ্য হবে। এখানে এসেছিলে সে কথা যেন জানতে না পারে, যদি জিজ্ঞাসা করে, অসময়ে কেন, ব'লো—ট্রেন লেট ছিল।"

হাতঘড়িতে সময় দেখে প্রকাশ বললে, "আর আধ ঘটাটাক্ পরে গেলে

অসময় হবে না মেসোমশায়। ও-লাইনের গাড়ির সময় মামার খুব জানা আছে, মনে করবেন বস্থে মেলে আমরা এলাম। কিন্তু কথা হচ্ছে, আমি তো যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করিব না, তা সত্ত্বেও যদি ওঁরা সন্ধ্যাকে রাখতে রাজী না হন তা হ'লে আপনাদের কাছেই তাকে রেখে যাব তো?"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে ক্ষণকাল চিন্তা ক'রে বেণীমাধব বললেন, "আমার যে কত দিকে কত বিপদ তা আর কি বলব বাবা! সন্ধ্যার বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে সাধনার একটি ভাল পাত্র পাওয়া গেছে—ছেলেটি ইম্পীরিয়াল সার্ভিসে চাকরি করছে—বাপের এক পয়সার কামড় নেই। আমার মতো দরিদ্র লোকে এ সুযোগ ছাড়ে কি ক'রে বল? তাই মনে করছি অঘ্রাণ মাসে দায় থেকে উদ্ধার হয়ে যাই। ততদিন সন্ধ্যা যদি তোমার কাছে থাকে, তা হ'লে বড় ভাল হয়। তার পর সাধনার বিয়ে হয়ে গেলে আমি আর কাউকে গ্রাহ্য করি নে। খুকির বিয়ে? সে ভাবনা আমার নেই—ততদিনে আমি ডঙ্কা বাজিয়ে চ'লে যাব।"

কঠোর নেত্রে প্রকাশ ক্ষণকাল বেণীমাধবের দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, "দরকার হ'লে সন্ধ্যা চিরদিনই আমার কাছে থাকবে, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন,—কিন্তু এ বিষয়ে পাত্রপক্ষ কি কোনো রকম শর্ত করেছে?"

"এক রকম করেছে বইকি!"

"আর, সেই শর্তে আপনাকে রাজী হতে হয়েছে?"

প্রকাশের কথার ভঙ্গি দেখে বেণীমাধবের মুখ শুকিয়ে উঠল; বললেন, "রাজী না হয়ে কি করি বল? সমাজের যে কি জুলুম, তা তো তোমরা ঠিক জান না বাবা।" ব'লে হিন্দু-সমাজের একটা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যাপারে উদ্যত হলেন।

সহসা আসন ত্যাগ ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে প্রকাশ বললে, "এ-সব আলোচনা এখন থাক্ মেসোমশায়—এ ভারি পেন্‌ফুল। আমি রাস্তায় বেরিয়ে

একটা ট্যাক্সির চেষ্টা দেখি—সে ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়েছি।" ব'লে প্রস্থান করলে।

"ওমা, একটু চা-জলখাবার না খেয়ে কেমন ক'রে যাবে?" ব'লে স্বর্ণলতা ব্যস্ত হয়ে প্রকাশের পিছনে পিছনে বেরিয়ে গেলেন।

সন্ধ্যা মেঝে থেকে বেণীমাধবের পদপ্রান্তে উঠে বসল। ধীরে ধীরে পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে, "তোমার এত অসুখ বাবা, ভাল ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাচ্ছ তো?"

বেণীমাধব বললেন, "সে ভয় নেই মা, এখানে অনেক দুঃখ ভোগ করবার বাকি আছে, ভাল ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা না করালেও কোন ক্ষতি হবে না।" তার পর একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বললেন, "সন্ধ্যা, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না মা।"

সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে সন্ধ্যা বললে, "তুমিও মাকে ভুল বুঝো না বাবা। মা সবই বোঝেন, কিন্তু হাজার হোক মেয়েমানুষ তো।"

সন্ধ্যার মনটাও মেয়েমানুষেরই মন—এ কথা বেণীমাধবের মনে পড়ল কি-না, তা তাঁর আকৃতি থেকে ঠিক বোঝা গেল না।

ট্যাক্সি এনে জিনিস উঠিয়ে ভিতর এসে প্রকাশ বললে, "আর দেরি ক'রে কাজ নেই, সন্ধ্যাকে ডেকে দিন মাসিমা।"

স্বর্ণলতা বললেন, "মুখ ধুয়ে একটু চা খেয়ে নাও প্রকাশ।"

সজোরে মাথা নেড়ে প্রকাশ বললে, "ওরে বাপ্ রে! আমার এখন অনেক হাঙ্গামা বাকি। আমি তো এখনি হোটেলে গিয়ে উঠব,—আপনি বরং সন্ধ্যাকে কিছু খাইয়ে দিন।"

সন্ধ্যা কিন্তু কিছুতেই রাজী হ'ল না; বললে, "এবার যেদিন আসব সেদিন তুমি নিজের হাতে আমাকে খাইয়ে দিয়ো মা, আজ কিন্তু একটু জল পর্যন্ত আমার গলা দিয়ে তলাবে না।"

মলিনমুখে সুবর্ণলতা বললেন, "তুই আমাদের ওপর রাগ ক'রে যাচ্ছিস সন্ধ্যা ?"

সন্ধ্যার মুখে একটা ক্ষীণ হাসি দেখা দিল, বললে, "তোমাদের ওপর বলছ কেন মা ? আমারও তো একটা অদৃষ্ট আছে—তার ওপর তো রাগ করতে পারি।" ব'লে সোজা গিয়ে ট্যাক্সিতে প্রকাশের পাশে বসল।

জহরলালের বাড়ি পৌঁছানো পর্যন্ত পথে একটা কথাও হ'ল না—উভয়েরই মনের অবস্থা চিন্তায় স্তব্ধ হয়ে ছিল। গৃহদ্বারে ট্যাক্সি স্থির হয়ে দাঁড়ালে গৃহরক্ষী উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম করলে।

প্রকাশ জিজ্ঞাসা করলে, "বাবু ঘরমে হ্যায় ?"

"বড়া মহারাজ তো কোই দশ মিনিট নিকল গয়ে।"

"কব আবেঙ্গে মালুম হ্যায় ?"

"দশ বাজে।"

"মাই লোক ভিতর হ্যায় ?"

"হ্যায় হজুর।"

মুখ ফিরিয়ে সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে প্রকাশ চিন্তিত হয়ে উঠল। তার মুখ জবাফুলের মত আরক্ত, দৃষ্টি অর্থহীন কঠোর,—যেন সাধারণ চৈতন্যের সীমা হঠাৎ অতিক্রম করেছে। ভয়ে ভয়ে প্রকাশ বললে, "তা হ'লে কি করা যায় সন্ধ্যা ?"

সন্ধ্যা বললে, "কি আর করা যাবে ? আমি ভিতরে যাচ্ছি।"

"কিন্তু দশটা পর্যন্ত আমার অপেক্ষা করা তো চলবে না—কাউলি সাহেবের সঙ্গে বেলা এগারটায় অ্যাপয়েন্ট্মেণ্ট।"

"আপনি পরে বেলা দুটো তিনটের সময়ে আসবেন।"

"মা মিমার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যাব ?"

"তাড়াতাড়ির দরকার নেই, পরে দেখা করবেন।"

"তোমার সুট্‌কেসটা ?"

"নামিয়ে দিয়ে যান।"

ট্যাক্সি থেকে নেমে প'ড়ে সন্ধ্যা দ্রুতপদে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করল।

সন্ধ্যাকে কোনও রকম পরামর্শাদি দেবার সময় পাওয়া গেল না, পাওয়া গেলেও পরামর্শ গ্রহণ করবার মতো মনের অবস্থা তার ছিল না। সুট্‌কেসটা দারোয়ানের জিম্মা ক'রে দিয়ে চিন্তিত মনে প্রকাশ বললে, "ক্যালক্যাটা হোটেল।"

ট্যাক্সি ক্যালক্যাটা হোটেল অভিমুখে ধাবিত হ'ল।

সদর মহলে প্রবেশ ক'রে সন্ধ্যা অন্তঃপুরে যাবার পথটা ঠিক নির্ণয় করতে পারছিল না, দূর থেকে দেখতে পেয়ে একজন ভৃত্য ছুটে এল; বললে, "আসুন আমার সঙ্গে, আমি গিন্নীমার কাছে নিয়ে যাচ্ছি।" অভ্যাগতা যে সেই বাড়িরই বধূ, তা অবশ্য সে বুঝতে পারে নি।

অন্তঃপুরে প্রবেশ ক'রে দীর্ঘ বারান্দার প্রান্তে উপরে উঠবার প্রশস্ত সোপান। ভৃত্যের পিছনে পিছনে সোপান অতিক্রম ক'রে সন্ধ্যা দ্বিতলের বারান্দায় উপনীত হয়ে দেখলে, ঠিক যেন তারই অপেক্ষায় প্রিয়লাল স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে হঠাৎ মাথাটা গেল ঘুরে, চক্ষে যেন একটা অন্ধকার ঘনিয়ে এল, সিঁড়ির রেলিং-প্রান্তের মোটা থামের মাথাটা তাড়াতাড়ি ধ'রে ফেলে সে ভাবটা সে সামলে নিলে।

কথাটা মিথ্যে নয়। মোটরের শব্দ শুনতে পেয়ে প্রিয়লাল বারান্দায় বেরিয়ে গিয়ে সন্ধ্যাকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করতে দেখতে পেয়েছিল। কি যে করা উচিত, তা সে প্রথমটা ভেবেই ঠিক করতে পারে নি, তার পর শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যা উপরেই আসবে অনুমান ক'রে সিঁড়ির নিকটে গিয়ে তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল। সন্ধ্যাকে সম্বোধন ক'রে প্রিয়লাল বললে, "মা এখন পূজো করছেন, হয়তো একটু দেরি হবে,—ততক্ষণ অন্য ঘরে একটু অপেক্ষা করলে ভাল হয়।" তার পর ভৃত্যের দিকে তাকিয়ে বললে, "হরি, তুই তোর কাজে যা, আর দরকার নেই।"

হরি চ'লে গেলে প্রিয়লাল বললে, "এস আমার সঙ্গে।"

প্রিয়লালের পিছনে পিছনে গিয়ে সন্ধ্যা যে ঘরে প্রবেশ করল, সেটা প্রিয়লালের পাঠাগার। চার-পাঁচটা বই-ভরা আলমারি, একটা বড় সেক্রেটেরিয়েট

টেবিল, গোটা দুই-তিন হোয়াট্‌নট, সাধারণ ও কুশন-মোড়া পাঁচ-সাতটা চেয়ার, —অবস্থাপন্ন ব্যক্তির পাঠাগারে যেমন থাকা উচিত সবই তেমনি, অধিকন্তু ঘরের এক পাশে একটা গদি-মোড়া অপ্রশস্ত খাট, সম্ভবত পরিশ্রমের পর ক্লান্তি অপনোদনের জন্য।

ঘরে প্রবেশ ক'রে ভাল ক'রে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে প্রিয়লাল বললে, "ওই চেয়ারটায় ব'স।"

সন্ধ্যা একবার নিমেষের জন্য প্রিয়লালের মুখের উপর দৃষ্টিপাত ক'রে আঁচলটা গলায় দিয়ে নত হয়ে প্রিয়লালের পদধূলি গ্রহণ করলে, তার পর ধীরে ধীরে চেয়ারে গিয়ে ব'সে চেয়ারের বাহুর উপর মাথা রেখে নিঃশব্দে রোদন করতে লাগল।

প্রিয়লালেরও চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এল, মুখ দিয়ে কথা বার হ'ল না। ক্ষণকাল নীরবে অবস্থান ক'রে ভগ্নকণ্ঠে সে ডাকলে, "সন্ধ্যা!"

বস্ত্রাঞ্চলে চোখ মুছে মুখ তুলে জিজ্ঞাসু নেত্রে সন্ধ্যা প্রিয়লালের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে।

প্রিয়লাল বললে, "সন্ধ্যা, আমাদের প্রাণের যা কথা, তা বলবার সময় এখন হয়তো হবে না, মা অনেকক্ষণ পূজোয় বসেছেন, এখনি উঠবেন। তার আগেই দু-চারটে কাজের কথা সেরে নিতে হবে।"

প্রিয়লালের ভূমিকা শুনে সন্ধ্যার মুখ আশঙ্কায় বিবর্ণ হয়ে উঠল। স্খলিত-কণ্ঠে বললে, "কাজের কথা? আমার সঙ্গে কি কাজের কথা?"

প্রিয়লাল বললে, "কাজের কথা আর কিছু নয়, আমরা যে বিপদে পড়েছি তার কথা।"

"তার কি কথা?"

"তুমি আজ যে এখানে এসেছ, সে কি বাবাকে জানিয়ে এসেছ?"

"না।"

"প্রকাশদাদা তোমাদের আসবার কথা চিঠি লিখে কিছু জানান নি?"

"যতদূর জানি, জানান নি।"

সন্ধ্যার উত্তর শুনে প্রিয়লালের মুখে চিন্তা দেখা দিলে; বললে, "বোধ হয় ভাল কর নি, হঠাৎ এসে পড়া হয়তো ঠিক হয় নি।"

সহসা সন্ধ্যার চক্ষের মধ্যে বিদ্যুৎ-কণিকা জ্ব'লে উঠল। আরক্ত মুখে ঋজু হয়ে ব'সে সে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে প্রস্তুত ক'রে নিলে, তার পর সোজা-সুজি প্রিয়লালের দিকে চেয়ে দৃঢ়স্বরে বললে, "ডাকাতদের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার পর পনেরো ষোলো দিন আমি জামসেদপুরে প'চে মরছি,—একে তুমি হঠাৎ এসে পড়া বল? তুমি পারতে এতদিন অপেক্ষা করতে?" এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে পুনরায় বললে, "তুমি তো তোমার কাজের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছ, এবার আমি একটা কাজের কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি। আচ্ছা, আমাকে তা হ'লে পরিত্যাগ করবে ব'লেই কি তোমরা স্থির করেছ? বল? সত্যি ক'রে বল?"

এই আকস্মিক কঠিন প্রশ্নের উত্তরে কি বলবে সহসা তা স্থির করতে না পেরে প্রিয়লাল ক্ষণকাল বিমূঢ়ভাবে নিরুত্তরে রইল, তার পর বললে, "এক কথায় তো এ কথার উত্তর দেওয়া যায় না সন্ধ্যা। এর উত্তর হ্যাঁ-ও নয়, না-ও নয়।"

"তবে কী এর উত্তর? বল?"

"এর উত্তর—বাবা যতদিন পর্যন্ত মন স্থির করতে না পারছেন ততদিন আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে। বাবার সঙ্গে এ নিয়ে বাদবিসম্বাদ করলে তাঁর জেদটা মিছামিছি বাড়িয়ে দেওয়া হবে—হয়তো তাতে তাঁর মতকে আমাদের বিরুদ্ধে পাকা ক'রেই তোলা হবে। তার চেয়ে কিছুদিন তাঁকে ভাবতে দিয়ে অপেক্ষা করাই উচিত নয় কি সন্ধ্যা? বুঝে দেখ।"

সন্ধ্যা বললে, "আচ্ছা, এ কথা তা হ'লে না-হয় তাঁর সঙ্গেই হবে, কিন্তু

একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি,—বাবা যদি শেষ পর্যন্ত আমাকে না নেওয়াই স্থির করেন, তখন তুমি কি করবে? তখন তুমি আমাকে গ্রহণ করবে তো?"

সন্ধ্যার এই সুকঠিন প্রশ্নে প্রিয়লালের মুখ শুকিয়ে উঠল; বললে, "এ কথা এখন কেন সন্ধ্যা? পরের কথা আগে কেন?"

সন্ধ্যার মুখে গভীর দুঃখের মৃদু হাসি স্ফুরিত হ'ল। বললে, "কেন, তা তুমি বুঝবে না। যে আশ্রয়হীন অবলম্বনহীন, তার যে কত দুঃখ, কত ভয়, তা তুমি কি ক'রে বুঝবে বল?—তোমার তো আশ্রয় ভাঙে নি।" এক মুহূর্ত বিশ্রাম নিয়ে বললে, "তুমি বলতে পারলে না, কিন্তু আমি হ'লে কি করতাম জান? দরকার হ'লে তোমার জন্যে সমাজ, সংস্কার, অবুঝ বাপ-মা—সমস্ত ত্যাগ করতাম, কিন্তু বিনা অপরাধে এক মুহূর্তের জন্যেও তোমাকে ছেড়ে থাকতাম না। এ তোমাকে আমি স্পষ্ট ক'রে ব'লে রাখলাম, একমাত্র বাংলা দেশের হিন্দু ঘরের মেয়ে হয়ে জন্মানো ছাড়া আর আমি কোনো অপরাধ করি নি,—পাল্কী থেকে লাফিয়ে প'ড়ে ডাকাতদের সঙ্গে পালিয়ে যায় নি, আমি তাদের লুঠ করতে আসবার জন্যে ব'লে পাঠাই নি। তাদের হাতে প'ড়ে আমার যে নিগ্রহ হয়েছে তার জন্যে একমাত্র তোমরা দায়ী। কেন তোমরা আমাকে অমন বিপদ-ভরা পথ দিয়ে রাত্রে নিয়ে এসেছিলে? কেন তোমরা আমার রক্ষার জন্যে যথেষ্ট লোক-জন সঙ্গে আনো নি? কেন তোমরা ডাকাতদের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করবার চেষ্টায় সেখানে প্রাণ দিলে না? অপরাধ করবে তোমরা, আর শাস্তি ভোগ করব আমি?" দীর্ঘ উত্তেজিত অভিভাষণের পর সন্ধ্যা ঘন ঘন হাঁপাতে লাগল।

প্রিয়লালের পায়ে তখনো লাঠির আঘাতের বেদনা ছিল, তখনো আহত পায়ের চিকিৎসা শেষ হয় নি। একবার মনে করলে বলে যে, পা যদি সেদিন না ভাঙত তা হ'লে প্রাণ হয়তো দিতেই হ'ত। কিন্তু কৈফিয়ৎ দিতে

প্রবৃত্তি হ'ল না; বললে, "অপরাধ স্বীকার করছি সন্ধ্যা, কিন্তু তুমি বড় বেশি উত্তেজিত হয়েছ,—একটু শান্ত হও।"

সন্ধ্যা বললে, "উত্তেজিত হয়তো কিছু হয়েছি, কিন্তু যতটা তুমি মনে ভাবছ, ততটা ঠিক নয়। মনে ক'রো না এ-সব কথা এখনি আমি বানিয়ে বানিয়ে তোমাকে বলছি। এ সব আমার মুখস্থ হয়ে গেছে! দিনের মধ্যে কতবার যে এই সব কথা নিয়ে মনে মনে তোমাদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করি, তা তুমি কি ক'রে জানবে? তুমি ভাবছ, এ মেয়েটা যে এমন মুখরা তা আগে কখনো জানতাম না!"

দুঃখার্তকণ্ঠে প্রিয়লাল বললে, "আমি ভাবছি সন্ধ্যা, কত দুঃখই না-জানি তুমি পেয়েছ, যা তোমার মত লাজুক মেয়েকে এতটা মুখরা ক'রে তুলেছে!"

শুনে সন্ধ্যার দুই চক্ষু সজল হয়ে এল; সে বললে, "সত্যিই তাই। ভেবে দেখ, পঁয়ত্রিশ দিন আমি ডাকাতদের বাড়ি ছিলাম। সেখানে কী ঝড় আমার ওপর দিয়ে ব'য়ে গেছে তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। তারা যে দুর্গতি আমার করেছিল, তার চেয়ে যদি আমাকে প্রাণে মারত তো আমি তাদের সদয় বলতাম। জানো?—আমার মনে হয় আমার বয়স যেন দশ বৎসর বেড়ে গেছে। সময়ে সময়ে মনে হয়, সে সন্ধ্যাকে বোধ হয় ডাকাতেরা মেরেই ফেলেছে, আমি তার প্রেত-দেহ।"

এ কথার উত্তরে প্রিয়লালের মুখ দিয়ে কোনো কথা নির্গত হ'ল না,—একটা মর্মান্তিক মনস্তাপে তার দেহ স্তব্ধ হয়ে গেল। সমস্ত ঘরটা বেদনার সকরুণ ব্যঞ্জনায় থম্‌থম্ করতে লাগল। একটা ক্লক্-ঘড়ি ঠক ঠক ক'রে একটানা শব্দ ক'রে চলেছিল, ঢং ক'রে তাতে সাড়ে নটার প্রহর বাজল। সেই শব্দে যেন উভয়ের অনুভূতি ফিরে এল।

কাতরস্বরে প্রিয়লাল বললে, "সময় আমাদের বেশি নেই সন্ধ্যা। বাবা ছেলে-মেয়েদের নিয়ে দমদমার বাগানে বেড়াতে গেছেন, সাড়ে নটা দশটার

সময়ে তাঁর আসবার কথা; মার পূজো এতক্ষণে বোধ হয় শেষ হয়ে এসেছে। তোমার অক্ষম স্বামীকে যদি ক্ষমা করতে পার তো ক'রো; কিন্তু সব দিক বিবেচনা ক'রে, সব কথা সব রকমে ভেবে দেখে আমি যা উচিত ব'লে স্থির করেছি আর একবার তোমাকে তা বলতে বাধ্য হলাম,—বাবার মত না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে।"

দৃপ্তস্বরে সন্ধ্যা বললে, "কিন্তু তোমার এ কথার উত্তরে তোমাকে যে কথা আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আর একবার তা জিজ্ঞাসা করি,—বাবা যদি শেষ পর্যন্ত আমাকে না নেন, তুমি নেবে তো?"

প্রিয়লালের মুখ সহসা কালো হয়ে উঠল, গভীরস্বরে সে বললে, "এ কথারও উত্তরের জন্যে তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে।"

ঘৃণা ও ব্যঙ্গ-মিশ্রিত তীক্ষ্ণকণ্ঠে সন্ধ্যা বললে, "অপেক্ষা করতে হবে? —কতদিন অপেক্ষা করতে হবে, শুনি? জীবনের শেষ দিন পযন্ত কি?"

"তা বলতে পারি নে,—কিন্তু অপেক্ষা করতে হবে।"

রুষ্ট মুখে এক মুহূর্ত প্রিয়লালের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে সন্ধ্যা বললে, "তা যেন বলতে পার না,—কিন্তু কোথায় অপেক্ষা করতে হবে তাও বলতে পার না কি? কোন্ দেশে, কোন্ শহরে, কাদের বাড়ি?"

"ধর, তোমার বাপের বাড়ি।"

"আমার বাপের বাড়ি? কেন, তোমাদেরই সমাজ আছে, জাত আছে, ধর্ম আছে,—আর আমার বাপের বাড়ির লোকেদের সে-সব কিছু থাকতে নেই? তারা তো টাকা-কড়ি আসবাব-পত্র দিয়ে আমাকে দান ক'রে দিয়েছে —তুমি তো ধর্ম সাক্ষী ক'রে আমাকে গ্রহণ করেছ,—এখন তুমি আমাকে একটা অনিশ্চিত সময়ের জন্যে বাপের বাড়িতে অপেক্ষা করতে বলছ। দৈবক্রমে তুমি পুরুষ হয়ে জন্মেছ, আর আমি জন্মেছি মেয়েমানুষ হয়ে,—

এরই বলে তুমি আমার ওপর এতবড় অত্যাচার করতে পারছ। এই কি তোমার ধর্ম? এই তোমার কর্তব্য?"

"আমার কর্তব্য তা হ'লে কি বল তুমি?"

স্থির দৃষ্টিতে সন্ধ্যা ক্ষণকাল প্রিয়লালের দিকে চেয়ে রইল, তার পর বললে; "আমি যা বলি তা পারবে তুমি করতে? আমি বলি—তোমার কর্তব্য, তোমার বাপ-মা আমাকে নিতে রাজী না হ'লে আজই তোমার আমার সঙ্গে এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা। তার পরে কোনো দিন যদি তাঁদের মত আমাদের সপক্ষে বদলায় সেদিন আমরা দুজনে আবার এ বাড়িতে ফিরে আসব। দুটো পেটের জন্যে ভেবো না। তুমি বড়লোকের ছেলে, তুমি যদি চালাতে না পার, মেয়ে-স্কুলে মাস্টারি ক'রে, বড়লোকের মেয়েদের গান শিখিয়ে আমি চালিয়ে নেব। এ তুমি পারবে করতে? আমি হ'লে নিশ্চয় করতুম।"

আর্তস্বরে প্রিয়লাল বললে, "আমি দুর্বল, আমাকে তুমি ক্ষমা ক'রো সন্ধ্যা।"

সজোরে মাথা নেড়ে প্রবলভাবে সন্ধ্যা বললে, "না না, দুর্বলকে আমি ক্ষমা করি নে; দুর্বলকে আমি ঘৃণা করি।"

"তবে তাই ক'রো।"

তেমনিভাবে সন্ধ্যা বলতে লাগল, "শোন। খবরের কাগজে আমার মতো হতভাগিনীদের কাহিনী পড়তে পড়তে যখন দেখতাম যে, বিনা অপরাধে তাদের বাপ-মা শ্বশুর-শাশুড়ী স্বামী তাদের অনায়াসে ত্যাগ করলে, তখন কী ঘৃণা যে তাদের ওপর হ'ত তা তোমাকে কি বলব! গুণ্ডাদের চেয়েও তাদের ওপর আমার বেশি ঘৃণা হ'ত। তখন কি জানতাম, আমি নিজেই একদিন তাদেরই একটা দলের হাতে পড়ব!"

একটু চুপ ক'রে থেকে প্রিয়লাল বললে, "সেই ঘৃণিত দলের কাছে আজ তুমি বিনা আহ্বানে কি প্রত্যাশা নিয়ে এসেছ, বলবে?"

"কোনো প্রত্যাশা নিয়ে আসি নি, একটা বোঝাপড়া করতে এসেছি।"

"কি বোঝাপড়া ?"

"বোঝাপড়া এই যে, আমার আর একটুও ধৈর্য নেই, আর আমি একদিনও অপেক্ষা করতে পারব না। আজ তোমরা আমাকে গ্রহণ করলে তো ভাল, নইলে আমিও তোমাদের আজ ত্যাগ ক'রে যাব। তার পর আর ফিরে আসবার পথ থাকবে না, তোমরা নিজে সাধ্য-সাধনা ক'রে নিয়ে আসতে গেলেও নয়।"

"এত বড় অপরাধ আমরা করেছি ব'লে মনে কর তুমি যে, এই শাস্তি আমাদের দিতে পার ?"

প্রিয়লালের কথা শুনে সন্ধ্যার দুই চক্ষু প্রজ্বলিত হয়ে উঠল, বললে, "এ কি তুমি পরিহাস ক'রে বলছ ?"

ব্যস্ত হয়ে প্রিয়লাল বললে, "না না, সন্ধ্যা, আমি এমন ইতর নই যে, তোমার সঙ্গে এ অবস্থায় পরিহাস করব,—আমার মনের অবস্থা পরিহাসের মতো নয়। আমি স'ত্যই জানতে চাই, আমরা কী এমন অপরাধ করেছি যে, আর কিছুদিন অপেক্ষা করতে বললে তুমি আমাদের চিরদিনের মতো পরিত্যাগ ক'রে যাবে ? আমরাও তো ডাকাতদের লেলিয়ে দিই নি ?"

সন্ধ্যা বললে, "না, তা দাও নি, সে অপরাধ তোমাদের নয়। কিন্তু এক কথা কতবার বলব বল ? তুমি তো বুঝবে না, তুমি এত বড় প্রাসাদে বাস কর, খাওয়া-পরার ব্যবস্থা তোমার ঠিক মতো আছে, নিরাশ্রয়ের দুঃখ তুমি কেমন ক'রে বুঝবে ? একদিনও ভাল ক'রে ভেবে দেখেছ কি আমার কথাটা ? কত অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য ক'রে হাতে পায়ে ধ'রে মুক্তি পেলাম, অধীর আগ্রহে তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম ! ভাবলাম, সংবাদ পেয়েই তোমরা জামসেদপুরে গিয়ে বুকে ক'রে আমাকে নিয়ে আসবে। এই প্রত্যাশার বদলে কী পেলাম জান ? দু-চারটে শুকনো ছোট ছোট টেলিগ্রাম, আর

দু চারটে ছোট ছোট চিঠি॥ তাও আমাকে নয়। তারপর পনের-ষোল দিন অপেক্ষা ক'রে এখানে ছুটে এলাম। বাপের বাড়ি গেলাম তারা বললে—এখানে নয়, শ্বশুরবাড়ি যাও। শ্বশুরবাড়ি এলাম, তুমি বলছ—এখানে নয়, বাপের বাড়ি যাও। আচ্ছা, কোথায় যাই বল দেখি? আছি তো প'ড়ে দূর-সম্পর্কের এক ভগ্নীপতির বাড়ি। সবিতাদিদি তাতে ঠিক সন্তুষ্ট নয় তাও বুঝতে পারি। এতে কি অপেক্ষা করবার ধৈর্য থাকে?"

ম্লান মুখে প্রিয়লাল বললে, "সত্যি।"

সন্ধ্যা বলতে লাগল, "তোমার সঙ্গে আমার কথা শেষ হয়েছে, এখন চল মার সঙ্গে একবার দেখা করি, তাঁর হয়তো এতক্ষণে পূজো শেষ হয়েছে। তোমাকে অনেক দুর্বাক্য, অনেক কটু কথা বলেছি,—তুমি আমাকে ক্ষমা ক'রো। তুমি আমার স্বামী, তোমাকে না ব'লে, তোমার কাছে নালিশ না ক'রে আমার উপায় নেই। তা ছাড়া, একটা কথা কি জান? বেশ বুঝতে পারছি, এ আমার স্বাভাবিক অবস্থা নয়, এত কথা কওয়া আমার অভ্যাস নয়,—কিন্তু কিছুতেই সামলাতে পারছি নে। ঠিক মনে হচ্ছে, আর কোনো লোকের আত্মা যেন আমার উপর ভর ক'রে এসব বলাচ্ছে করাচ্ছে।" তার পর আসন ত্যাগ ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "হয়তো এ জীবনে আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে ন, তাই আর একবার তোমার পায়ের ধুলো দাও।" ব'লে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রিয়লালের পদধূলি গ্রহণ করলে।

উচ্ছল অশ্রু রোধ করতে করতে উঠে দাঁড়াতেই প্রিয়লাল বাহুবন্ধনে সন্ধ্যাকে আবদ্ধ করতে উদ্যত হ'ল। প্রিয়লালের বাহুপাশ কাটিয়ে ত্বরিত পদে দূরে স'রে গিয়ে সন্ধ্যা বললে, "না, ও-সব এখন নয়। আমি এসেছি তোমার কাছে আশ্রয় চাইতে। আশ্রয় পেলে তারপর তোমার কাছ থেকে আদর যত্ন সবই নেব,—তার আগে কিছু নয়। এখন মার কাছে চল।"

বিষণ্ণ মুখে প্রিয়লাল বললে, "চল।"

তখন পূজার্চনাদি সমাপন ক'রে মমতাময়ী একটা ঘরে ব'সে ধর্মগ্রন্থে মনোনিবেশ ক'রে ছিলেন। সেই ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে প্রবেশ ন ক'রেই প্রিয়লাল বললে, "মা, সন্ধ্যা এসেছে।"

মমতাময়ী কথাটা ঠিক শুনতে পেলেন না, কিংবা বুঝতে পারলেন না, বই থেকে চক্ষু উত্থিত ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে এসেছে?"

অন্তরাল থেকে সম্মুখে এসে সন্ধ্যা নিমেষের জন্য স্থির হয়ে দাঁড়াল, তার পর দ্রুতপদে ঘরের ভিতর প্রবেশ ক'রে নত হয়ে দুই হস্তে মমতাময়ীর পদধূলি গ্রহণ করতে গিয়ে দুই পা জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে লাগল। বললে, "মা, তোমরা নাকি আমাকে ত্যাগ করবে?"

সযত্নে মমতাময়ী সন্ধ্যাকে তুলে নিজের পাশে বসিয়ে বললেন, "স্থির হও বউমা, শান্ত হও। বিপদে উতলা হ'য়ো না।"

"কিন্তু এমন বিপদে কি ক'রে স্থির হয়ে থাকি মা? তোমার পদসেবার দাসী হয়েও কি এ বাড়িতে থাকতে পাব না?"

বধূর চিবুক স্পর্শ ক'রে চুম্বন ক'রে মমতাময়ী বললেন, "দাসী হয়ে থাকবে কেন বউমা, তুমি তো এ বাড়িতে রাজরাণী হয়ে থাকবে তাই জানি। কিন্তু অদৃষ্ট আমার এমনই মন্দ যে এমন সোনার চাঁদের মত বউ পেলাম তা ভোগে এল না। সংসারটা একেবারে ভেঙে চুরে গেল।" ব'লে কাঁদতে লাগলেন। তার পর অঞ্চলে চক্ষু মুছে বলতে লাগলেন, "আমার কি অসাধ যে তোমাকে নিয়ে ঘর করি? কিন্তু কি করব বল, কর্তাকে তো কিছুতেই রাজী করাতে পারছি নে, কেবল বংশ-মর্য্যাদা আর বংশ-মর্যাদা! বেশি চাপাচাপি ক'রে ধরলে বলেন, কাশীবাসী হব।"

মমতাময়ীর কথা শুনে সন্ধ্যার মুখ সন্ত্রাসে কালো হয়ে উঠল। আর্তস্বরে সে বললে, "তুমি তো মেয়েমানুষ হয়ে মেয়েমানুষের দুঃখ বুঝবে মা! তুমি বল, তা হ'লে আমার কি গতি হবে?"

তখন শাশুড়ী বধূতে অনেকক্ষণ ধ'রে অনেক কথাবার্তা, অনেক পরামর্শ হ'ল। মমতাময়ী বললেন, "আমি যে ভাবে বললাম ঠিক সেই ভাবে তুমি কথা কইবে বউমা। তার পর তোমার অদৃষ্ট।"

কিন্তু ক্ষণকাল পরেই জহরলাল গৃহে প্রত্যাগমন করলে মমতাময়ী যখন নানাপ্রকার ভূমিকাদির পর বধূর আগমন-সংবাদ তাঁর নিকট জ্ঞাপন করলেন, তখন হতেই অদৃষ্ট বিরূপ মূর্তিতে দেখা দিলে। ক্রুদ্ধস্বরে তর্জন ক'রে জহরলাল বললেন, "না, সে কিছুতেই হতে পারে না, তুমি এখনি ওকে ওর বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও।"

মমতাময়ীর চিত্তের অন্তরতম প্রদেশে অভাগিনী বধূর জন্য অকৃত্রিম সমবেদনা ছিল, সেজন্য ইতিপূর্বে কয়েকবারই তিনি বধূর সপক্ষে স্বামীর নিকট দরবার করেছেন, কিন্তু কখনো তর্ক অথবা বচসা করেন নি। আজ সূচনাতেই স্বামীর কাছ থেকে রূঢ় প্রতিবাদ পেয়ে তাঁর মনটা বিগড়ে গেল। তিক্তকণ্ঠে বললেন, "দেখ, অত কঠিন হ'য়ো না। সে তোমার ছেলের বউ, এত বড বিপদে প'ড়ে তোমার কাছে এসেছে আশ্রয় ভিক্ষে করতে, আর তুমি তার সঙ্গে একটা কথা না ক'য়ে আমাকে বলছ—পাঠিয়ে দাও তার বাপের বাড়ি? একটা মিষ্টি কথাও তোমার কাছ থেকে সে পেতে পারে না? আচ্ছা, বুকে হাত দিয়ে বল দেখি, তার অপরাধটা কি?"

ভ্রুকুঞ্চিত ক'রে জহরলাল বললেন, "কিন্তু আমার অপরাধটাই বা কি শুনি যে, আমি সমাজের কাছে অত বড একটা অপরাধ করব?"

মমতাময়ী বললেন, "বউমার সঙ্গে দুটো কথা কইলেই সমাজের কাছে তোমার অপরাধ করা হবে? সমাজ তা হ'লে একটা দত্যি-দানবের মতো কিছু বল?"

জহরলাল মনে করলেন, উকিলের সঙ্গে তর্ক করার চেয়ে আসামীর সঙ্গে কথাবার্তা কইলে মামলা সহজে নিষ্পত্তি হতে পারে। বললেন,

"আচ্ছা, নিয়ে এস তা হ'লে। আমি কিন্তু দশ মিনিটের বেশি কথা কইব না।"

কথা কইতে গিয়ে কিন্তু বহু বহু দশ মিনিট হয়ে গেল, তবু কথা শেষ হয় না। প্রথমে জহরলাল বিনা অনুমতিতে এবং না জানিয়ে হঠাৎ আসার অবিমৃষ্যকারিতার জন্য সন্ধ্যাকে মৃদু তিরস্কার ক'রে আর বাজে দুই-একটা উপদেশ দিয়ে ব্যাপারটা শেষ করবার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু ভর্ৎসনা-উপদেশের লাঠি-সোঁটা শেষ হওয়ার পর সন্ধ্যার দিক থেকে যখন বিচার-বিতর্কের গুলি-গোলা বর্ষণ আরম্ভ হ'ল, তখন আত্মরক্ষা করতে করতে তিনি বিব্রত হয়ে উঠলেন, বুঝলেন, বিবাহ-কালের বউমা আর নেই, তখনকার কেঁচো এখন হয়েছে কেউটে।

জহরলালের কাছে আসবার পূর্বে সন্ধ্যা নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠিত ক'রে নিয়েছিল,—মনে মনে সে স্থির করেছিল যে, জহরলালের নিকট কোনো অবস্থাতেই নিজের সংযম হারাবে না। তাই যুদ্ধের বিশৃঙ্খল গোলযোগের মধ্যে একজন পাকা গোলন্দাজ যেমন মাথা ঠাণ্ডা রেখে চতুর্দিক দেখে দেখে গোলা-গুলি ছোঁড়ে, সেও তেমনিভাবে জহরলালের প্রতি প্রশ্ন বর্ষণ করছিল। উত্তর দিতে দিতে জহরলাল অস্থির হয়ে উঠছিলেন,—বারে বারে তাঁর সাক্ষী মানতে হচ্ছিল হিন্দুজাতির সনাতন সমাজ-বৃদ্ধকে, কিন্তু জেরার বাণে বাণে বৃদ্ধের দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাচ্ছিল।

অবশেষে জহরলাল বললেন, "তোমার তর্কের কাছে আমি হার মানলাম। এবার তুমি থাম।"

সন্ধ্যা বললে, "কিন্তু আমি তো শুধু তর্কই করি নি বাবা, আমি তো আমার মহাদুঃখের কথা, নিরাশ্রয়তার কথাও আপনার কাছে নিবেদন করছিলাম। আমার তো মনে হয়, তার কাছেই আপনার হারা উচিত ছিল।"

তীব্রকণ্ঠে জহরলাল বললেন, "না, তার কাছে আমার হারবার কোনো

কারণ নেই। তোমার দুরদৃষ্টের ফল তুমি যদি ভোগ কর 'তার জন্যে আমি দায়ী নই। সুতরাং এ কথা তুমি জেনে রাখ যে, যতদিন পর্যন্ত আমি তোমাকে স্পষ্ট কথায় গ্রহণ না করেছি ততদিন পর্যন্ত এ বাড়িতে আর এমন ক'রে হঠাৎ এসে উত্ত্যক্ত করবার কোনো অধিকার তোমার রইল না। এ কথা এমন রূঢ়ভাবে বলবার আমার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু তুমি আজ অতিশয় নির্লজ্জ ভাবে আমার সঙ্গে ব্যবহার করেছ, তাই বলতে বাধ্য হলাম। আর একটা কথা তোমাকে জানিয়ে রাখি, তোমার ভরণপোষণের জন্যে একটা অর্থের ব্যবস্থা আমি করব, সে বিবেচনা আমার আছে। সে কথাটা তোমার বাবাকে জানিয়ে দিয়ো, ফল হবে।"

এর পর কিছুক্ষণ ধ'রে এমন একটা ব্যাপার চলল যুদ্ধের ভাষায় যাকে বলে—বেয়নেট চার্জ। মনের রক্ত থাকলে নিশ্চয় দেখা যেত উভয়ে পক্ষেই রক্তপাত ঘটেছে।

বেলা তিনটার সময়ে প্রকাশ যখন এসে উপস্থিত হ'ল, জহরলাল তখন বৈঠকখানায় ব'সে তারই অপেক্ষা করছিলেন। প্রকাশকে দেখে তিনি ক্রোধে আগুন হয়ে উঠলেন; কিন্তু যতটা সম্ভব তার বাহ্য অভিব্যক্তি প্রচ্ছন্ন রেখে বললেন, "প্রকাশ, তুমি আজ বিনা সংবাদে একটা হিস্টিরিক মেয়েকে বাড়িতে ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়ে ভারি অন্যায় করেছিলে। এমন সব ভীষণ সীন যে ঐ একটা অল্প বয়সের মেয়ে করতে পারে তা আমার এর আগে ধারণাই ছিল না।"

প্রকাশ বললে, "তার কারণ, এর আগে আর কখনো আপনার ও-রকম ভীষণ-অবস্থায়-পড়া মেয়ের সঙ্গে কথাবার্তা করবার কারণ ঘটে নি। ভেবে দেখুন দেখি, কি নিদারুণ অবস্থায় ও দিনযাপন করছে, মাথা ঠিক রাখা সম্ভব কি?—কিন্তু সে কথা যাক, ওর সম্বন্ধে আপনি কি সাব্যস্ত করলেন? ও আপনার এখানেই রইল তো?"

প্রবল ভাবে মাথা নেড়ে জহরলাল বললেন, "না না, নিশ্চয়ই সে আমার এখানে থাকবে না। কিন্তু সে বিষয়ে শুধু আমিই সাব্যস্ত করি নি, সে নিজেও সাব্যস্ত করেছে, আজ থেকে আমাদের ত্যাগ করবে।" ব'লে কথাটার একান্ত হাস্যকরতার প্রমাণ স্বরূপ উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন।

প্রকাশ বললে, "এ কথা সে নিশ্চয় তখন বলেছে, যখন দেখেছে আপনার কাছে তার বিশেষ কিছু আশা ভরসা নেই, আপনি তাকে ত্যাগ করবেনই।"

জহরলাল বললেন, "কিন্তু ত্যাগ না ক'রে কি করি বল? তাকে ত্যাগ না করলে সমাজকে আমার ত্যাগ করতে হয়। কিন্তু আমি কী এমন অপরাধ করেছি যে, সমাজকে ত্যাগ করতে যাব, তা বল?"

"সেই বা কী অপরাধ করেছে বলুন?"

"অদৃষ্ট তার মন্দ, এই তার অপরাধ। এ নিশ্চয় জেনো প্রকাশ, দুরদৃষ্টের মতো দ্বিতীয় অপরাধ আর নেই। তা নইলে এত সাধুলোকে যে এত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে তার কোনো অর্থই হয় না।"

উভয় পক্ষে বহুক্ষণ ধ'রে এই ভাবে তর্ক বিতর্ক চলল, কিন্তু কোনো ফল হ'ল না। অবশেষে হতাশ হয়ে প্রকাশ বললে, "সন্ধ্যাকে গ্রহণ করতে কিছুতেই যখন আপনি রাজী নন তখন তর্ক ক'রে কোনো ফল নেই, ওকে ডেকে পাঠান, বাইরে আমার গাড়ি অপেক্ষা করছে।"

জহরলাল বললেন, "তুমি মনে ক'রো না প্রকাশ, আমি এমনই একটা ভীষণ-রকম নিষ্ঠুর লোক যে, আমার মনে কোনো কষ্টই হচ্ছে না। এ ব্যাপারটা আমার জীবনেও একটা বড় রকম দুর্ঘটনা হয়ে রইল। আমি বেঁচে থাকতে সন্ধ্যাকে গ্রহণ করবে না—এই কথা দেওয়াতে আমিও প্রিয়কে কথা দিতে বাধ্য হয়েছি যে, পুনর্বার বিয়ে করবার জন্যে আমি কোনদিন তাকে অনুরোধ করব না। সংসার আমার ভেঙে গেছে। তোমার মামীমা হাসেন না, আমার সঙ্গে ভাল ক'রে কথা কন না, দিবারাত্র ধর্মগ্রন্থ নিয়েই

সময় কাটান। আমি যদি সেই রাত্রেই সন্ধ্যাকে ডাকাতদের হাত থেকে উদ্ধার ক'রে আনতে পারতাম তা হ'লে তো তাকে একেবারে বাড়িতেই নিয়ে আসতাম। কিন্তু এক মাসের ওপর সে ডাকাতদের বাড়ি বাস ক'রে এসেছে, এখন, ধর, কিছুদিন পরে যদি প্রকাশ পায়—"অদূরে এক ব্যক্তি ব'সে খবরের কাগজ পড়ছিল, হয়তো আত্মীয়ই কেউ হবে, তার দিকে তাকিয়ে প্রকাশের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কথাটা মৃদু চাপা কণ্ঠে শেষ করিলেন।

শুনে প্রকাশের মুখে আরক্ত হযে উঠল। একটু চুপ ক'রে থেকে সে বললে, "কিন্তু তাতেও কিছু আসে যায় না। ডাকাতদের সন্ধ্যাকে হরণ ক'রে নিয়ে যাওয়াতে সন্ধ্যার নিজের কোনো অপরাধ হয় না স্বীকার করতে হ'লে ও-কথাতেও হয় না স্বীকার করতে হয়।"

"তুমি স্বীকার করতে পারতে ?"

"আমরা দুর্বৃত্ত লোক, আমাদের কথা ছেড়ে দিন মামাবাবু, আমরা কিছু কিছু দুষ্কর্ম ক'রে থাকি,—হয়তো পারতাম।"

"বলা সহজ, করা শক্ত।"

মৃদু হেসে প্রকাশ বললে, "এখন এ কথা থাক্, কিন্তু পরীক্ষা যদি আসে তা হ'লে পাস হব—এ কথাও ব'লে গেলাম।"

জহরলাল বললেন, "ভাল কথাই। আমরা সামান্য লোক, বড় কথার মাহাত্ম্য বুঝতে পারি নে। কিন্তু আর দেরি ক'রে কাজ নেই, ওকে নিয়ে গিয়ে কিছু খাওয়াও।"

"ও কি এখানে এখন পর্যন্ত কিছু খায় নি ?"

উচ্ছ্বসিত স্বরে জহরলাল বললেন, "কত বড় ওর দর্প! কেউ ওকে জলস্পর্শ পর্যন্ত করাতে পারে নি।"

দুঃখিত স্বরে প্রকাশ বললে, "আহা, সেই কাল রাত্রে সামান্য-একটু খেয়েছিল, এখন পর্যন্ত উপোস ক'রে আছে!" তার পরই কিন্তু তার মুখ

উজ্জ্বল হয়ে উঠল; বললে, "তা ভালই করেছে,—এখানে খেলে হজম হ'ত না, বমি হয়ে যেত।"

রুষ্ট কণ্ঠে জহরলাল বললেন, "কেন শুনি?"

প্রকাশ বললে, "তা নয় মামাবাবু? এ রকম অবস্থায় আপনি হ'লে এক পেট খেয়ে ঢেকুর তুলতে তুলতে ফিরে যেতে পারতেন? পারতেন না, আপনারও বমি হয়ে যেত।"

কি উত্তর দেবেন ভেবে না পেয়ে জহরলাল আরক্ত মুখে ব'সে রইলেন। কিছুতেই বলতে পারলেন না, তাঁর বমি হ'ত না, হজম করতেন।

গাড়িতে উঠে সন্ধ্যা বললে, "মুখুয্যে মশায়, আমিনার দেওর নাসীরউদ্দিন এখানে বোধ হয় ইসলামিয়া কলেজে পড়ে। তার সন্ধান পাওয়া শক্ত হবে না, তার সঙ্গে আমাকে আমিনার কাছে পাঠিয়ে দিন।"

প্রকাশ বললে, "কিন্তু আমি কি অপরাধ করলাম সন্ধ্যা? আমার সঙ্গে যাবে না কেন?"

সন্ধ্যার দুই চোখের মধ্যে আলো জ্বলে উঠল, বললে, "আপনিও তো হিন্দু-সমাজের লোক, আপনাকেই বা বিশ্বাস কি? আমি কিছুতেই জামসেদপুরে ফিরে যাব না।"

স্নিগ্ধকণ্ঠে প্রকাশ বললে, "হোটেলে গিয়ে আগে কিছু খাবে চল সন্ধ্যা তার পর এসব কথা হবে।"

শেষ পর্যন্ত কিন্তু প্রকাশের কাছে সন্ধ্যার হার মানতেই হ'ল, সেই দিন রাত্রের ট্রেনেই উভয়ে জামসেদপুর ফিরে চলল।

প্রত্যূষে যখন প্রকাশের মোটর গেট পার হয়ে গৃহাঙ্গণে প্রবেশ করল, তখন সবিতা বারান্দায় স্বামীর প্রতীক্ষায় ব'সে ছিল। দূর থেকে প্রকাশের পার্শ্বে সন্ধ্যাকে উপবিষ্ট দেখে মনটা একেবারে তিক্ত হয়ে উঠল। একবার ভাবলে, তাড়াতাড়ি উঠে বাড়ির ভিতর চ'লে যায়,—কিন্তু ভাবতে ভাবতেই গাড়িটা এত কাছে এসে পড়ল যে তার আর উপায় রইল না।

অতি কষ্টে কোনো প্রকারে সন্ধ্যাকে কলিকাতায় চালান দিয়ে মনে মনে সে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছিল। তার উপর কাল সন্ধ্যার পর স্টেশনে গাড় পাঠাবার জন্যে যখন প্রকাশের টেলিগ্রাম এল, তখন সবিতা মনে মনে এই কথাই স্থির ক'রে নিয়েছিল যে, সন্ধ্যাকে তার শ্বশুরেরা সহজে গ্রহণ করেছে ব'লেই এত শীঘ্র প্রকাশের ফিরে আশা সম্ভবপর হচ্ছে। আজ সন্ধ্যাকে প্রকাশের সঙ্গে ফিরে আসতে দেখে মনের সমস্ত স্থৈর্য অন্তর্হিত হ'ল। মনে হ'ল, এ আপদ সংসারের শান্তি একেবারে নষ্ট না ক'রে দিয়ে বিদায় হবে না।

গাড়ি থেকে অবতরণ ক'রে বারান্দার উপর উঠে প্রকাশ সবিতার মুখমণ্ডলে যে বস্তু সুপরিস্ফুট দেখলে, তার সহিত ধূম মেঘ মসী প্রভৃতি দ্রব্যের উপমা দেওয়া চলে। সন্ধ্যাকে নিয়ে প্রত্যাবর্তনের ফলে এই ধরনের ঘটনাদির সম্ভাবনা আছে মনে মনে সে আশঙ্কা বরাবরই ছিল। আসন্ন অপ্রীতিকর অবস্থার দুশ্চিন্তায় মনটা বিষণ্ণ হয়ে উঠল, কিন্তু তথাপি মুখে একটু ক্ষীণ হাস্য স্ফুরিত ক'রে বললে, "কি সবু? খবর সব ভাল তো?"

সবিতা বললে, "সবের মধ্যে তো আমি। বেঁচে যখন আছি তখন ভালই।"

অদূরে একটা চেয়ারের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ ক'রে প্রকাশ বললে, "কিন্তু

ঐ চেয়ারের পিঠে ঝোলানো ও শৌখিন জামাটি নিশ্চয়ই আমার নয়,—সুতরাং আরও কিছু খবর থাকতে পারে ব'লে মনে হচ্ছে।"

সবিতা বললে, "ও! ওটা প্রমথ ঠাকুরপোর। প্রমথ ঠাকুরপো কাল কলকাতা থেকে এসেছেন।"

"হঠাৎ?"

"হঠাৎ ভিন্ন কবে তিনি নোটিস দিয়ে আসেন?"

স্মিতমুখে প্রকাশ বললে, "এ কথা অকাট্য। কিন্তু কোট ঝুলছে, দেহ কোথায়?"

সন্ধ্যা সংক্ষেপে বললে, "বাথ্-রুমে।"

"বোঝা গেল।" ব'লে প্রকাশ ভিতরের দিকে প্রস্থান করলে।

প্রমথ পিতৃমাতৃহীন ধনী যুবক। নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত কোনও গ্রামে, কিন্তু গ্রামের সহিত সম্পর্ক একরকম বিচ্ছিন্নই। ক্বচিৎ কদাচিৎ সেখানে পদার্পণ করে, বাস করে কলিকাতার গৃহে। বহুদূরসম্পর্কে সে প্রকাশের পিসতুতো ভাই। সাধারণত এরূপ অবস্থায় আত্মীয়তার স্বীকার-স্বীকৃতি আদান-প্রদান থাকে না, এ ক্ষেত্রেও ছিল না, কিন্তু প্রকাশ এবং সবিতা একবার লক্ষ্ণৌ বেড়াতে গিয়ে ঘটনাক্রমে দুই-এক দিনের জন্য প্রমথর অতিথি হতে বাধ্য হয়। প্রমথ তখন দীর্ঘকাল যাবৎ তার লক্ষ্ণৌয়ের বাড়িতে বাস করছিল। সেই সময়ে কথায় কথায় তাদের মধ্যে আত্মীয়তার ক্ষীণ ধারাটুকু অকস্মাৎ আবিষ্কৃত হয়ে পড়ে। তার পর থেকে প্রমথ পশ্চিমযাত্রার পথে মাঝে মাঝে দু-চার দিনের জন্য জামসেদপুরে প্রকাশের গৃহে অবস্থান ক'রে যায়। প্রমথর প্রকৃতি উচ্ছৃঙ্খল, চরিত্র তার নিষ্কলুষ নয়, এ সব কতকটা জানা এবং বোঝা থাকলেও তার সহৃদয়তা এবং আন্তরিকতার গুণে প্রকাশ এবং সবিতা উভয়েই তাকে ভালবাসত এবং সে এলে খুশি হ'ত।

সন্ধ্যা প্রকাশের পশ্চাতে এসে দাঁড়িয়ে ছিল, এগিয়ে এসে নত

হয়ে সবিতাকে প্রণাম ক'রে ভগ্নকণ্ঠে বললে, "আবার ফিরে এলাম সবিদিদি।"

গম্ভীরমুখে সবিতা বললে, "ফিরে যে আসবে তা কতকটা জানাই ছিল।"

কথাটা নিতান্ত সহজ নয়। এই ফিরে আসার অপরাধের জন্য সবিতা কোন্ পক্ষকে দায়ী করতে চায়—সন্ধ্যাকে, না, সন্ধ্যার পিতামাতা শ্বশুর-শাশুড়ী স্বামীকে—তা ঠিক বোঝা যায় না, কিন্তু তার মুখের ভাব এবং কথার সুর থেকে মনে হয় সন্ধ্যার প্রতি তার সন্দেহ কম নয়। বিশেষত নিত্যকার 'তুই' সম্বোধনের পরিবর্তে আকস্মিক 'তুমি' শব্দের প্রয়োগ সাধারণত বিদ্রূপ বিরক্তি প্রভৃতি মনোভাবেরই পরিচায়ক। আত্মাবমাননার গ্লানিতে সন্ধ্যার মুখ কঠিন হ'য়ে উঠল, বললে, "তোমার কতকটা জানা ছিল, আমার কিন্তু পুরোপুরিই জানা ছিল।"

রুক্ষস্বরে সবিতা বললে, "তাই যদি ছিল, তা হ'লে যাবার দরকারই বা কি ছিল শুনি?"

কার নির্বন্ধে কলিকাতা গিয়েছিল সে কথা না তুলে সন্ধ্যা বললে, "অদৃষ্টের ভোগ ছিল, ভুগে এলাম।"

দৃঢ়স্বরে সবিতা বললে, "এ কথা আমি মানি নে,—অদৃষ্ট গাছে ফলে না, আমরা নিজের হাতেই গ'ড়ে তুলি। কিন্তু সে কথা যাক, তোমার মুখুয্যে মশাই সেখানে তোমার বিষয়ে চেষ্টা চরিত্র কিছু করেছিলেন, না, শুধু তোমাকে একদিনের জন্যে বেড়িয়ে নিয়েই এলেন?"

সন্ধ্যা বললে, "এ কথা তুমি মুখুয্যে মশাইকে জিজ্ঞাসা ক'রো সবিদি, তিনি ঠিক বলতে পারবেন, তবে আমার বিশ্বাস সাধ্যমতো চেষ্টার ত্রুটি তিনি করেন নি।"

"কিন্তু তাঁর সাধ্য কি একদিনেই শেষ হ'ল? আর দিন দুই সেখানে থেকে চেষ্টা করলে বিশেষ কিছু ক্ষতি হ'ত কি?"

সন্ধ্যা বুঝতে পারলে যে, প্রশ্নের আকারে হ'লেও প্রকৃতপক্ষে এ-সকল কথা প্রশ্ন নয়, পরন্তু দোষারোপেরই রূপান্তর, এবং নামতঃ প্রকাশের প্রতি প্রযুক্ত হ'লেও সে নিজেও লক্ষ্যের বহির্ভূত নয়,—সুতরাং এ সকল কথার যথাযথ উত্তর দিতে হ'লে এমন সব কথা বলবার প্রয়োজন হতে পারে যাতে কথোপকথনটা হয়তো ক্রমশ বচসার রূপ ধারণ করবে। আপাতত কি উপায়ে আলোচনাটা বন্ধ করবে মনে মনে সেই কথা সে চিন্তা করছিল, এমন সময়ে অদূরে প্রমথ আবির্ভূত হ'ল। সন্ধ্যাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে সবিতার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে সে জিজ্ঞাসা করলে, "আসতে পারি ?"

সবিতা বললে, "নিশ্চয় পার, এস প্রমথ ঠাকুরপো।"

নিকটে এসে চেয়ার থেকে জামাটা নিয়ে গায়ে দিতে দিতে প্রমথ বললে, "প্রকাশদাদা এসেছেন তা গাড়ির আওয়াজে আর তার গলার শব্দে টের পেয়েছি, কিন্তু এত দেরি হ'ল কেন ? গাড়ি লেট ছিল না কি ?"

সবিতা বললে, "বোধ হয় কিছু ছিল।"

সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে মৃদুস্বরে প্রমথ জিজ্ঞাসা করলে, "ইনি ?"

সবিতা বললে, "সন্ধ্যা।"

সন্ধ্যার কথা সবিতার মুখে প্রমথ প্রায় সবটাই শুনেছিল। এত শীঘ্র প্রকাশের সহিত তার প্রত্যাবর্তনে মনে কৌতূহলের উদয় হ'ল, কিন্তু সন্ধ্যা-প্রসঙ্গের অনালোচ্যতা স্মরণ ক'রে তদ্বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করা সে অসমীচীন বিবেচনা করলে। সন্ধ্যাকে সম্বোধন ক'রে বললে, "এত সংক্ষেপে বউদিদি আপনার পরিচয় দিলেন তা থেকে বুঝতে পারছেন, আপনার পরিচয় আমার অজানা নয়; যদিও আপনাকে দেখছি আজ প্রথম, কিন্তু নাম করলেই বুঝতে পারি। আপনার দিদি আমার বউদিদি, সুতরাং এ বাড়িতে আমার কি সম্পর্ক তাও বুঝতে পারছেন।"

সবিতা বললে, "কিন্তু সে সম্পর্কের হিসেবে তোমার ওকে 'আপনি' ব'লে সম্বোধন না করলেও চলে।"

সবিতার কথা শুনে প্রমথর মুখে হাসি দেখা দিলে; বললে, "শুধু সম্পর্কের হিসেবেই নয় বউদিদি, বয়সের হিসেবেও 'আপনি' ব'লে সম্বোধন না করলে চলে; কিন্তু আজকালকার যুগরীতির হিসেবে বিনা অনুমতিতে হঠাৎ 'তুমি' ব'লে সম্বোধন করলে বর্বরতার পরিচয় দেওয়া হবে।"

প্রমথর কথা শুনে একটু সঙ্কোচের সহিত তার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে ঈষৎ আরক্তমুখে সন্ধ্যা বললে, "অনুমতির দরকার নেই, আমাকে 'তুমি' ব'লেই ডাকবেন।"

স্মিতমুখে প্রমথ বললে, "আচ্ছা, তাই তা হ'লে ডাকব।

গৃহমধ্যে সন্ধ্যা প্রস্থান করলে প্রমথ বললে, "ভারি সুন্দর দেখতে তো। তার বোনের মত সুন্দরী মেয়ে বাঙালীর ঘরে খুব বেশি নেই বউদিদি।"

প্রকৃতপক্ষে সে বিষয়ে সবিতারও বিশেষ কিছু মতভেদ ছিল না, কিন্তু যে স্ত্রী ভীম্নাথার অস্ত্রের মতো তার বিরুদ্ধে উদ্যত হয়েছে ব'লে মনে মনে সে আশঙ্কা করে, সুস্পষ্ট বচনে তার প্রশংসায় যোগ দিতে প্রবৃত্তি হ'ল না। অস্পষ্ট উদাস কণ্ঠে বললে, "তা হবে।"

প্রমথ বললে, 'তা হবে' না বউদিদি, সত্যি সত্যিই তাই। কিন্তু সে কথা থাক, এরা তো কলকাতা গেছলেন মাত্র পরশুদিন রাত্রে, এরই মধ্যে ফিরে এলেন কেন? সেখানে কি তাঁরা সন্ধ্যাকে ঘরে নিতে রাজী হলেন না?"

সবিতার মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠল, ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বললে, "এখনো শুনি নি তো কিছু, কি ক'রে বলব বল—তাঁরাই রাজী হলেন না, না, এঁরাই রাজী হলেন না।"

বিস্ময়মিশ্রিত স্বরে প্রমথ বললে, "এঁরাই রাজী হলেন না?—এঁদের রাজী না হবার কারণ কি হতে পারে বউদিদি?"

অন্তরের যত্ননিরুদ্ধ ক্রোধ এবং দুঃখ যে-কোন একটা পথ দিয়ে নির্গত হবার চেষ্টা করছে বুঝতে পেরে সবিতা কথাটা এড়িয়ে যাবার অভিপ্রায়ে বললে, "তা ধর, তাঁরা যদি ঠিক এঁদের পছন্দমতো কথাবার্তা না ক'য়ে থাকেন তা হ'লে এঁরাই বা হঠাৎ রাজী হন কি ক'রে?"

সবিতার পূর্বকথা এবং এ কথা বলবার ভঙ্গীতে সুরের আকস্মিক পরিবর্তন লক্ষ্য ক'রে প্রমথ মনে মনে মাথা নাড়লে। কথার টোপ ফেলে কথা তোলবার উদ্দেশ্যে শান্ত স্বরে বললে, "সে কথা ঠিকই বউদিদি, এখন তো তোমাদের আর সে 'পতি পরম গুরু'র দিন নেই, এখন মেয়েদের মধ্যে 'মানুষ' জেগে উঠছে, সুতরাং এখন আর এমন শর্তে স্বামীর ঘরে বাস করা চলে না যাতে আত্মসম্মানে আঘাত লেগে মাথা হেঁট হয়।"

বিরক্তিকুঞ্চিত মুখে সবিতা বললে, "স্বামীর ঘরে বাস করতেই আত্মসম্মানে আঘাত লাগে, কিন্তু—" কথাটা শেষ না ক'রেই সে চেপে গেল। অন্তরের গ্লানিটা পুনরায় প্রকাশ পাবার চেষ্টায় ছিল।

প্রমথ বললে, "কিন্তু কি বউদিদি?"

মৃদু হেসে সবিতা বললে, "কিন্তু এ-সব কথা এখন থাক্, মুখটুক ধুয়ে চা খাবার জন্যে তয়ের হও।"

এ 'কিন্তু' দিয়ে পূর্বের 'কিন্তু'কে ঠিক চাপা দেওয়া গেল না। সামান্য একটি ছিদ্রের উপর চক্ষু স্থাপিত ক'রে যেমন পৃথিবীর অর্ধেকখানা দেখে নেওয়া যায়, ঠিক তেমনি ভাবে একটি মাত্র 'কিন্তু' শব্দের দ্বারা চতুর প্রমথ সবিতার অন্তরের অনেকখানি অংশের সন্ধান লাভ করলে। মুখে বললে, "প্রকাশদাদার সঙ্গে এখনো দেখা হয় নি; আগে চল, তাঁর সঙ্গে দেখা করি।"

প্রকাশের সঙ্গে নিভৃতে সাক্ষাত হতে সবিতা বললে, "তুমি আবার ওকে ঘাড়ে ক'রে এখানে নিয়ে এলে কেন?"

প্রকাশ বললে, "খুব সরল কারণে। আর কেউ নিলে না, তাই নিয়ে আসতে বাধ্য হলাম।"

সবিতার মুখে বিদ্রূপের হাসি স্ফুরিত হ'ল; বললে, "খুব সরল তো? আর কেউ না নিলে তুমি নিয়ে আসতে বাধ্য হও?"

প্রকাশ বললে, "হই, তা তো দেখতে পাচ্ছ। কিন্তু তুমি কি মনে কর যে, এর মধ্যে একটা জটিল কারণও কিছু আছে?"

প্রকাশের অধরপ্রান্তে কৌতুকের মৃদু হাসির রেখা দেখে সবিতার পিত্ত জ্ব'লে উঠল, তীব্রকণ্ঠে বললে, "দেখ, শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চেষ্টা ক'রো না।"

ব্যগ্রকণ্ঠে প্রকাশ বললে, "বিশ্বাস কর সবু, এ পর্যন্ত ও চেষ্টা করি নি। কারণ, এ ক্ষেত্রে শাকই বা কি, আর মাছই বা কে, তা যখন জানা নেই, তখন অজানা জিনিস দিয়ে অজানা জিনিস ঢাকবার চেষ্টা ভারি কঠিন কম।'

প্রকাশের রসিকতাকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য ক'রে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সবিতা বললে, "তুমি যে ওকে আবার এখানে ফিরিয়ে নিয়ে এলে তাতে কার উপকার হ'ল শুনি?"

মনে মনে একটু চিন্তা ক'রে প্রকাশ বললে, "তোমার যে হয় নি তা তো বুঝতেই পাচ্ছি, কিন্তু সন্ধ্যা ছাড়া আর কোনো লোকের হয়েছে ব'লে কি তোমার সন্দেহ হয়?"

আরক্ত মুখে সবিতা বললে, "ঠাট্টা এখন তুলে রাখ। ফিরিয়ে নিয়ে এসে মনে ক'রো না সন্ধ্যার তুমি বিশেষ কিছু উপকার করেছ।"

"কিন্তু ফিরিয়ে না এনে আর কি করতে পারতাম তা বল?'

"কেন, ফেলে এলে না কেন?"

সবিস্ময়ে প্রকাশ বললে, "ফেলে এলাম না কেন? কোথায় ফেলে আসতাম তাকে?"

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সবিতা বললে, "তার বাপের বাড়িতে,—শ্বশুর বাড়িতে। তা না পারতে,—কলকাতায় তো ফুটপাথের অভাব ছিল না, ফুটপাথে।"

এবার কিন্তু প্রকাশের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল, বললে, "ওটা মনে পড়ে নি, ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু একটা কথা বলি তোমাকে, এখানেও তো ফুটপাথের অভাব নেই, দাও না ওকে ফুটপাথে বার ক'রে। আমার কুটুম্ব, কিন্তু তোমার তো আত্মীয়—তুমি ঢের সহজে ও-কাজটা পারবে।'

অকস্মাৎ কথাটার মোড় ফিরে গেল। ছিল রঙিন, হয়ে উঠল সঙীন। ঈষার মত্ততায় বচসা করা চলে, কিন্তু যুক্তি-হেতু দিয়ে তর্ক করা চলে না, সুতরাং এর পর থেকে তর্কটা যে-ভাবে অগ্রসর হ'ল তাতে শেষ পযন্ত সবিতাকেই পরাস্ত হতে হ'ল। সে যখন বুঝতে পারলে যে, বাক্য তার প্রকৃত অস্ত্র নয়, তখন বাক্য পরিত্যাগ ক'রে সহসা এমন একটা নিশ্ছিদ্র নীরবতা অবলম্বন করলে যে তার চাপে সংসারের দম আটকাবার উপক্রম হ'ল। যে দু চারটে কথা না কইলে আতিথ্য-ধর্ম নিতান্তই ক্ষুণ্ণ হয়, শুধু প্রমথর সহিত কথোপকথন সেই শীর্ণ ধারায় চলল, বাকি লোকের সহিত এক রকম পরিপূর্ণ-ভাবেই বন্ধ হয়ে গেল। মাঝে মাঝে অতি সংক্ষিপ্ত যে এক-আধটা কথাবার্তা হয় তাকে কোনো মতেই সদালাপ বলা চলে না। দেখতে দেখতে দু তিন দিনের মধ্যে সংসারের আবহাওয়া বিষিয়ে উঠল।

ঐকতানের মধ্যে একটা যন্ত্র যখন বেসুরা বাজতে থাকে, তখন বাকি যন্ত্র-গুলার মধ্যে যথার্থ মিলও ব্যর্থ হয়ে যায়। প্রকাশ প্রমথ আর সন্ধ্যার হ'ল সেই দশা। একটা অস্বাস্থ্যকর নীরবতার মধ্যে কিছুতেই তারা সহজভাবে আলাপ জমাতে পারলে না। ফলে, অফিসের কাজের অত্যধিক চাপাচাপির অছিলায় প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় নানাবিধ ফাইলের অন্তরালে প্রকাশ আত্মগোপন করলে, প্রমথ একটা অত্যন্ত মোটা ইংরাজী নভেল সংগ্রহ ক'রে তার মধ্যে ডুব মারলে, আর সন্ধ্যা নিরবশেষ দুশ্চিন্তা এবং দুর্ভাবনার পথ দিয়ে

ধীরে ধীরে সেই অবস্থায় উপনীত হ'ল, যে অবস্থার অব্যবহিত পরবর্তী অবস্থায় মানুষ জীবনের কোনো আকর্ষণ অথবা সমাজের কোনো প্রয়োজন অনুভব করে না, যে অবস্থায় সে সুযোগ পেলে প্রাণত্যাগ করতে পারে, প্ররোচনা পেলে কুলত্যাগ করতে পারে।

প্রত্যুষের ক্ষীণ আভা সবেমাত্র পূর্বদিকে ফুটে উঠেছে, গৃহমধ্যে সকলেই তখনো নিদ্রাগত, সন্ধ্যা শয্যাত্যাগ ক'রে বারান্দায় এসে একটা চেয়ারে উপবেশন করলে। সমস্ত রাত্রিই নিদ্রিত অবস্থায় দুঃস্বপ্নে, এবং জাগ্রত অবস্থায় দুশ্চিন্তায় কেটেছে,—মনটা হয়ে রয়েছে একটা অতি বেগবান সূক্ষ্ম যন্ত্রের মতো স্পন্দিত। সংসারের এই গ্লানিকর অবস্থার জন্য মুখ্যত যে সে-ই দায়ী এবং গৌণত প্রকাশ,—এ কথা তার বুঝতে বাকি নেই; এবং যৌবন-প্রবৃত্তির সহজ অনুভূতির বশে এমন সংশয়ও তার মনে দেখা দিতে আরম্ভ করেছে যে, সে নারী এবং প্রকাশ পুরুষ—এই যোগাযোগই অবস্থাটাকে বিশেষভাবে জটিল ক'রে তুলেছে। কথাটা ভেবে এক এক সময়ে তার হাসি পায়, মনে মনে বলে, হায় রে মানুষের ক্ষুদ্র মন। এত অকারণ পাপও তোমার মধ্যে বাস করতে পারে।

কলিকাতা যাওয়ার পূর্বে সন্ধ্যা প্রকাশকে মাঝে মাঝে অনুরোধ করত, গার্লস স্কুলের একটা মাস্টারি অথবা কোনও ধনী ব্যক্তির কন্যাকে গান শেখানোর কাজ জুটিয়ে দেবার জন্যে। এবার কলিকাতা থেকে ফিরে এসে পর্যন্ত একবারও সে রকম অনুরোধ সে করে নি। সে স্থির করেছে, এবার তার নিজের ব্যবস্থা নিজেই করবে, তার সঙ্গে অপর কোনো ব্যক্তিকেই জড়িত রাখবে না। কিন্তু কি যে সে ব্যবস্থা, গত রাত্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চিন্তা ক'রেও তা স্থির করতে পারে নি। মাঝে মাঝে আমিনার কথা মনে হয়েছে,—বাপ-মা শ্বশুর-শাশুড়ী স্বামী তাকে যে জিনিস দেয় নি, সেই নিরতিপ্রয়োজনীয় আশ্রয় আমিনা তাকে দিয়েছিল এবং প্রয়োজন হ'লেই দেবে ব'লে প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছে।

আশ্রয় যে কত বড় বস্তু, তা যার নেই সেই জানে। অনাহারে দেহত্যাগ করা সহজ, কিন্তু সেই দেহটার অবস্থিতির জন্য এই বিশাল পৃথিবীর মধ্যে এক হাত ভূমি অধিকারে না থাকার মতো বিড়ম্বনা আর নেই। আমিনা তাকে শুধু সেই আশ্রয়ই দেয় নি, মর্যাদাও দিয়েছিল; এবং সেই মর্যাদা যাতে চিরস্থায়ী হয় তদুপযুক্ত ব্যবস্থা করবার প্রস্তাবও করেছিল। হায় রে! যে গৃহবধূকে এক সমাজ বিনা-অপরাধে গৃহ হতে বহিষ্কৃত ক'রে দেয়, আর-এক সমাজ সেই হতভাগিনীকেই গৃহের বধূ করবার জন্য প্রস্তাব করে! তবে?—একটা নির্মম আক্রোশে, সন্ধ্যার চিত্ত আহত বিষধর সর্পের মতো পাক খেতে লাগল।

চটিজুতার শব্দ পেয়ে সন্ধ্যা ফিরে দেখলে, প্রমথ আসছে। এ কয়েক দিনের মধ্যে প্রমথর সঙ্গে তার দু-চারবার মামুলি কথা হয়েছে মাত্র, আলাপ-পরিচয় বিশেষ কিছু হয় নি।

একেবারে সোজা সন্ধ্যার নিকট উপস্থিত হয়ে প্রমথ একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল; তার পর শান্ত কণ্ঠে বললে, "তুমি যদি কিছু মনে না কর সন্ধ্যা, তা হ'লে আমি তোমার কাছে সহজভাবে একটা প্রস্তাব করি।"

প্রমথ সাহসা এত নিকটে এসে বসাতেই সন্ধ্যা একটু বিস্মিত হয়েছিল, তার পর কোনপ্রকার ভূমিকা ব্যতিরেকে অকস্মাৎ এমন একটা অদ্ভুত ধরনের কথা বলায় সে আরও বিস্মিত হ'ল। প্রমথর প্রতি সকৌতূহল দৃষ্টি স্থাপিত ক'রে বললে, "কি প্রস্তাব বলুন?"

প্রমথ বললে, "বলছি। কিন্তু কথাটা যখন একান্ত তোমার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে, তখন বলতে গিয়ে কোনদিক দিয়ে যদি রূঢ়তা প্রকাশ পায় তো আমাকে ক্ষমা ক'রো,—কারণ বাস্তবিকই একটা স্পোর্টিং স্পিরিট নিয়ে এ কথা বলতে আমি উদ্যত হয়েছি।"

প্রমথর প্রতি তেমনি উৎসুক দৃষ্টি স্থাপন ক'রে সন্ধ্যা বললে, "বলুন।"

মনে মনে একটুখানি চিন্তা ক'রে নিয়ে প্রমথ বললে, "ঘুম ভেঙে কেউ উঠে এলে অসুবিধে হবে, তাই কথাটা সংক্ষিপ্ত করবার জন্যে প্রথমেই ব'লে রাখা ভাল যে, যে কঠিন সমস্যা আর দুঃখের ভিতর দিয়ে তোমার জীবন এখন চলেছে, তার প্রায় সব কথাই আমি জানি,—সে বিষয়ে যেটুকু শোনবার তা শুনেছি,—তার পর যতটুকু বোঝবার তাও বুঝেছি। আমি যা জানি তাতে এই বুঝেছি যে, একমাত্র প্রকাশদাদা ছাড়া তোমাকে আশ্রয় দেবার উপস্থিত আর কোনো লোক নেই, কিন্তু তোমাকে আশ্রয় দিতে গিয়ে তাঁর অবস্থা যে কী শোচনীয় হয়েছে তা হয়তো তুমি নিজেও কিছু কিছু বুঝতে পার। তোমার যতটা আদরযত্ন করবার জন্যে তাঁর মন ব্যস্ত হয়ে রয়েছে তার কিছুই তিনি করতে পারছেন না, অথচ অপর দিকে বউদিদি তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করেছেন। বউদিদির এই মনোভাবের কারণ কি, তুমি ঠিক তা অনুমান করতে পেরেছ কি না জানি নে, সুতরাং সে বিষয়ে একটু খুলে বলি। মেয়েমানুষ সব জিনিসই ভাগ ক'রে ভোগ করতে পারে, শুধু পারে না স্বামী। অবস্থাবিশেষে হয়তো স্বামীর সমস্তটাই ছাড়তে পারে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই খানিকটা ছাড়তে পারে না। তোমার প্রতি প্রকাশদাদার স্নেহ দেখে সম্ভবত বউদিদি মনে মনে ভয় পেয়েছেন, ভাবছেন, ও শুধু স্নেহই নয়, তার চেয়েও এমন কিছু ধারালো আর জোরালো বস্তু যার দ্বারা তাঁর ষোল আনা পত্নীস্বত্বের খানিকটা অংশ কেটে বেরিয়ে তোমার এলাকায় গিয়ে মিলতে পারে। সত্যি কথা বলতে গেলে, এ বিষয়ে বউদিদিকে বিশেষ দোষ দেওয়াও যায় না। তোমার মতো এমন একটি অপরূপ পদার্থকে পাশে রেখে স্বামীর বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বাস করতে পারে এমন মনের জোর অল্প মেয়েমানুষেরই আছে। বউদিদির তুমি মাসতুতো বোন, সে জন্যে মনে ক'রো না এ বিষয়ে ব্যতিক্রম হবার কথা। একটা কথা আছে জান তো?—আন-সতীনে নাড়ে চাড়ে, বোন-সতীনে পুড়িয়ে মারে। ভালবাসার ক্ষেত্রে বোন ব'লে কোনো দয়া-দাক্ষিণ্য

নেই। সেই জন্যে ভয় পেয়ে বউদিদি এমন একটা রুক্ষ মূর্তি ধারণ করেছেন যে, সংসার থেকে আমোদ-আহ্লাদ হাসিখুশি, এমন কি কথাবার্তা পর্যন্ত উবে গেছে। প্রকাশদাদার মতো সদানন্দপ্রকৃতি লোকের পক্ষে এ অবস্থা হয়েছে জল থেকে ডাঙায় তোলা মাছের মতো। কিন্তু ওঁরা মতো অতবড় মহাপ্রাণ ব্যক্তি আমি তো আর একটিও দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না, ভদ্রলোক বলতে প্রকৃত অর্থে যা বোঝায় সত্যিই তিনি তাই। তাই এ কথা আমি নিশ্চয় ক'রে তোমাকে বলতে পারি যে, বউদিদি যদি কোনো রাগ বা অভিমান ক'রে এ বাড়ি ছেড়ে চ'লেও যান, তা হ'লেও প্রকাশদাদা মুখ ফুটে কোনো কথা তোমাকে বলতে পারবেন না; একবার আশ্রয় দিয়ে কখনই তোমাকে পরিত্যাগ করবেন না। কিন্তু যার মনে কিছুমাত্র আত্মসম্মানের বোধ আছে তার পক্ষে এ রকম আশ্রয়ে জীবন যাপন যে কত বড় শাস্তি তা বলবার আবশ্যক করে না;—তুমি যে সেই শাস্তি প্রতিনিয়ত প্রতিমুহূর্তে ভোগ করছ এ আমি হলফ ক'রে বলতে পারি। কেমন?—যতটা বললাম মোটামুটি ঠিক কি-না?"

অবনত মস্তকে সন্ধ্যা বললে, "হ্যাঁ, ঠিক।"

"আচ্ছা, এবার তা হ'লে আমার দিকের কথা একটু বলি। আমার বাপ নেই, মা নেই, ভাই নেই, বোন নেই, এ পর্যন্ত বিয়ে করি নি—কাজেই স্ত্রী পুত্র কন্যা নেই। থাকবার মধ্যে আমার কি আছে জান?—প্রভূত অর্থ আছে। গর্ব করছি নে, সত্যিই যে অর্থ আমার আছে তাকে লোকে প্রভূত অর্থ-ই বলে। এই অর্থ হচ্ছে একটা মস্ত বড় শক্তি। তা ছাড়া, সমাজের কাছে কোনো দিক দিয়েই আমার কোনো বাঁধা নেই ব'লে সমাজকে আমি অনায়াসে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাতে পারি। যাবে তুমি আমার সঙ্গে? থাকবে তুমি আমার কাছে? তোমারও আশ্রয়ের একান্ত প্রয়োজন, আমারও সে আশ্রয় দেবার মতো অর্থ আর সামর্থ্য আছে। চিরদিনের জন্যেই আমি তোমাকে আশ্রয় দিতে প্রস্তুত

আছি, কোনোদিনই তা এক মুহূর্তের জন্যেও অনিশ্চিত হবে না।" একটু চুপ ক'রে থেকে পুনরায় বলতে লাগল, "মনে ক'রো না, আমি তোমার কাছে এ প্রস্তাব করছি তোমার প্রতি কোনো মোহ অথবা আকর্ষণের বশীভূত হয়ে। অন্তত এ পর্যন্ত তো ও-সব জিনিসের কোনো লক্ষণ টের পাই নি। এ আমি করছি নিতান্ত তোমার যে জিনিসটার প্রয়োজন হয়েছে সেই জিনিসটার যোগান দেবার লোভে,—সমাজের কসাইখানা থেকে উদ্ধার ক'রে একজন অসামাজিকের ঘরে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবার আকাঙ্ক্ষায়। এ আমার ভারি ভাল লাগছে।—মনে হচ্ছে তা যদি করতে পারি, তা হ'লে আমার টাকার সবটাই অপথে-কুপথে নষ্ট না হয়ে পুণ্য কাজেও খানিকটা লাগে। কিছুদিন আগে অমলা নামে একজন মেয়েকে কতকটা এই রকম অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে ভারি ধাক্কা খেয়েছিলাম। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আর কখনো কোনো মেয়ের উপকার করতে যাব না, কিন্তু তোমার দুর্গতি দেখে সে প্রতিজ্ঞা রাখতে পারলাম না। আমার প্রস্তাবে তুমি রাজী আছ সন্ধ্যা? যাবে আমার সঙ্গে?"

প্রমথর সুদীর্ঘ বাক্যের সমস্তটাই সন্ধ্যার কর্ণে প্রবেশ করেছিল কি-না বলা কঠিন, শেষকালের পর পর দুইটা প্রশ্নে সহসা যেন তন্দ্রামুক্ত হয়ে সে প্রমথর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে; তার পর শান্তকণ্ঠে বললে, 'যাব।"

নিরতিবিস্ময়ে প্রমথ বললে, "যাবে?—বেশ ক'রে ভেবেচিন্তে বলছ তো?"

সন্ধ্যা এ কথার কোনো উত্তর দিলে না, চুপ ক'রে রইল।

প্রমথ বললে, "তাড়াতাড়ি নেই, দুই-এক দিন ভাল ক'রে ভেবে তার পর না-হয় আমাকে ব'লো।"

চকিত হয়ে ব্যগ্রকণ্ঠে সন্ধ্যা বললে, "না না, ভাববার দরকার হবে না, আজই চলুন।"

উৎফুল্লমুখে প্রমথ বললে, "তা বেশ, আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু

দেখ সন্ধ্যা, জানিয়ে যাওয়া কিছুতেই চলবে না,—তাতে শেষ পর্যন্ত যাওয়াও হবে না, অথচ মিছে একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হবে। তা ছাড়া, প্রকাশদাদা ভারি একটা অসুবিধার অবস্থায় পড়বেন। রাত্রের গাড়িতে যাওয়াও সুবিধা হবে না, চাকরদের নজরে প'ড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, তা ছাড়া গেটে তালা দেওয়া থাকে, সে এক বিপদ। যেতে হবে দুপুরের গাড়িতে, সে সময়ে প্রকাশদাদা থাকবেন অফিসে আর বউদিদি থাকবেন ঘুমিয়ে। বাগানের একেবারে শেষের দিকে কোণে মালীদের যে ছোট গেট আছে, তুমি বেড়াতে বেড়াতে সেখানে ঠিক বেলা দুটোর সময়ে গিয়ে দাঁড়াবে, আমি তখনি এসে তোমাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে স্টেশনে চ'লে যাব। কেমন এই ব্যবস্থাই ঠিক তো?"

সন্ধ্যা বললে, "হ্যাঁ।"

"আর দেখ, জিনিসপত্র বিশেষ কিছুই নেওয়া চলবে না। পথে একটা বড় শহরে, দুই-এক দিনের জন্যে নেবে একেবারে গুছিয়ে দুজনের মতো সমস্ত জিনিস কিনে নোব,—তার পর পৌঁছে লিখে দিলেই হবে আমাদের জিনিস-গুলো এখানকার চাকর-বাকরদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে।"

কোনো কথা না ব'লে সন্ধ্যা চুপ ক'রে ব'সে রইল।

প্রমথ বললে, "আর একটা কথা। দু-চার কথায় প্রকাশদাদাকে একখানা চিঠি লিখে রেখে যেয়ো,—এ ব্যবস্থা যে প্রধানত তাঁদের কথা ভেবেই আমরা করলাম, এ কথাটা বুঝিয়ে দিয়ো। এ বাড়িতে তুমি থাকলে যদি কোন রকম অশান্তির উৎপত্তি না হ'ত, তা হ'লে আমার সঙ্গে তোমার এমন ক'রে চ'লে যাবার কোন প্রয়োজনই হ'ত না, এই কথাটা স্পষ্ট ক'রো। বুঝলে?"

এবারও সন্ধ্যা কোনো কথা কইলে না। প্রমথ লক্ষ্য ক'রে দেখলে, সন্ধ্যার চক্ষুর মধ্যে অশ্রুর আড়ম্বর হয়েছে, তাড়াতাড়ি উঠে প'ড়ে বললে, "আমি চললাম। দোর খোলার শব্দ পেলাম, কেউ হয়তো উঠেছে,—এ দিকে আসতে

পারে।" যেতে যেতে পিছন ফিরে তাকিয়ে বললে, "সময়টা ভুলো না যেন, ঠিক দুটো।"

প্রমথ চ'লে যেতেই সন্ধ্যার চোখ থেকে অবরুদ্ধ অশ্রুর রাশি ঝরঝর ক'রে ঝ'রে পড়ল। তপ্ত অশ্রু—এর মধ্যে যে কত দুঃখ কত বেদনা কত গ্লানি সঞ্চিত তা একমাত্র তার অন্তর্যামী ভিন্ন আর কেহই জানে না। কিন্তু আজ যে নূতন ক'রে তার প্রাণে মর্মন্তুদ যন্ত্রণা উদ্বেল হয়ে উঠল, তার হেতু কি?—উৎপত্তি কোথায়?—যে সমাজের শেষ সীমা আজ সে অতিক্রম ক'রে যাচ্ছে ব'লে মনে করছে, সে সমাজের কাছ থেকে তো নির্বাসন-পত্র কয়েকদিন পূর্বেই পেয়েছে,—সে সমাজের মধ্যে এ কয়েক দিনের বাস তো' অধিকারের বাস নয়, অনুগ্রহের বাস। তবে নূতন ক'রে কী এমন বস্তু সে আজ হারাতে চলেছে যে, সব হারানোর করুণ রাগিণীতে তার প্রাণ সহসা আকুল হয়ে উঠল! হায় সংস্কার! হায় মোহ! এমন নির্দয়ভাবে পদাহত হয়েও পদলগ্ন হয়ে থাকতে চাও কিসের লোভে!

পদশব্দে সন্ধ্যা চেয়ে দেখলে, প্রকাশ আসছে। তাড়াতাড়ি বস্ত্রাঞ্চলে দুই চক্ষু ভাল ক'রে মুছে ফেলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

নিকটে এসে প্রকাশ বললে, "উঠলে কেন সন্ধ্যা? ব'সো না।"

সন্ধ্যা বললে, "অনেকক্ষণ ব'সে ছিলাম, এবার বাড়ির ভিতর যাই।"

"প্রমথর সঙ্গে গল্প করছিলে?"

মৃদুস্বরে সন্ধ্যা বললে, "হ্যাঁ।"

"খুব ভাল কথা। প্রমথ একজন চমৎকার গল্প-বলিয়ে। তা ছাড়া বিশ্বের এত খবরও ওর সংগ্রহে আছে। আমি তো অফিসের কাজের জন্যে একটুও সময় পাই নে, তুমি প্রমথর সঙ্গে মাঝে মাঝে গল্প-টল্প ক'রো, তবু একটু অন্যমনস্ক থাকতে পারবে। কিন্তু ও-ই বা আর কদিন এখানে আছে,—যে খেয়ালী মানুষ, কখন যে তল্পি-তল্পা নিয়ে স'রে পড়ে তার ঠিক নেই।"

"মুখুয্যে মশাই!"

প্রকাশ বললে, "কি?"

"আপনি আমাকে কখনো ভুল বুঝবেন না মুখুয্যে মশায়?"

স্মিতমুখে প্রকাশ বললে, "তা হ'লে তুমিও কখনো আমাকে ভুল বোঝাতে চেষ্টা ক'রো না।"

"আর, যত অপরাধই আমি করি নে কেন, আপনি আমাকে ক্ষমা করতেও কখনো ভুলবেন না।"

প্রকাশ বললে, "সর্বনাশ! সে তিতিক্ষা আমার আছে না-কি সন্ধ্যা?"

সন্ধ্যা বললে, "আছে। একমাত্র আপনারই আছে। আচ্ছা মুখুয্যে মশায়, দেবতারা খুব বড় শুনেছি, কিন্তু তারা কি আপনার চেয়েও বড়?"

সন্ধ্যার কথা শুনে প্রকাশ মুখে বিস্ময়ের ভাব প্রকট ক'রে বললে, "মাথায়, না, বহরে?"

সন্ধ্যা বললে, "সে আপনি যাই বলুন, আমার বিশ্বাস তারা আপনার চেয়ে সব দিকেই ছোট।"

দুই চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে প্রকাশ বললে, "ব্যাপারটা কি, বল দেখি সন্ধ্যা? দেবতা আর মানুষ নিয়ে হঠাৎ এ রকম মাপজোক আরম্ভ করলে কেন?"

সন্ধ্যা বললে, "তা জানি নে, কিন্তু আপনি একটু দাঁড়ান মুখুয্যে মশায়, আপনার পায়ের ধুলো নিই।"

দুই পা পিছিয়ে গিয়ে প্রকাশ বললে, "হঠাৎ?"

এগিয়ে গিয়ে নত হয়ে প্রকাশের পদধূলি নিয়ে সন্ধ্যা বললে, "হঠাৎ নয়। ভারি ইচ্ছে হ'ল নিতে, তাই নিলাম।"

"সন্ধ্যা!"

চক্ষে অশ্রু, মুখে হাসি নিয়ে সন্ধ্যা মুখ তুলে বললে, "কি?"

"লুকিয়ো না, আসল ব্যাপার কি খুলে বল।"

সন্ধ্যা নীরবে একটু হাসলে; তার পর বললে, "আচ্ছা, আপনি অফিস থেকে এলে ও-বেলা বলব অখন।" ব'লে আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না ক'রে উদ্‌গত অশ্রু রোধ করতে করতে বাড়ির ভিতর চ'লে গেল। যেতে যেতে মনে মনে বলতে লাগল, হে ভগবান, তুমি আমার এইটুকু মিথ্যা বলার অপরাধ ক্ষমা ক'রো। এ যদি না বলতাম, তা হ'লে সমস্ত জিনিসটাই হয়তো পণ্ড হয়ে যেত।

একটা অনির্দিষ্ট দুশ্চিন্তায় সমস্ত দিন প্রকাশের মন অসুস্থ হয়ে রইল। কাজের তাড়ায় অফিস থেকে বাড়ি ফিরতেও সেদিন একটু বিলম্ব হয়ে গেল। এসে শুনলে দুপুরবেলা থেকে সন্ধ্যার কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না, সঙ্গে সঙ্গে প্রমথরও উদ্দেশ নেই। ব্যাপারটা বুঝে নিতে এক মুহূর্তও বিলম্ব হ'ল না, এবং সন্ধ্যার সকালবেলাকার ব্যাপারটা যে প্রচ্ছন্ন বিদায়-অভিনয়, তাও সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলে। সবিতার মুখে শুনলে, টেবিলের উপর একটা খামে-মোড়া চিঠি চাপা আছে,—সম্ভবত সন্ধ্যারই চিঠি। খুলে দেখলে তাই-ই। চিঠিটা সংক্ষিপ্ত, এই রকম।—

শ্রীচরণকমলেষু,

মুখুয্যে মশায়, সকালবেলাকার কথাবার্তার পর আজই আপনার কাছে একেবারে দু-দুটো অপরাধ করলাম। সকালবেলা যখন বলেছিলাম, সন্ধ্যাবেলায় আপনাকে আসল কথা বলব, তখন এই চিঠিটার কথা ভেবেই 'ইতি গজ'র মিথ্যা কথা বলেছিলাম। সেই প্রথম অপরাধ, আর এই না জানিয়ে প্রমথবাবুর আশ্রয়ে পালিয়ে যাওয়া দ্বিতীয়। আমি জানি, আপনি আমার এ দুটো অপরাধই ক্ষমা করবেন।

কেন আপনার আশ্রয় ত্যাগ করলাম, তা আপনার মতো বুদ্ধিমান আর হৃদয়বান লোককে বেশি বুঝিয়ে বলতে হবে না। আত্মহত্যাও তো করতে পারতাম, তা না ক'রে আত্মার হত্যা করলাম। এ একটা দুর্ঘটনা,

যা যে-কোনো মেয়েমানুষের জীবনে ঘটতে পারে। বাংলা দেশের শত সহস্র দুর্ভাগিনী মেয়ে সমাজ থেকে বিতাড়িত হয়ে যে পথে গেছে, আমিও সেই পথে গেলাম। আপনি আশীর্বাদ করুন, এই পথের চরম দুর্গতি থেকে আমি যেন রক্ষা পাই।

আপনি আমার জীবনে যে কত বড় হয়ে রইলেন, তা বড় ক'রে বলতে গিয়ে ছোট করতে চাই নে। আপনার কথা মৃত্যুর দিন পর্যন্ত মনে থাকবে। আর মনে থাকবে আমিনার কথা, সেও আমার পূর্বজন্মে আপনার জন ছিল।

চললাম মুখুয্যে মশায়, অভাগিনী সন্ধ্যাকে ক্ষমা করবেন। সমস্ত মনটা একটা গভীর বিস্ময়ে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। কেবলই মনে হচ্ছে, এ-ও আবার হয়! আমারই জীবনে এ-ও আবার হ'ল! উৎকট বিস্ময়ের মধ্যে আর সব অনুভূতি ডুবে গেছে। রাগ নেই, দুঃখ নেই, ভয় নেই। কিন্তু এ আপনাকে ব'লে গেলাম মুখুয্যে মশায়, সত্যিই আমি এমন কোনো অপরাধ করি নি, যাতে সমাজের কাছ থেকে আমার এত বড় দণ্ডটা পাওয়া উচিত হ'ল।

মনের অবস্থা অত্যন্ত চঞ্চল, সব কথা ভাল ক'রে গুছিয়ে লিখতে পারছি নে, তাই এইখানেই শেষ করলাম।

সবিদিদিকে বলবেন, আমার অপরাধ যেন তিনি ক্ষমা করেন। তাঁকে আমার প্রণাম জানাবেন, আপনিও জানবেন। ইতি

আপনার অভাগিনী ছোট বোন

সন্ধ্যা

চিঠি শেষ ক'রে প্রকাশ চক্ষু মার্জনা করলে, তার পর সন্ধ্যার মঙ্গলের জন্যে মনে মনে এমন আকুলভাবে প্রার্থনা করলে যেমন সচরাচর কেউ কারুর জন্যে করে না।

উনিশ

টাটানগর স্টেশনে পৌঁছে, লেডিস ওয়েটিং-রুমের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে প্রমথ বললে, "সন্ধ্যা, ভিতরে গিয়ে একটু ব'সো, গাড়ি এলে আমি তোমাকে নিয়ে যাব অখন। আমি কাছেই আছি, ভয় নেই।"

ওয়েটিং-রুমের ভিতর সন্ধ্যা প্রবেশ করলে প্রমথ বুকিং অফিসে উপস্থিত হয়ে দুজন কুলিকে দিয়ে সদ্যক্রীত সুটকেস, দুটো স্বতন্ত্র হোল্ডলে বাঁধা বিছানা এবং অপরাপর খুচরা দু-একটা জিনিস নিয়ে লেডিস ওয়েটিং-রুমের সম্মুখে উপস্থিত হ'ল। প্রথমে সে মনে করেছিল, পথে কোনো বড় শহরে এক-আধ দিনের জন্য নেমে প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি কিনে নেবে, কিন্তু সর্বদা-ব্যবহার্য দ্রব্যাদির অভাবে পথেও অসুবিধা ভোগের সম্ভাবনা আছে; তা ছাড়া, যুবতী স্ত্রীলোক সহ নিতান্ত এক-বস্ত্রে রেল ভ্রমণ সাধারণের চক্ষে একটু বিসদৃশ ঠেকতে পারে মনে ক'রে সে জামসেদপুর থেকেই কতক জিনিস-পত্র কিনে নিয়েছিল। তার পর স্টেশনে এসে টিকিট কিনে, বুকিং অফিসে জিনিসগুলো একজন পরিচিত কর্মচারীর জিম্মায় রেখে সে পরামর্শ অনুযায়ী যথাসময়ে সন্ধ্যাকে আনবার জন্য প্রকাশের গৃহের কাছে উপস্থিত হয়েছিল।

গাড়ি এলে সন্ধ্যাকে নিয়ে প্রমথ একটা প্রথম শ্রেণীর কামরায় গিয়ে উঠল। সে কামরায় অপর কোনো যাত্রী ছিল না। সাধারণত প্রমথ দ্বিতীয় শ্রেণীতেই ভ্রমণ করে, কিন্তু আজ অকস্মাৎ সন্ধ্যার মতো অমন একটি সুদুর্লভ মেয়ের আধিপত্য লাভ করার অপরিসীম আনন্দে মনটা এমনই উচ্ছ্বসিত হয়ে ছিল যে, রেল-ভ্রমণের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা এবং আরাম দিয়ে তাকে অভ্যর্থিত ও সম্মানিত করবার জন্য সে প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনেছিল।

স্ত্রীলোক নিয়ে ঘটনা প্রমথর অভিজ্ঞতায় এই নূতন নয়। নীতিবোধের

শৈথিল্য এবং অর্থের প্রাচুর্য, এই দুই কারণের সংযুক্ত প্রভাবে তার নারী-পরিশীলনের সংখ্যা এবং বৈচিত্র্য যথেষ্ট; কিন্তু তাই ব'লে আজকের এ ঘটনার তুলনায় সে সকলই তুচ্ছ, হেয়। এর অপরূপত্ব এর আভিজাত্য এরূপ যে, যে-অংশ এর মলিন সেখানেও একে হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায় না,—প্রজ্বলিত কয়লার মতো তাও উত্তপ্ত দীপ্তিশীল।

কিন্তু সে জন্য প্রমথর মনে ক্ষোভ ছিল না। বরঞ্চ আজকের দিনের এই সম্পূর্ণ নূতন আস্বাদ নূতন উদ্দীপনার আনন্দে তার অন্তরের গভীরতম প্রদেশে সন্ধ্যার প্রতি কৃতজ্ঞতাই ক্ষরিত হচ্ছিল। যে অতীন্দ্রিয়তার স্পর্শ লাভ ক'রে তার মনের একটা দিক নূতন চেতনায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে, তার জন্য সে ঋণী একমাত্র সন্ধ্যার অসামান্যত্বের কাছে, তার রূপসম্ভারের অপরূপত্বের কাছে, তার অচপল মনের দুরভিগম্যতার কাছে। এই সকলেরই দ্বারা নিষিক্ত নূতন এক রসায়নের ক্রিয়ায় প্রমথর মনে সুচিরসুপ্ত নীতিবোধ জাগ্রত হয়ে উঠেছে, তার ভদ্র মন সাড়া দিয়েছে। মনে হ'ল, যে নিরুপায় বিহঙ্গ অবস্থা-বিপর্যয়ে আজ তার পিঞ্জরের মধ্যে এসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হ'ল, তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অপরিহার্য। প্রমথর জীবনে এ এক নূতন অনুভূতি। সংসারপথযাত্রায় সন্ধ্যার একান্ত নিরুপায়তার কথা স্মরণ ক'রে তার চক্ষু সজল হয়ে এল।

গাড়ি তখন টাটানগর স্টেশনের ডিস্ট্যান্ট সিগনাল ছাড়িয়ে ছুটে চলেছিল। প্রমথ চেয়ে দেখলে, সন্ধ্যা পিছন ফিরে বাহিরের চলমান দৃশ্যরাজির দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে ব'সে আছে।

প্রমথ ডাকলে, "সন্ধ্যা!"

সন্ধ্যা একটু ফিরে ব'সে জিজ্ঞাসু নেত্রে প্রমথর দিকে দৃষ্টিপাত করলে।

"আমরা কোথায় চলেছি, তার তুমি নিশ্চয় কিছু জান না?"

মৃদুস্বরে সন্ধ্যা বললে, "না।"

"কোন্ দিকে চলেছি,—কলকাতার দিকে, না, কলকাতার বিপরীত দিকে, তাও বোধ হয় বুঝতে পারছ না?"

সন্ধ্যা বললে, "কলকাতার বিপরীত দিকে।"

"এটা ঠিক বুঝেছ। চলেছি আমরা আপাতত বিলাসপুরে। বিলাসপুরের টিকিট কিনেছি। সেখানে কাল ভোর পাঁচটায় পৌঁছব, তার পর তোমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে হয় সোজা লক্ষ্ণৌ যাব, নয়, কয়েকদিনের জন্যে কাশীবাস ক'রে তার পর লক্ষ্ণৌ। লক্ষ্ণৌ যেতে তোমার আপত্তি কিংবা অনিচ্ছা নেই তো সন্ধ্যা?"

সন্ধ্যা মাথা নেড়ে বললে, "না।"

"কাশী যেতে?"

সন্ধ্যা বললে, "আপনি যেখানে আমাকে নিয়ে যাবেন, সেখানেই আমি বিনা আপত্তিতে যাব।"

গভীরব্যগ্রকণ্ঠে প্রমথ বললে, "শুধু বিনা আপত্তিতে গেলে চলবে না তো সন্ধ্যা, বিনা অনিচ্ছায় যাওয়া চাই।"

এক মুহূর্ত মনে মনে চিন্তা ক'রে সন্ধ্যা বললে, "কিন্তু ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর আমার যখন হাত নেই, তখন সে কথা না ভাবাই ভাল। ইচ্ছা না হওয়াও তো অসম্ভব নয়।"

প্রমথ বললে, "না, একটুও অসম্ভব নয়। কিন্তু সে বিষয়ে আমার এই মাত্র বলবার আছে যে, অনিচ্ছার সঙ্গে কোনো জায়গায় যেতেই তোমার বাধ্যতা নেই। আমরা বিলাসপুরের দিকে চলেছি, তাতে যদি তোমার অনিচ্ছা থাকে তো বল, পরের স্টেশনে নেমে প'ড়ে ফিরতি ট্রেনে যে দিকে তোমার ইচ্ছে সেই দিকেই ফিরে যাই। যদি তাই তোমার ইচ্ছা হয় তো বল, আবার না-হয় জামসেদপুরে প্রকাশদাদার বাড়িতেই গিয়ে উঠি। যতদিন না তুমি আমাকে তোমার আত্মীয় ব'লে মনে করতে পারছ

ততদিন তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক পা অগ্রসর হবার অধিকার আমার নেই।"

জানলার দিকে তাকিয়ে সন্ধ্যা স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল। এ কথার উত্তরে কী যে সে বলবে, তা কিছুই ভেবে পেলে না। তা ছাড়া, এই যে বিশেষ একটা মুহূর্তের উন্মাদনায় সহসা একজন অপরিচিত-প্রায় পুরুষের সঙ্গে প্রকাশের গৃহ ত্যাগ ক'রে বেরিয়ে আসা—এর অচিন্তনীয়তায় তার মন এমন আচ্ছন্ন হয়ে ছিল যে, সব কথার ভাল-মন্দ বিচার ক'রে দেখবার শক্তি সে যেন ঠিক খুঁজে পাচ্ছিল না। সমাজের পরীক্ষাপাত্রে একে ঢেলে দেখলে, এ সেই বহুনিন্দিত কুলত্যাগ ভিন্ন আর কিছুই নয়; কিন্তু মহামানবতার কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে দেখলে, সেই কূলের সীমান্তরেখা কোন্ অকূলে যে স'রে গিয়ে দাঁড়ায় তা চোখে দেখা যায় না; সেই দিগন্তাতীত পরিবেশের মধ্যে প্রমথ তার অনাত্মীয় নয়, প্রমথ তার আপন; তার দুঃখ-বিপত্তির সমবেদনায় প্রমথর চিত্ত বিগলিত হয়েছে, প্রমথ তাকে হীনতার চরম দুরবস্থা থেকে উদ্ধার ক'রে এনেছে,—এ উদ্ধার করার মধ্যে জোরজবরদস্তি ছিল না, সহৃদয়তার সহজ প্রেরণায় প্রমথ আশ্রয়দানের প্রস্তাব তুলেছিল, সন্ধ্যা স্বেচ্ছায় সে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে, তবু থেকে থেকে প্রমথর প্রতি মন যেন তিক্ত হয়ে ওঠে;—মনে হয়, একদিন মহবুবও তার বীভৎস অত্যাচারের মধ্যে যা করতে পারে নি, আজ প্রমথ তার এই সদয় উপচিকীর্ষার দ্বারা তাই করলে,—তার ভবিষ্যতের যা-কিছু সত্তা, যা কিছু সম্ভাবনা একেবারে নিশ্চিহ্ন ক'রে ধুয়ে মুছে দিলে। কিন্তু কী যে এই সত্তা, কী এই সম্ভাবনা, নিঃসত্ত নিষ্প্রাণ ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে তার কিছুই অনুমান করা যায় না, তবু মনে হয়—মহবুব ছিল ব্যাধি, কিন্তু প্রমথ মৃত্যু।

"সন্ধ্যা!"

প্রমথর আহ্বানে সন্ধ্যা তার চিন্তার তন্দ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে ভাল ক'রে ফিরে ব'সে বললে, "বলুন।"

প্রমথ বললে, "তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি বেশ একটু চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছ—নিজের অবস্থায় ঠিক যেন নিশ্চিন্ত হতে পারছ না। প্রথমটা এ রকম অবশ্য হবারই কথা, এর জন্যে তোমাকে আমি দোষ দিতে পারি নে। কিন্তু শুধু আমার মুখের কথা ছাড়া আর কোনও রকমে তুমি যদি আমার মনের অবস্থাটা ঠিক চোখে দেখতে পেতে, তা হ'লে বোধ হয় তোমার উদ্বেগের বিশেষ কারণ থাকত না। একটা কথা তুমি সব সময়ে মনে রেখো সন্ধ্যা, তুমি আমার আশ্রয়ে আছ, কিন্তু তাই ব'লে তুমি আমার আশ্রিতা নও। কেন নও, তা নিশ্চয় বুঝতে পারছ?"

সন্ধ্যা এ কথার কোনো উত্তর দিলে না, শুধু একবার প্রমথর প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত করলে।

প্রমথ বলতে লাগল, "কেন নও তা বলছি, শোন। আজ সকালে যখন আমার ঘুম ভাঙল, তখন পর্যন্ত তোমার সঙ্গে আমার কোনো আত্মীয়তা ছিল ব'লে আমি স্বীকার করি নে; টেনে-বুনে যেটুকু সম্পর্ক স্থির করা গেছল, তার কোনো অর্থ, কোনো মূল্য নেই। সে কেবল ভদ্রতার নিতান্তই পাতানো সম্পর্ক। কিন্তু আমি যখন তোমার কাছে উপস্থিত হয়ে আমার আশ্রয়ে তোমাকে গ্রহণ করবার অধিকার প্রার্থনা করলাম, তুমিও আমার প্রস্তাবে সম্মত হ'লে এবং সেই মতো প্রকাশদাদার বাড়ি পরিত্যাগ ক'রে আমাকে অনুসরণ করলে, তখন তোমার সঙ্গে আমার পরমাত্মীয়তা স্থাপিত হ'ল। তোমাদের সমাজে চলিত কোনো আত্মীয়তার চেয়ে আমাদের এ আত্মীয়তা কম মূল্যবান বা কম পবিত্র ব'লে আমি মনে করি নে। তুমি এলে আমার জীবনে অতিথি হয়ে,—তুমি হ'লে আমার চিরদিনের জীবনসঙ্গিনী।"

প্রমথর কথা শুনে সন্ধ্যার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল এবং তার আকৃতির মধ্যে একটা সুপরিস্ফুট উৎকণ্ঠার চিহ্ন দেখা দিলে।

সন্ধ্যার মনের অবস্থা সঠিক উপলব্ধি ক'রে প্রমথ স্নিগ্ধকণ্ঠে বললে, "তুমি

অকারণ লজ্জিত হ'য়ো না সন্ধ্যা। তোমাকে সন্তুষ্ট করবার অভিপ্রায়ে আমি কোনো কাব্য-কথা বলি নি। ও-জিনিসটা একেবারেই আমার ধাতে সয় না। যাতে তুমি আমার কাছে সহজ হতে পার, স্বচ্ছন্দ হতে পার, যাতে আমার সঙ্গে তোমার যথার্থ সম্পর্ক জানতে পেরে তোমার মনে কোনো রকম কুণ্ঠা না থাকে, একমাত্র সেই উদ্দেশ্যে আমি আমার মনের অকপট কথা তোমাকে জানিয়েছি। জীবনসঙ্গিনী কথা শুনে তুমি চম্‌কে উঠো না; ও কথার কোনো কদর্থ আছে ব'লে আমার ধারণা নেই। তা ছাড়া, স্ত্রী ভিন্ন অন্য কোনো স্ত্রীলোকের জীবনসঙ্গিনী হবার অধিকার নেই, এ কথাও আমি বিশ্বাস করি নে। তুমি যদি আজীবন আমার সঙ্গে বাস কর, তা হ'লে তোমাকে জীবনসঙ্গিনী ছাড়া আর কি বলব, বল ?"

শব্দের সহজ অর্থ অনুসরণ করলে এ কথায় আপত্তি করা চলে না, কিন্তু তথাপি কথাটা কানে কটু হয়েই বাজে। কিন্তু উপায় কি! যে কথার সুলভ যুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে পরাস্ত হতে হবে, সে কথার অনতিবর্তনীয় গ্লানিকে পরিপাক ক'রে সন্ধ্যা আহত মনে নিঃশব্দে ব'সে রইল।

প্রমথ বলতে লাগল, "আমার সম্বন্ধে তুমি কতদূর কি শুনেছ তা জানি নে, কিন্তু আজ থেকে যার সঙ্গে তোমার জীবন জড়িত হ'ল সে কি-প্রকৃতির মানুষ তা জানবার আগ্রহ এবং প্রয়োজন তোমার হতে পারে। সাধুপ্রকৃতির লোক ব'লে আমি এক মুহূর্তের জন্যে দাবি করি নে, তবে একেবারে প্রথম নম্বরের দুর্বৃত্ত বললেও আপত্তি করব। আমাকে চরিত্রবান বললে গালি দেওয়া হবে, চরিত্রহীনই আমি নিশ্চয়,—কিন্তু তাই ব'লে দুশ্চরিত্রও নই। চরিত্রহীন অথচ দুশ্চরিত্র নই, এর কি অর্থ তা হয়তো তোমাকে আমি ঠিক বোঝাতে পারব না,—কিন্তু আমার চরিত্রের এই খবরটুকু জানা আছে ব'লেই বোধ হয় প্রকাশদাদাদের বাড়ির মতো আরও পাঁচ-সাত বাড়িতে আমার অবাধ প্রবেশ আছে। সুতরাং বুঝতেই পারছ, সাধু-পুরুষ না হ'লেও আমার

মধ্যে এমন কিছু থাকতে পারে যা তোমার উপকারে লাগবে। ছলে বলে অথবা কৌশলে আমি যখন তোমাকে আয়ত্ত করি নি সন্ধ্যা, তখন তুমি আমার কাছে অনেকটা নিরাপদ, এ আশ্বাস তোমাকে দিতে পারি।"

আশ্বাসের পাশে পাশে যেন আশঙ্কা ওৎ পেতে ব'সে আছে, নল-খাগড়া বেড়ার অপর দিকে যেন বাঘের খসখসানি—কখন যে লাফ দিয়ে বেড়া ডিঙিয়ে আসে তার স্থিরতা নেই!

মনের এই অকারণ দুর্ব্বলতায় সন্ধ্যার হাসিও পায়। কি-ই বা তার অবশিষ্ট আছে যার জন্যে এই উৎকণ্ঠা, এই ভয়। মান গেছে, ইজ্জৎ গেছে, সমাজ সংসার কুল গেছে। আছে তো শুধু অস্থি রক্ত মাংসের জড়বস্তু এই দেহটা! তবে তার জন্যে এত আশঙ্কা কিসের? দিলেই তো হয় তাকে যে কোনো মুহূর্তে শেষ ক'রে! দোর খুলে এই চলন্ত গাড়ি থেকে নীচে লাফিয়ে পড়লেই তো অভীষ্ট সিদ্ধি।—তবে?

চক্রধরপুর থেকে যখন গাড়ি ছাড়ল তখন অপরাহ্ণ উত্তীর্ণ হয়েছে। স্তব্ধ ভাবে জানালার ধারে উপবেশন ক'রে সন্ধ্যা তার আলোড়িত কেন্দ্রচ্যুত মনকে কেন্দ্রস্থ করবার চেষ্টা করছিল, এমন সময়ে প্রমথ ডাক দিলে।

প্রমথ বললে, "সন্ধ্যা, ছোট স্যুট্‌কেস্‌টা আমার, আর বড়টা তোমার। উপস্থিত ব্যবহারের জন্যে কিছু-কিছু জিনিস-পত্র জামসেদপুর থেকেই কিনে নিয়েছি। তোমার স্যুট্‌কেস্‌ থেকে কাপড়-চোপড় সাবান-টাবান বার ক'রে নিয়ে বাথরুমে গিয়ে মুখ হাত পা ধুয়ে এস। এই নাও তোমার চাবি।" ব'লে উঠে গিয়ে সন্ধ্যার পাশে চাবিটা রেখে এল।

আরক্তমুখে ভগ্নকণ্ঠে সন্ধ্যা বললে, "এখন থাক্, পরে নোব অখন।"

"আবার পরে কখন? সেই সকালে তো দুটি ভাত খেয়েছ, খিদে পায় নি?"

ঘাড় নেড়ে সন্ধ্যা বললে, "না।"

"না?—মেয়েদের কখনোই খিদে পায় না। কিন্তু আমি তো একজন পুরুষমানুষ,—আমার খিদে পেতে তো বাধা নেই?"

প্রমথর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "বেশ তো, আপনি খান।" তার পর দৈব কর্তৃক সহসাগঠিত তাদের এই বিচিত্র সংসারকে একেবারে অস্বীকার না করলে তার যা কর্তব্য তা স্মরণ ক'রে বললে, "ওই ঝোড়াটায় বোধ হয় খাবার আছে,—বার ক'রে দোব?"

"নিশ্চয়ই দেবে,—কিন্তু তার আগে বাথরুম থেকে হয়ে এস। কাপড়-চোপড় না বদলে কি খাবারে হাত দিতে আছে?"

এ কথার পর আর আপত্তি করা চলে না,—অগত্যা সন্ধ্যা স্যুট্‌কেস খুলে প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি বার ক'রে নিলে। মূল্যবান শৌখিন দ্রব্যে স্যুট্‌কেস ভরা।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে সন্ধ্যা দেখলে, ইত্যবসরে প্রমথ দুই দিকের দুইটি বেঞ্চে শয্যা রচনা ক'রে রেখেছে। অপ্রতিভ হয়ে বললে, "আপনি কেন বিছানা পাতলেন?"

প্রমথ মৃদু মৃদু হাসতে লাগল; বললে, "আর এ সব ব্যাপারে আপত্তি করলে চলবে না, এখন আমার পরিচর্যা তুমি করবে, তোমার পরিচর্যা আমি করব। এখনি তোমাকে আমাদের দুজনের জন্যে খাবার প্রস্তুত করতে হবে। ঐ ঝোড়ায় ফল, মিষ্টি, রুটি, মাখম, প্লেট, ছুরি—সবই আছে। দু প্লেট খাবার প্রস্তুত ক'রে রাখ। আমি বাথরুমে চললাম।"

খাবার প্রস্তুত করতে ব'সে সন্ধ্যার দুই চক্ষে অশ্রু ভ'রে এল। কার সংসার কে করে! অদৃষ্টে এতও লেখা ছিল!

প্রমথ বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলে সন্ধ্যা তার সম্মুখে এক প্লেট খাবার রাখলে। প্রমথ জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার?"

মৃদুস্বরে সন্ধ্যা বললে, "আছে।"

খাবারের পালা শেষ হ'লে অল্পক্ষণ পরেই সন্ধ্যা তার শয্যায় শুয়ে পড়ল।

প্রমথ বললে, "এরই মধ্যে শুলে সন্ধ্যা? এখনো আটটা বাজে নি।"

সন্ধ্যা বললে. "মাথাটা একটু ধরেছে।"

ব্যগ্রকণ্ঠে প্রমথ বললে, "তাই না-কি? তা হ'লে আর কথা নেই, শুয়ে পড়।"

প্রমথ বাতিগুলো সব নিবিয়ে দিলে। তার পর কিছুক্ষণ নিঃশব্দে ব'সে থেকে সে-ও শুয়ে পড়ল। অন্ধকার কক্ষের দুইটি বিভিন্নচিন্তামথিত যাত্রী নিয়ে রেলগাড়ি সুনিবিড় অন্ধকারের মধ্য দিয়ে দ্রুতবেগে ছুটে চলল।

গভীর রাত্রে বৃষ্টি এসে একটা কনকনানির সৃষ্টি করলে। সন্ধ্যা বুঝতে পারলে, প্রমথ সন্তর্পণে তার গায়ে একটা বস্ত্র ঢেকে দিচ্ছে। একটা অনির্ণেয় ঘৃণা এবং বিরক্তিতে তার সমস্ত শরীর রী-রী ক'রে উঠল।

ত্রিশ

শেষ-রাত্রির দিকে সহসা সন্ধ্যার ঘুম ভেঙে গেল। তিমিরাবৃত জনহীন প্রান্তর ভেদ ক'রে গাড়ি হু-হু শব্দে ছুটে চলেছে। বাহিরে অন্ধকারের মধ্যে রেলপথের অতি নিকটবর্তী গাছ-পালার কৃষ্ণবর্ণ মূর্তি মাঝে মাঝে দ্রুতবেগে শট শট ক'রে পেছিয়ে যাচ্ছে। আকাশে একটিও তারা দেখা যাচ্ছে না, সুতরাং সমস্ত আকাশ নিশ্চয়ই এখনো মেঘাচ্ছন্ন হয়ে আছে।

ঘরের ভিতরকার আলো নেবানো,—ল্যাভেটরির বাতি জ্বলছে, ঘসা কাচের ভিতর দিয়ে তার নিষ্প্রভ রশ্মি এসে কক্ষটিকে নির্ভেদ্য অন্ধকারের গ্রাস থেকে রক্ষা করেছে। সেই স্তিমিত আলোকে দেখা যাচ্ছে, অপর বেঞ্চে প্রমথ শয়ন ক'রে আছে, নিদ্রিত কি জাগ্রত তা ঠিক বোঝা যায় না, কিন্তু তার নিশ্চল নীরব দেহ দেখে অনুমান হয় নিদ্রিতই।

প্রমথর গাত্রবস্ত্র তখনো তার গাত্রে আচ্ছাদিত রয়েছে মনে হওয়া মাত্র সন্ধ্যা ক্ষিপ্রবেগে সেটাকে টেনে নিয়ে মাথার শিয়রে একটা কোণে গুঁজে রেখে দিলে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল, কি হবে তুচ্ছ একটা গাত্রবস্ত্রের প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শন ক'রে, দেহ যখন প্রমথর অর্থে ক্রীত বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করছে এবং পাকস্থলীতে যখন প্রমথর অর্থে ক্রীত খাদ্য জীর্ণ হচ্ছে! প্রমথর গাত্রবস্ত্র তো সহজেই টেনে ফেলে দেওয়া যায়, কিন্তু এই যে প্রমথর প্রসাদ-সঞ্জাত পরিবেশ, যার মধ্যে সে তারই অন্নে বস্ত্রে জীবন যাপন করছে, তাকে তো সহসা টেনে ফেলে দেবার উপায় নেই! এ অবস্থাকে সে স্বয়ং স্বীকার ক'রে নিয়েছে, গৃহস্থ গৃহের শেষ সীমান্তরেখা অতিক্রম ক'রে সে স্বেচ্ছায় এর মধ্যে প্রবেশ করেছে। এখানে তার প্রমথর সঙ্গে যোগ!

অপাঙ্গে প্রমথর প্রতি সন্ধ্যা দৃষ্টিপাত করলে। তার অস্পষ্ট দীর্ঘবিসারিত

দেহ দেখে মনে হ'ল যেন কোনো দৈত্য কার্যসিদ্ধির পর অপহৃতা বন্দিনীকে পাশে শুইয়ে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাচ্ছে। নদ-নদী পার হয়ে মাঠ-ঘাট কানন-কান্তার পশ্চাতে ফেলে দ্রুতগামী রেলগাড়ি কোন্ সুদূরে কত দিনের জন্য তাকে রেখে আসতে ছুটে চলেছে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। সহসা মনে পড়ল পঞ্চবটী নিবাসিনী জানকীর কথা। তাঁকেও একদিন লঙ্কেশ্বর রাবণ অপহরণ ক'রে রথে নিয়ে এমনি ক'রে লঙ্কাভিমুখে প্রস্থান করেছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত রামচন্দ্র জানকীকে উদ্ধার করেছিলেন। কিন্তু তাকে উদ্ধার কে করবে? উদ্ধার তো দূরের কথা, তার রামচন্দ্র গ্রহণ করতেও জানেন না, বোঝেন শুধু বর্জন করার যুক্তি। তারই ফলে সে এখন আর কন্যা নয়, বধূ নয়, পুরস্ত্রী নয়,—সে এখন যূথভ্রষ্টা বিপথগামিনী,—হয়তো বা অদূরভবিষ্যতে কোনো এক লঙ্কাপুরীর কক্ষে প্রমথর চিরজীবনের রক্ষিতা!

দুঃখে, নৈরাশ্যে, অপমানে, অভিমানে সন্ধ্যার সমস্ত দেহ বিমথিত ক'রে মর্মান্তিক বেদনা জাগ্রত হ'ল। শয্যার উপর উপুড় হয়ে প'ড়ে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে রোদন করতে লাগল যতক্ষণ না নিদ্রা এসে তাকে পুনরায় অচেতন ক'রে দিলে।

প্রমথর যখন ঘুম ভাঙল তখন আকাশে প্রত্যুষের আলো দেখা দিয়েছে। সেই অনুগ্র স্নিগ্ধ আলোকে প্রথমেই চোখে পড়ল, নিদ্রিতা সন্ধ্যার নিমীলিতনেত্র মুখ, ঘুমের ঘোরে কোনো-এক সময়ে সে প্রমথর দিকে পাশ ফিরে শয়ন করেছে। নিদ্রাজড়িত চক্ষে সন্ধ্যার মুখের অনির্বচনীয় সুষমা নিরীক্ষণ ক'রে প্রমথর বিস্ময়ের সীমা রইল না।—আশ্চর্য। এত সুন্দরও স্ত্রীলোকের মুখ হয়! সন্ধ্যার ঈষৎ-হিল্লোলিত দেহখানি দেখে মনে হ'ল যেন একটি সদ্য ছিন্ন পুষ্পবল্লরী শয্যার উপর প'ড়ে রয়েছে। শাড়ির কালো পাড় অতিক্রম ক'রে আগু-পিছু রক্ষিত উন্মুক্ত দুখানি পা দেখে প্রমথ মনে মনে বললে, সুন্দরী স্ত্রীলোকের পাকে কেন যে পাদপদ্ম বলে আজ তা স্পষ্ট বোঝা গেল। নিজেকে অসীম

ভাগ্যবান ব'লে মনে করলে। এই অপরূপ সৌন্দর্যের ভাণ্ডার তার প্রতিক্ষণের অধিকারের বস্তু হ'ল! এই রজনীগন্ধারূপিণী বালিকার সহিত সে একত্রে নিশা যাপন করেছে! সুপ্রভাত!

পুলকিত চিত্তে প্রমথ উৎসাহভরে শয্যা ত্যাগ ক'রে দাঁড়িয়ে উঠল, তার পর দক্ষিণে-বামে ভাল-রকম দুটো আড়ামোড়া ভেঙে জামার পকেট থেকে সিগার-কেস ও দেশলাই বার ক'রে একটা মোটা চুরুট ধরিয়ে বেঞ্চের প্রান্তে জুৎ ক'রে পা মুড়ে বসল।' তার পর সন্ধ্যার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে মৃদু মৃদু টানে চুরুটটি উপভোগ করতে প্রবৃত্ত হ'ল। দেখতে দেখতে, এবং সম্ভবত ভাবতে ভাবতে সহসা কোন্ এক মুহূর্তে প্রমথ ভিতরে ভিতরে স্তব্ধ হয়ে গেল, টানার অভাবে মুখের চুরুট মুখের মধ্যেই নিবে গেল, মনে হ'ল চিত্তের একটা নবোন্মুক্ত পথ দিয়ে এমন একটা অনুভূতি প্রবেশ করছে যা ইতিপূর্বে আর কখনও অনুভব করে নি। দুঃখে, করুণায়, সমবেদনায় চোখের পাতা ভিজে এল; মনে মনে সন্ধ্যার প্রতি যে ভাব ব্যক্ত করলে ভাষায় তা প্রকাশ করলে বলা যেতে পারত, ওরে আমার ঝড়-খাওয়া পাখী, এসেছ যখন আমার পিঞ্জরে, নির্ভয়ে অবস্থান কর। ভয় নেই, ভয় নেই!

নিবে-যাওয়া চুরুটটা জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিলে; আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে আপন মনে মৃদুস্বরে বললে, সত্যই সুপ্রভাত! তার পর তোয়ালে আর সাবান নিয়ে সন্তর্পণে ল্যাভেটরিতে প্রবেশ করলে।

ল্যাভেটরি থেকে বেরিয়ে এসে প্রমথ দেখলে, তখনো সন্ধ্যা নিদ্রা যাচ্ছে; নিকটে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে ডাকলে, "উষা! উষা!"

কানে শব্দ যেতেই সন্ধ্যা চোখ মেলে দেখলে, পূর্বেকার অন্ধকার কক্ষ কখন আলোকে ভ'রে গেছে; ধড়মড় ক'রে শয্যার উপর উঠে ব'সে অপ্রতিভ মুখে স্খলিত কণ্ঠে বললে, "কিছু বলছেন?"

নিকটেই সুটকেস দুটো উপরে-নীচে রাখা ছিল, তার উপর ব'সে প'ড়ে

স্মিতমুখে প্রমথ বললে, "বলছি, সন্ধ্যা নামের পরিবর্তে আজ তোমার নূতন নামকরণ করলাম,—উষা।"

প্রমথর এই অদ্ভুত প্রস্তাবে যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হয়ে বিমূঢ়ভাবে সন্ধ্যা প্রশ্ন করলে, "কেন?"

প্রমথ হাসতে লাগল; বললে, "তা হ'লেই বিপদে ফেললে দেখছি! কেন বলতে হ'লে হয়তো এমন কথাও বলতে হবে জীবনে যেমন কোনদিন বলি নি। সরস শৌখিন পোশাকী কথা আমি দুচক্ষে দেখতে পারি নে। ধর, এমন কথাই যদি বলি যে, 'আজ উষাকালে তোমাকে দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে হ'ল, আমার জীবনেও আজ এক নূতন উষার উদয় হ'ল, সুতরাং তুমি আমার পক্ষে সন্ধ্যা নও, উষা, তা হ'লে লজ্জায় আর মুখ দেখাবার জো থাকবে না। আসলে হয়তো কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়,—কিন্তু সব সত্যি কথাই কি মুখ দিয়ে বলা যায়? এই ধর, তোমার হয়তো উপস্থিত মনের অবস্থা এ-রকম যে, সুবিধে পেলেই আমাকে গাড়ি থেকে নীচে ঠেলে ফেলে দিতে পার, কিন্তু তাই ব'লে তো আর সে কথা খুলে বলতে পারছ না!"

প্রমথর কথা শুনে সন্ধ্যা একবার তার প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে মুখ নত করলে। আরক্ত মুখে অতি ক্ষীণ যে হাস্যটুকু স্ফুরিত হ'ল, তার যথার্থ অর্থ করা কঠিন।

প্রমথ হো-হো ক'রে হেসে উঠল; বললে, "রাগ ক'রো না, উদাহরণ দিয়েছি, 'হয়তো' বলেছি। 'হয়তো'র মধ্যে 'হয়তো না-ও' আছে; কাজেই না ও ঠেলে ফেলে দিতে পার।"

এবার সন্ধ্যার মুখে যে হাসি দেখা দিলে তা তত দুর্বোধ্য নয়। তার মধ্যে কৌতুকের স্পষ্ট আভা লক্ষ্য ক'রে প্রমথ খুশি হ'ল; বললে, "ও-সব বাজে কথা যাক, 'উষা' নামে তোমার কোনো আপত্তি আছে কি-না বল?"

প্রথমটা সন্ধ্যা একটু চুপ ক'রে রইল; তার পর মৃদুস্বরে বললে, "কোনো

সুনামই আর যাব নেই, কোনো নামেই তার আপত্তি থাকতে পারে না। আপনার যদি ইচ্ছে হয়, উষা ব'লেই আমাকে ডাকবেন।"

সন্ধ্যার কথা শুনে উৎফুল্ল মুখে প্রমথ বললে, "সুনাম-দুনামেব তর্ক অন্য কোনো সময়ে হবে, এখন তার সময নেই। আপাতত তুমি যে আমাব প্রস্তাব মঞ্জুর করলে এব জন্যে ধন্যবাদ দিই। আজ হতে যতদিন তুমি আমার কাছে থাকবে ততদিন তুমি আমার উষা। কিন্তু ভবিষ্যতে কোনোদিন যদি তোমাতে আমাতে ছাড়াছাড়ি হবার কাবণ ঘটে,—ধর, কোনো শুভদিনে যদি আবার তোমার শ্বশুর বাড়ি কিংবা বাপের বাড়ি ফিরে যাবার সৌভাগ্য হয়,—তা হ'লে সেদিন থেকে আবার তুমি আমার সন্ধ্যা হবে। কেমন?—এ বেশ ভাল ব্যবস্থা নয়?"

সন্ধ্যা এ কথার কোনো উত্তর দিলে না, নতমুখে ব'সে রইল।

প্রমথ বললে, "বিলাসপুর পৌঁছাত আর বেশি দেরি নেই। বাথরুম থেকে চট্ ক'রে হয়ে এস। গাড়িতে জল-টলের ব্যবস্থা তবু ভাল আছে, অবশ বিলাসপুরের উপর নিভর ক'বে কাজ নেই।"

প্রমথর কথা শুনে সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি উঠে প'ড়ে শয্যা উত্তোলন করতে উদ্যত হ'ল। প্রমথ বাধা দিয়ে বললে, "ও-কাজটা আমার এলাকার ভেতরেব। আমি বাঁধা-ছাঁদাগুলো সেরে রাখি, তুমি ততক্ষণে বাথরুম থেকে হয়ে এস আমার বাথরুম যাওয়া হয়ে গেছে।"

একটু ইতস্তত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "আমি না হয় আমার বিছানাটা তুলে দিয়ে যাই।"

মাথা নেড়ে প্রমথ বললে, "না, সে ভাল দেখাবে না, লোকে বলবে শুধু আপনারটাই বোঝে; তুলতে হ'লে দুটো বিছানাই তুলতে হয়। কিন্তু বিছানা হোল্ডলে পোরা তোমার কর্ম নয়, ও-কাজে পৌরুষের দরকার।"

সন্ধ্যা বললে, "তা হ লে না হয় শুধু গুটিয়ে দিয়ে যাই?"

মৃদু হেসে প্রমথ বললে, "তাও না। অতিথি-সেবার আনন্দের পুরোপুরিটাই ভোগ করতে দাও। জান তো, অতিথি পুরুষমানুষ হ'লে নারায়ণ, আর স্ত্রীলোক হ'লে লক্ষ্মী। সুতরাং আর তর্কাতর্কি না ক'রে লক্ষ্মীটির মতো ল্যাভেটরিতে ঢুকে পড়।"

এ কথার পর ল্যাভেটরিতে প্রবেশ করা ভিন্ন উপায়ান্তর রইল না। বিলাসপুরে গাড়ি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে, প্রমথ একবার মনে করলে সেইখানেই কুলিদের দিয়ে বিছানা-পত্র বাঁধিয়ে নেবে, কিন্তু মনের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা এত বেশি সঞ্চিত হয়েছিল যে তাহার তাড়নায় নিজেই উদ্যমের সহিত লেগে গেল। তা ছাড়া, সন্ধ্যার কাছে সদ্য-প্রকাশিত পৌরুষের গর্ব ক্ষুণ্ণ না হয় সে বিষয়েও বোধ হয় আগ্রহ কম ছিল না।

ল্যাভেটরি থেকে সন্ধ্যা নিষ্ক্রান্ত হ'লে প্রমথ বললে, "বিলাসপুর তো পৌঁছলাম উমা, এখন কোথাকার টিকিট করব বল,—কাশীর, না, লক্ষ্ণৌর?"

একটু ইতস্তত ভাবে প্রমথর প্রতি একবার চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "কাশীরই না হয় করুন।"

প্রফুল্লমুখে প্রমথ বললে, "বেশ কথা, আমারও তাই ইচ্ছে। কাশী আমরা এর চেয়ে অনেক সোজা পথে যেতে পারতাম। ইচ্ছে ক'রেই এই ঘোরা পথে যাচ্ছি। কাল বেলা সাড়ে দশটার সময়ে আমরা কাশী পৌঁছব, তার আগে পথে পথে এ দু রাতের ঘরকন্না বোধ হয় নিতান্ত মন্দ লাগবে না।"

প্রমথর গৃহে প্রবেশ ক'রে সন্ধ্যা প্রথমে যে স্বজনহীন কারাগৃহের নির্মমতার মতো একটা রূঢ় আঘাত পাবে, এ কথা অনুমান ক'রেই প্রমথ এই দীর্ঘবিসর্পী পথ অবলম্বন করেছিল। পাখীকে পিঞ্জরে আবদ্ধ করবার পূর্বে গাছের শাখায় বসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, যদি তদবসরে কতকটা পোষ মানিয়ে নিতে পারে।

বিলাসপুরে যখন গাড়ি পৌঁছল, তখন বেলা সাড়ে পাঁচটা। আকাশ মেঘহীন হয়ে গেছে, বায়ু সুশীতল, এবং রাত্রে বৃষ্টিপাতের ফলে বৃক্ষলতা তখনো আর্দ্র।

প্রমথ বললে, "উষা, ওয়েটিং রুমে যাবে, না, বাইরে বেঞ্চিতে বসবে? টিকিট কিনে আর চা-পানের ব্যবস্থা ক'রে আমরা গাড়িতে গিয়ে বসব। গাড়ি প্ল্যাটফর্মের কাছেই লেগে আছে।"

বাহিরের স্নিগ্ধতা পরিত্যাগ ক'রে ওয়েটিং রুমের আবদ্ধতার ভিতরে যেতে সন্ধ্যার প্রবৃত্তি হ'ল না; বললে, "বাইরেই বসব।"

প্ল্যাটফর্মের অপেক্ষাকৃত নির্জন স্থানে একটা বেঞ্চে সন্ধ্যাকে বসিয়ে এবং অদূরে কুলীর জিম্মায় জিনিস-পত্র রেখে প্রমথ বুকিং অফিসে উপস্থিত হ'য়ে টিকিট করলে, তার পর রিফ্রেশমেণ্ট রুমে গিয়ে চা ও খাবার প্রস্তুত ক'রে কাট্‌নগামী গাড়ির প্রথম শ্রেণীতে নিয়ে যাবার উপদেশ দিয়ে সন্ধ্যার নিকট ফিরে চলল। দূর থেকে দেখলে, বেঞ্চে সন্ধ্যার বাম পাশে একজন প্রৌঢ়া মহিলা ব'সে আছেন, মনে হ'ল তাঁর দক্ষিণ বাহু যেন সন্ধ্যার স্কন্ধদেশ বেষ্টন ক'রে আছে। নিকটে আসতেই মহিলাটি সন্ধ্যার কাঁধ থেকে হাত তুলে নিলেন এবং সন্ধ্যাও একটু স'রে সোজা হয়ে বসল।

সন্ধ্যার মুখ-চোখের আরক্ত ভাব লক্ষ্য ক'রে বিস্মিত হয়ে প্রমথ বললে, "কি ব্যাপার উষা? কি হয়েছে?"

উত্তর দিলেন মহিলাটি; সহাস্যমুখে বললেন, "হয় নি বিশেষ কিছু। এই দিক দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম মেয়েটির, চোখ দুখানি জলে টলমল করছে,—বোধ হয় বাপ-মার জন্যে মন কেমন করছিল, কাছে এসে ব'সে একটু আদর করতেই সমস্ত জলটা ঝরঝর ক'রে ঝ'রে গেল।" ব'লে হাসতে লাগলেন।

প্রমথও সহাস্যমুখে কপট বিস্ময়ের ভঙ্গীতে বললে, "সে কি উষা? একেবারে কান্নাকাটি?" তার পর মহিলাটিকে সম্বোধন ক'রে স্নিগ্ধ স্বরে বললে, "আপনার সহানুভূতির জন্যে ধন্যবাদ।"

মহিলাটি স্মিত মুখে বললেন, "না না, এর জন্যে ধন্যবাদ দেবার কি আছে? এঁর নাম বুঝি উষা?"

প্রমথ বললে, “হ্যাঁ, উষা।”

সন্ধ্যার প্রতি সতৃপ্তনেত্রে দৃষ্টিপাত ক’রে মহিলাটি বললেন, “যেমন নাম, মূর্তিখানিও তেমনি।” তার পর সন্ধ্যার চিবুক স্পর্শ ক’রে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, “চললাম উষা, সুখে থেকো।”

যুক্তকরে সন্ধ্যা নমস্কার করলে, চক্ষে তার কৃতজ্ঞতার দীপ্তি।

মহিলাটি উঠে দাঁড়িয়ে প্রমথর প্রতি দৃষ্টিপাত ক’রে বললেন, “আপনার স্ত্রীভাগ্য ভাল।”

ঈষৎ বিমূঢ় ভাবে প্রমথ বললে, “কেন বলুন তো?”

সহাস্য মুখে মহিলাটি বললেন, “কেন, তা যদি এখনো না বুঝে থাকেন তো’ শীঘ্রই বুঝবেন। আমরা জিনিস দেখলে বুঝতে পারি। যত্নে রাখবেন।” তার পর একটু ব্যস্ত হয়ে বললেন, “রায়পুর থেকে আমার আত্মীয় আসছেন। ডিস্ট্যাণ্ট সিগনাল ডাউন হয়েছে, এখন তা হ’লে আসি।”

যুক্তকরে প্রমথ নমস্কার করলে। প্রতিনমস্কার ক’রে মহিলাটি দ্রুতপদে প্রস্থান করলেন।

সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক’রে প্রমথ বললে, “সময় পাওয়া গেল না উষা, নইলে স্ত্রীভাগ্য আমার কি রকম ভাল, তা ভাল ক’রেই বুঝিয়ে দিতে পারতাম। যে ফুল এ পর্যন্ত ফুটল না, আর সম্ভবত কোনোদিনই ফুটবে না, সে ফুলের সুগন্ধের উনি প্রশংসা ক’রে গেলেন। তবে তুমি যে ভাল, সে অনুমান ওঁর ভুল হয় নি; সে বিষয়ে উনি পাকা জহুরীর পরিচয় দিয়েছেন। আচ্ছা চল, এবার আমরা গাড়িতে গিয়ে বসি।” ব’লে জিনিস-পত্র ও সন্ধ্যাকে নিয়ে প্রমথ প্ল্যাট্‌ফর্মের সন্নিকটে অবস্থিত কাট্‌নি যাবার গাড়িতে গিয়ে প্রবেশ করলে।

বিলাসপুর থেকে কাট্‌নি পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল, এবং সেখানে গাড়ি পরিবর্তন ক’রে পরদিন প্রত্যূষে পাঁচটার সময়ে প্রমথ ও সন্ধ্যা এলাহাবাদে উপনীত হ’ল।

প্রমথ বললে, "উষা, কি করবে বল? কাশী গেলে সেখানে পৌঁছতে একটু বেলা হয়ে যাবে, এগারটা সাড়ে এগারটার কম হবে না। হয়তো তোমার কষ্ট হবে। এলাহাবাদে আজ থাকবে? সুবিধে আছে থাকবার।"

সন্ধ্যা বললে, "আমার কষ্ট হবে না। আপনার যদি কষ্ট হয়, তা হ'লে না হয় থাকুন।"

প্রমথ বললে, "আমারও কষ্ট হবে না। কিন্তু তুমি যদি কাশী পৌঁছে প্রথমেই বিশ্বেশ্বর দর্শন কর, তা হ'লে তো আরও বেলা হয়ে যাবে। অতক্ষণ উপোস ক'রে থাকলে নিশ্চয়ই কষ্ট হবে।"

সন্ধ্যা বললে, "না, কষ্ট হবে না। আপনি কিন্তু চা-টা খেয়ে নিন"

প্রমথ বললে, "ক্ষেপেছ? এক যাত্রায় পৃথক ফল কিছুতেই হতে দেওয়া হবে না। তুমি উপবাসী থেকে বিশ্বেশ্বর দর্শন ক'রে পুণ্য অর্জন করবে, আর আমি চা-পাউরুটি পেটে পুরে গিয়ে নন্দীভৃঙ্গীর লাঠির গুঁতো খাব—এ সহ্য করতে পারব না। অতএব আমারও অদৃষ্টে আজ পুণ্য অর্জন আছে।"

বেনারস ক্যান্টনমেণ্টে যখন গাড়ি পৌঁছল, তখন বেলা এগারটা উত্তীর্ণ হয়েছে। সেখান থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে প্রমথ ও সন্ধ্যা গোধুলিয়ার একটা ত্রিতল গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হ'ল। ঘন ঘন হর্নের শব্দ শুনে একজন পশ্চিমা ভৃত্য বেরিয়ে এল, তারপর প্রমথকে দেখেই দ্রুতপদে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করল।

মিনিট খানেক পরে একজন মধ্যবয়স্কা স্ত্রীলোক বেরিয়ে এসে গাড়ির ভিতর প্রমথকে দেখে উৎফুল্ল মুখে বললে, "ও মা, তুমি এসেছ! আর মুখপোড়া বিশুয়াটা গিয়ে বললে কি-না যে, বলদেঘাটার জমিদারবাবু এসেছে!"

স্মিতমুখে প্রমথ বললে, "মুখপোড়া বিশুয়া তো তা হ'লে তোমাকে ভারি নিরাশ করেছে মাসী! এসে দেখলে কি-না বলদেঘাটাব জমিদারবাবুর বদলে কলকাতার ফতো বাবু!"

মাসী বললে, "তোমার মতো ফতো বাবুর পকেটে অমন দশ-বারোটা

বলদেঘাটার জমিদারবাবু পোরা থাকে। কিন্তু গাড়িতে ব'সে কেন ?—এস, নেমে এস।”

পকেট থেকে দশখানা দশ টাকার নোট বার ক'রে মাসীর হাতে দিয়ে প্রমথ বললে, “না মাসী, এবার আর এখানে থাকা চলবে না। তুমি এখনি একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হাওয়াদার বাড়ি এক মাসের জন্যে ভাড়া ক'রে ফেল। আর একজন রাঁধুনী, একজন চাকর, একজন ঝি,—আর মোটামুটি সংসারের যা যা জিনিস-পত্রেব দরকার, ব্যবস্থা ক'রে দাও।'

বিস্মিত হয়ে মাসী বললে, “কিন্তু এ সবের কি দরকার তা তো বুঝতে পারছি নে। তেতলায় তোমার তিনখানা বড় বড় ঘর আছে, নিত্যি ঝাঁট সন্ধ্যে পড়ে, সারাদিন দোর জানলা খোলা থাকে,—পাঁচ বছর ধ'রে তুমি ভাড়া দিয়ে রেখেছ। তবে আবার একটা আলাদা বাড়ির কি দরকার ?”

প্রমথ বললে, “ও যেমন আছে থাক মাসী, এবার একটা আলাদা বাড়িই চাই।”

প্রমথর কথায় সন্ধ্যাকে একটু ভাল ক'রে নিরীক্ষণ ক'রে মাসী সহসা বললে, “বুঝেছি এখন। বউমা ? বিয়ে করেছ ? তা খুবই সুখের কথা, কিন্তু আমি এবার ছাড়ছি নে বাছা, এক জোড়া গরদের শাড়ি, আব গলার জন্যে এক ছড়া পবিত্তির হাব আমার চাইই। মাদুলিটা সদা-সর্বদা খুলে খুলে প'ড়ে যায়, একটা হার হ'লে সুবিধে হয়।”

প্রমথ বললে, “আচ্ছা মাসী, সে সবের জন্যে চিন্তা নেই, সে যা-হয় হবে অখন, উপস্থিত আমরা শঙ্কর পাণ্ডার বাড়ি চললাম, সেখানে গঙ্গাস্নান সেরে, বিশ্বেশ্বর দর্শন ক'রে প্রসাদ পাব। তার পর সমস্ত দিনটা বজরায় কাটিয়ে সন্ধ্যার সময়ে তোমার কাছে আসব। জিনিস-পত্রগুলো নামিয়ে রেখে দাও।”

“স্নানের পর কাপড় চোপড় ?”

“সে একটা পুঁটলি বেঁধে নেওয়া হয়েছে।”

নিকটেই বিশুয়া ছিল, জিনিস-পত্র নাবিয়ে নিলে।

প্রমথ বললে, "যেমন বললাম সব যেন ঠিক থাকে মাসী।"

হাসিমুখে মাসী বললে, "সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থেকো,—তোমার মানদা মাসীর হাতে আধখানা কাশী আছে।"

"আর কিছু টাকা দোব ?".

মাসী বললে, "ওমা, সে কি কথা! লক্ষ্মীকে 'না' বলতে আছে কি ? দেবে দাও।"

সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে অস্ফুট কণ্ঠে প্রমথ বললে, "আর যাই বল, মাসীকে নাস্তিক বলতে পারবে না।" তার পর আর পাঁচখানা নোট মানদা মাসীর হাতে দিয়ে গাড়ি চালাতে আদেশ দিলে।

মাসী যে একজন 'কাশীবাসিনী মাসী', এর বেশি পরিচয় দেবার বোধ হয় প্রয়োজন নেই। প্রমথ তার একজন শাঁসাল যজমান। শৌখিন জীবন যাপনের ব্যাপারে এই সব কাশীবাসিনী মাসীরা প্রমথর মত ধনী যুবকদের অভিভাবিকা।

সন্ধ্যা আসন্ন। মানদার গৃহ থেকে একজন লোক সঙ্গে নিয়ে প্রমথ সন্ধ্যার সহিত তার নব-নিযুক্ত গৃহে উপস্থিত হ'ল। গৃহটি ছোট, কিন্তু পরিচ্ছন্ন। দ্বিতলে তিনটি শয়নকক্ষ এবং পূর্বদিকে একটি সুপ্রশস্ত বারান্দা। পাশে এক দিকে কল-পাইখানার ব্যবস্থা। বারান্দার এক প্রান্ত দিয়ে নীচু-ধাপের সিঁড়ি, যা কাশীতে খুব সুলভ নয়, নিম্নে নেবে গিয়েছে।

মানদার কাযতৎপতার গুণে এই অল্প সময়ের মধ্যে ধোয়া মোছা, উপরের তিনটি ঘর ও বারান্দা চুনকাম করা থেকে আরম্ভ ক'রে ঘরে ঘরে আসবাব-পত্র সাজানো, ভাঁড়ার ঘরের দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা প্রভৃতি যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। তার নিজ গৃহে প্রমথর তিনটি ঘরে আসবাব-পত্র নিতান্ত অল্প ছিল না, তার অধিকাংশই আনিয়ে নিয়েছে। বাকি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মধ্যে কতক সে নিজের থেকে উপস্থিত দিয়েছে এবং কতক প্রমথর অর্থে ক্রয় করেছে।

গৃহমধ্যে প্রবেশ ক'রে চতুর্দিকে শৃঙ্খলা এবং পরিচ্ছন্নতা দেখে প্রমথর মন প্রসন্ন হয়ে উঠল। রান্নাঘরের সম্মুখে বারান্দায় ব'সে বিশুয়া নবনিযুক্তা পরিচারিকা কামিনীর সহিত ঘনিষ্ঠতা বিস্তারে মনোযোগী ছিল, প্রমথ ও সন্ধ্যাকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে মৃদুকণ্ঠে কামিনীকে বললে, "বাবু এসেছেন।"

উঠানে নেমে প্রমথ ও সন্ধ্যাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে কামিনী প্রণাম করলে, তার পর উঠে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যাকে সম্বোধন ক'রে বললে, "মা, চায়ের জল চড়িয়ে দোব কি ?"

যে ধারণার বশবর্তী হয়ে এই মাতৃ-সম্বোধন উদ্ভূত, তা স্মরণ ক'রে সন্ধ্যা

প্রথমটা ক্ষণকাল লজ্জায় মূক হয়ে রইল, কিন্তু সমস্ত দিনের নানা প্রকার হাঙ্গামা এবং পরিশ্রমের পর গৃহে এসে দু-এক পেয়ালা চা, অন্তত প্রমথর পক্ষে, এতই প্রয়োজনীয় বস্তু যে, সে-বিষয়ে কোনো প্রকার আদেশ না দিয়ে নিরুত্তর থাকার লজ্জাটাও কিছু কম নয় মনে ক'রে মৃদুস্বরে বললে, "দাও।"

কামিনী বললে, "চায়ের সঙ্গে খাবারের কি ব্যবস্থা করব মা?"

সন্ধ্যা চিন্তিত হ'ল। এ প্রশ্ন পূর্বপ্রশ্নের মতো সরল নয়, এবং দু-একটি বাক্যের সাহায্যে উত্তর দিয়ে একে শেষ করা শক্ত। প্রমথ দয়াপরবশ হয়ে সন্ধ্যাকে তার সঙ্কট থেকে উদ্ধার করলে। কামিনীকে সম্বোধন ক'রে বললে, "মাসী কোথায়?—মানদা মাসী?"

"দোতলায় আছেন বাবা।"

"তা হ'লে কিছু ভাবতে হবে না, তিনি সব ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন।" ব'লে সন্ধ্যার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "চল উষা, আমরা উপরে যাই।"

প্রমথ ও সন্ধ্যা দ্বিতলে উপনীত হ'লে মানদা দক্ষিণ প্রান্তের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে উভয়কে দেখে সহাস্যমুখে বললে, "এলে? সারাদিন ঘুরে ঘুরে খুব কষ্ট হয়েছে?"

প্রমথ বললে, "কষ্ট কি মাসী? খুব আনন্দেই দিনটা কেটেছে।"

স্মিতমুখে মাসী বললে, "তোমার তো আনন্দে কাটবেই বাবা, অমন লক্ষ্মী-পিরতিমের মতো বউ পাশে থাকলে কষ্টকে কষ্ট ব'লে মনে হয় কি?"

প্রমথ বললে, "লক্ষ্মী-পিরতিমের মতো কি মাসী? কাশীতে কি ও কথা বলতে আছে?"

বিস্মিত-স্মিত মুখে প্রমথর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে মানদা বললে, "কেন?—কি বলতে হয়?"

"বলতে হয় অন্নপুন্নোর মতো।"

মানদা বললে, "সে কথা সত্যি। পিছন দিকে একটা চাল-চিত্তির রেখে

দিলে তাই ব'লেই মনে হয়। এ জিনিস তুমি কোথা থেকে খুঁজে বার করলে বাবা?"

প্রমথ বললে, "সে কথা তোমাকে আর একদিন নিশ্চিন্ত হয়ে বলব মাসী, এখন তাড়াতাড়ি চা-টার একটু ব্যবস্থা ক'রে দাও।"

মানদা বললে, "কামিনীকে বলা আছে, তোমরা এলেই সে চায়ের জল চড়িয়ে দেবে। তোমরা এই তিনটে ঘর দেখতে দেখতেই সব এসে পড়বে অখন। ততক্ষণ এস, এই ঘরটা থেকেই আরম্ভ করি। এইটে তোমাদের শোবার ঘর।" ব'লে মানদা দক্ষিণ দিকের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে।

প্রমথ মানদার পিছনে পিছনে প্রবেশ করলে, সন্ধ্যা কিন্তু বারান্দার রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইল।

মানদা দেখতে পেয়ে দ্বারের কাছে এসে বললে, "একা ওখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন বউমা? ভেতরে এস। এ তো তোমার ঘর, তোমার সংসার, নিজে দেখে শুনে নাও।"

অগত্যা সন্ধ্যা ঈষৎ সঙ্কুচিতভাবে ঘরের ভিতর প্রবেশ করলে।

ঘরটি প্রশস্ত, কিন্তু ঘরের মধ্যে মাত্র তিনটি আসবাব,—একটি পালঙ্ক, ছোট একটি কাঠের আলনা এবং ঘরের এক কোণে একটি ড্রেসিং টেবিল,—অর্থাৎ কেবলমাত্র নিশা যাপনের জন্য যা একান্ত প্রয়োজনীয়, তা-ই। সুবৃহৎ পালঙ্কে দুগ্ধশুভ্র শয্যা, তদুপরি দুইটি মাথার এবং তিনটি পাশের বালিশ পাশাপাশি রাখা। শয্যা রচনা তখনো শেষ হয় নি, একজন পশ্চিমা ভৃত্য আস্তরণের বিলম্বিত অংশ গদির তলায় মুড়ে দিচ্ছিল।

মানদা বললে, "এই তোমাদের চাকর থাকবে। বিরিঞ্চি, আমার জানা লোক, বিশ্বেসী,—তবে একটু বোকা।"

বিরিঞ্চি বাংলা ভাল বলতে পারে না, কিন্তু বুঝতে পারে অনেকটা, তাই এ দোষারোপ সে একেবারে অপ্রতিবাদে পরিপাক করলে না, জিহ্বা-

তালুর সংযোগে একটা মতভেদসূচক শব্দ নির্গত ক'রে বললে, "নেই, নেই, মায়জী। চালাক ভী আছে।

মানদা হঠাৎ চিৎকার ক'রে উঠল, "চালাক ভী আছে, না তোর মাথা ভী আছে! পই পই ক'রে ব'লে দিলাম যে, নীল ফুলওয়ালা ওয়াড়ের বালিশটা ডানদিকে দিবি, আর লাল ফুলেরটা বাঁ দিকে; তা না, ভেবে চিন্তে ঠিক উল্টোটি ক'রে রেখেছে! একটু নড়েছি কি অমনি ভুল!"

ঈষৎ ঘাড় বেঁকিয়ে ক্ষণকাল বালিশ দুটির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আবদ্ধ রেখে ক্ষিপ্রগতিতে বিরিঞ্চি পালঙ্কের পাদদেশে এসে দক্ষিণ ও বাম হস্ত সম্মুখে প্রসারিত ক'রে যা বললে, তা শুনে মানদা হেসে লুটিয়ে পড়ল।

বিরিঞ্চির কৈফিয়তের মর্ম কিছুমাত্র বুঝতে না পেরেও মানদার হাসির দাপট দেখে প্রমথ হেসে ফেলে বললে, "কি বলে ও মাসী?"

তেমনি হাসতে হাসতে মানদা বললে, "বলে, পাছতলায় দাঁড়িয়ে দুই হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলে নীল ফুলওয়ালা বালিস ডান দিকে পড়বে আর লাল ফুলওয়ালা পড়বে বাঁ দিকে। ডান-বাঁয়ের কি টনটনে জ্ঞান দেখ দেখি বাছা!"

শুনে প্রমথ হাসতে লাগল; বললে, "সে যাই বল মাসী, বিরিঞ্চি আজ তোমাকে হারিয়েছে।"

"হারিয়েছে ব'লে হারিয়েছে, বিষম হারিয়েছে।" ব'লে মানদা নিজে বালিষ দুটো উল্টে দিয়ে বিরিঞ্চিকে বললে, "খুব হয়েছে। এখন যা, নীচে গিয়ে তুই আর কামিনী দুজনে মিলে চা আর খাবার নিয়ে আয়,— ঠাকুরের কাছে খাবার ঠিক করা আছে।" তার পর প্রমথকে সম্বোধন ক'রে বললে, "এ খাটটা চিনতে পারছ তো বাবা? এ তোমারই নিজের খাট, ও-বাড়ি থেকে আনিয়েছি। খুব চওড়া, দুজনের শুতে একটুও কষ্ট হবে না।"

একটু অপ্রসন্ন স্বরে প্রমথ বললে, "এ-সব হাঙ্গামা আজই করবার দরকার ছিল কি মাসী; পরে হ'লেই তো হ'ত।"

সবিস্ময়ে মানদা বললে, "শোন কথা! নিজের এমন পালং থাকতে ভুঁয়ে শুতে হবে না-কি? চাবি দিয়ে খাটখানা খুলে কুলীরা এখানে এনে খাটিয়ে দিয়েছে—হাঙ্গামা তো এই।" তার পর হঠাৎ বিরিঞ্চির কথা মনে প'ড়ে গিয়ে আবার হাসতে লাগল, বললে, "বিরিঞ্চিটা আজ কিন্তু ভারি হাসিয়েছে। ডান-বাঁয়ের মর্ম খুব বুঝেছিল যা হোক!

এ কথার উত্তরে কোনো কথা না ব'লে চকিতে একবার সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে প্রমথ বললে, "চল মাসী, এবার ও-ঘরটা দেখিগে।"

বিরিঞ্চিকে নিয়ে যখন হাস্যকৌতুকের একটা অভিনয় চলছিল, তখন তারই মধ্যে এক সময়ে সন্ধ্যা নিঃশব্দে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। একই পালঙ্কের উপর পাশাপাশি দুটো মাথার বালিশ দেখে আতঙ্কে তার প্রাণ উড়ে গিয়েছিল। তবে আর বাকি কী রইল। মাকড়সা যখন এক পাকে জড়িয়েছে, তখন দেখতে দেখতে শত পাক সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। আজ আর রেলগাড়ির কক্ষে রাত্রি যাপন নয়,—আজ সে প্রমথর অচল অনড় গৃহ-কারাগারে বন্দিনী। আজ রাত্রে যথার্থ পদ-মর্যাদায় তার অভিষেক হয়ে যাবে। হায় ভগবান, কপালে এতও ছিল! নিজের অবনত অসহায় অবস্থা উপলব্ধি ক'রে সন্ধ্যার দুই চক্ষু ফেটে অশ্রু ঝ'রে পড়ল।

"উষা!"

তাড়াতাড়ি বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছে ফেলে সন্ধ্যা ফিরে চাইলে।

স্নিগ্ধকণ্ঠে প্রমথ বললে, "এবার ও-ঘরটা দেখিগে চল।" তার পর সন্ধ্যা নিকটে এলে তার কানের অতি-নিকটে মুখ নিয়ে গিয়ে মৃদুস্বরে বললে, "ও-সব দেখে ভয় পেয়ো না,—নিশ্চিন্ত থাক।"

ঘরের ভিতর দিয়ে দিয়ে তিনটে ঘরেই যাওয়া যায়। দ্বিতীয় কক্ষে

প্রবেশ করতেই মানদা বললে, "এইটে তোমাদের বসবার ও কাজকর্ম করবার ঘর।"

কক্ষের মধ্যস্থলে একটা টেবিল, তার চার দিকে চারটে চেয়ার, ঘরের এক পাশে দুটো ঈজি-চেয়ার এবং অপর দিকে একটা প্রশস্ত সোফা।

তৃতীয় ঘরে স্যুট্‌কেস, বাক্স ইত্যাদি যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সজ্জিত এবং নিত্যব্যবহার্য বস্ত্রাদির জন্য দুটো কাঠের আলনা।

সব দেখে শুনে প্রসন্নমুখে প্রমথ বললে, "না মাসী, তোমার বাড়িটিও পছন্দসই,—আর ব্যবস্থাপত্র যা করেছ তার মধ্যেও ত্রুটি ধরবার কিছু নেই।"

প্রমথর প্রশংসা শুনে মানদা আনন্দিত হ'ল; বললে, "পরিশ্রমের মর্যাদা তুমি বোঝ বাবা, তাই তোমার কাজে পরিশ্রম ক'রে সুখ আছে।" তার পর বারান্দার দিকে তাকিয়ে বললে, "ওই তোমাদের চা-টা বোধ হয় নিয়ে এল,—কলের ঘরে গিয়ে চট্ ক'রে হাত মুখ ধুয়ে এস।" ব'লে মানদা চায়ের ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করতে তাড়াতাড়ি বারান্দায় বেরিয়ে গেল।

চা পান শেষ হ'লে প্রমথ মানদাকে বললে, "মাসী, অনেক পরিশ্রম তুমি করেছ, এবার বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম কর।"

মানদা বললে, "মনে করছিলাম তোমাদের খাইয়ে-দাইয়ে তার পর যাব।"

মাথা নেড়ে প্রমথ বললে, "না না, মাসী, তার এখনো অনেক দেরি আছে। আমার কথা শোন, বাড়ি গিয়ে একটু বিশ্রাম কর। কাল সকালে একবার না হয় এসে বাকি যা করবার আছে শেষ ক'রে যেয়ো।"

মানদা প্রমথর ধাতও জানত, সুরও চিনত; বুঝতে বিলম্ব হ'ল না যে, অনুরোধের আকারে হ'লেও বস্তুত এ আদেশ; বললে, "ওমা, কাল সকালে আসব বইকি! কিন্তু বাবা, তোমার টাকার হিসেবটা?"

"করেছ?"

"এখনো তো সব জিনিসের দাম দেওয়া হয় নি, তাই করা হয় নি।"

প্রমথ বললে, "যদি বেশি খরচ হয়েছে ব'লে মনে হয়, তা হ'লে হিসেব ক'রে কাল বাকিটা আমার কাছ থেকে নিয়ে নিয়ো। আর তা যদি না হয়, তা হ'লে কেন আর মিছে কষ্ট ক'রে হিসেব করতে যাবে?"

"আচ্ছা, সে যা হয় কাল হবে।" ব'লে মানদা প্রস্থান করলে, কিন্তু সিঁড়ির কাছ থেকে পুনরায় ফিরে এসে প্রমথর কানে কানে, মৃদুস্বরে একটা কথা বললে।

শুনে প্রমথ একটু উচ্ছ্বসিত স্বরে ব'লে উঠল, "এ তুমি কেন করেছ মাসী?—ও-জিনিস কিনতে তো আমি তোমাকে বলি নি। ও তুমি এখনি এখান থেকে নিয়ে যাও।"

একটু ইতস্তত ক'রে মানদা বললে, "অনেক পরিশ্রম হয়েছে, হঠাৎ যদি দরকার হয়—"

"তখন তোমার কাছ থেকে চেয়ে পাঠাব।"

"তা হ'লে আমার কাছেই ওটা রেখে দোব?"

প্রমথ বললে, "তা রাখতে পার, আর যদি তার চেয়েও ভাল ব্যবস্থা করতে চাও, তা হ'লে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ ক'রে বিশ্বনাথকে দান ক'রো।"

কপালে যুক্তকর স্পর্শ ক'রে মানদা মৃদুস্বরে বললে, "বিশ্বনাথ!" তার পর তৃতীয় কক্ষের গায়ে গা-আলমারি খুলে একটা বোতল বার ক'রে বস্ত্রাঞ্চলে ঢেকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেবে গেল।

নিকটেই কোনো গৃহে ভাগবত পাঠ হচ্ছিল। পাঠের মাঝে মাঝে যে গান হচ্ছিল তার অস্পষ্ট ধ্বনি থেকেই বোঝা যাচ্ছিল যে, গায়ক একজন উচ্চশ্রেণীর গুণী। মানদা প্রস্থান করলে সঙ্গীতের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে সন্ধ্যা উত্তর প্রান্তের কক্ষের জানলার ধারে উপস্থিত হ'ল। সেখানে থেকে গান আরও একটু স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল।

মিনিট দশেক পরে প্রমথ সেখানে এসে দাঁড়াল। তখন অন্য একটা গান আরম্ভ হয়েছে। প্রমথ বললে, "বেশ গাচ্ছে, না উষা?"

সন্ধ্যা ঘাড় নেড়ে বললে, "চমৎকার গাচ্ছে।"

প্রমথ বললে, "সবিতা-বউদিদির মুখে শুনেছি তুমিও চমৎকার গাও। কাল তোমার গান-বাজনার সমস্ত যন্ত্রপাতি কিনে দোব, তার পর তোমার গান শোনা যাবে। কিন্তু সমস্ত দিন ঘোরা-ফেরা ক'রে তুমি নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছ ঊষা, তোমার ঘরে গিয়ে বিছানায় গা-টা একটু এলিয়ে দাও, সেখান থেকেও গান শুনতে পাবে।"

পরিশ্রান্ত সে সত্যই হয়েছিল,—শুধু দেহে নয়, মনেও। সমস্ত দিনটা নানাবিধ কাযকলাপের মধ্যে প্রমথর একান্ত সান্নিধ্যে অতিবাহিত ক'রে একটা কোনো নির্জন কক্ষের শয্যার উপর লুটিয়ে পড়বার জন্য সমস্ত দেহটা অবসন্ন হয়ে এসেছিল। এরূপ অবস্থায় প্রমথর প্রস্তাব লোভনীয়,—কিন্তু মানদার লালফুল নীলফুল বালিশের ব্যবস্থার কথা স্মরণ ক'রে মন উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল। দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, "কোন্ ঘরটা আমার?"

"কেন, মানদা মাসী প্রথম যে-ঘরটা দেখালে, সেইটে। দক্ষিণের ঘরটা।"

সঙ্কুচিত হয়ে সন্ধ্যা বললে, "সে ঘরে তো আপনার বিছানা হয়েছে—আপনি শোবেন।"

সন্ধ্যার কথা শুনে প্রমথ হাসতে লাগল বললে, "তুমি শুধু বয়সেই ছেলেমানুষ নও ঊষা, বুদ্ধিতেও তাই। স্বয়ং পুলিস-কমিশনার যখন তোমার সহায় তখন কন্স্টেবলের কাজ দেখে ভয় পাও কন? তা ছাড়া, মানদা মাসীর দোষ কোথায় বল? যে ভুল ধারণা ওঁর মনের মধ্যে রয়েছে তাতে ও-ভাবে বিছানা করা বিশেষ ভুল হয়েছিল কি? কিন্তু এখন দেখবে এস তো।" ব'লে প্রথম দক্ষিণ দিকের ঘরের দিকে অগ্রসর হ'ল।

প্রমথর পিছনে পিছনে এসে সন্ধ্যা দেখলে, পালঙ্কের উপর শয্যায় শুধু সেই

লালফুলযুক্ত মাথায় বালিশ, এবং তিনটের পরিবর্তে দুটো পাশ-বালিশ। সকৌতূহলে সে জিজ্ঞাসা করলে, "এখানে কে শোবে?"

"তুমি।"

"আর আপনি?"

"দেখবে এস।"

প্রমথর পিছনে পিছনে পাশের ঘরে গিয়ে সন্ধ্যা দেখলে, সোফার উপর সেই নীলফুলের বালিশ। সবিস্ময়ে বললে, "আপনি এই সোফায় শুয়ে রাত কাটাবেন?"

স্মিতমুখে প্রমথ বললে, "কাটাব।"

এক মুহূর্ত নির্বাক থেকে সন্ধ্যা বললে, "না, তা কিছুতেই হবে না, আমি এ-ঘরে শোব, আপনি ও-ঘরে খাটে শোবেন।"

তেমনি স্মিতমুখে প্রমথ বললে, "তুমি আমার মান্য অতিথি উষা। মনে মনে আশা রাখি, শেষ পর্যন্ত তোমার কাছ থেকে আতিথেয়তার একটা ভাল রকম সার্টিফিকেট আদায় করব। তুমি কি তার হন্তারক হতে চাও? এ বাড়ি যদি তোমার বাড়ি হ'ত, তা হ'লে আমাকে এ ঘরে শুইয়ে তুমি ও-ঘরে শুতে পারতে? কখনই পারতে না। তা ছাড়া আর একটা কথা আছে। এদিক থেকে লাগাবার জন্যে দরজার ছিটকিনি কিংবা হুড়কো নেই, কিন্তু ও-ঘর থেকে হুড়কো লাগিয়ে দেওয়া যায়। আমার ঘরে হঠাৎ ভুল ক'রেও কেউ এসে পড়তে পারে না, মনের মধ্যে এ নিশ্চয়তা থাকা ভারি আরামের জিনিস—বিশেষত তোমাদের—মেয়েদের পক্ষে। কাল তোমার সঙ্গে অনেক দরকারী কথা আছে, আজ কিন্তু আর একটিও নয়। যাও, শুয়ে পড়। রাত্রে খাবার তৈয়ের হ'লে আমি তোমাকে ডাকব অখন।

একবার প্রমথর প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে সন্ধ্যা ধীরে ধীরে ও-ঘরে গিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিলে। একটু অপেক্ষা ক'রে প্রমথ দেখলে, হুড়কো লাগাবার

শব্দ হ'ল না,—দরজা একটু ঠেলে দেখলে, নিকটেই সন্ধ্যা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বললে, "হুড়কো লাগালে না?"

সন্ধ্যা বললে, "রাত্রে শোবার সময়ে লাগাব অখন।"

"তখন লাগিয়ো, এখনো লাগাও।" ব'লে প্রমথ দরজার পাল্লা দুটো টেনে দিলে।

ভিতরে খট্ ক'রে একটা শব্দ হ'ল। তখন পকেট থেকে সিগার-কেস বার ক'রে একটা সিগার ধরিয়ে প্রমথ সোফায় গিয়ে ব'সে নিঃশব্দে টান দিতে লাগল।

বাইশ

প্রত্যূষে যখন প্রমথর নিদ্রাভঙ্গ হ'ল, তখনো রাত্রির অন্ধকার সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নি। মুখ হাত পা ধুয়ে এসে একটা চুরুট ধরিয়ে সে সোফায় বসল। চেয়ে দেখে মনে হ'ল, সন্ধ্যার ঘরের দ্বার রুদ্ধই রয়েছে। মনে মনে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললে, প্রথম রাত্রিটা যে ভালয় ভালয় কেটে গেল, বাঁচা গেল।

নিজের মানসিক শক্তির দৃঢ়তার প্রতি আস্থার অভাব না থাকলেও এ কথাও তার অবিদিত ছিল না যে, সাধু-সঙ্কল্পের দণ্ডাঘাতে বিতাড়িত হয়ে বাসনা-কামনার যে হাঙ্গর-কুমীরগুলো চিত্তের সুগভীর প্রদেশে নিঃশব্দে সঞ্চরণ করছিল তাদের শক্তিও কম প্রবল নয়, এবং সুযোগ লাভ করলে যে-কোনো মুহূর্তে তারা উপরে ভেসে উঠে অনর্থ ঘটাতে পারে। রাত্রির নির্জনতা তেমনিই একটা সুযোগ। সুতরাং প্রথম রাত্রির বিষয়ে তার মনের মধ্যে সামান্য একটু উৎকণ্ঠা ছিল। সেই আশঙ্কার লগ্ন নির্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হয়ে আত্ম-জয়ের প্রসন্নতায় মনে মনে সে নিজের পিঠ ঠুকে দিয়ে বললে, "শাবাশ প্রমথ!"

কিন্তু এই শাবাশি সে কেমন ক'রে কোন্ শক্তির বলে অর্জন করলে, তা ভেবে তার মন বিস্ময়ে এবং কৌতূহলে আচ্ছন্ন হয়ে এল। তার চিত্তের অবচেতন মহলে যে আভিজাত্য এবং সুনীতিবোধ সুষুপ্ত ছিল, তা-ই সহসা জাগ্রত হয়ে উঠল,—না, অস্পর্শনীয় সন্ধ্যার অপরিমেয় চরিত্র-প্রভাব তার মনের সমস্ত দুষ্প্রবৃত্তিকে নিষ্ক্রিয় ক'রে দিলে তা সে কিছুতেই ভেবে পেলে না। মনে মনে বললে, দূর হোকগে ছাই, যেমন ক'রেই হোক এ যা হয়েছে খুবই ভাল হয়েছে; পাপ তো অনেকই করা গেছে, কিন্তু তাই ব'লে রক্ষক হবার ছল ক'রে ভক্ষক হওয়া—এত বড় পাপ কিছুতেই করা হবে না। কিন্তু মাত্র বৎসর দেড়েক পূর্বে কাঞ্চনপুরের বিনোদিনীর সম্পর্কে আশ্রিতকে রক্ষা করবার এ নীতিজ্ঞান

তার কোথায় ছিল আজ তা একেবারেই মনে পড়ল না। অথচ সেই বিনোদিনী এই কাশীতে তারই মাসহারায় জীবন যাপন করছে। মনে মনে মাথা নেড়ে বারম্বার সে বলতে লাগল, ক্ষেপেছ? কখনই না, কিছুতেই না। রক্ষক হয়ে ভক্ষক হওয়া—সে কিছুতেই হবে না। তার চেয়ে এবার একবার ভক্ষক হয়ে রক্ষক হওয়ার আস্বাদটা উপভোগ ক'রে দেখা যাক।

খুট্ ক'রে একটা শব্দ হ'ল। প্রমথ চেয়ে দেখলে, পাশের ঘরের দরজা খুলে সন্ধ্যা পাল্লা দুটোয় ছিটকানি লাগাচ্ছে।

"এস উষা।"

সন্ধ্যা প্রমথর ঘরে প্রবেশ করলে। একটা চেয়ার নির্দেশ ক'রে প্রমথ বললে, "ব'স।" সন্ধ্যা উপবেশন করলে জিজ্ঞাসা করলে, "কাল রাত্রে ঘুমের কোনো ব্যাঘাত হয় নি তো?"

সন্ধ্যা বললে, "না।" তার পর প্রমথর মুখের প্রতি দৃষ্টি উত্তোলিত ক'রে বললে, "আপনার নিশ্চয়ই হয়েছিল?"

"অনুমান করছ? না, দোর খুলে ঘরে এসে দেখে গিয়েছিলে?"

ঈষৎ আরক্তমুখে সন্ধ্যা বললে, "না, অনুমানই করছি।"

প্রমথ বললে, "অনুমান ভুল হচ্ছে। আমার ঘুম এত ব্যাঘাতশূন্য হয়েছিল যে, মনে মনে যে সঙ্কল্প ক'রে রেখেছিলাম—রাত্রে এক-আধবার বারান্দায় বেরিয়ে তোমার ঘরের সামনে পাহারা দিয়ে আসব, তা একবারও পেরে উঠি নি। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার ঘরের বারান্দার দিকের দরজা খুলে দিয়েছ কি?"

কি মনে ক'রে ঈষৎ অপ্রতিভ মুখে সন্ধ্যা বললে, "দিয়েছি।"

"দিয়েছ, ভালই করেছ। কিন্তু তুমি যদি হ'লে আধ মিনিট ব'স উষা, আমি চট্ ক'রে সেই ফাঁকে একটা কাজ সেরে নিই।" ব'লে তার মাথার বালিশটা নিয়ে সন্ধ্যার ঘরে গিয়ে সন্ধ্যার ও তার মাথার বালিশ দুটো পাশা-

পাশি স্থাপন ক'রে পাশ-বালিশটা শয্যার এক পাশে ঠেলে দিলে। সমস্ত পালঙ্কটা যৌথ নিশা-যাপনের একটা কপট পরিচয় বক্ষে ধারণ ক'রে মলিন হয়ে উঠল।

প্রমথর পিছনে পিছনে সন্ধ্যা দরজার নিকট এসে দাঁড়িয়ে ছিল। প্রমথ তার দিকে ফিরতেই সে বললে, "এ কিন্তু আমার ভাল লাগে না প্রমথদাদা।"

"কি ভাল লাগে না?"

"এই এ রকম ছল চাতুরী।"

প্রমথ এক মুহূর্ত নীরব থেকে ঈষৎ গভীর স্বরে বললে, "কিন্তু এ তো একমাত্র তোমার জন্যেই করছি উষা। নইলে আমারই কি এই বিনা শাঁসের খোলা চিবুতে ভাল লাগে? সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক যদি একেবারে বিচ্ছিন্ন করতে না পার, একটুমাত্র মোহও যদি মনের মধ্যে লেগে থাকে, তা হ'লে এ-রকম ছোট বড় আচরণের আশ্রয় নিতেই হবে। এই যে তুমি এখন থেকে আমাকে 'প্রমথদাদা' ব'লে ডাকতে আরম্ভ করলে, এও তো তাই-ই। নইলে আমি আর তোমার দাদা কোন হিসেবে বল? তা ছাড়া, এর দ্বারা শেষ পর্যন্ত কুফলই ফলবে। কাশীর তৃতীয়-ব্যক্তি-হীন বাড়িতে আমাকে 'দাদা' ব'লে সম্বোধন করলে সকলেই মনে মনে তোমাকে যা ব'লে স্থির ক'রে নেবে, আসলে তুমি তো সে বস্তু নও, অথচ তার মিথ্যা কলঙ্ক থেকে আমি তোমাকে বাঁচাতে চাই। চল, ও ঘরে গিয়ে বসা যাক।"

সোফায় উপবেশন ক'রে একটা চুরট ধরিয়ে প্রমথ বললে, "এ অবস্থায় একমাত্র যে পরিচয়ে তোমার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে, লোকে সহজ ভাবে সেই পরিচয়টাই ধ'রে নিচ্ছে। বিলাসপুর স্টেশনের সেই স্ত্রীলোকটির কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু অত-বড় ধূর্ত মেয়েমানুষ মানদা মাসীর কথা ভাব, সে তোমাকে আমার স্ত্রী ব'লে মনে করলে; শঙ্কর পাণ্ডা তোমার মুখের মধ্যে কি দেখতে পেলে জানি নে, কিন্তু জিজ্ঞাসা না ক'রেই একেবারে আমার

গোত্র ধ'রে তোমার সঙ্কল্প করিয়ে দিলে। স্ত্রীলোক সঙ্গে ক'রে তার কাছে যাওয়া এই আমার প্রথম নয়, কিন্তু এ রকম সে কোনো বারই তো করে নি। সকলেই তোমাকে বিবাহিত স্ত্রীর মর্যাদা দিচ্ছে উষা, আমি কেমন ক'রে তোমাকে সেখান থেকে নামিয়ে আনি? আমার না হ'লেও, তুমি একজনের বিবাহিত স্ত্রী তো নিশ্চয়ই—রক্ষিতা তুমি কারোই নও। কিন্তু এ তুমি নিশ্চয় জেনো, তুমি যদি আমাকে 'প্রমথদাদা' ব'লে ডাকতে আরম্ভ কর তা হ'লে কেউ তোমাকে তা ছাড়া আর কিছু মনে করবে না। এখন যারা তোমাকে অন্তরে বাইরে শ্রদ্ধা করছে, সম্মান করছে, সেই দাস-দাসী বামুন-চাকর থেকে আরম্ভ ক'রে মানদা মাসী শঙ্কর পাণ্ডা পর্যন্ত সকলেই তখন মনে মনে তোমাকে করুণা করবে, হয়তো একটু ঘৃণাও করবে। তুমি আমার জীবনে মান্য অতিথি উষা, তোমার এ অকারণ অমর্যাদা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না। তা যদি পারতাম, তা হ'লে কাল সমস্ত দিন নৌকোয় না কাটিয়ে তোমাকে নিয়ে সোজাসুজি মানদা মাসীর বাড়িতেই উঠতাম, এত হাঙ্গামার মধ্যে যেতাম না।"

প্রমথর কথার ভিতর কোন এক মুহূর্তে অতর্কিতে সন্ধ্যার চোখের কোণে অশ্রু সঞ্চিত হয়েছিল, হঠাৎ ঝরঝর ক'রে ঝ'রে পড়ল। বস্ত্রাঞ্চল দিয়ে চক্ষু মুছে দুঃখার্ত কণ্ঠে সে বললে, "সত্যি। কি বিব্রতই না আপনাকে করেছি!"

সন্ধ্যার কথা শুনে এক মুহূর্ত নির্বাক থেকে তো‍য় বললে, "না, এ সত্যি নয়। কিন্তু সত্যি যা তা যদি সহজে বিশ্বাসযোগ্য না হয়, তা হ'লে সে কথা কাউকে বলতে নেই, মনে মনে রাখতে হয়—এ হচ্ছে শাস্ত্রের উপদেশ। কিন্তু তুমি কাঁদলে কেন উষা? আমি তো তোমার মনে কষ্ট দেবার জন্যে কোনো কথা বলি নি। তবে তোমার এ দুঃখ কিসের?"

একটু ইতস্তত ক'রে মৃদুস্বরে সন্ধ্যা বললে, "আপনার আশ্রয়ে আমার নিজের যথার্থ পরিচয়ে বাস করবার সুবিধে হ'ল না—এই আমার দুঃখ।"

ঈষৎ মাথা নেড়ে প্রমথ বললে, "বুঝেছি। আমার নিজের দিক থেকে তাতে বিশেষ কিছু আপত্তি নেই উষা, কারণ সমাজকে আমি বহুদিন থেকেই বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে আসছি, কিন্তু তোমার যথার্থ পরিচয়ে এ বাড়িতে বাস করা তোমার পক্ষে সুবিধের হবে কি-না সেইটেই হচ্ছে কথা। আমার মনে হয়, এই কথাটা স্থির করবার জন্যে আগে একটা পরীক্ষা হয়ে যাওয়া ভাল।"

সকৌতূহলে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "কি পরীক্ষা?"

প্রমথ বললে, "মাথার বালিশ নিয়ে উপস্থিত যখন কথাটা উঠেছে তখন সেইটে দিয়েই পরীক্ষা হোক। আমার মুখ ধোয়া-টোয়া হয়ে গেছে, মিনিট কুড়ি-পঁচিশ মর্নিং ওয়াক ক'রে আসি। তুমি ততক্ষণে মুখ-হাত-পা ধুয়ে চা খাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে নাও, আর তার আগে আমাদের মাথার বালিশ দুটো, প্রয়োজন বোধ করলে বিছানার অন্যান্য জিনিসও, এ দুটো ঘরের এমন জায়গায় এমন ভাবে রেখে দাও যা দেখলে স্পষ্ট দেখা যায় যে, রাত্রে তুমি আর আমি পৃথক ঘরে পৃথক শয্যায় শুয়েছিলাম, সুতরাং খুব সম্ভবত আমরা স্বামী-স্ত্রী নই। তার পর সুবিধামতো একদিন মানদা মাসীর কাছে তোমার জীবন-বৃত্তান্ত খুলে বলো। তা হ'লেই সমস্ত জিনিসটা একেবারে স্পষ্ট হয়ে যাবে। কেমন?"

সন্ধ্যা শুধু একবার প্রমথর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে, কিছু বললে না।

পাশের ঘরে গিয়ে ছড়ি নিয়ে ফিরে এসে প্রমথ বললে, "উষা, তৈরি থেকো, বেড়িয়ে এসে একসঙ্গে চা খাব।" ব'লে আর একটা চুরুট ধরিয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

প্রমথ যখন ফিরে এল, তখন সন্ধ্যা বাথরুমে। কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে সন্ধ্যার ঘরে গিয়ে দেখলে, শয্যার অবস্থা সে যেমন ক'রে রেখেছিল ঠিক তাই আছে, সন্ধ্যা স্পর্শ পর্যন্ত করে নি। মনে মনে একটু হাস্য ক'রে নিজের ঘরে

এসে বসল। রাস্তা থেকে একটা খবরের কাগজ কিনে এনেছিল, তাতেই মনোনিবেশ করলে।

মিনিট পাঁচেক পরে বাথরুম থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে সন্ধ্যা প্রমথর ঘরে উঁকি মেরে দেখলে, প্রমথ ফিরে এসেছে। ঘরের ভিতর প্রবেশ ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনার চা আর খাবার আনতে বলব ?"

প্রমথ বললে, "বল। কিন্তু শুধু আমার নয়, তোমারও।"

"আচ্ছা।" ব'লে সন্ধ্যা বেরিয়ে গেল।

কিন্তু চায়ের জন্য সন্ধ্যার বিশেষ কিছুই ব্যবস্থা করতে হ'ল না, শুনতে পাওয়া গেল নীচে মানদা বিষম তর্জন করছে, "আটটা বাজতে চলল, এখনো চা আর খাবার তৈরি হ'ল না! তবু না যদি কাল সমস্ত ব'লে ক'য়ে দেখিয়ে শুনিয়ে যেতুম! বিরিঞ্চি, শীগগির ওপরের বারান্দায় টেবিল চেয়ার পেতে আয়।

উপরে এসে সন্ধ্যার ঘরে প্রবেশ ক'রে মানদা চিৎকার ক'রে উঠল, "দেখেছ! কাণ্ড দেখেছ! বাসি বিছানা তেমনি প'ড়ে আছে, এখন পর্যন্ত হাত পড়ে নি! আর দুটো দিন দেখব, তার পর ঝেঁটিয়ে সব বিদেয় ক'রে একেবারে নতুন সেট আনব। ভাত ছড়ালে আবার কাকের অভাব!"

প্রমথর ঘরে মানদা প্রবেশ করতে প্রমথ বললে, "কি মাসী, সকালবেলা এসে একেবারে রণমূর্তি ধরলে কেন?"

মৃদু হেসে চাপা গলায় মানদা বললে, "রণমূর্তি কি সাধে ধরেছি! দু-তিনদিন এমন ক'রে তম্বি করলে সবগুলো সায়েস্তা হয়ে যাবে।" তার পর সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো বউমা?"

সন্ধ্যা মাথা নেড়ে বললে, "না।"

"রাত্রে বেশ ঘুম হয়েছিল।"

"হয়েছিল।"

কামিনী চা আর খাবার নিয়ে আসছিল, দেখতে পেয়ে মানদা বললে, "চা দিয়েছে, যাও, তোমরা খেতে যাও।"

চা খেতে খেতে প্রমথ বললে, "তোমার পরীক্ষার কি হ'ল উষা? পরীক্ষায় একেবারে হাজিরই হ'লে না? পরীক্ষাটা একটু গোলমেলে ঠেকল না কি?"

এতগুলো প্রশ্নের কোনোটারই উত্তর না দিয়ে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "আমরা এখানে কতদিন থাকব?"

"যতদিন তোমার ইচ্ছে।"

"কলকাতায় কবে যাব?"

"যে দিন তুমি বলবে।"

"লক্ষ্ণৌ যাবেন না?"

"বল তো যাই। সেখানে তো আমার নিজের বাড়িই রয়েছে। কিন্তু কাশী কি তোমার ভাল লাগছে না উষা?"

সন্ধ্যা মাথা নেড়ে বললে, "না, খারাপও লাগছে না।"

প্রমথ বললে, "তবে কাশীতেই দিন কতক থাকা যাক। থাকতে থাকতে দেখবে, কাশী নিতান্ত মন্দ জায়গা নয়। কিন্তু তোমার মন সহজ ক'রে নাও উষা, নইলে কোনো জায়গাই ভাল লাগবে না। নিজের যথার্থ পরিচয়ে এ বাড়িতে বাস করতেই যদি তোমার ভাল লাগে, তা হ'লে তাই না হয় আরম্ভ কর। আজ থেকে রাত্রে তোমার ঘরের মেজেয় কামিনী যাতে শোয় সে ব্যবস্থা ক'রে দোব। কেমন? না হ'লেই হবে তো?"

মুহূর্তের জন্য প্রমথর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "না, কামিনীর শোবার দরকার নেই, আমি একাই শোব।"

হর্ষোৎফুল্লমুখে প্রমথ বললে, "এই তো বীরত্বব্যঞ্জক কথা। না হয় কিছুদিনের জন্যে আমাকে পাতানো স্বামীতে বরণ করই না উষা। বিপদে পড়লে শত্রুকেও সেলাম করতে হয়, তোমার তো এ বিপদের কথাই নেই। এমন তো কত মেয়ে

দাদা, কাকা, মেসো, পিসে পাতাচ্ছে; তেমন প্রয়োজন হ'লে স্বামী পাতানোতেই বা দোষ কি? বিয়ের আগে তো খেলাঘরে কত মেয়ে সে সম্পর্কও পাতায়। তোমারও এ খেলাঘরই। তার পর সৌভাগ্যক্রমে যেদিন আসল স্বামী তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য আসবে, সেদিন খেলাঘরের এ পাতানো স্বামীকে ফেলে গেলেই হবে?" ব'লে প্রমথ হো-হো ক'রে হাসতে লাগল।

পাতানো স্বামীত্বের এই বিচিত্র তত্ত্ব শুনে সন্ধ্যার হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠল। মনে হ'ল, এই যেন তার ভবিষ্য জীবনের আভাস। প্রমথর ঘর তার খেলাঘর, এবং সেই খেলাঘরের ভিতরে প্রমথ তার পাতানো স্বামী—এই নিয়েই বাকি জীবনটা মিথ্যার অভিনয় ক'রে কাটাতে হবে। তার পর একদিন সৌভাগ্যক্রমে আসল স্বামী এসে উপস্থিত হবেন?—হায় রে! সে সৌভাগ্য চাচ্ছেই বা কে, আর পাচ্ছেই বা কে! একটা মর্মন্তুদ নৈরাশ্যে সন্ধ্যার হৃদয় উদাস হয়ে গেল। চোখের সম্মুখে শরৎ-প্রভাতের উজ্জ্বল আলোক হয়ে গেল স্তিমিত।

"উষা!"

সন্ধ্যা তার চিন্তা-স্বপ্ন থেকে জাগ্রত হয়ে বললে, "আজ্ঞে?"

"অলস হয়ে বাড়ি ব'সে কি হবে?—একটু বেড়াতে যাবে?"

"কোথায়?"

"এমনি—পায়ে পায়ে, পথে পথে।"

দুঃখ-মনস্তাপের মধ্যে প্রস্তাবটা সন্ধ্যার নিতান্ত মন্দ লাগল না; বললে, "চলুন।"

চা খাওয়া শেষ হ'য়ে গিয়েছিল, উভয়ে উঠে পড়ল। তারপর বেশভূষা পরিবর্তি ক'রে পথে বেরিয়ে প'ড়ে উভয়ে পাশ পাশি চলতে আরম্ভ করলে। যেতে যেতে প্রমথ বললে, "উষা, আমাদের জীবনটা একটা অভিনয়।"

একটু চুপ ক'রে থেকে সন্ধ্যা বললে, "সত্যি।"

প্রমথ বললে, "আমার সঙ্গে তোমার যে জীবন তাও অভিনয়, আবার প্রিয়লালের সঙ্গে তোমার যে জীবন হবে, তাও হবে অভিনয়। শুধু আমার সঙ্গে হচ্ছে ট্র্যাজেডি, আর তার সঙ্গে হবে কমেডি। বল, ঠিক কি-না?"

সন্ধ্যা কোনো উত্তর দিলে না। নীরবে চলতে লাগল।

"উষা!"

"আজ্ঞে?"

"ব্যাপার কি বল দেখি? একবার মাত্র ডেকে, আর আমাকে 'প্রমথদাদা' ব'লে ডাকছ না! কামিনীকে ঘরে শোয়াতে রাজী হ'লে না। শেষ পর্যন্ত নকল সম্পর্ক পাতাবারই মতলব নাকি?"

সন্ধ্যা তেমনি নীরবে চলতে লাগল। কোনো কথা বললে না।

সহাস্যমুখে প্রমথ বললে, "তোমার কোনো ভয় নেই উষ', যদিই সে সম্পর্ক পাতাও, তার কপট অভিনয় চলবে একমাত্র মানদা মাসীদের দলের সামনে, তোমার আমার মধ্যে চলবে বন্ধুর সহিত বন্ধুর অকপট অভিনয়। তোমার ভয় নেই।"

এ কথাতেও সন্ধ্যা কোনো কথা কইলে না, নতমুখে প্রমথর পাশে পাশে চলতে লাগল। আধ মাইলটাক পথ অতিক্রম করবার পর একটা বড় বাদ্য-যন্ত্রের দোকানের সম্মুখে উভয়ে উপনীত হ'ল।

প্রমথ বললে, "চল উষ', এই দোকান থেকে দু-একটা যন্ত্র কেনা যাক।"

সন্ধ্যা বললে, "কেন, কি হবে?"

"অবশ্য বাজানো হবে।"

"কে বাজাবে?"

"ধর, কখনো কখনো আমিই বাজাব।"

সকৌতূহলে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি বাজাতে পারেন?"

গম্ভীর মুখে প্রমথ বললে, "পারি নে, কিন্তু বাজাই।"

উত্তর শুনে সন্ধ্যার মুখে ক্ষীণ হাস্য স্ফুরিত হ'ল; বললে, "কিন্তু আমার জন্যে যদি হয়, তা হ'লে এ সব কেনার কোনো দরকার নেই। মিছে কতকগুলো টাকা নষ্ট করবেন না।"

প্রমথ বললে, "মিছে কেন বলছ উষা? আর নষ্টই বা কেন বলছ? আমার তো মনে হয়, দুঃখ কষ্ট মনস্তাপ ভুলে থাকবার পক্ষে সঙ্গীতের চেয়ে বড় জিনিস আর কিছু নেই। তোমার নিঃসঙ্গ বৈচিত্র্যহীন জীবনে সঙ্গীত একটা বড় রকমের অবলম্বন হবে। লক্ষ্মীটি, এস।" ব'লে প্রমথ দোকানের দিকে অগ্রসর হ'ল। অগত্যা সন্ধ্যাকে অনুসরণ করতেই হ'ল।

বেছে বেছে প্রমথ একটা হারমোনিয়ম, একটা এসরাজ, একটা সেতার এবং এক সেট বাঁয়া-তবলা কিনলে। পরীক্ষা করবার সময় সন্ধ্যার হাতের দুই-একটা টান এবং দু-চারটে ঝঙ্কার থেকেই প্রমথ তার নৈপুণ্যের পরিচয় পেলে। সকাল-সন্ধ্যায় সঙ্গীতমুখর গৃহের কথা মনে মনে কল্পনা ক'রে খুশিতে মন ভ'রে উঠল।

দাম হ'ল সবশুদ্ধ দু শো পঁচাশি টাকা। দোকানদারকে প্রমথ জিজ্ঞাসা করলে, "বেনারস ব্যাঙ্কের উপর চেক লিখে দিলে চলবে?"

দোকানদার একটু ইতস্তত করছে দেখে একজন কর্মচারী ত্বরিত পদে কাছে এসে কানে কানে কি বলতেই দোকানদার প্রসন্ন নিশ্চিন্ত মুখে বললে, "চলবে।" তার পর ক্যাশমেমো সই ক'রে প্রমথর হাতে দিয়ে বললে, "বছর খানেক আগে আমরা যে আপনার জন্যে সাড়ে তিন শো টাকা দামের একটা বক্স-হারমোনিয়ম ক'রে দিয়েছিলাম, সেটা কেমন বাজছে?"

প্রমথ বললে, "তা তো ঠিক বলতে পারিনে, যার কাছে আছে সেই বলতে পারে। সম্ভবত ভালই বাজছে। দেখুন, আমাকে আর একটা সেই রকম হারমোনিয়ম করিয়ে দিন। আমি এই এক্ষেত্র একটা চেকে পঞ্চাশ টাকা আগাম দিয়ে যাচ্ছি।"

দোকানদার বললে, "আগাম কিছুই দিতে হবে না। আপনি শুধু আমাকে আপনার ঠিকানাটা লিখে দিন। হারমোনিয়ম হ'লেই আপনার কাছে পাঠিয়ে দোব।"

গাড়িতে উঠে সন্ধ্যা বললে, "এত দাম দিয়ে আবার একটা হারমোনিয়ম করতে দিলেন কেন? ও-অর্ডার ক্যানসেল ক'রে দিন।"

প্রমথ হাসিমুখে বললে, "কিন্তু ও-হারমোনিয়মটাও যে তোমারই জন্যে করাচ্ছি—এ মনে করছ কিসের জোরে উষা?"

এ কথার উত্তর দেওয়া কঠিন, সুতরাং চুপ করতেই হ'ল।

অপরাহ্ণে অনেক সাধ্য-সাধনা উপরোধ-অনুরোধ ক'রে প্রমথ সন্ধ্যাকে এসরাজ বাজাতে রাজী করালে। সোফার উপর ব'সে সন্ধ্যা একটা ভীমপলশ্রীর আলাপ করছিল, আর প্রমথ তন্ময় হয়ে মুদিতনেত্রে ঈজি-চেয়ারে শুয়ে তাই শুনছিল, এমন সময়ে কামিনী এসে ডাকলে, "বাবা!"

চক্ষু উন্মীলিত ক'রে বিরক্তিমিশ্রিত স্বরে প্রমথ বললে, "কি?"

"একজন লোক দুটো টেরাঙ্কো নিয়ে এসেছে, নাম বললে শোভরাজ।"

মুহূর্তের মধ্যে প্রমথর মুখের বিরক্তির ভাব অপসৃত হ'ল; বললে, "শোভরাজ?" একটু চিন্তা ক'রে বললে, "এইখানেই নিয়ে এস। বিরিঞ্চিকে বল বাক্স দুটো এখানে তুলে আনবে।"

ভীমপলশ্রীর সুমধুর রেশ শূন্যপথে তখনো সম্পূর্ণ বিলীন হয় নি, ছড়টা এসরাজের গায়ে সংলগ্ন করতে করতে সন্ধ্যা বললে, "আমি হ'লে তা ও-ঘরে গিয়ে বসি?"

একটু অন্যমনস্কভাবে প্রমথ বললে, "তুমি? আচ্ছা, তাই না হয় একটু ব'স।"

ক্ষণকাল পরে শোভরাজ এসে তার ট্রাঙ্ক দুটি খুলে টেবিলের উপর কুড়ি-

পঁচিশখানা জড়োয়া অলঙ্কার সাজিয়ে ফেললে। হীরা মুক্তা চুনি পান্নার বিচিত্র প্রভায় টেবিলখানা অপরূপ রূপ ধারণ করলে।

বহুক্ষণ ধ'রে পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা ক'রে প্রমথ তা থেকে পাঁচখানা অলঙ্কার নির্বাচিত ক'রে নিয়ে সন্ধ্যার নিকট উপস্থিত হ'ল। বললে, "উষা, এগুলো তোমার জন্যে নিলাম।"

বিরক্তি-বিস্ময়মিশ্রিত স্বরে সন্ধ্যা বললে, "কেন নিলেন? এর তো আমার কোনো দরকার নেই! এ আপনি ফিরিয়ে দিন।"

প্রমথ বললে, "আচ্ছা, ফিরিয়ে না হয় দিচ্ছি, কিন্তু একটা কথা উষা, তুমি শুধু তোমার নিজের দরকারটাই দেখছ,—আমার দরকার দেখছ না?"

প্রমথর প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "আপনার আবার কি দরকার?"

প্রমথ বললে, "তোমাকে আমি আমার বাড়িতে যে পদে প্রতিষ্ঠিত করেছি, তার উপযুক্ত সাজ-সজ্জা অলঙ্কার দেওয়ার আমার একটা দায়িত্ব আছে। তার জন্যে তোমার কাছে আমার কোনো জবাবদিহি হয়তো নেই, কিন্তু তুমি ছাড়া আর সকলেরই কাছে আছে।"

একটু চুপ ক'রে থেকে সন্ধ্যা বললে, "এই শুধু আপনার দরকার?"

প্রমথ বললে, "এ ছাড়া আর যদি কিছু থাকে তো তা জেনে তোমার প্রয়োজন কি? যা বললাম, তাই কি যথেষ্ট নয়?"

বিষণ্ণ-গভীরকণ্ঠে সন্ধ্যা বললে, "তা হ'লে ফিরিয়ে কাজ নেই, রাখুন।"

প্রমথ বললে, "আর একটা উৎপীড়ন তোমার ওপর করতে হবে উষা।"

"কি, বলুন?"

"নিত্য ব্যবহারের মতো তোমার জন্যে এক সেট সোনার গহনা শোভারামকে অর্ডার দোব বলেছি,—তার মাপ দিতে হবে।"

"কি ক'রে দোব বলুন?"

"শোভরাজের কাছে নানা ফাঁদের মাপ আছে, ও-ই মাপ নেবে।"

"তা হ'লে ওর কাছে যেতে হবে কি ?"

"গেলেই ভাল হয়।"

"চলুন, যাই।"

শোভরাজ সন্ধ্যার অলঙ্কারের মাপ নিলে, তার পর জড়োয়া গহনাগুলোর রসিদ নিয়ে মনোনয়নের জন্য সেগুলো রেখে চ'লে গেল।

প্রমথ বললে, "গয়নাগুলো একবার প'রে দেখবে না ঊষা ?"

সন্ধ্যা বললে, "বলেন তো পরি।"

সাগ্রহে প্রমথ বললে, "পর না একবার।"

"আচ্ছা, আপনি বসুন। প'রে আসছি।"

পাশের ঘরে গিয়ে সন্ধ্যা হাতে পরলে চুনির চুড়ি আর হীরের ব্রেস্‌লেট, গলায় পরলে মুক্তার হার, কানে পরলে হীরার দুল, আঙুলে পরলে হীরার আংটি। কি মনে ভেবে আরশির সামনে গিয়ে একবার দাঁড়াল, স্তব্ধ হয়ে দর্পণের মধ্যে নিজ মূর্তি দেখতে দেখতে গাল বেয়ে কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। তার পর বস্ত্রাঞ্চলে চোখের জল ভাল ক'রে মুছে প্রমথর সম্মুখে এসে উপস্থিত হ'ল।

নির্নিমেষ নেত্রে ক্ষণকাল সন্ধ্যার দিকে চেয়ে থেকে প্রমথ বললে, "ঊষা, গয়না নিয়ে তোমাকে উত্ত্যক্ত ক'রে অপরাধ হয়তো কিছু করেছি, কিন্তু তা না করলে আরো কত বড় অপরাধ করতাম, জান ? প্রতিমার অঙ্গে রঙ ফলিয়ে তারপর সাজ না পরালে কারিগরের যে অপরাধ হয়, আমার সেই অপরাধ হ'ত। বিশ্বাস না হয়, একবার একটা আরশির সামনে গিয়ে দেখে এস।"

কোনো কথা না ব'লে সন্ধ্যা নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল।

"রাগ করেছ ঊষা ?"*

সন্ধ্যা বললে, "না।"

"অভিমান হয়েছে?"

একটুখানি ম্লান হাসি হেসে সন্ধ্যা বললে, "না, হয় নি।"

"তা যদি না হয়ে থাকে, তা হ'লে তখনকার শেষ-না-করা ভীমপলশ্রীটা আবার আরম্ভ কর না উষা, অবিশ্যি তোমাদের মতে ভীমপলশ্রীর লগ্ন যদি এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়ে গিয়ে না থাকে।" ব'লে প্রমথ এসরাজটা সন্ধ্যার দিকে এগিয়ে দিলে।

এসরাজটা হাতে তুলে নিয়ে সন্ধ্যা বললে; "গয়নাগুলো এখন খুলে রেখে দোব?"

সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে প্রমথ বললে, "থাক্ না একটু, ভারি চমৎকার দেখাচ্ছে। বিশেষ আপত্তি আছে কি?"

"না, তা নেই।" ব'লে সন্ধ্যা এসরাজ নিয়ে সোফার উপর উঠে বসল। তার পর ছড় দিয়ে তারের উপর একটা টান দিলে, নি সা গা মা পা—

এর পর দিন দুই-তিন ধ'রে অবিশ্রান্ত নানাবিধ দ্রব্যের আমদানিতে গৃহ পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে লাগল। লোহার আলমারি, কাঠের আলনা, ক্যাশ-বাক্স, গহনার বাক্স, তাঁতের শাড়ি, রেশমী শাড়ি, ব্লাউস পীস, সেলাই কল, গ্রামোফোন, প্রসাধন সামগ্রী,—জিনিস-পত্রের একটা যেন হুড়োহুড়ি প'ড়ে গেল। সন্ধ্যা ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, ফিরে ফিরে দেখে, কিন্তু কিছু বলে না।

এক সময়ে তাকে কাছে পেয়ে প্রমথ জিজ্ঞাসা করলে, "বিরক্ত হচ্ছ উষা?"

সন্ধ্যা বললে, "বিরক্ত কেন হব?"

"এই সব জিনিস-পত্র আসছে ব'লে? কই, আর কিছু প্রতিবাদ করছ না তো?"

সন্ধ্যা একটু চুপ ক'রে রইল, তার পর মৃদুস্বরে বললে, "আপনার বাড়ি আপনি জিনিস-পত্রে পূর্ণ করছেন, আমি তাতে প্রতিবাদ করব কেন?"

গভীর স্বরে প্রমথ বললে, "সে কথা সত্যি উষা। যদিও এ সমস্তই আমি তোমার জন্যে করছি, কিন্তু বস্তুত এ সব কিছুই তোমার নয়। কোনো দিন যদি তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে তোমার শ্বশুরবাড়ি থেকে পাইক-বরকন্দাজ এসে হাজির হয়, সেদিন তখনি এ খেলাঘর ভেঙে দিয়ে এর সমস্ত জিনিসই পিছনে ফেলে চ'লে যাবে। যে ব্যক্তি এ খেলাঘর গড়বার জন্যে উন্মত্ত হয়েছিল, যাবার তাড়াতাড়িতে হয়তো তার দিকে একবার ফিরে চাইবার কথাও মনে পড়বে না।"

সন্ধ্যা নিমেষের জন্য প্রমথর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে নতমুখে বললে, "আমাকে কি এমনই অকৃতজ্ঞ মনে করেন ?"

"অকৃতজ্ঞ কেন উষা ? পাতানো সম্পর্ক তো বেশি দূর পর্যন্ত শেকড় ফেলতে পারে না—তাই টান দিলে সহজেই সমূলে উপড়ে আসে। কিন্তু সে যাই হোক—সংসারে তো কোনো জিনিসই চিরদিন থাকে না, শেষ পর্যন্ত ভেঙে যায়ই। আমাদের এ খেলাঘর যতদিন না ভাঙছে ততদিন এর প্রতি একটু মন দাও না ?"

"কি করতে হবে বলুন ?"

প্রমথ হেসে ফেললে; বললে, "বেশ! আমাকে যদি ব'লে দিতে হয়, তা হ'লে আমাকেই তো মন দিতে হবে। ক্যাশ-বাক্সর টাকা-কড়ি থেকে এক পয়সা এ পর্যন্ত খরচ করেছ কি ?"

সন্ধ্যার মুখে অতি ক্ষীণ হাসি দেখা দিলে, বললে, "করি নি, কিন্তু আজ করব।"

"ক'রো।"

প্রমথর মুখের দিকে একবার দৃষ্টি উত্তোলিত ক'রে সন্ধ্যা সভয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "একটা কথা বলব ?"

"বল না।"

"এখান থেকে শুনে ঠিক তৃপ্তি হয় না, আজ সন্ধ্যাবেলার ভাগবত-পাঠ শুনতে যাব ?"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে প্রমথ বললে, "নিশ্চয় যাবে। এর জন্যে আবার অনুমতি চাচ্ছ কেন ? তুমি আমার বাড়িতে বন্দিনী—এ ধারণা তুমি মন থেকে মুছে ফেল উষা। বন্দিনী তুমি নও, তুমি আমার বন্ধু, সম্পূর্ণ স্বাধীন। তা ছাড়া ভাগবত-পাঠ শুনতে যাওয়া তো পুণ্যের কাজ। নিশ্চয় যাবে।"

"আপনি সঙ্গে যাবেন তো ?"

সহাস্যমুখে প্রমথ বললে, "ঐটি পারব না। প্রথমত, ধর্মের বক্তৃতা শুনতে শুনতে আমার হাঁফ ধরে; দ্বিতীয়ত, চড়া গলায় কড়া কীর্তন আধ ঘণ্টার বেশি আমি শুনতে পারি নে, মাথা ধরে। এ তো খুব কাছেই, বলতে গেলে পাশের বাড়ি। তুমি কামিনীকে সঙ্গে নিয়ে যেয়ো। মেয়েদের বসবার জায়গায় ব'সো, কোনো অসুবিধে হবে না।"

সন্ধ্যা বললে, "আচ্ছা।" তার পর প্রমথর মুখের দিকে চেয়ে বললে, "আপনি বাড়িতে থাকবেন ?"

"হ্যাঁ, বন্ধুহীন একা।"

সন্ধ্যার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল ; বললে, "এর জন্যে আপনার খাওয়া-দাওয়ার দেরি হয়ে যাবে না ?"

প্রমথ বললে, "কিছু দেরি হবে না, তুমি এলে দুজনে একসঙ্গে খাব। আর, 'দাওয়া' তো আলাদা আলাদা ঘরে, কিন্তু তার আগে একটা বেহাগের আলাপ শুনিয়ে দিতে হবে।"

আরক্তমুখে সন্ধ্যা বললে, "দোব।"

তেইশ

সন্ধ্যার পর কামিনীকে সঙ্গে নিয়ে সন্ধ্যা যখন ভাগবত-সভায় উপস্থিত হ'ল, তখন সবেমাত্র পাঠ আরম্ভ হয়েছে। চক-মেলানো প্রশস্ত গৃহাঙ্গণ। দুই দিকের বারান্দায় স্ত্রীলোকদের বসবার জায়গা এবং এক দিকের বারান্দায় এবং প্রাঙ্গণে পুরুষদের। পুণ্যকথা শ্রবণোৎকর্ণ নরনারীতে সমস্ত স্থান পূর্ণ হ'য়ে গেছে। কিন্তু সে জন্য সন্ধ্যার কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করতে হ'ল না; তার দেহের লাবণ্যে এবং বস্ত্রালঙ্কারের আভিজাত্যে আকৃষ্ট হয়ে পুরমহিলাদের মধ্যে একজন অগ্রসর হয়ে এসে সযত্নে তাকে হাত ধ'রে নিয়ে গিয়ে স্ত্রীলোকদের মধ্যে সম্মুখ শ্রেণীতে স্থান ক'রে বসিয়ে দিলে।

ভাগবত-পাঠকের নাম শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী। কাব্যে এবং ন্যায়শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন, পুরাণাদি ধর্মগ্রন্থে অসামান্য অধিকার। তর্ক দর্শন তীর্থ প্রভৃতি কয়েকটি বিশিষ্ট উপাধি আছে, কিন্তু নামের পশ্চাতে কখনো সেগুলি ব্যবহার করেন না, সবগুলিই উপাধিপত্রের মধ্যে বন্দী হয়ে আছে,—বিশেষত ভাগবত সম্বন্ধে উপাধিটি। কেউ সে বিষয়ে উল্লেখ করলে মৃদু হাস্য করেন, পীড়াপীড়ি করলে বলেন, "গ্রহণ ক'রে যে অন্যায় করেছি ঘোষণা ক'রে তাকে বাড়াতে চাই নে।"

পাঠকজীর বয়ঃক্রম ন্যূনাধিক পঞ্চাশ বৎসর, সুগঠিত নাতিপুষ্ট উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দেহ, চক্ষে প্রতিভার প্রদীপ্ত দীপ্তি। সমস্ত মুখমণ্ডল ব্যেপে নির্মলতা এবং অধ্যাত্ম বৈভবের সুস্পষ্ট সুষমা। রঘুনাথের কণ্ঠে পুষ্পপত্রখচিত মাল্য, ললাট ও বাহু চন্দনচর্চিত, পরিধানে হরিদ্রাবর্ণের রেশমের ধুতি ও উত্তরীয়। সম্মুখে তুলসীবৃক্ষতলে শালগ্রামশিলা। কাষ্ঠাসনে উপবেশন ক'রে সুস্পষ্ট সুমিষ্ট কণ্ঠে রঘুনাথ ভাগবত পাঠ করছেন,—প্রথমে মূল শ্লোক, তার পর

অন্বয়, তার পর অনুবাদ, সর্বশেষে টীকা। সূর্যকিরণের প্রভাবে পদ্মকোরকের দলগুলি যেমন ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়ে যায়, সরস প্রাঞ্জল ভাষায় বিশদ ব্যাখ্যার প্রভাবে ভাগবতের শ্লোকসমূহ তেমনি তাদের অর্থ এবং মর্মের কোষ-গুলি ধীরে ধীরে উন্মোচিত ক'রে দিচ্ছে,—কোথাও বিন্দুমাত্র জটিলতার আবরণ থাকছে না। বিদ্বান মূর্খ, শিক্ষিত অশিক্ষিত, পুরুষ স্ত্রীলোক সকলের মনে এক পরিতৃপ্তি, এক আনন্দ।

ব্যাখ্যার স্থানে স্থানে রঘুনাথ গান গাচ্ছেন। কণ্ঠের ধ্বনি সুমিষ্ট সুগভীর;—গমক, গিটকারী, মীড়,' মূর্ছনায় সম্পন্ন; শুনলে সন্দেহ থাকে না যে, একজন প্রথম শ্রেণীর গুণী।

পাঠ শেষ হবার পর রাত্রি সাড়ে নটার সময়ে সন্ধ্যা গৃহে ফিরল; চক্ষে অশ্রুর আমেজ, বক্ষে উদ্বেল আবেগ। গৃহে উপনীত হয়ে দেখলে, প্রমথ বেরিয়েছে, তখনো ফেরে নি। বারান্দায় একটা ঈজি-চেয়ার ছিল, তার মধ্যে দিলে অবশ দেহটাকে এলিয়ে। স্তব্ধ হয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে দুই চক্ষু বেয়ে নামল অশ্রুর বন্যা। কিছুক্ষণ সেইভাবেই কাটল, তার পর সিঁড়িতে পদধ্বনি শুনতে পেয়ে চক্ষু মার্জিত ক'রে উঠে দাঁড়াল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে সন্ধ্যাকে দেখতে পেয়ে প্রমথ বললে, "কি উষা? এখানে দাঁড়িয়ে যে?"

সন্ধ্যা বললে, "এমনি।"

"ভাগবত কেমন লাগল?"

"বেশ লাগল।"

"আর কদিন হবে?"

"আর চার দিন। আসছে বুধবারে পূর্ণিমার দিন উদ্‌যাপন।" এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে বললে, "এ কদিন আমি যাব?"

সন্ধ্যার কথা শুনে প্রমথ হাসতে লাগল; বললে, "স্ত্রী-স্বাধীনতার জন্যে

তোমরা যতই লাফালাফি কর না কেন উষা, শেষ পর্যন্ত ও-জিনিস তোমাদের ধাতে সইবে না। তোমরা লতার জাত, পাদপকে আশ্রয় ক'রেই চিরকাল থাকবে। আমি তো বলেছি তোমাকে, এ বাড়িতে তুমি যখন বন্দিনী নও তখন এ রকম অনুমতি চাইবার প্রয়োজন নেই। তোমার যদি ইচ্ছে হয়, তা হ'লে নিশ্চয় যাবে।"

ইচ্ছে! পরদিন সমস্ত দিনটা সন্ধ্যার কাটল ভাগবত-পাঠের অধীর প্রতীক্ষায়। দিন যেন আর শেষ হতে চায় না, সন্ধ্যা যেন আর আসে না! শেষ পর্যন্ত যথাকালের জন্য ধৈর্য কিছুতেই রাখা গেল না। কয়েকটা প্রয়োজনীয় দ্রব্য খরিদ করতে প্রমথ বাইরে গিয়াছিল, তার প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষা না ক'রেই কামিনীকে সঙ্গে নিয়ে সন্ধ্যা ভাগবত-সভায় উপস্থিত হ'ল। চতুর্দিকে চেয়ে দেখলে, সে-ই প্রথম, বাইরের শ্রোতাদের মধ্যে আর কেউ তখনো উপস্থিত হয় নি। নিজের অধীরতার এই প্রত্যক্ষ প্রমাণে মনে মনে একটু লজ্জিত হ'ল। খুশিও হ'ল এই মনে ক'রে যে, যে-বস্তু তাকে এমন ক'রে আকৃষ্ট করছে, চিত্তের অন্তরতম প্রদেশে তার প্রতি তার শ্রদ্ধারও অন্ত নেই। মনে বাইরে এমন সামঞ্জস্যের তৃপ্তি বহুকাল উপভোগ করে নি। গত রাত্রে যে সভাগৃহে সে এই নূতন আনন্দের আস্বাদ লাভ করেছিল, আজ তার জনহীন নির্বাক আবেষ্টনীও তাকে কম পরিতুষ্ট করলে না।

মহিলাদের বসবার সম্মুখ বারান্দায় প্রথম শ্রেণীর মধ্যস্থলে সন্ধ্যা স্থান অধিকার ক'রে বসল। পূর্বদিনের সেই স্ত্রীলোকটি দেখতে পেয়ে সন্ধ্যার পাশে এসে উপবেশন ক'রে সহাস্যমুখে বললে, "কাল আপনি এসেছিলেন খুব দেরি ক'রে, আজ এসেছেন সকলের আগে,—আপনার যে খুব ভাল লেগেছে, তা বুঝতে পারছি।"

সলজ্জমুখে সন্ধ্যা বললে, "হ্যাঁ, সত্যিই খুব ভাল লেগেছে। এত ভাল জিনিস আমি এর আগে আর কখনো শুনি নি।"

স্ত্রীলোকটি বললে, "সে কথা এক হিসেবে সত্যি। এত বড় ভাগবত-পাঠক সারা বাংলা দেশে আর নেই বললে চলে। তার ওপর কি চমৎকার গান গাইতে পারেন, দেখেছেন ?"

সন্ধ্যা বললে, "ভারি চমৎকার! আমার মনে হয়, এত বড় গাইয়েও আমাদের বাংলা দেশে খুব বেশি নেই। আচ্ছা, ইনি কোথায় থাকেন ?"

স্ত্রীলোকটি বললে, "নবদ্বীপে।"

"নবদ্বীপে কি করেন ?"

"নবদ্বীপে এঁর আশ্রম আছে,—সেখানে ইনি শিষ্যদের পড়ান, নিজেও পড়েন, তা ছাড়া দুঃখী দুর্ভাগাদের আশ্রয় দেন, সেবা করেন। শুনেছি, বিয়ে করবার পীড়াপীড়িতে বিরক্ত হয়ে বাইশ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ ক'রে বৈরাগী হন। সেই থেকে বরাবর নবদ্বীপে আছেন। এত বড় দিগ্‌গজ পণ্ডিত আর সাধু বৈষ্ণব নবদ্বীপে ইনি ছাড়া আর খুব বেশি নেই।"

শেষের দিকের সব কথা সন্ধ্যা মন দিয়ে শুনল কি-না বলা যায় না, সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে, "নবদ্বীপে এর আশ্রমে মেয়েরা কেউ আছেন কি ?—শিষ্যদের মধ্যে কিংবা সেবকদের মধ্যে ?"

স্ত্রীলোকটি বললে, "তা তো ঠিক বলতে পারিনে, তবে থাকাই সম্ভব। কারণ এত বড় চরিত্রবান সংযমী মহাপুরুষের কাছে মেয়েদের আশ্রয় তো পাকা।"

"ইনি এখানে কোথায় থাকেন ?"

"এখানে ? এই বাড়িতেই থাকেন। ঐ যে পূবদিকের বারান্দায় কোণের ঘর দেখছেন, ঐ ঘরে থাকেন। সব শুদ্ধ চারখানা ঘর ওঁর ব্যবহারের জন্যে দেওয়া হয়েছে। কেন ? ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চান না-কি ?"

সন্ধ্যার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল ; বললে, "না, এমনি জিজ্ঞাসা করছিলাম।"

এর পর কথোপকথন তেমন আর জমল না, সন্ধ্যা অবিরত অন্যমনস্ক হতে

লাগল, ওদিকে মেয়েরাও একে একে আসতে আরম্ভ করেছিলেন, স্ত্রীলোকটি বললে, "চললুম ভাই, ওঁদের বসাইগে; আবার আসব অখন।"

এ কথারও একটা সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতে সন্ধ্যার ভুল হয়ে গেল, চিন্তাচ্ছন্ন মনে স্তব্ধভাবে ব'সে রইল।

সেদিন পাঠ-শেষে একটা গভীর স্বপ্নের স্মৃতি নিয়ে সন্ধ্যা বাড়ি ফিরল। দীর্ঘকালব্যাপী পাঠের মধ্যে কোন্ সময়ে ঠিক কি-ভাবে এ স্বপ্ন সে দেখেছিল তা মনে পড়ে না, কিন্তু সেই অস্পষ্ট অনির্ণেয় স্বপ্নের চিন্তা করতে করতে মন উত্তরোত্তর চঞ্চল থেকে চঞ্চলতর হয়ে উঠতে লাগল। আহার-বিহার, কাজ-কর্ম, কথাবার্তার মধ্যে ক্ষণকালের জন্যও তার বিরাম নেই।

এমনি ভাবেই আরও দু দিন কেটে গেল, অবশেষে এল বুধবার, ব্রত উদযাপনের দিন। দীর্ঘ তিন মাস পূর্বে এক পূর্ণিমা তিথিতে এই পাঠ আরম্ভ হয়েছিল, আজ পূর্ণিমায় তার পরিসমাপ্তি।

মদ্ভাগবতের যে অংশটুকু বাকি ছিল তা বেশি নয়, মাত্র দ্বাদশ স্কন্ধের দ্বাদশ ত্রয়োদশ অধ্যায়। অল্প সময়ের মধ্যে সেটুকু শেষ ক'রে রঘুনাথ বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবতার উদার আদর্শবাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। সংসার-নিস্পৃহ কৈবল্যকামী আদর্শ বৈষ্ণবের বৈরাগ্যমধুর অথচ সেবানিয়ত জীবন-যাপনের বিষয়ে সে কি বিচিত্র অভিভাষণ! পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মতো সে জীবনের অবস্থান আছে কিন্তু আসক্তি নেই, ঔদাস্য আছে কিন্তু আলস্য নেই, কর্ম আছে কিন্তু লোভ নেই। যে ধর্মকে অবলম্বন ক'রে বৈষ্ণব এই ভাবে দিনাতিপাত করেন, রঘুনাথ তাকে উপমিত করলেন মহাসিন্ধুর সহিত। মহা-সিন্ধুর মতোই সে ধর্মের বিস্তৃতি, মহাসাগরেরই মতো গভীরতা; মহাসিন্ধুর গর্ভের মতোই সে ধর্মের গর্ভে মানুষের দুঃখ-দৈন্য পাপ-তাপ সমস্ত নিমজ্জিত হয়ে যায়, আর মহাসিন্ধুরই মতো উপরে প্রবাহিত হয় জ্ঞানসূর্যকিরণে আনন্দের সমীরণ। বৈষ্ণবধর্মের মতো মানুষের এত বড় আশ্রয় আর কিছু

নেই। কোনো অবস্থাতেই বৈষ্ণবধর্ম মানুষকে অস্বীকার করে না,—তার পাপ পুণ্য, দুঃখ দৈন্য, ত্রুটি বিচ্যুতি সমস্তর সঙ্গেই সে তাকে স্বীকার করে। তাই সে ধর্ম মানুষকে শাস্তি দেয় না, শোধন করে; তিরস্কৃত করে না, পরিষ্কৃত করে; বর্জন করে না, আশ্রয় দেয়। দুঃখ গ্লানি নৈরাশ্যে যে জীবন নিষ্ফল হবার উপক্রম করেছে, মানব-কল্যাণের মহত্তর কর্তব্যসাধনের মধ্য দিয়ে পরিচালিত ক'রে তাকে সার্থক ক'রে তোলে। তাই এ ধর্ম জাতি-কুল-গোত্রনির্বিশেষে সমস্ত বিশ্বের মানবসমাজের দিকে দুই বাহু প্রসারিত ক'রে আহ্বান করছে; বলছে—এস এস, দুঃখী এস, সুখী এস, আর্ত এস, সমর্থ এস, পাপী এস, পুণ্যাত্মা এস, আমার আশ্রয়ে এসে সকল সুখ-দুঃখ সম্পদ-বিপদের বোঝা নামিয়ে দিয়ে লঘু হও, মুক্ত হও,—পরমা শান্তি লাভ কর।

সভা শেষ হয়ে গেছে। রঘুনাথ তাঁর বিশ্রামকক্ষে গিয়ে শ্রান্তি অপনয়ন করছেন, শ্রোতাদের মধ্যে প্রায় সকলেই গৃহে প্রত্যাগমন করেছে, সন্ধ্যা কিন্তু তার স্থানে অনড় স্তব্ধ হয়ে ব'সে আছে। চক্ষে অশ্রু, বক্ষের মধ্যে দুরন্ত ঝটিকা।

কামিনী এসে ডাকলে, "মা!"

বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছে কামিনীর দিকে চেয়ে দেখে সন্ধ্যা বললে, "কি?"

"ভাগবত তো শেষ হয়ে গেছে, রাত হয়েছে, বাড়ি চলুন।"

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে সন্ধ্যা বললে, "কামিনী, পাঠকঠাকুর এখন কোথায় আছেন, জান?"

কামিনী বললে, "জানি বইকি মা। ঐ যে কোণের ঘরে ব'সে আছেন, পর্দার ফাঁক দিয়ে ঐ যে একটু একটু দেখা যাচ্ছে।"

"ওঁর কাছে গিয়ে বলতে পার, আপনার সঙ্গে একটি মেয়ে দেখা করতে চায়?"

কামিনী ঘাড় নেড়ে বললে, "তা পারি। আপনি দেখা করবেন না-কি মা?"

"হ্যাঁ।"

কামিনী রঘুনাথের কক্ষের দিকে অগ্রসর হ'ল।

কামিনীর পিছনে পিছনে সন্ধ্যা রঘুনাথের ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে রেলিঙে হেলান দিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়াল। পর-মুহূর্তেই কামিনী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সন্ধ্যাকে বারান্দায় দেখতে পেয়ে বললে, "মা, ঠাকুরমশাই আপনাকে ডাকছেন।"

ঘরের ভিতর প্রবেশ ক'রে সন্ধ্যা দেখলে, দর্শনপ্রার্থিনীর অপেক্ষায় রঘুনাথ সহাস্যমুখে দ্বারের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। একটা চেয়ার নির্দেশ ক'রে তিনি বললেন, "ব'সো মা ব'সো, ঐ চেয়ারটায় ব'সো।"

সন্ধ্যা এগিয়ে গিয়ে অবনত হয়ে রঘুনাথের পদধূলি গ্রহণ ক'রে মস্তকে হস্ত স্পর্শ করলে।

অসন্তোষসূচক মাথা নেড়ে রঘুনাথ বললেন, "এ ভাল নয় মা, তুমি আমার পায়ে হাত দিলে কেন?—সাধারণ নমস্কার করলেই তো চলত।" তার পর পুনরায় পূর্বের সেই চেয়ারটা নির্দেশ ক'রে সন্ধ্যাকে উপবেশন করতে বললেন। রঘুনাথ আসন গ্রহণ করলে সন্ধ্যা সঙ্কুচিত হয়ে চেয়ারে উপবেশন করল।

সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে স্নিগ্ধ কণ্ঠে রঘুনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, "কি চাও মা, তুমি আমার কাছে?"

রঘুনাথের দিকে একবার মাত্র দৃষ্টিপাত ক'রে নতনেত্রে সন্ধ্যা বললে, "আশ্রয়।"

বিস্মিতকণ্ঠে রঘুনাথ বললেন, "আশ্রয়? আশ্রয়ের দ্বারা তুমি কি বলতে চাও, তা তো ঠিক বুঝতে পারছি নে মা?"

"আপনি আমাকে আপনার নবদ্বীপের আশ্রমের একজন সেবিকা ক'রে নিন—একজন দাসী।"

"কিন্তু তুমি আমার আশ্রমের দাসী কেন হবে, তা তো আরও বুঝতে পারছি নে মা! তোমার আকৃতি বেশভূষা দেখে তোমাকে তো রাজরাণী ব'লে মনে হয়।"

সন্ধ্যার চক্ষু দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল; কম্পিত দুঃখার্ত কণ্ঠে সে বললে, "এ বেশভূষা আমার নয়, আমার কাছে এর কোনো মূল্য নেই—এ সাজানো জিনিস। আপনি আমাকে দয়া ক'রে আশ্রয় দিন, আমি সত্যিই আশ্রয়হীন। আজ আপনার কথা শুনে আমি বুঝতে পেরেছি যে, আমার মতো হতভাগিনীর জীবনও একেবারে অসার্থক না হতে পারে, কিছু প্রয়োজন তারও থাকতে পারে। আপনি আমাকে আপনার আশ্রমের সেবিকা ক'রে নিন।"

সন্ধ্যার দুঃস্থ অবস্থা দেখে রঘুনাথের মুখে-চক্ষে গভীর সহানুভূতির চিহ্ন ফুটে উঠল; স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললেন, "তুমি বিচলিত হয়েছ মা, একটু সংযত হয়ে নাও; তার পর তোমার সকল কথা শুনব। যে গৃহত্যাগী হয়ে সংসার ছেড়ে আসতে উদ্যত হয়েছে, সংযম তার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু। তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি ততক্ষণে আমার হরিদাসকে বারান্দায় বসিয়ে আসছি, যাতে হঠাৎ কেউ এসে আমাদের কথাবার্তার মধ্যে বিঘ্ন ঘটাতে না পারে।" ব'লে রঘুনাথ কক্ষের বাইরে চ'লে গেলেন, তার পর মিনিট দুই-তিন পরে ফিরে এসে বললেন, "আচ্ছা মা, এবার তুমি বেশ সংযত হয়ে তোমার আর যদি কিছু বলবার থাকে তো বল।"

তখন সন্ধ্যা ধীরে ধীরে তার দুঃখময় জীবনের ইতিহাস যথাসম্ভব সংক্ষেপে ব'লে গেল,—তার প্রয়োজনীয় অংশ কিছুই বাদ দিলে না, অনাবশ্যক অংশও বিবৃত করলে না।

গভীর মনোযোগের সহিত আদ্যোপান্ত শুনে রঘুনাথ বললেন, "কিন্তু তুমি কি তোমার শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাবার জন্যে আর চেষ্টা করতে চাও না?"

সন্ধ্যা ব'ললে, "না।"

"বাপের বাড়িও যেতে চাও না?"

"না।"

"যতদূর শুনলাম আর বুঝলাম, প্রমথবাবু তোমাকে একটা বিশেষ রকম অবাঞ্ছনীয় অবস্থা থেকে উদ্ধার ক'রে তোমার উপকার করেছেন। তোমার প্রতি আচরণও তাঁর যৎপরোনাস্তি ভাল। তবে তুমি তাঁর আশ্রয় ছেড়ে আসতে চাচ্ছ কেন?"

এক মুহূর্ত নীরব থেকে সন্ধ্যা বললে, "প্রমথবাবু আমার যথেষ্ট উপকার করেছেন, আর আমার প্রতি তার আচরণ খুব ভাল—এ নিশ্চয়ই সত্যি; কিন্তু এই কপট জীবন ধারণ ক'রে আমি বেশি দিন বাঁচব না—এ আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে।"

ক্ষণকাল চিন্তা ক'রে রঘুনাথ বললেন, "তোমাকে ছেড়ে দিতে প্রমথবাবু সম্মত হবেন তো মা?"

"নিশ্চয় হবেন। আমার স্বাধীন ইচ্ছায় তিনি কখনো বাধা দেবেন না—এ কথা বার বার বলেছেন।"

"কিন্তু তোমার এরূপ আচরণে তিনি দুঃখ পাবেন ব'লে মনে কর না-কি?"

একটু চিন্তা ক'রে ঈষৎ আরক্ত মুখে সন্ধ্যা বললে, "তা হয়তো একটু পাবেন, কিন্তু উপায় কি?" তার পর সংশয়-ব্যাকুল স্বরে বললে, "এত কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন কেন? তবে কি আমাকে আশ্রয় দিতে আপনি রাজী নন?"

সন্ধ্যার কথা শুনে রঘুনাথ মৃদু হাস্য ক'রে বললেন, "তুমি যে অতিশয়

বুদ্ধিশালিনী মেয়ে তা আমি তোমার জীবনকাহিনী বর্ণনা করবার শক্তি থেকেই বুঝতে পেরেছি, তাই তোমাকে এত অল্প কথা জিজ্ঞাসা করলাম; অপর কেউ হ'লে আরও অনেক কথা জিজ্ঞাসা করতে হ'ত।"

আগ্রহান্বিত কণ্ঠে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "তা হ'লে আমাকে গ্রহণ করলেন তো আপনি?"

প্রসন্নমুখে রঘুনাথ বললেন, "হ্যাঁ মা, তোমাকে আমি সাদরে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করলাম। শাস্ত্রচর্চা তো নীরস বস্তু, সেবা-ব্রতের মধ্যে সরসতার অন্ত নেই। পূর্বজন্মে নিশ্চয় কোনো পুণ্য অর্জন করেছিলাম, আজ তাই আমার হাতের সেবা গ্রহণ করবার জন্যে বাসুদেব তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। তোমার সেবা ক'রে আমি ধন্য হব মা।"

রঘুনাথের কথা শুনে সন্ধ্যার চোখ ছলছলিয়ে এল, বললে, "ও-কথা ব'লে আমাকে অপরাধী করবেন না।"

রঘুনাথ হাসতে লাগলেন; বললেন, "তুমি জানো না মা, তাই ভাবছ, এ আমার অত্যুক্তি কিংবা অন্যায় উক্তি। কিন্তু আর কিছুদিন পরে তুমিও বুঝবে যে, সেবা করতে পাওয়ার চেয়ে বড় সৌভাগ্য বৈষ্ণবের কাছে আর কিছুই নেই। কিন্তু সে কথা যাক, আমি তো আজ রাত্রেই বারোটার গাড়িতে নবদ্বীপ যাচ্ছি,—তুমি কবে, কি রকম ক'রে যাবে?"

সন্ধ্যা বললে, "আমিও আজ রাত্রে আপনার সঙ্গে যাব?"

"হয়ে উঠবে?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয় হবে।"

রঘুনাথ বললেন, "তবে আর বিলম্ব ক'রো না—প্রস্তুত হয়ে এস। জিনিস-পত্র কিছু এনো না, সংসার ত্যাগ ক'রে আসবার সময়ে একবস্ত্রে আসতে হয়। দেহে যা থাকবে তা অবশ্য আনতে পার; কিন্তু বহন ক'রে কিছু এনো না। তোমার নিত্যকার যা কিছু প্রয়োজনের বস্তু সবই

আশ্রম থেকে পাবে। তবে সেখানে গিয়ে দেখবে, সে প্রয়োজন অতি অল্প।”

ভূমিষ্ঠ হয়ে রঘুনাথকে প্রণাম ক’রে সন্ধ্যা উঠে দাঁড়াল। তার মস্তকের উপর দক্ষিণ হস্ত স্থাপিত ক’রে রঘুনাথ বললেন, “বাসুদেবের ইচ্ছায় আশ্রমে তোমার এই যোগদান তোমার পক্ষে, আমার পক্ষে আর আশ্রমের পক্ষে শুভ হোক, কল্যাণপ্রদ হোক।”

আর একবার ভূমিষ্ঠ হয়ে রঘুনাথের পদধূলি গ্রহণ ক’রে সন্ধ্যা প্রস্থান করলে।

চব্বিশ

সন্ধ্যা যখন গৃহে পৌছল, তখন রাত্রি নয়টা। প্রমথ একটা বিদেশী উপন্যাসের ইংরাজী অনুবাদ পাঠে ব্যাপৃত ছিল। স্থানটা খুবই চিত্তচমকপ্রদ, কিন্তু উদরের মধ্যে ক্ষুধার প্রকোপ এমন একটু বেড়ে উঠেছিল যে মনটা ঠিক তার মধ্যে বসছিল না; মনে হচ্ছিল, সন্ধ্যা শীঘ্র এলে মন্দ হয় না, আহারে বসা যায়। ঠিক এমনি এক মুহূর্তে সন্ধ্যার আবির্ভাবে মনটা খুশি হয়ে উঠল; বললে, "আজ একটু শীঘ্র ফিরেছ উষা, আজ শেষ হয়ে গেল বুঝি?"

নিকটে এসে একটা চেয়ারে উপবেশন ক'রে সন্ধ্যা মৃদুস্বরে বললে, "হ্যাঁ।"

"আর অন্য কোনো বাড়িতে পাঠ হবে না?"

"না।" একটু চুপ ক'রে থেকে জিজ্ঞাসা করলে,, "আপনার খাওয়া হয়েছে?"

এ প্রশ্নে একটু বিস্মিত হয়ে প্রমথ বললে, "তা কি ক'রে হবে? তোমাকে সঙ্গে না নিয়ে কোনো দিন খেয়েছি কি?"

"তা হ'লে আপনার খাবার দিতে বলি?"

"আর তোমার?"

একটু ইতস্তত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "আমি আজ একটু জল-টল খেয়ে নোব—বেশি কিছু খাব না।"

উদ্বিগ্ন মুখে প্রমথ বললে, "কেন, শরীর খারাপ হয়েছে না-কি?"

মৃদুস্বরে সন্ধ্যা বললে, "না, শরীর ভাল আছে।"

"তবে?"

একটু চুপ ক'রে থেকে সন্ধ্যা বললে, "আপনি খেয়ে নিন, তার পর সে কথা বলব।"

প্রমথ বললে, "কিন্তু সে তো আমি পারব না উষা, উদ্বেগ নিয়ে এক গ্রাসও আমার গলা দিয়ে নাববে না। কি কথা, তুমি এখনি বল।"

এক মুহূর্ত সন্ধ্যা নীরবে ব'সে রইল, তার পর প্রমথর প্রতি একবার চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে নতনেত্রে বললে, "আমি আপনার কাছ থেকে আজ মুক্তি ভিক্ষে চাচ্ছি।"

সন্ধ্যার কথা শুনে প্রমথর মুখখানা একটু বিবর্ণ হয়ে গেল, বললে, "বাঁধন কোথায় যে, মুক্তি। কিন্তু সে কথা যাক, আসলে কথাটা কি খুলে বল দেখি? ভাগবত সভায় কোনো আত্মীয়-স্বজনের দেখা পেয়েছ?"

মাথা নেড়ে সন্ধ্যা বললে, "না, তা পাই নি। ভাগবত-পাঠকের সঙ্গে আমি নবদ্বীপ যেতে চাই তাঁর আশ্রমের একজন সেবিকা হয়ে।"

ক্ষণকাল নীরবে অবস্থান ক'রে প্রমথ বললে, "এই রকম একটা কথা কি তুমি মনে মনে ভাবতে আরম্ভ করেছ, না, তাঁর সঙ্গে ও-কথাটা শেষ ক'রেও এসেছ?"

"তাব সঙ্গেও কথা কয়েছি।"

"তিনি রাজী আছেন?"

"আছেন।"

"এ সঙ্কল্প কি তোমার একেবারে পাকা উষা, না, এখনো এ বিষয়ে বাদানুবাদের সময় আছে?"

দুঃখ-মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে সন্ধ্যা বললে, "দেখুন, আপনি আমার পরম উপকারী বন্ধু, আপনার কাছ থেকে আমি যে সদয় ব্যবহার পেয়েছি তার জন্যে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই, কিন্তু তবু আপনি আমাকে এ অনুমতি দিন। আমার মনে হয়, আশ্রমের সেবাদাসী হয়ে আমার এই কদর্য জীবন সামান্য একটুও সার্থক হতে পারে।"

সন্ধ্যার কথা শুনে প্রমথ আঙুল দিয়ে দুই চোখ টিপে ধ'রে নিঃশব্দে ক্ষণকাল

মনে মনে চিন্তা করলে, তার পর চোখ চেয়ে সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "আমার কাছ থেকে উপকার পেয়ে তুমি যে আজ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রে বিদায় নিচ্ছ উষা, এজন্যে আমিও তোমাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। মানুষের মন আজকাল এমন শুকিয়ে শক্ত হয়ে গিয়েছে যে, কৃতজ্ঞতা লাভ করাও একটা মহা সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু সে যাক, আজ তোমার কাছ থেকে যে আঘাতটা পেলাম তা একদিন পেতে হবে ব'লে যদি জানা থাকত, তা হ'লে কখনই আমি তোমাকে প্রকাশদাদার বাড়ি থেকে উদ্ধার ক'রে আনতাম না। এত বড় নিঃস্বার্থ-পরার্থপর ব্যক্তি আমি নই যে, এতখানি মূল্য দিয়ে পরের উপকার করতে পারি।"

সন্ধ্যা এ কথার কোনো উত্তর দিলে না, জড় পদার্থের মত নিঃশব্দ নিশ্চল হয়ে ব'সে রইল।

একটু পরে প্রমথ পুনরায় বলতে আরম্ভ করলে, "তোমার বোধ হয় মনে আছে উষা, একদিন তোমাকে বলেছিলাম যে, আমি গদ্য-প্রকৃতির সোজাসুজি লোক, কাব্যগন্ধী কথা শুনতেও ভালবাসি নে, বলতেও ভালবাসি নে। কিন্তু মানুষের জীবনে মাঝে মাঝে এমন দুর্বলতার মুহূর্ত আসে, যখন সে নিজেকে হারায়, নিজের প্রকৃতিকে হারায়। আজ মনে হচ্ছে, আমারও সেই রকম একটা মুহূর্ত এসেছে। আমি হয়তো আজ তোমাকে কিছু কাব্য-কথা শোনাব, কিন্তু তার আগে ভূমিকার মতো একটা খুব ছোট শানাই। একজন অতি নিষ্ঠুরপ্রকৃতির দুর্বৃত্ত লোক ছিল, তার কাজ ছিল সারাদিন তীর ধনুক হাতে বনে বনে পাখী মেরে বেড়ানো। প্রাণীহত্যা ক'রে ক'রে তার মন হয়ে গিয়েছিল পাথরের মতো কঠিন, তাই কোনো রকম দুষ্কর্ম ক'রে তার মনে কিছুমাত্র কষ্ট হ'ত না। একদিন তীর ধনুক হাতে নদীর ধারে বেড়াতে বেড়াতে পায়ে ঠেকল একটা পাথরের নুড়ি; নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলে দেবার জন্যে বিরক্ত হয়ে সেটা তুলে ধরতেই তার আকৃতি গেল বদলে, চোখ হয়ে

গেল বড় বড়, মুখে ফুটে উঠল বিস্ময় আর আনন্দের দীপ্তি। কত সংখ্যাতীত নুড়ি সে তার জীবনে দেখেছে, কিন্তু এমনটি তো কোনো দিন দেখে নি; একেবারে সুডোল স্বচ্ছ শ্বেতকান্তি স্ফটিক, কোথাও কোনোখানে তার একটুখানি মলিনতা নেই। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেটিকে দেখতে দেখতে সে অন্যমনস্ক হয়ে উঠল, বাঁ হাত থেকে তীর ধনুক মাটিতে প'ড়ে গেল খ'সে; তার পর নদীর জলে নুড়িটিকে পরিষ্কার ক'রে নিতে গিয়ে নিজেও জলের মধ্যে নেবে পড়ল; অবগাহন স্নান ক'রে নুড়িটি নিয়ে সে বনের মধ্যে নিজের আস্তানায় উপস্থিত হ'ল; একটা প্রকাণ্ড বুনো গাছের তলা, কত পাখীর পালক প'ড়ে আছে চতুর্দিকে; এইখানে সে পাখী পুড়িয়ে পুড়িয়ে খায়। সেখানে অমন নির্মল জিনিস রাখতে প্রবৃত্তি হ'ল না, একটা বটগাছ খুঁজে নিয়ে তার তলা পরিষ্কার ক'রে সযত্নে সেখানে সেটিকে স্থাপন করলে; তার পর খেয়াল চাপল, বন থেকে খুঁজে নিয়ে এল ফুল ফল দূর্বা বেলপাতা; তাই দিয়ে পুজো করে, ভোগ দেয়; ভুলে গেল নদীর-ধারে-ফেলে-আসা তীর-ধনুকের কথা। এই রকম করতে করতে একদিন সে হয়ে গেল বাবাজী-মহারাজ, আর তার নুড়ি হয়ে গেল শালগ্রামশিলা। আমার জীবনেও একদিন ঠিক এমনি একটা ঘটনা ঘটল উষা। ছিলাম মোদো-মাতাল দুশ্চরিত্র, মেয়েমানুষ শিকার ক'রে ক'রে গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে বেড়িয়ে বেড়াতাম; হঠাৎ হ'ল প্রকাশদাদার বাড়িতে তোমার সঙ্গে দেখা; নিয়ে এলাম সেখান থেকে তোমাকে কুড়িয়ে কাশীতে; সব ভুলে গিয়ে তোমাকে নিয়ে মত্ত হলাম; বসন-ভূষণ সাজ-সজ্জা দিয়ে তোমাকে সাজাতে লাগলাম মনের মতন ক'রে; কোথায় অন্তর্হিত হ'ল এতদিনের অভ্যাসের মদ আর মেয়েমানুষ! আজ আমার শালগ্রামশিলা হঠাৎ নোটিস দিচ্ছেন যে, তিনি এই অপবিত্র কাশী শহর পরিত্যাগ ক'রে পবিত্র নবদ্বীপধামে আশ্রমবাসিনী হতে চলেছেন। এখন ভাবছি কি জানো উষা? ভাবছি, এই শালগ্রামহীন বাবাজী-মহারাজের কি দশা হবে, এখন কি ফল-

মূল খেয়ে জীবন ধারণ করতে পারবেন, না, তীর-ধনুক সংগ্রহ ক'রে আবার ছুটবেন পাখী শিকার করতে! যাক, সে কথা ভাববার অনেক সময় পাওয়া যাবে, উপস্থিত তোমার কথা একটু ভাবা যাক। নবদ্বীপ যাওয়া তা হ'লে কবে?

পাষাণের মতো অসাড় হয়ে সন্ধ্যা এতক্ষণ প্রমথর কথা শুনছিল, এক এক সময়ে তার নিশ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসছিল। একটু চুপ ক'রে থেকে সিক্ত চক্ষু-পল্লব অলক্ষিতে বস্ত্রাঞ্চলে মুছে নিয়ে বললে, "আজই।"

"আজই? কটার গাড়িতে।"

"রাত্রি বারোটার গাড়িতে।"

পুনরায় ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে প্রমথ বললে, "তা হ'লে তোমার জিনিস-পত্র গুছিয়ে নাও। সময় তো খুব বেশি নেই।"

একটু সঙ্কুচিত হ'য়ে সন্ধ্যা বললে, "জিনিসপত্র নিতে পাঠক-ঠাকুর নিষেধ করেছেন।"

"নিষেধ করেছেন? ওঃ, খেয়াল হয় নি। অপবিত্র স্থানের জিনিসপত্রের ছুঁৎ দিয়ে আশ্রমের পবিত্রতা নষ্ট করা হবে না। তা হ'লে কি একবস্ত্রেই যেতে বলেছেন?"

"হ্যাঁ, তাই বলেছেন।"

"মাথার একটা বালিশ, কি গায়ের একটা কাপড়, তাও নেওয়া চলবে না?"

"না।"

"জয়! পাঠক-ঠাকুরজীকী জয়! এখন থেকেই কৃচ্ছ্রসাধন আরম্ভ হয়ে গেল! তা হ'লে আর দেরি না ক'রে একটু যা হয় খেয়ে নাও। না, সে বিষয়েও পাঠক-ঠাকুরজীর নিষেধ আছে?"

একটু চুপ ক'রে থেকে সন্ধ্যা বললে, "আপনার খাবার তা হ'লে দিতে বলি?"

প্রমথ বললে, "ক্ষেপেছ? আমি শুধু শুধু তোমার সঙ্গে তাড়াতাড়ি খেতে

যাব কেন? পাঠক-ঠাকুরজীর জিম্মায় তোমাকে দিয়ে এসে নিশ্চিন্ত হয়ে খেতে বসব।"

প্রমথর প্রতি একটা কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে সন্ধ্যা প্রস্থান করলে, তার পর মিনিট দশ-পনেরো পরে ফিরে এসে দাঁড়াল। মূল্যবান শাড়ি পরিত্যাগ ক'রে একটা মামুলী সুতির বস্ত্র পরিধান করেছে, দেহে কিন্তু অলঙ্কারগুলো তখনো রয়েছে।

প্রমথ চেয়ে দেখে বললে, "কি, প্রস্তুত না-কি?"

সন্ধ্যা কোনো উত্তর দিলে না। নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

"খেয়েছ?"

"খেয়েছি।"

"চল, তা হ'লে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

একটু ইতস্তত ক'রে কুণ্ঠিতস্বরে সন্ধ্যা বললে, "গয়নাগুলো তা হ'লে খুলে দিই?"

উঠতে উঠতে প্রমথ ধপ ক'রে সোফার উপর পুনরায় ব'সে পড়ল, মুখে তার ফুটে উঠল একটা মর্মান্তিক বেদনার ছায়া; বললে, "দোহাই উষা, তোমার সমস্ত জিনিসই তো ফেলে যাচ্ছ, গা থেকে গয়না খুলে নেবার গ্লানি থেকে আমাকে অব্যাহতি দাও। যদি প্রয়োজন মনে কর, ও নিষ্ফল অপয়া জিনিসগুলো পুলের উপর থেকে কাশীর গঙ্গায় ফেলে দিও, কিন্তু আমার হাতে খুলে দিও না।"

আঁচল থেকে চাবির রিং খুলে প্রমথর হাতে দিয়ে সন্ধ্যা বললে, "এট আপনার পকেটে রাখুন।"

চাবির রিংটা হাতে নিয়ে প্রমথ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "একটা কথা উষা। যাবার আগে আমার একটা প্রার্থনা মঞ্জুর ক'রে যাও। মাসিক এক হাজার টাকা আয়ের আমার কলকাতার একটা বাড়ি তোমার নামে লিখে দোব

বলেছিলাম, আমাকে সে প্রতিশ্রুতি পালন করবার অনুমতি দিয়ে যাও। তার আয় থেকে তুমি আশ্রমেরও তো অনেক প্রয়োজন মেটাতে পারবে, জনসেবার জন্যে অর্থের প্রয়োজন কম নয়। কিছু আগে কৃতজ্ঞতার কথা তুলেছিলে, সেই কৃতজ্ঞতার ঋণ যদি শোধ ক'রে যেতে চাও তা হ'লে আমার এই অনুরোধটা রাখ।"

প্রমথর মুখের উপর সজল চক্ষের করুণ দৃষ্টি স্থাপিত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "আচ্ছা।" তার পর অঞ্চল-বস্ত্র গলায় দিয়ে প্রমথকে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়াল।

প্রমথ বললে, "আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি উষা, যত দুঃখ যত কষ্টই আমাকে তুমি দিয়ে যাও না কেন, তুমি যেন এবার সুখী হ'য়ো।"

সন্ধ্যাকে সঙ্গে নিয়ে প্রমথ যখন গৃহ থেকে বহির্গত হ'ল, তখন রাত্রি দশটা।

পঁচিশ

আহারাদি শেষ ক'রে রঘুনাথ বারান্দায় ব'সে তিন-চার জন লোকের সঙ্গে আলাপ করছিলেন। প্রমথর সহিত সন্ধ্যাকে দেখতে পেয়ে লোকগুলি উঠে পাশের ঘরে গিয়ে বসল।

রঘুনাথ দাঁড়িয়ে উঠে সাদরে আহ্বান করলেন, "আসুন, আসুন।" প্রমথর প্রতি সহাস্যে দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন, "প্রমথবাবু,নিশ্চয়ই ?"

করজোড়ে নমস্কার ক'রে প্রমথ বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই পাপিষ্ঠই বটে। আপনারা সাধু পুরুষ, আমাদের মুখ দেখলেই চিনে ফেলেন।"

রঘুনাথ বললেন, "প্রমথবাবু , শাস্ত্রের মতে নিন্দার ছলে আত্মস্তুতি আর স্তুতির ছলে পরনিন্দা—উভয়ই নিষিদ্ধ। আপনি নিজেকে পাপিষ্ঠ আর আমাকে সাধু পুরুষ ব'লে উভয়তই শাস্ত্রবাক্যের অপলাপ করছেন।" ব'লে হো-হো ক'রে হাসতে লাগলেন।

প্রমথ পুনরায় হাত জোড় ক'রে বললে, "আপনি বৈষ্ণব আর আমি শাক্ত, আপনার সঙ্গে বিনয়ে পেরে উঠব কেন ? আমার বিষয়ে সত্যের অপলাপ করি নি, তবে এক হিসাবে আপনি আমার সঙ্গে এক শ্রেণীতেই আছেন,—শুধু আপনি ওপরে আর আমি নীচে।"

রঘুনাথ বললেন "সে কথা শুনছি, তার আগে এই চেয়ারটায় আপনি বসুন, আর তুমি মা, এই চেয়ারটায় ব'স।" উভয়ে উপবেশন করলে বললেন, "এবার বলুন, কোন্ শ্রেণীতে আপনার সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে ?"

প্রমথ বললে, "কথাটি শুনতে ভাল নয়, কিন্তু আসলে সত্যি। অভয় দেন তো বলি।"

রঘুনাথ হাসতে লাগলেন; বললেন, "ভয় দেখালেও আপনি বলবেন, কারণ আমি বৈষ্ণব আর আপনি শাক্ত। তবুও অভয় দিচ্ছি, বলুন।"

প্রমথ বললে, "পথে আসতে আসতে এই মেয়েটির মুখে শুনলাম, ইনি এঁর দুঃখের কাহিনী মোটামুটি সবই আপনাকে জানিয়েছেন। তা হ'লে বুঝতেই পারছেন যে আমি চোর, কারণ প্রকাশবাবুর বাড়ি থেকে এঁকে চুরি ক'রে নিয়ে এসেছি। কিন্তু এত বড় বাটপাড় কাশীতে ভাগবত পাঠ করছেন জানলে কি আমি একদণ্ডের জন্যে কাশীর মাটি মাড়াই মশায়? একেবারে সোজা লক্ষ্ণৌয়ে পাড়ি দিই। এখন বুঝতে পারছেন, কোথায় আমি আর আপনি এক শ্রেণীতে আছি, আর সেখানে কেন আপনি ওপরে আর আমি নীচে?"

প্রমথর কথা শুনে রঘুনাথ হাসতে লাগলেন, বললেন, "এমন সাধু-চোরের ওপর যে বাটপাড়ি করে সে কিন্তু অসাধু, তা সে যতই ভাবগত পড়ুক না কেন। মা-লক্ষ্মীর নামটি কিন্তু এখনও আমার জানা হয় নি প্রমথবাবু।"

প্রমথ বললে, "এঁর দুটি নাম—উষা আর সন্ধ্যা।"

"তার অর্থ?"

"তার অর্থ, যেখানে উনি উদয় হন সেখানে উনি উষা, আর যেখানে অস্ত যান সেখানে সন্ধ্যা।"

প্রসন্ন মুখে রঘুনাথ বললেন, "তা হ'লে আমার আশ্রমে উনি উষাই হবেন।"

প্রমথ বললে, "তা সত্যিই হবেন। আপনি দেখবেন এঁর প্রভায় আপনার আশ্রম আলোকিত হবে। এমন একটি মেয়ে কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায় গোঁসাইজী, একেবারে খাঁটি হীরে,—কোথাও একটু দাগ-দোগ খুঁজে পাবেন না।"

রঘুনাথ বললেন, "তা বুঝতে পেরেছি। বাসুদেবের কৃপায় আর আপনার অনুগ্রহে এমন রত্ন লাভ করলাম।"

প্রমথ মাথা নেড়ে বললে, "বাসুদেবের কৃপায় কি-না তা বলতে পারি নে,

কারণ বৈকুণ্ঠের কোন খবরই আমি রাখি নে, কিন্তু আমার অনুগ্রহে যে নয়, তা হলফ নিয়ে বলতে পারি। রাত হয়ে আসছে, আর দুটো কথা আপনার সঙ্গে ক'য়ে নিয়ে বিদায় হই।"

রঘুনাথ বললেন, "কি কথা বলুন ?"

প্রমথ বললে, "আমি তো একটি পয়লা নম্বরের দুরাত্মা ব্যক্তি। আপনার আশ্রমের কোন উপকারেই লাগব না, কারণ সেখানে আমার প্রবেশ-নিষেধ; কিন্তু উষার জন্যে অথবা আশ্রমের জন্যে যদি কখনো আপনাদের বিশেষ কিছু অর্থের ব্যবস্থা করবার প্রয়োজন হয় তা হ'লে অনুগ্রহ ক'রে হুকুম-নামা পাঠাবেন, তামিল করব।"

সহাস্যমুখে রঘুনাথ বললেন, "দুরাত্মা আপনি কার পক্ষে তা জানি নে, কিন্তু আমাদের পক্ষে যে নিকট আত্মীয় হলেন তাতে সন্দেহ নেই। আশ্রমে কারোরই প্রবেশ নিষেধ নেই, আপনার তো নেই-ই। যখনই আপনার ইচ্ছে হবে, আমাদের সম্মানার্হ অতিথি হয়ে সেখানে যাবেন।"

প্রমথ বললে, "ধন্যবাদ। কিন্তু আপনি ভদ্রতা ক'রে যেতে বললেন ব'লেই যে আমি যাব ব'লে আপনাকে ভয় দেখাব, ততটা দুরাত্মা আমাকে মনে করবেন না। আমার দ্বিতীয় কথা শুনুন। অপরাধ নেবেন না গোঁসাইজী, ষোল আনা প্রত্যয় আমার কোন জিনিসেরই উপরে নেই, এমন কি আপনার আশ্রমের উপরেও নয়। তা ছাড়া, মানুষের জীবন তো অনিশ্চিতই, তা আমারই বলুন আর আপনারই বলুন। সেই জন্যে আমি শীঘ্র কলকাতা গিয়ে আমার একটা বাড়ি উষার নামে লিখে দিয়ে দলিলপত্রখানা আপনার কাছে পাঠিয়ে দোব। সেই দলিলপত্রে লিখিত শতমতো উষা আর আপনি বিষয় এবং আয়ের বিলি-ব্যবস্থা করবেন, অনুগ্রহ ক'রে আমাকে এই আশ্বাসটুকু দিন। উষা সমস্তই ছেড়ে এসেছে, শুধু আমার একান্ত পীড়াপীড়িতে এইটুকুতে রাজী হয়েছে,—এজন্যে আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ।"

রঘুনাথ বললেন, "আমার প্রতি ভারার্পণ ক'রে আপনি যে আমার সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করছেন, সে জন্যে আমিও আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমাদের ভার থেকে মুক্ত হওয়াই উচিত প্রমথবাবু, ভার বাড়ানো উচিত নয়।"

প্রমথ বললে, "দলিলপত্র দেখলেই বুঝতে পারবেন যে, তাতে ভার থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যবস্থাই থাকবে। আমারই কর্মচারী অদায়পত্র ক'রে মাসে মাসে আপনাকে টাকা পাঠাবে, এবং সে টাকার হিসাবনিকাশ করবার কোনো দায়িত্বই আপনার থাকবেন না।"

প্রমথ আসন ত্যাগ ক'রে উঠে রঘুনাথকে নমস্কার ক'রে বললে, "চিঠিপত্র লেখালেখি আপনাদের বোধ হয় সুবিধে হবে না, নিয়মও হয়তো নেই, দরকারও নেই; কিন্তু ভগবান না করুন, উষার যদি কখনো তেমন বেশি অসুখ-বিসুখ করে সে কথা আমাকে অবিলম্বে জানাবেন।"

রঘুনাথ বললেন, "নিশ্চয় জানাব।"

সন্ধ্যা উঠে গলবস্ত্র হয়ে প্রমথকে প্রণাম করলে, তার পর মৃদুকণ্ঠে বললে, "বাড়ি গিয়েই খেতে বসবেন।"

পুনরায় রঘুনাথকে নমস্কার ক'রে প্রমথ সিঁড়ি দিয়ে নেমে চ'লে গেল।

ছাব্বিশ

অবস্থাবিশেষে মানুষ যেমন হাসি দিয়ে কান্না ঢাকবার চেষ্টা করে, ঠিক সেই রকমেই রঘুনাথের কাছে প্রমথ তার দুঃসহ দুঃখটা কৌতুক দিয়ে চাপা দেবার চেষ্টা করছিল। পথে বেরিয়ে কিন্তু চিত্তের সেই কৃত্রিম ভাবটা অন্তর্হিত হতে এক মুহূর্তও বিলম্ব হ'ল না। রিক্ততার একটা মর্মন্তুদ গ্লানিতে সমস্ত অন্তরিন্দ্রিয় টনটন করতে লাগল। সন্ধ্যাসহ বিগত কয়েকদিনের জীবনযাপন মনে হতে লাগল যেন একটা নিঃসত্ত্ব সুখস্বপ্ন, নিদ্রাভঙ্গে যার অবাস্তবতা সমস্ত মনকে মহাশূন্যতায় ভ'রে দিয়ে গেল। পলে পলে তিলে তিলে যে জিনিসকে সে বহু দুঃখে যত্নে আয়ত্ত ক'রে আনছিল, এক মুহূর্তে তাকে হারাতে হ'ল।

গৃহে ফিরে প্রমথ সোজা সন্ধ্যার ঘরে গিয়ে দাঁড়াল। সেই ড্রেসিং টেবিল, সেই কাঠের আলনায় কয়েকখানা কোঁচানো শাড়ি ব্লাউস আর পেটিকোট, পালঙ্কের উপরে সেই শয্যা পাতা। সবই রয়েছে, নেই শুধু সে, যার অভাবে এ সমস্তই বৃথা হয়ে গেছে। পিঞ্জর আছে, পাখী নেই, বৃন্ত আছে, ফুল নেই।

শয্যার উপরে প্রমথ তার শিথিল অলস দেহটাকে বিস্তৃত ক'রে দিলে। খাবার দেবে কি-না জিজ্ঞাসা করতে এসে পাচক বিষম তাড়া খেয়ে পালাল, কামিনী আসছিল সন্ধ্যার বিষয়ে কি-একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে, প্রভুর রুদ্রমূর্তি দেখে ঘরে ঢুকতে সাহস হ'ল না, নিঃশব্দে পাচককে অনুসরণ করলে।

শুয়ে শুয়ে প্রমথ কত কি মাথামুণ্ড ভাবতে আরম্ভ করলে, যার না ছিল আদি, না ছিল অন্ত। অসম্বদ্ধ বিচ্ছিন্ন চিন্তার জাল,—কখনো অতীতের স্মৃতি,

কখনো বর্তমানের দুঃখ, কখনো ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তায় তার অবস্থিতি। ভাবতে ভাবতে নিজের কথা ভেবে একবার তার ভারি হাসি পেলে। মনে মনে নিজেকে সম্বোধন ক'রে বললে, বেশ বাপু প্রমথনাথ, নেশা-ভাঙ বদখেয়ালি করতে, বেশ ছিলে। হঠাৎ একটা খেয়ালের বশে ভদ্রলোক সেজে এ দুর্গতি কেন টেনে আনলে! ফেরো আবার আগেকার জীবনে, আনাও ডাকিয়ে মনদা মাসীকে, কিনতে পাঠাও শোকদুঃখচিন্তাবিনাশিনী সুধার ভাণ্ডার। তার পর আছে বিনোদিনী, আছে সরমা, আছে সুরমা, আছে রেবতী। কে সন্ধ্যা? কার সন্ধ্যা? কোথায় সন্ধ্যা? সন্ধ্যা রজনীর অন্ধকারে মিশে গেছে।

চিত্তের এক দিক কিন্তু মাথা নেড়ে বলে, না না, তা হয় না। এতটা এগিয়ে এসে এখন আর পেছন ফেরা যায় না। স্রোতস্বতীর সাক্ষাৎ পেয়ে পঙ্কিল নালার মধ্যে প্রত্যাবর্তন অসম্ভব। তার চেয়ে এবার এক তৃতীয় পন্থা অবলম্বন কর। এবার হিমালয় থেকে কুমারিকা, আর মণিপুর থেকে বেলুচিস্তান ঘুরে বেড়াও। এবার পরিব্রাজক শ্রীমৎ প্রমথনাথ স্বামী!

দ্বারের দিকে কিসের খুসখাস শব্দ হ'ল। অল্প একটু মাথা তুলে প্রমথ দেখলে, ঘরের মধ্যে প্রবেশ করছে সন্ধ্যা। সহসা একটা ঝাঁকা দিয়ে টপ ক'রে শয্যার উপর উঠে ব'সে বিস্মিত কণ্ঠে বললে, "এ কি সন্ধ্যা! তুমি যে আবার এলে?"

সন্ধ্যা বললে, "দশ দিনের জন্যে ফিরে এলাম।" মুখে তার রহস্য এবং কৌতুকের অনিবারণীয় আভা।

"দশ দিনের জন্যে ফিরে এলে? জয় বিশ্বনাথ! কিন্তু দশ দিনের জন্যে কেন? চিরদিনের জন্যে কেন নয়?" শয্যার একেবারে এক প্রান্তে স'রে গিয়ে অপর প্রান্তে সন্ধ্যাকে বসতে ব'লে প্রমথ বললে, "ব'স ব'স, ভাল ক'রে সমস্ত কথা বল।"

শয্যায় উপবেশন ক'রে সন্ধ্যা বললে, "আমরা যখন গেলাম তখন যে লোকগু'ল পাঠকজীর কাছে ব'সে ছিলেন, তাঁরা তাঁদের বাড়িতে দশ দিনের পাঠের ব্যবস্থা করতে এসেছিলেন। আপনি চ'লে আসার পরই তাঁদের সঙ্গে কথা পাকা হয়ে গেল। পাঠকজী অবশ্য একবার বলেছিলেন যে, আমার থাকবার জন্যে একটা স্বতন্ত্র ঘরের ব্যবস্থা ক'রে দেবেন। কিন্তু আমি যখন এই দশ দিন এ বাড়িতে কাটাবার কথা বললাম, তখন তৎক্ষণাৎ লোক সঙ্গে দিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। ভাবলাম, কাশীতেই যখন থাকতে হ'ল তখন পরের বাড়ি থাকি কেন?"

প্রমথর মুখ উৎফুল্ল হয়ে উঠল, বললে, "বেশ কথা বলেছ। তোমার উপযুক্ত কথাই বলেছ। সত্যিই তো, তোমার নিজের বাড়ি থাকতে পরের বাড়ি থাকতে যাবে কেন?"

প্রমথর কথা শুনে সন্ধ্যার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। প্রমথ যে তার কথাটা নিয়ে এমন একটা মোচড় দেবে তা সে আগে বুঝতে পারে নি।

'উষা।"

"আজ্ঞে?"

"দশ দিন পরে নবদ্বীপ যাওয়া কি একেবারেই ঠিক?"

একটু চুপ ক'রে থেকে নতনেত্রে সন্ধ্যা বললে, "উপস্থিত তো ঠিক।"

"তা হোক। আমি মুহূর্তের উপাসক উষা, মুহূর্তের সুখ, মুহূর্তের আনন্দকে আমি উপেক্ষা করি নে। কালকের দুশ্চিন্তায় আজকের দিনকে নষ্ট করা আমি বোকামি মনে করি। এই ধর, কথার কথা বলছি, দশ দিন পরে তুমি যখন চ'লে যাবে তখন তো ঠিক আজকের মতোই দুঃখ পাব। কিন্তু এমনও তো ঘটা আশ্চর্য নয় যে, সে দুঃখ না পেতে পারি। জীবন তো আমাদের অনিশ্চিত উষা, ধর, দশ দিনের মধ্যে কোনোদিন যদি আমার মৃত্যু হয়, কথার কথা বলছি, তা' হ'লে তো আর আমাকে তোমার চ'লে যাওয়ার দুঃখ

ভোগ করতে হবে না। তবেই বুঝে দেখ, দশ দিন পরে যে দুঃখ ঘটবে তার জন্যে আজ হা-হতোস্মি করার মধ্যে কোনো সুবুদ্ধির পরিচয় নেই।"

স্তব্ধ হয়ে সন্ধ্যা প্রমথর এই গভীর বেদনাত্মক কথা শুনছিল, চোখের কোণ তার ভিজে এসেছিল। আর্দ্র নেত্রের চকিত-বিমর্ষ দৃষ্টি এক মুহূর্তের জন্য প্রমথর মুখে স্থাপিত ক'রে সে বললে, "জীবনের উপমা দিয়ে কোনো কথাই এ রকম ক'রে মেয়েদের বলতে নেই।"

শুনে প্রমথ হাসতে লাগল ; বললে, "ক্ষণে-অক্ষণের কথা হঠাৎ লেগে যেতে পারে—এই ভয় করছ তো? নিশ্চিন্ত থেকো, অত সুখে-সুখে মরব না ;—তোমার হাতে অনেক দুঃখ পেতে এখনো বাকি আছে। কিন্তু এ কথা পরে হবে, উপস্থিত কাশীর রাবড়ি, চমচম—এই সব ভাল ভাল জিনিস আনাও, ভাল ক'রে খেতে হবে।"

প্রমথর কথা শুনে সন্ধ্যা চমকিত হয়ে বললে, "আপনি এখনো খান নি না-কি?"

হাসিমুখে প্রমথ বললে, "নিশ্চয় খাই নি, কিন্তু নিশ্চয় খাব। তুমিও খাবে।"

খাবারের ব্যবস্থা করবার জন্য সন্ধ্যা দ্রুতপদে অগ্রসর হ'ল। প্রমথ ডাক দিয়ে বললে, "উষা, একটা কথা শুনে যাও।"

ফিরে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসু নেত্রে প্রমথর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে।

"আজ আমার যেমন দুঃখের দিন, তেমনি সুখের দিন। আজ আমার একটা প্রার্থনা পূর্ণ করবে?"

কুণ্ঠিত স্বরে সন্ধ্যা বললে, "কি বলুন?"

"খাওয়া-দাওয়ার পরে এসরাজের গোটা দুই আলাপ, আর তোমার গলার গোটা দুই গান শোনাবে? তুমি তো বলেছিলে উষা, ভাগবত শেষ হয়ে গেলে শোনাবে—আর আজ না শুনিয়ে তাড়াতাড়ি চ'লে যাচ্ছিলে। শোনাবে?"

এক মুহূর্ত নীরব থেকে মৃদুস্বরে সন্ধ্যা বললে, "শোনাব।" তার পর দ্রুতপদে নীচে নেমে গিয়ে পাচককে বললে, "ঠাকুর, শীঘ্র বাবুর খাবার উপরে নিয়ে এস।"

পাচক বললে, "মা, একটু আগে বাবুকে জিজ্ঞাসা করতে গিয়েছিলাম, বাবু আমাকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন যে, আজ খাবেন না।"

ঈষৎ আরক্ত মুখে সন্ধ্যা বললে, "না, খাবেন, নিয়ে এস।"

"আপনারও তো নিয়ে যাব মা?"

একটু ইতস্তত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "আচ্ছা, আন।"

সময়ে সময়ে এমন অদ্ভুতভাবে ঘটনার সমাবেশ হয় যে, মনে হয় এ যেন আপন খেয়ালে ঘটে নি, কোনো অদৃশ্য নিয়ন্তার ইচ্ছার বশে ঘটেছে। দু দিন পরে অপরাহ্নের দিকে অতিশয় কম্প দিয়ে প্রমথর যখন জ্বর এল, তখন অন্তত সন্ধ্যার মনে হ'ল, হয়তো এমনি একটা ঘটনাই ঘটবার উপক্রম করছে। ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে গেল, মনে হ'ল কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় কে জানে!

একটা মোটা র‍্যাগে সর্বাঙ্গ জড়িয়ে বালিশে ভর দিয়ে প্রমথ সোফার উপর শুয়ে ছিল; চোখ দুটো জবাফুলের মতো লাল, মুখে তীব্র যন্ত্রণার ছাপ। সন্ধ্যা এসে বললে, "চলুন, ও-ঘরে বিছানায় শোবেন চলুন।"

রক্তবর্ণ চক্ষু সন্ধ্যার মুখে স্থাপিত ক'রে প্রমথ বললে, "কার বিছানায়? তোমার?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি তা হ'লে কোথায় শোবে?"

সন্ধ্যা বললে, "সে রাত্রের কথা রাত্রে হবে, এখন তো আপনি চলুন।"

সমস্ত দেহটা ছড়িয়ে দিয়ে ভাল ক'রে শয়ন করবার জন্য ভারি ইচ্ছা হচ্ছিল, উঠে দাঁড়িয়ে প্রমথ বললে, "চল।"

প্রমথ শয্যায় শয়ন করলে সন্ধ্যা ভাল ক'রে দুখানা র‍্যাগ তার গায়ে দিয়ে দিলে, তার পর অডিকোলনের জল ক'রে কপালে জলপটি দিয়ে একটা চেয়ার নিয়ে মাথার শিয়রে বসল।

"উষা!"

"আজ্ঞে?"

"কোনদিন বোধ হয় ভুলে বড় রকমের একটা পুণ্যের কাজ করেছিলাম তাই এ অসুখটা আজ হ'ল।"

সন্ধ্যা কোনো কথা কইলে না, চুপ ক'রে রইল।

"কেন, বুঝতে পেরেছ ?"

সন্ধ্যা বললে, "পেরেছি। আপনি চুপ ক'রে থাকুন, কথা কইবেন না।"

প্রমথ কিন্তু কথাটা শেষ না ক'রে ছাড়লে না; বললে, "তাই তোমার হাতের এত মিষ্টি সেবা পেলাম।" তার পর ঘাড় ফিরিয়ে সন্ধ্যার মুখের দিকে চেয়ে বললে, "কিন্তু তাই ব'লে মনে ক'রো না সে পুণ্যটা এত বেশি যে, সেদিনকার সে কথাটাও ফ'লে যাবে। দেখো, শেষ পর্যন্ত সেরেই উঠব।"

সন্ধ্যার মুখে গভীর বেদনার রেখা ফুটে উঠল। আর্ত কণ্ঠে সে বললে, "আপনি চুপ করবেন কি-না বলুন!"

স্মিতমুখে প্রমথ বললে, "আচ্ছা, চুপ করলাম। চুপ করতেই তো চাই, কিন্তু জ্বরের ধমকে কথাগুলো কেমন যেন আপনি বেরিয়ে আসে।"

সন্ধ্যা মনে মনে সকাতরে তার অন্তরের ঐকান্তিক প্রার্থনা জ্ঞাপন ক'রে বললে, 'হে বাবা বিশ্বনাথ! দয়া ক'রো ঠাকুর। নইলে এ মুখ দেখাবার আর কোনো উপায়ই থাকবে না।'

"মা!"

সন্ধ্যা তাকিয়ে দেখলে, দ্বারের কাছে কামিনী দাঁড়িয়ে। উঠে গিয়ে বললে, "এনেছ ?"

"হ্যাঁ মা, এনেছি।" ব'লে কামিনী একটা থার্মোমিটার সন্ধ্যার হাতে দিলে।

প্রমথ তাকিয়ে দেখে বললে, "ওটা কি উষা ?"

সন্ধ্যা বললে, "থার্মোমিটার।"

"আনালে ?"

"হ্যাঁ।"

থার্মোমিটার দিয়ে জ্বর পরীক্ষা ক'রে সন্ধ্যার মুখ শুকিয়ে গেল। জ্বর প্রায় ১০৫।

প্রমথ জিজ্ঞাসা করলে "কত দেখলে? খুব বেশি, না?"

সন্ধ্যা বললে, "না, এমন কিছু বেশি নয়।" কিন্তু সন্ধ্যা যে সত্য কথা অনেকখানি গোপন করলে তার মুখ দেখে প্রমথর বুঝতে বাকি রইল না।

থার্মোমিটার তুলে রেখে সন্ধ্যা ত্বরিতপদে নীচে গিয়ে কামিনীকে বললে, "কামিনী, বাবুর বড় বেশি অসুখ। তুমি মানদা মাসীর কাছে গিয়ে বল যে, তিনি যেন শীঘ্র একজন ভাল ডাক্তার নিয়ে এখানে আসেন।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই মানদা একজন বিচক্ষণ ডাক্তার নিয়ে হাজির হ'ল। ডাক্তার ভাল ক'রে রোগীকে পরীক্ষা ক'রে দেখলেন, তার পর পাশের ঘরে গিয়ে গোটা দুই প্রেসক্রিপশন লিখে দিলেন।

সন্ধ্যা এসে নমস্কার ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, "কেমন দেখলেন?"

ডাক্তার বললেন, "উপস্থিত ভয়ের কোনো কারণ নেই, কিন্তু আপনার স্বামীর হার্ট তেমন সবল নয়। একেবারে উঠা-বসা করতে দেবেন না, তা ছাড়া অবিরত মাথায় বরফ দিতে হবে, অডিকলোন চলবে না। জ্বর একশো দুয়ের নীচে নামলে বরফ বন্ধ করবেন। মনে হচ্ছে, ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া। কাল রক্ত পরীক্ষা করাব।"

পথ্যাদির ব্যবস্থা ক'রে ডাক্তার চ'লে গেলে সন্ধ্যা ঔষধ-পত্রের একটা ফর্দ ক'রে মানদার হাতে দিলে। একখানা দশ টাকার নোট দিয়ে বললে, "শীঘ্র এগুলো আনিয়ে দিন।"

ঔষধাদি এলে একটা ছোট টেবিলের উপর সন্ধ্যা সেগুলো সাজিয়ে ফেললে।

সমস্ত রাত ঔষধ পথ্য আর বরফ চলল। রাত দুটোর সময় প্রমথ তাকিয়ে দেখলে, তার মাথায় বরফের টুপি ধ'রে সন্ধ্যা ব'সে রয়েছে। ব্যস্ত হয়ে

বললে, "এখনো ব'সে আছ উষা? বিরিঞ্চিকে কি ঠাকুরকে ধরতে দাও না একটু।"

সন্ধ্যা বললে, "ওরা এসব পারবে কেন? আপনি ঘুমোন, আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না।"

মেঝেয় বিছানা পেতে মানদা ঘুমোচ্ছিল। তার দিকে তাকিয়ে প্রমথ বললে, 'মানদা মাসীকে একটু দাও না।"

সন্ধ্যা বললে, "একটা লোক ঘুমোচ্ছে, অনর্থক তার ঘুম ভাঙিয়ে কি লাভ হবে?"

প্রমথ একটু হাসল; বললে, "কিন্তু সমস্ত রাত জেগে ব'সে থেকে তোমারই বা কি লাভ হবে বল?

সন্ধ্যা কোনো উত্তর দিলে না,—বরফ বদলে আনবার জন্যে টুপিটা নিয়ে উঠে গেল।

প্রত্যূষে পাঁচটার সময় সন্ধ্যা থার্মোমিটার নিয়ে দেখলে, জ্বর একশো একের কাছে নেবে গেছে। টুপি থেকে বরফ ফেলে দিয়ে টুপিটা রেখে ফিরে এসে দেখলে, প্রমথ তারই মধ্যে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। অল্প অল্প ঘাম হচ্ছিল, একটা র‍্যগ আস্তে আস্তে গা থেকে তুলে দিলে। তার পর মানদার পাশে একটা মাদুর পেতে নিয়ে শুয়ে পড়ল।

৮ দিন অসুখটা খুব বেশি চলল। তার পর ক্রমশ ক'মে ক'মে ছ দিনের দিন জ্বর ছেড়ে গেল। বেলা দশটার সময় সন্ধ্যা প্রমথকে হরলিক্‌স্‌ ক'রে খাওয়াবার উপক্রম করছে, এমন সময় একটা পিতলের পরাতে নৈবেদ্য নিয়ে কামিনী প্রবেশ ক'রে বললে, "মা, পূজো দিয়ে এলুম।"

সন্ধ্যা উঠে গিয়ে হাত ধুয়ে কামিনীর হাত থেকে পরাতটা নিয়ে ঘরের এক কোণে রাখলে। তার পর তা থেকে একটি ফুল আর বিল্বপত্র তুলে নিয়ে প্রমথর মাথায় ছুঁইয়ে দিলে। একটুখানি চিনি নিয়ে প্রমথকে বললে, "হা

কক্ষন্দ" প্রমথ হাঁ করলে তার মুখে চিনিটুকু ফেলে দিয়ে হাতটা নিজের মাথায় বুলিয়ে নিলে। তার পর ফীডিং কাপে হরলিক্‌স্ ঢেলে প্রমথকে খাওয়াতে উদ্যত হ'ল।

হরলিক্‌স্ খাওয়া শেষ হ'লে প্রমথ সন্ধ্যার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "অনাহারে অনিদ্রায় নিজের শরীরপাত ক'রে, দেবতার পায়ে মাথামুড় খুঁড়ে আমাকে তো বাঁচিয়ে তুলসে উষা, কিন্তু এ অসার অপদার্থ বস্তু তোমার কোন্ কাজে লাগবে তা তো ভেবে পাচ্ছি নে একটুও।"

সন্ধ্যা বললে, "শরীর আপনার অতিশয় দুর্বল, এ সব কথা এখন ভাববেন না।"

প্রমথ হাসতে লাগল; বললে, "ভাবব না—সে কথা কেমন ক'রে বলি? তবে বলব না না-হয়। কিন্তু তুমি ঠিক বলেছ উষা, শরীর আমার অতিশয় দুর্বল হয়েছে। মাত্র দিন ছয়েকের জ্বর, শরীরটা কিন্তু একেবারে গুঁড়ো ক'রে দিয়েছে। তুমি না থাকলে এবার লম্বা পাড়ি দিতে হ'ত। ভাগ্যিস দিন কতকের জন্য ফিরে এসেছিলে, তাই।"

কথাটা যে একেবারে নিছক মিথ্যা নয়, এ বিশ্বাস সন্ধ্যারও ছিল। নিরবসর সতর্ক সেবার মধ্যে সামান্য অবহেলা হ'লেও সে কঠিন রোগ বোধ হয় একেবারেই আয়ত্তের বাইরে চ'লে যেতে পারত। শুশ্রূষার অকুণ্ঠিত প্রশংসা করবার সময় ডাক্তারও সেই মর্মে ব'লে গিয়েছিলেন। তাই প্রমথর কৃশ দেহ এবং পাংশু মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সন্ধ্যার চোখ ছলছলিয়ে আসত। মনে হ'ত, আহা! বাপ নেই, মা নেই, স্ত্রী নেই, কেউ নেই,—ভাগ্যে আমি ছিলাম! এই চিন্তা হতে ধীরে ধীরে ক্ষরিত হ'ত একটা সূক্ষ্ম মমতার বোধ,—কঠিন রোগ হতে আরোগ্য লাভের পর সন্তানের প্রতি জননীর যেমন নূতন ক'রে একটা মায়া পড়ে কতকটা সেই প্রকার।

দিন দুই পরে প্রমথর শয্যাপার্শ্বে ব'সে সন্ধ্যা বেদানা ছাড়াচ্ছিল, এমন সময়ে

কামিনী এসে বললে, "মা, সেই পাঠক-ঠাকুর আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।"

কামিনীর কথা শুনে সন্ধ্যার মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া ঘনিয়ে উঠল; বললে, "কি দরকার?"

"তা তো বলতে পারি নে মা, আপনাকে খবর দিতে বললেন।"

প্রমথ বললে, "কি দরকার বুঝতে পারছ না উষা? আজ বোধ হয় দশ দিন পুরল—তাই তোমাকে খবর দিতে এসেছেন।"

এ কথা সন্ধ্যাকে বুঝিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না, সে আপন মনে মৃদুস্বরে গুঁইগাঁই করতে লাগল—"আমি কিন্তু আজ কি ক'রে যাই, আজ আমার যাওয়া কেমন ক'রে হয়?"

প্রমথ বললে, "আমি তো এখন ভাল হয়েছি উষা, এখন আর তোমার যেতে আপত্তি কি?"

এ কথার উত্তরে সন্ধ্যা পরস্পর-বিচ্ছিন্ন যোগযুক্তিবর্জিত যে কয়টি কথা বললে, তার ভাষাগত অর্থ নিরূপণ করা কঠিন, কিন্তু ভাবগত অর্থ যে নবদ্বীপ যাবার একান্ত অনিচ্ছা, তা বুঝতে প্রমথর কিছুমাত্র বিলম্ব হ'ল না। উদগ্র আনন্দ এবং কৌতুক কষ্টে রোধ ক'রে গম্ভীর মুখে সে বললে, "কিন্তু সেটা ভাল দেখায় না উষা, কথা দিয়ে এখন যদি বল—"

প্রমথকে কথা শেষ করতে না দিয়ে সন্ধ্যা বললে, "কিন্তু কথা আমি যখন দিয়েছিলাম তখন তো আপনার অসুখ হয় নি। এখনো আপনি ভাত খান নি, এ অবস্থায় ফেলে কেমন ক'রে চ'লে যাই? তা ছাড়া—"

এবার প্রমথ সন্ধ্যাকে তার অসমাপ্ত কথার মধ্যে নিবারিত করলে; বললে, "তা ছাড়া যা বলবার তা পাঠক-ঠাকুরকে আমিই বলব, তোমার আর কিছু বলবার দরকার নেই।" কামিনীর দিকে তাকিয়ে বললে, "তাঁকে এখানে ডেকে নিয়ে এস।"

রঘুনাথ ঘরে প্রবেশ করতেই প্রমথ হাত জোড় ক'রে বললে, "ক্ষমা করবেন মশায়, রোগে পড়া ছাড়া আমার আর দ্বিতীয় অপরাধ নেই, আপনার শিষ্যা কিন্তু বিগড়েছেন।"

সহাস্যমুখে রঘুনাথ বললেন, "অর্থাৎ ?"

"অর্থাৎ তিনি মনে করেছেন যে, উপস্থিত যে সেবার ভার তিনি নিজের হাতে নিয়েছেন তা অসমাপ্ত রেখে নবদ্বীপ গেলে আশ্রম-ধর্মের ব্যতিক্রম হবে।"

রঘুনাথ বললেন, "তা সত্যিই হবে। বিশেষত, তাঁর সেবা অসমাপ্ত রেখে, যার কাছে মা-লক্ষ্মী এতখানি উপকৃত।"

সহাস্যমুখে প্রমথ বললে, "উপকার-প্রত্যুপকারের হিসেব করতে যাবেন না গোঁসাইজী, ও-ব্যাপার অতিশয় জটিল, কারণ ওঁর কাছেও আমি কম উপকৃত নই। সেই উপকারের কথা স্মরণ ক'রে আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, সমর্থ হওয়া মাত্র আমি ওঁকে আপনার আশ্রমে দিয়ে আসব।"

রঘুনাথ বললেন, "সেই কথাই ভাল। এখন মা-লক্ষ্মী আপনার কাছেই থাকুন। তাঁর জন্যে আমার আশ্রমের দ্বার সব সময়েই খোলা রইল।"

প্রমথ ও সন্ধ্যার সহিত কিছুক্ষণ আলাপ ক'রে রঘুনাথ বিদায় গ্রহণ করলেন।

দিন দশেক পরের কথা। নষ্টস্বাস্থ্য উদ্ধারের উদ্দেশ্যে সন্ধ্যাকে নিয়ে প্রমথ দ্বিপ্রহরের গঙ্গাবক্ষে নৌকা ক'রে বেড়াচ্ছিল। কথাবার্তার মধ্যে এক সময়ে সে বললে, "উষা, এখন তো আমি বল পেয়েছি, এবার চল একদিন তোমাকে নবদ্বীপ রেখে আসি।"

সন্ধ্যা কোনো কথা বললে না, চুপ ক'রে ব'সে রইল।

"কি বল ?"

সন্ধ্যা বললে, "আপনি বলছেন বল পেয়েছেন, কিন্তু আপনাকে দেখে তা একটুও মনে হয় না। আমার মনে হয়, একটা কোনো ভাল জায়গায় আপনার চেঞ্জে যাওয়া উচিত।"

"কোথায় যাবে বল ?"

একটু ভেবে সন্ধ্যা বললে, "লক্ষ্ণৌয়ে তো আপনার নিজের বাড়ি আছে! সেখানে গেলে হয়।"

প্রমথ বললে, "সে মন্দ কথা নয়। তা হ'লে কবে যাবে বল ?"

সন্ধ্যা বললে, "দেরি ক'রে আর লাভ কি ? দু'তিন দিনের মধ্যে বেরিয়ে পড়লেই হয়। এখন তো আপনি কতকটা বল পেয়েছেন।"

সন্ধ্যার কথা শুনে প্রমথ আর হাসি চেপে রাখতে পারলে না; বললে, "কিছু মনে ক'রো না উষা, যে অত্যাশ্চর্য বল আমাকে লক্ষ্ণৌ নিয়ে যেতে পারে অথচ নবদ্বীপে নিয়ে যেতে পারে না, তার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। কিন্তু একটা কথার উত্তর দেবে কি ?"

আরক্ত মুখে সন্ধ্যা বললে, "কি ?"

সন্ধ্যার দিকে একটু মুখ বাড়িয়ে মৃদুস্বরে প্রমথ বললে, "পাখী কি অবশেষে পোষ মানল ? আমার সংসারেই কি তোমার আশ্রম পাতলে উষা ?"

সন্ধ্যা কোনো কথা বললে না, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চুপ ক'রে রইল।

প্রমথ বললে, "পাত না ভাই! নাও না আমাকে রিক্ত ক'রে আমার সমস্ত সম্পদ! নিরন্নের আহার যোগাও, দরিদ্রের সেবাশ্রম কর,—যে ভাবে তোমার ইচ্ছে হয়, যা করলে তোমার ভাল লাগে। পরের আশ্রমে গিয়ে কাজ কি উষা ?"

এবার সন্ধ্যা তার মুখ আরও খানিকটা ফিরিয়ে নিলে রামনগরের তীরের দিকে, তখন তার চোখ দিয়ে বড় বড় ফোঁটায় অশ্রু ঝ'রে পড়ছে—বোধ হয় অনেক দুঃখে আর অনেক সুখে।

এর দিন তিনেক পরে কামিনী প্রভৃতিকে নিয়ে প্রমথ ও সন্ধ্যা লক্ষ্ণৌ রওনা হ'ল।

আটাশ

কালের চাকায় সময়ের কাঁটা মাস ছয়েক এগিয়ে গেছে। চৈত্র. মাসের শেষ ভাগ। জহরলাল চৌধুরী তাঁর কলিকাতার বাড়ির বৈঠকখানায় ব'সে সদ্য-লব্ধ সংবাদপত্রে মনোনিবেশ করেছেন, এমন সময়ে একটি প্রৌঢ় ব্যক্তি প্রবেশ ক'রে নত হয়ে যুক্তকরে জহরলালকে অভিবাদন করলে।

চশমার রীমের উপর দিয়ে আগন্তুকের প্রতি বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ ক'রে জহরলাল বললেন, "কি কেশব, খবর কি? কখন এলে?"

বিনীতকণ্ঠে কেশব বললে, "আজ্ঞে মহারাজ, আজ এসেই বাসায় জিনিসপত্র ফেলে হুজুরে হাজির হয়েছি।"

"আচ্ছা, ব'সো, সব শুনছি।" ব'লে জহরলাল আলবোলার নল মুখে দিয়ে অসমাপ্ত সংবাদটুকু শেষ করতে উদ্যত হলেন।

ফরাসের নিকটে কাঠের পালিশ-করা একটা বেঞ্চ ছিল। কেশব সন্ত্রস্ত-ভাবে তার এক প্রান্তে উপবেশন করল। কেশব, অর্থাৎ কেশবচন্দ্র হালদার, জহরলালের বিশ্বস্ত নায়েব। জমিদারি পরিচালনার জন্য যে বুদ্ধির অথবা কূট বুদ্ধির প্রয়োজন, কেশবের তা যথেষ্ট ছিল শুধু তাই নয়, সুনীতি এবং বিবেক নিন্দিত যে-কোনো দুঃসাধ্য কর্ম সাধনের জন্য বিচক্ষণতার সহিত যে দুঃসাহসের প্রয়োজন তাও তার অল্প ছিল না। সেজন্য, দুরূহ অথবা গোপনীয় বিশেষ কোনো কার্যসাধনের প্রয়োজন হ'লে জহরলাল কেশবের সহায়তা গ্রহণ করতেন।

সংবাদের অপঠিত অংশটুকু সমাপ্ত ক'রে জহরলাল চক্ষু হতে চশমা খুলে রেখে কেশবের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন, "কি খবর বল কেশব? আপাতত কোথা থেকে আসছ?"

"আজ্ঞে মহারাজ, কাশী থেকে।"

"সেখানে সন্ধান কিছু পেলে ?"

"বিশেষ কিছু পাই নি, কিন্তু প্রমথ যে বউ-রাণীমাকে নিয়ে কাশী গিয়েছিল—এ বিষয়ে আমার খুব বেশি সন্দেহ নেই।"

কেশবের কথা শুনে জহরলালের মুখে বিরক্তির চিহ্ন পরিস্ফুট হ'ল ; ঈষৎ ভর্ৎসনার স্বরে বললেন, "মুখে বলেছি, চিঠিতে লিখেছি—বউ-রাণীমা ব'লো না তাকে, এ পরিবারের সঙ্গে তার আর কোনো সম্পর্ক নেই, তবু বারম্বার ঐ কথাটা ব্যবহার করবে!"

অপ্রতিভ ভাবে কেশব বললে, "মুখ দিযে বেরিয়ে যায় হুজুর, এখনো অসম্মানের কথা উচ্চারণ করতে মুখে বাধে।"

জহরলাল বললেন, "তার তো কুলত্যাগ ক'রে প্রকাশের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বাধল না, তোমারই বা বাধে কেন ? কাশীতে কি সন্ধান পেলে বল শুনি ?"

কেশব বললে, "কাশীতে পাণ্ডাদের মধ্যে সন্ধান করতে করতে শঙ্কর পাণ্ডা নামে একজন পাণ্ডার কাছে টের পেলাম যে, প্রমথ নামে এক ব্যক্তি মাস পাঁচ-ছয় আগে সস্ত্রীক কাশীতে এসেছিল। কিন্তু দু-চারটে কথা জিজ্ঞাসা করতেই কি তার মনে হ'ল, হয়তো আমাকে গোয়েন্দা ব'লেই সন্দেহ করলে, আর কোনো কথা ভাঙলে না। শুধু সে-ই নয়,তার পর যাকেই প্রমথর বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি সে-ই মাথা নাড়ে আর বলে, কিছু জানে না। খুব সম্ভবত শঙ্কর পাণ্ডার পরামর্শে। শঙ্কর পাণ্ডা যে দোকান থেকে ফুল বিল্বপত্র নেয়, যে দোকান থেকে ফলমূল কেনে, যে দোকানের মিষ্টান্ন ব্যবহার করে—সব জায়গায় চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোনো সন্ধান পাই নি।"

জহরলাল বললেন, "আর কোনো সন্ধানে দরকারও নেই, যতটুকু পেয়েছ তাই যথেষ্ট। প্রকাশের বাড়ি থেকে সে কাউকে না জানিয়ে প্রকাশের বিনা

অনুমতিক্রমে প্রমথ নামে একজন অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে, আর বাপের বাড়ি কিংবা অন্য কোনো আত্মীয়ের বাড়ি নেই—এ কথায় তো তোমার কোনো সন্দেহ নেই ?”

কেশব মাথা নেড়ে বললে, “না মহারাজ, এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।”

জহরলাল বললেন, “এ-ই যথেষ্ট। আর কিছু দরকার নেই।” তার পর কেশবের সহিত অন্যান্য বিষয়ে কিছুক্ষণ কথাবার্তা ক'য়ে তাকে বিদায় দিলেন।

প্রমথর সহিত সন্ধ্যার প্রস্থানের পর নিজ দায়িত্ব থেকে মুক্তিলাভের জন্য প্রকাশ অবিলম্বে সে কথা সন্ধ্যার পিতাকে পত্র লিখে জানায়, এবং জহরলালকে সে কথা জানানোর কর্তব্য নিরূপণের ভার তাঁরই বিবেচনার উপর ছেড়ে দেয়। সন্ধ্যার পিতা বেণীমাধব কিন্তু সহসা এ কথা জহরলালকে জানানো সমীচীন মনে করেন নি, কারণ তা হ'লে সন্ধ্যার শ্বশুরালয়ে প্রবেশের যৎসামান্য আশাটুকুও যে চিরদিনের মতো নির্বাপিত হয়ে যাবে সে বিষয়ে তাঁর কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি কিছুদিন পূর্বে কথাটা অন্য দিক থেকে একটু গোলমেলে ভাবে জহরলালের কানে এসে পৌঁছায়। পীরনগরে পাঁচ-আনা তরফের ইন্দ্রনাথ চৌধুরী—সুধারাণীর স্বামী, জামসেদপুর চাকরি করে। ইন্দ্রনাথের নিকট হতে জহরলাল একখানা চিঠি পান, তার প্রধান বক্তব্য এইরূপ।—'কাকাবাবু, আমার এখানকার একটি বন্ধুর মুখে আজ কথায় কথায় শুনলাম যে, মাস তিন-চার পূর্বে প্রকাশ ভায়ার গৃহে সন্ধ্যা নামে একটি মেয়ে সহসা একদিন আবির্ভূত হয় এবং কিছুকাল তথায় অবস্থান ক'রে সকলের অগোচরে প্রমথ নামে একটি যুবকের সহিত একদিন অন্তর্হিত হয়ে যায়। এ সন্ধ্যা আমাদের অপহৃতা বধূমাতা সন্ধ্যা কি-না জানবার জন্য আমাদের অত্যন্ত ঔৎসুক্য হয়েছে। কিন্তু আমার সহিত প্রকাশ ভায়ার অকারণ বিরোধ এবং

অসরস আচরণের কথা। আপনি তো সমস্তই অবগত আছেন, সুতরাং বুঝতেই পারছেন তাঁর নিকট গিয়ে এ কথা জিজ্ঞাসা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তা ছাড়া, এ কথাও মনে হচ্ছে যে, জামসেদপুরে প্রকাশ ভায়ার অপেক্ষা আমি আপনার অনেক নিকটতর আত্মীয়, সুতরাং বধূমাতা হ'লে তিনি খুব সম্ভবত আমার গৃহেই আসতেন। এ যদি আর কোনো সন্ধ্যা হয়, তা হ'লে প্রকাশের কাছে এ কথা তুলে তার অধিকতর বিরাগভাজন হব। সে কারণ কথাটা অবিলম্বে আপনাকে জানালাম। আপনি প্রকাশকে পত্র লিখে অনুসন্ধান করবেন এবং যথাকালে অনুসন্ধানের ফল অনুগ্রহ ক'রে আমাকে জানাবেন।"
এই চিঠি পাওয়ার পর জহরলাল কেশবকে অনুসন্ধানে নিযুক্ত করেন।

দ্বিপ্রহরে জহরলাল পত্নী মমতাময়ীর নিকট কথাটা উত্থাপিত করলেন; বললেন, "কেশব আজ ফিরে এসেছে মমো।"

মমতাময়ী বুঝলেন যে, সংবাদ যদি জহরলালের মতের অনুকূল না হ'ত তা হ'লে এত শীঘ্র এবং এত উৎসাহসহকারে তিনি কখনই তা বলতে উদ্যত হতেন না। তথাপি নিজের অন্তরের অবুঝ ঔৎসুক্যকে অপ্রকাশ রেখে বললেন, "কি খবর আনলে?"

জহরলাল মুখ গম্ভীর ক'রে বললেন, "খবর আর নতুন কি আনবে, আমি যা মনে মনে জানতাম তাই। প্রকাশের বাড়ি থেকে একটা বকাটে ছেলের সঙ্গে লুকিয়ে পালিয়ে গিয়ে কাশীতে দুজনে বাস করছে।"

বস্তুত কথাটা সত্য হতে বিশেষ দূরবর্তী মিথ্যা না হ'লেও জহরলাল প্রকৃত কথার মধ্যে এমন একটু অসত্য মিশিয়ে দিলেন যার দ্বারা সমস্ত জিনিসের আকৃতিটা অনেকখানিই কদর্য হয়ে উঠল। কথাটা কিন্তু মমতাময়ীর নিকট সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য বোধ হ'ল না; বললেন, "এ কথা তুমি সত্যি ব'লে মনে করছ?"

জহরলাল বললেন, "এ কথাটা এমন কি অপরাধ করলে যে, মিথ্যা ব'লে মনে

করতে হবে? তুমি জান না মমো, ও-সব মেয়ের এই রকম পরিণতিই হয়ে থাকে।”

জহরলালের কথা শুনে মমতাময়ীর মুখ আরক্ত হয়ে উঠল; তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললেন, “দেখ, এত বড় অধর্মের কথা মুখে এনো না। হিন্দু সমাজের জাঁতি-কলে তাকে ফেলেছ, যত ইচ্ছে পীড়ন কর; কিন্তু নিজেদের সাফাই গাইবার জন্যে মিথ্যে অপবাদ দিয়ো না। তুমি তার কি জান যে, ও-কথা বলছ? আমি জানি. সে মেয়ে নিষ্পাপ, নিষ্কলুষ।”

মমতাময়ীর তীব্র প্রতিবাদে জহরলাল ঈষৎ অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন; বললেন, “তুমি আমাকে একটু ভুল বুঝছ মমো। আমার বলবার উদ্দেশ্য, এ রকম ঘটনার পর ও সব মেয়ের আর দ্বিতীয় কোনো উপায় থাকে না ব'লে প্রকৃতিও সেইভাবে বদলে যায়। একটা কথা আছে, বিষাক্ত সাপের মুখ থেকে যে ব্যাঙ কোনো রকমে রক্ষা পেয়ে পালায়, সেও-ও বিষাক্ত হয়ে ওঠে। এও তেমনি আর কি!”

মমতাময়ী বললেন, “সে যাই হোক, এ কথা তুমি প্রিয়কে জানিয়ো না। তুমি যে মনে করেছ এ কথার জোরে বউমার উপর থেকে প্রিয়র মন তুলে নিয়ে তুমি তার বিয়ে দিয়ে তাকে সংসারী করবে, তা কিছুতেই হবে না।”

“কেন?”

“কেন? তুমি পুরুষমানুষ হয়ে, জিজ্ঞেস করছ. ‘কেন?’ এ কথা শুনে হয় সে কাশী গিয়ে একটা খুনোখুনি ব্যাপার করবে; নয় চিরদিনের জন্যে এমন অশ্রদ্ধা হয়ে যাবে যে, জীবনে কখনো মেয়েমানুষের মুখ দেখবে না। কত ভ্রষ্টা স্ত্রীলোকের স্বামী সন্ন্যেসী হয়ে গেছে তা তুমি ভুলে যাচ্ছ? বিপিন বৈরিগীর কথা মনে নেই তোমার? পরাণ হালদারের কথা ভুলে যাচ্ছ? তা ছাড়া, এমন কথা যদি মনে হয় যে, আমাদের জবরদস্তির জন্যেই এ কাণ্ডটা ঘটল, তা হ'লে আমাদের উপর হয়তো এমন অভিমান হবে যা জীবনে কোনো

দিন যাবে না। স্ত্রীভ্রষ্টা—এ কথা কি সহজে কোনো পুরুষমানুষকে বলতে আছে? অনর্থ ঘ'টে যাবে যে?"

মমতাময়ীর ভয় প্রদর্শনে জহরলাল চিন্তিত হয়ে উঠলেন। এ অভিসন্ধি তাঁর মনে মনে ছিল তাতে সন্দেহ নেই যে, সন্ধ্যার প্রতি প্রিয়লালের মনে একটা ঘৃণা উৎপাদন করতে পারলে কতকটা সহজে তাকে দ্বিতীয়বার বিবাহে স্বীকৃত করতে পারা যাবে। কিন্তু ঔষধ প্রয়োগে ব্যাধির উপশম না হয়ে বৃদ্ধি পাবার আশঙ্কা আছে কি না সে কথা ভেবে দেখবার অবসর হয় নি।

স্বামীকে নির্বাক এবং চিন্তিত দেখে মমতাময়ী বললেন, "অত কি ভাবছ?"

জহরলাল বললেন, "ভাবছি, প্রিয়র মনের অবস্থা যদি কোনো রকমে না বদলায়, তা হ'লে ও যে কখনো আবার বিয়ে করতে রাজী হবে তার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই। দেখলে তো রামলাল চাটুজ্জের মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা নিয়ে কি কাণ্ডটা করলে।"

মমতাময়ী বললেন, "তা কি করবে? সকলেরই কি অদৃষ্টে সব সুখ থাকে। স্ত্রী-ভাগ্য ওর যদি ভালই হবে তা হ'লে অমন বউই বা হারাবে কেন? রূপে গুণে যেন লক্ষ্মী-প্রতিমা! মনে মনে কত সাধ করেছিলাম যে, এই কলকাতার বাড়ি সে আলো ক'রে থাকবে। কত দুঃখ-কষ্ট পেয়ে এ বাড়িতে এসে দাসী হয়ে থাকতে চেয়েছিল। দিলাম তাকে দূর দূর ক'রে শেয়াল কুকুরের মতো তাড়িয়ে! এক দিক দিয়ে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত তো করতে হবে।—ছেলেটাই না হয় সন্ন্যেসী হয়ে থাকবে, অদৃষ্ট যখন তার এতই মন্দ।" ব'লে মমতাময়ী অঞ্চলে চক্ষু মুছলেন।

জহরলাল বললেন, "অদৃষ্ট শুধু প্রিয়র মন্দ নয় মমো, আমাদেরও মন্দ—নইলে এ দুঃখ কে ই বা চেয়েছিল বল! কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের কথা তুলছ কেন? পাপ কোথায় যে তার প্রায়শ্চিত্ত?"

"পাপ যদি না থাকবে—তা হ'লে দিবারাত্র মনের মধ্যে দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্বলছে কেন ?"

"সেইটেই তো অদৃষ্ট।"

"তাই যদি হয় তা হ'লে ছেলেরও অদৃষ্ট নিয়ে নাড়াচাড়া করতে যেয়ো না ; ও যেমন দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে তেমনি করুক।" ব'লে মমতাময়ী কক্ষান্তরে প্রস্থান করলেন।

কথাটা সেদিনের মতো সেইখানেই শেষ হয়ে রইল।

স্বামীর কথায় সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করতে না পেরে মমতাময়ী সেই দিনই প্রমাণ সংগ্রহের জন্য জামসেদপুরে গোপনে সবিতাকে চিঠি লিখলেন। দিন দুই পরে কিন্তু সবিতার নিকট থেকে উত্তর পেয়ে পড়তে পডতে তাঁর মুখ অনেকখানি ম্লান হয়ে গেল। সবিতার পত্রের মর্ম জহরলালের কাহিনীর পরিপন্থী নয়, বরং তার প্রথমাংশের পরিপোষক। সবিতা লিখেছে,—'মামিমা, এ কথা সত্য, সন্ধ্যা আমাদের না জানিয়ে প্রমথবাবুর সঙ্গে কোথায় চ'লে গিয়েছে। কিন্তু সে কোথায় গিয়েছে, অথবা কাশী গিয়েছে কি-না, তা আমরা জানি নে। কাশী যাওয়া অবশ্য কিছুই আশ্চয নয়, কিন্তু সেখানে গিয়ে সে যে প্রমথবাবু সঙ্গে অসঙ্গত জীবন যাপন করছে—এ আমার সহজে বিশ্বাস হয় না। তার অদৃষ্ট মন্দ, কিন্তু প্রকৃতি মন্দ নয়।'

একটা কোনো কাহিনীর পারম্পর্যের মধ্যে কতকটা অংশ সত্য ব'লে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হওয়ার পর বাকি অংশকে মিথ্যা ব'লে সন্দেহ করবার প্রবলতা অনেকখানি ক'মে যায়। মমতাময়ীরও তাই হ'ল ; সবিতার নিকট হতে এ চিঠি পাওয়ার পর জহরলালের কথার কোনো অংশকেই আর অসত্য ব'লে অগ্রাহ্য করবার সাহস রইল না। অনাত্মীয় যুবকের সঙ্গে সকলের অগোচরে আত্মীয়ের গৃহত্যাগ করার পর কাশী গিয়ে অসঙ্গত জীবনযাপন করার মধ্যে এমন একটা সহজ সম্ভাবনীয়তা আছে যা প্রতিকূল প্রমাণের অভাবে

অগ্রাহ্য করা যায় না। যে ব্যক্তি উগ্র বিষ সংগ্রহ ক'রে রেখেছিল ব'লে জানি, সে একদিন বিষপানে প্রাণত্যাগ করেছে শুনলে কথাটা সম্ভব ব'লেই মনের মধ্যে স্থান লাভ করে।

প্রিয়লালের মানসিক দুরবস্থার জন্য জহরলালের মনে দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। সমাজের অনুশাসন প্রতিপালন করতে গিয়ে যে অনিবার্য আঘাত দিতে হয়েছে তার জন্য তিনি দায়ী নন,—এই যুক্তি সন্ধ্যার পক্ষে জহরলাল যেমন অবলীলাক্রমে প্রয়োগ করতেন, প্রিয়লালের পক্ষে তেমন পারতেন না। দৈবের অনিবার্যতা প্রিয়লালের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো সান্ত্বনা ছিল না, তাই তার জন্য জহরলালের চিন্তারও অবধি ছিল না। অবশেষে একটা উপায় মাথার মধ্যে দেখা দিল।

চতুর্দিক থেকে বিচার-বিবেচনা ক'রে উপায়টিকে পাকা ব'লেই মনে হ'ল—সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না—সেই শ্রেণীর একটা নিখুঁত কৌশল। এবার কিন্তু জহরলাল মমতাময়ীর সহিত পরামর্শ করিলেন না, 'মনসা চিন্তিতং কর্ম বচসা ন প্রকাশয়েৎ' চাণক্য নীতি পালন করলেন। তলব পড়ল গুপ্তমন্ত্রী কেশব হালদারের। সমস্ত সবিস্তারে শুনে কেশব কৌশলটি অনুমোদিত করলে।

জহরলাল বললেন, "দেখো, চিঠি যেন খবরদার নিজের হাতে লিখো না,—তোমার লেখা অনেকেই এখানে চেনে।"

জহরলালের কথা শুনে কেশবের মুখে মৃদু হাসি দেখা দিলে; বললে, 'মহারাজ, এতদিন ধ'রে নিজের হাতে শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ ক'রে আজ এই উপদেশ দেওয়া দরকার মনে করছেন?"

এই অনধিকার স্তুতির চাটুবাণীতে প্রসন্ন হয়ে জহরলাল বললেন, "তা বটে, কিন্তু চিঠি একটা লিখবে, না, দুটো লিখবে কেশব?"

"আমি বলি মহারাজ, তিনটে,—একটা হুজুরকে, একটা বেণীবাবুকে, একটা প্রকাশবাবুকে। কাজ করতে গেলে সাহস ক'রে সব দিক মেরে না

করলে কাঁচা কাজ হয়। একসঙ্গে সকলকে চিঠি দিয়ে অবস্থা এমন করুন, যাতে মোকাবিলা হ'লে সব জায়গায় একই কথা শোনা যায়। প্রমথর দেখা এখন কেই বা পাচ্ছে আর কেই বা চাচ্ছে মহারাজ যে, আসল কথার মোকাবিলা হবে!"

মনে মনে ক্ষণকাল চিন্তা ক'রে জহরলাল বললেন, "মন্দ নয়, তাই তবে কর। কিন্তু তোমার চিঠি নিয়ে কাশীতে যাকে পাঠাবে সে বিশ্বাসী লোক তো?"

"হুজুর যেমন আমাকে বিশ্বাস করেন, আমি তেমনি তাকে করি।"

"কবে পাঠাবে তাকে?"

"আজ্ঞে, আজ রাত্রেই।"

মনে মনে হিসাব ক'রে জহরলাল বললেন, "তা হ'লে বুধবারের ডাকে এখানে আমরা চিঠি পাব। এ সময়টা তোমার এখানে উপস্থিত থাকাই ভাল, নইলে লোকের মনে কোনোরকম সন্দেহ হতেও পারে।" এ 'লোক' অর্থে প্রধানত যে মমতাময়ী, সে কথা অবশ্য জহরলাল প্রকাশ ক'রে বললেন না।

তৃতীয় দিন বেলা দশটার সময় ডাক এল। জহরলাল ইচ্ছা ক'রেই দমদমার বাগান দেখতে গিয়েছিলেন। তাঁর হাত হয়ে চিঠিখানা মমতাময়ী বা প্রিয়লালের হাতে পড়ে—এটা তাঁর ইচ্ছা ছিল না। পিয়ন যখন এল তখন প্রিয়লাল বার-মহলে তার পড়বার ঘরে ব'সে এম. এ. ক্লাসের একটা পাঠ্য পুস্তকের পাতা ওল্টাচ্ছিল। পিয়ন চিঠির বাক্সে চিঠি ফেলতে উদ্যত হচ্ছে দেখতে পেয়ে সে পিয়নকে ডেকে তার হাত থেকে চিঠিগুলো নিয়ে নিলে। পাঁচ-ছ খানা চিঠি; ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎ একটা পোস্টকার্ডের ভিতরে গোটা দুই-তিন কথা চোখে পড়তেই মাথাটা গেল ঘুরে। কোনো প্রকারে সমস্ত শক্তি সংহত ক'রে চিঠিখানা প'ড়ে শেষ করলে। চিঠিটা এই—

কাশীধাম

সবিনয় নিবেদন,

গতকল্য রাত্রি দেড়টার সময়ে অভাগিনী সন্ধ্যা চিরদিনের মতো আমাদের পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেছে। তিন দিনের কলেরা রোগে তার মৃত্যু ঘটল। এক সময়ে সে আপনার পুত্রবধূ ছিল; এখনো সম্বন্ধ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয় নি ভেবে যদি অশৌচাদি পালন করেন সেই জন্য এ পত্র দিলাম। ইতি

বিনীত

শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়

ঘরের দরজা-জানালাগুলো রুদ্ধ ক'রে দিয়ে এসে টেবিলে মুখ গুঁজে প্রিয়লাল কিছুক্ষণ উচ্ছ্বসিত হয়ে রোদন করলে, তার পর বস্ত্রে চক্ষু মার্জিত ক'রে স্তব্ধ হয়ে বসল। দুঃখ ও অনুশোচনার একটা মর্মন্তুদ গ্লানিতে সমস্ত মন, এমন কি অন্তরিন্দ্রিয় পর্যন্ত, অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। মনে মনে বললে, অপরাধ করেছিলাম সন্ধ্যা, গুরুতর অপরাধই করেছিলাম, কিন্তু তাই ব'লে এমন শাস্তি দিলে যে, জীবনে কোনো দিন যে তোমার কাছ থেকে ক্ষমা ভিক্ষা ক'রে নোব তার পথ রাখলে না! অভিমান কি এমনি ক'রেই করতে হয়? জানকীও বোধ করি হতভাগ্য রামচন্দ্রের উপর এমন দুর্জয় অভিমান ক'রে পাতাল প্রবেশ করেন নি, তুমি যেমন আমার উপর ক'রে প্রাণত্যাগ করলে! প্রজার মনোরঞ্জনের জন্য রামচন্দ্র যে পাপ করেছিলেন, পিতৃ-মনোরঞ্জনের জন্য আমি তার চেয়ে গুরুতর পাপ করেছিলাম। প্রকাশদাদার বাড়িতে তোমাকে একখানা চিঠি দিয়েও তোমার মনে সান্ত্বনার একটু ক্ষীণ আলো জেলে রাখি নি।—প্রিয়লালের চক্ষু হতে পুনরায় টপ্‌ টপ্‌ ক'রে বড় বড় অশ্রুবিন্দু টেবিলের উপর ঝ'রে পড়তে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে কাশীর চিঠিখানা ছাড়া বাকি চিঠিগুলো চিঠির ঝাঁপে ফেলে

দিয়ে প্রিয়লাল মমতাময়ীর নিকট উপস্থিত হ'ল। প্রিয়লালের আকৃতি দেখে মমতাময়ী আতঙ্কে শিউরে উঠলেন; ব্যগ্রকণ্ঠে বললেন, "কি হয়েছে প্রিয়?"

প্রিয়লাল বললে, "আপদ একেবারে চুকেছে মা, আমাদের কলঙ্ক ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে।"

তীক্ষ্ণকণ্ঠে অধীরভাবে মমতাময়ী বললেন, "কি হয়েছে খুলে বল্ না!"

প্রিয়লালের মুখমণ্ডল একটা বিচিত্র হাস্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল—ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত মহানগরীর ভগ্নস্তূপের উপর প্রভাত-সূর্যের কিরণ পড়লে যেমন দেখায়, দেখা'ল ঠিক তেমনি। পোস্টকার্ডখানা মমতাময়ীর দিকে আগিয়ে ধ'রে বললে, "প'ড়ে দেখ।"

চিঠিতে দৃষ্টিপাত ক'রেই মমতাময়ী চিৎকার ক'রে উঠলেন, "এ কি সর্বনাশের কথা নিয়ে এলি প্রিয়!" তার পর ভূমিতলে ব'সে প'ড়ে চোখে কাপড় দিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

প্রিয়লাল বললে, "বুকের মধ্যে ভারি একটা যন্ত্রণা হচ্ছে মা।—আমি আমার ঘরে কিছুক্ষণের জন্য শুতে চললাম।" ব'লে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে ফিরে এসে বললে, "তুমি আমার দুঃখ-কষ্ট বোঝ ব'লেই তোমাকে বলছি মা, আমাকে যেন তোমরা সান্ত্বনা দিতে যেয়ো না। কিছুতে ও-কাজ ক'রো না। আমার দুঃখ আপনিই শেষ হতে দিয়ো।"

এ যে জহরলালের প্রতি প্রিয়লালের অব্যক্ত মর্মান্তিক অভিমান তা বুঝতে মমতাময়ীর বিলম্ব হ'ল না। প্রিয়লালের প্রতি কাতর দৃষ্টি স্থাপিত ক'রে বললেন, "ওরে প্রিয়, একবার আমার কাছে এসে ব'স্ বাবা।"

প্রিয়লাল নিকটে উপবেশন করলে তার মাথাটা নিয়ে মমতাময়ী ক্ষণকাল নিজের বক্ষের মধ্যে চেপে ধ'রে রইলেন, তার পর দু-চারবার সযত্নে তার উপর হাত বুলিয়ে বললেন, "যাও বাবা, শুয়ে থাক গে; কেউ তোমাকে বিরক্ত করবে-না।"

কিছুক্ষণ পরে জহরলাল ফিরে এলেন। রোদনবিক্লিন্না পত্নীর আকৃতি দেখে আকাশ থেকে পড়লেন; বললেন, "কি হয়েছে মমো?"

মমতাময়ী বললেন, "বউমা নেই। সব শেষ হয়ে গেছে।"

"তার মানে?"

"কলেরা হয়ে মারা গেছেন।"

জহরলাল চমকে উঠলেন। কপট অভিনয়ের চমকটা বোধ হয় একটুখানি মাত্রা অতিক্রম ক'রেই গেল, বললেন, "বউমা বাপের বাড়ি এসেছিলেন না-কি?"

মমতাময়ী মাথা নেড়ে বললেন, "না গো, কাশীতেই এই ব্যাপার ঘটেছে।" তার পর টেবিলের উপর থেকে পোস্টকার্ডখানা নিয়ে জহরলালের হাতে দিলেন।

চিঠি প'ড়ে জহরলালের মুখের মধ্যে নিবিড় বেদনার ছায়া ঘনিয়ে এল, কিন্তু তারই অন্তর্গত একটা দুর্নিবার্য আনন্দের দীপ্তি সেই ছায়াকে একটু ফিকে ক'রেও রইল। অন্য দিকে মুখটা একটু ফিরিয়ে নিয়ে জহরলাল বললেন, 'বেই-বাড়িতে চিঠি লিখে খবরটা একটু ভাল ক'রে জানলে হয় না?"

"আবার কি ভাল ক'রে জানবে?"

একটু ইতস্ততসহকারে জহরলাল বললেন, "খবরটা ঠিক পাকা কি-না?"

আর্তকণ্ঠে মমতাময়ীর বললেন, "এমন দুঃসংবাদ কখনো মিথ্যে হয় না!"

"সে কথা ঠিক।" ব'লে জহরলাল একটা চেয়ারের উপর ব'সে পড়লেন।

মমতাময়ীর অবস্থা দেখে এবং প্রিয়লালের কথা শুনে জহরলাল বুঝলেন, ঔষধ ক্রিয়াশীল হয়েছে। নিজের শুভবুদ্ধির প্রমাণে মনের মধ্যে একটা বিশেষ রকম পরিতৃপ্তি লাভ করলেন। ভাবলেন, যে দুষ্টগ্রহ পুত্রকে এতদিন সংসারবিমুখ ক'রে রেখেছিল, মৃত্যুর দ্বারা তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ায় এবার পুত্রকে সংসারী করা সহজ হবে।

কিন্তু দিন তিনেক পরে মমতাময়ীর নিকট হতে পুত্রের মানসিক অবস্থার ও সঙ্কল্পের পরিচয় পেয়ে আশঙ্কা হ'ল, ঔষধ বুঝি সক্রিয় হয়ে বিপরীত ফলই ফলায়! অশান্ত হৃদয়কে শান্ত করবার অভিপ্রায়ে প্রিয়লাল সুদূর পশ্চিম দেশে যাত্রা করবার জন্য উন্মুখ হয়েছে।

মমতাময়ী বললেন, "আমি অনেক বুঝিয়ে দেখেছি, তাকে আটকানো যাবে না। কিছুদিন ঘুরে এলে হয়তো তাকে সুস্থ মনেই ফিরে পাবে। আমি মা, আমি যখন বলছি তখন তুমি অমত ক'রো না।"

জহরলাল কিন্তু শুধু মমতাময়ীর কথার উপর নির্ভর ক'রে নিশ্চেষ্ট থাকলেন না, নিজেও অনেক চেষ্টা করলেন। শেষ পর্যন্ত হার মানতেই হ'ল।

মাস দুয়েক পরে পাসপোর্ট সংগ্রহ ক'রে পি. অ্যাণ্ড ও.র সুবৃহৎ ষ্টীমারে প্রিয়লাল অধীর উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয় নিয়ে সুদূরের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলে।

ঊনত্রিংশ

মেয়ারসাই বন্দরে জাহাজ পরিত্যাগ ক'রে রেলযোগে প্রিয়লাল প্যারিসে উপনীত হ'ল। জাহাজে একজন ভাটিয়া যুবকের সহিত তার আলাপ হয়েছিল। বছর পাঁচেক সে প্যারিসে আছে, মাঝে মাঝে ভারতবর্ষে আসবার প্রয়োজন হয়। মাস তিনেক পূর্বে তেমনি প্রয়োজনে ভারতবর্ষে এসেছিল, এখন ফিরে চলেছে। প্রথমে প্রিয়লাল স্থির করেছিল যে, প্যারিসে উপস্থিত হয়ে টমাস কুক অ্যাণ্ড সনের অফিসের সাহায্যে সেখানে বসবাসের ব্যবস্থা ঠিক ক'রে নেবে, কিন্তু ভাটিয়া যুবকটির নিকট প্যারিসের প্লাস-ডো-লাপেরা অঞ্চলের একটি বিখ্যাত হোটেলের সন্ধান লাভ ক'রে সে সেখানেই গিয়ে উঠল।

হোটেলটি অনেক দিক থেকে ভাল লাগায় প্রিয়লাল স্থির করলে, কিছু কাল সেইখানেই বাস করবে। প্রথমে দিনকতক সে হোটেল পরিত্যাগ ক'রে সহজে কোথাও বহির্গত হ'ত না। নিজের নির্জন নির্বান্ধব কক্ষে আবদ্ধ হয়ে দুরদৃষ্টের চিন্তায় এবং পুস্তকপাঠে দিনের পর দিন অতিবাহিত করত। হঠাৎ একদিন মনে পড়ল, লুভর মিউজিয়ামের কথা। চিরকাল চিত্রের প্রতি তার অনন্যসাধারণ অনুরাগ। মনে পড়বা মাত্র একটা ট্যাক্সি ভাড়া ক'রে তখনি তথায় উপস্থিত হ'ল। এতদিন পর্যন্ত একান্ত শ্রদ্ধা এবং কৌতূহলের সহিত যে-সকল বিশ্ববিখ্যাত চিত্রশিল্পীর কথা শুনে এসেছে, সেই র‍্যাফায়েল, দাভিঞ্চি, মুরলো, ভ্যান ডায়িক, রেমব্রাঁ, মিলে প্রভৃতির অঙ্কিত মূল চিত্রাবলীর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে প্রিয়লাল একেবারে আত্মহারা হ'ল। যে দুরপনেয় বেদনা অহরহ অনুক্ষণ তার হৃদয়কে ভারাক্রান্ত ক'রে রাখত, তার চাপ যেন অনেকটা লঘু হয়ে গেল। নিঃস্বাদ নিঃস্পন্দ জীবনের মধ্যে একটা অনুভূতির সাড়া দেখা দিলে। প্রত্যহ নিয়মিতভাবে সমস্ত

দ্বিপ্রহরটা প্রিয়লাল লুভর মিউজিয়মে অতিবাহন করতে লাগল। 'মোনা লিসা'র সম্মুখে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়, 'ফ্লাইট্ অভ্ লট্' দেখে দেখে দেখবার আগ্রহ কিছুতেই পরিতৃপ্তি মানে না।

কিন্তু মাস ছয়েক পরে হঠাৎ একদিন তার মনের মধ্যে এমন একটা কি পরিবর্তন এল যে, এ আকর্ষণ আর তাকে প্যারিসে আটকে রাখতে পারলে না। হোটেলের পাওনা-গণ্ডা চুকিয়ে দিয়ে তল্পিতল্পা বেঁধে রেলস্টেশনে এসে টিকিট কিনে গাড়িতে চ'ড়ে বসল। তার পর মাস চারেক ধ'রে কন্টিনেন্টের নানা স্থান পরিভ্রমণ ক'রে অবশেষে একদিন ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে লণ্ডনে এসে উপস্থিত হ'ল।

লণ্ডনের তার পরিচিত বন্ধু-বান্ধবের একান্ত অভাব না থাকলেও সে তাদের অগোচরে একটা হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করলে এবং পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হ'লে সহসা ইংলণ্ড আগমনের কৈফিয়ৎ দিতে দিতে উৎপীড়িত হবার আশঙ্কায় প্যারিসেরই মতো কতকটা অজ্ঞাত-বাস অবলম্বন ক'রে রইল।

লণ্ডনে আগমনের মাসখানেক পরে একদিন ভারতবর্ষের ডাকে সে তার শ্বশুর বেণীমাধবের একখানা চিঠি পেলে। চিঠিখানা আদ্যোপান্ত পাঠ ক'রে যেমন বিস্মিত হ'লে, তেমনি হ'ল বিরক্ত। বেণীমাধব লিখেছেন যে, ইম্পিরিয়াল সার্ভিসের একটি পাত্রের সহিত তাঁর কন্যা সাধনার যে বিবাহ-প্রস্তাব প্রায় স্থির হয়ে এসেছিল শুধু তা-ই ভেঙে যায় নি, তার পর তিনি অপরাপর বহু স্থলে যত চেষ্টা করেছেন সমস্তই বিফল হয়েছে—তাঁর কন্যা সাধনা পরমা সুন্দরী শিক্ষিতা ও সর্বগুণসম্পন্না হওয়া সত্ত্বেও। সুতরাং এরূপ দুর্ভেদ্য সঙ্কটে একমাত্র প্রিয়লালের বিবেচনা এবং সহৃদয়তার শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নেই ব'লে তিনি তার সঙ্গে সাধনার বিবাহ-প্রস্তাব উত্থাপিত করতে বাধ্য হচ্ছেন।

এ প্রস্তাব যে অসমীচীন নয়, তা প্রমাণ করবার জন্য বেণীমাধব বিবিধ

যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। প্রথমত, মৃত্যুর দ্বারা সন্ধ্যা যখন ইহলোকের এবং ইহকালের পক্ষে একেবারে গত হয়েছে, তখন সে ঘটনা যত শোচনীয়ই হোক না কেন, তার অনুশোচনা পরিত্যাগ করাই উচিত, কারণ বিবেচনার প্রত্যাদেশ হচ্ছে, গতস্য শোচনা নাস্তি। এবং দ্বিতীয়ত সন্ধ্যাকে গৃহে স্থান না দেওয়ার জন্য তার জীবনের যে মর্মন্তুদ পরিণাম ঘটল তজ্জনিত প্রত্যবায়ের যদি কোনো অংশ প্রিয়লালের থাকে, তা হ'লে সাধনাকে বিবাহ করলে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যাবে; কারণ তার অতি-বিপন্ন শ্বশুর যে দুশ্ছেদ্য সমস্যা নিয়ে বিপর্যস্ত হয়েছেন তা কখনই উপস্থিত হ'ত না, যদি তাঁর অভাগিনী কন্যা স্বামীগৃহে স্থান লাভ করতে সমর্থ হ'ত। বেণীমাধবের চিঠিখানা অনুনয় এবং অনুযোগের দ্বিবিধ সুরে রচিত,—অনুযোগের সুর অত্যন্ত ক্ষীণ, অনুনয়ের যৎপরোনাস্তি প্রবল।

প্রিয়লাল সেই দিনই বেণীমাধবের পত্রের উত্তরে লিখলে, "যার হাতে আপনার একটি মেয়ে অমন নির্দয়ভাবে নিগৃহীত হয়েছে তার হাতে আপনার আর একটি মেয়েকে সমর্পণ করবার দুঃসাহস দেখে সত্যই বিস্মিত হয়েছি। বাংলা দেশের মেয়ে কি বাপ-মার পক্ষে এত বড়ই পাপ যে, তার হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্য একজন নামজাদা দুর্বৃত্তের হস্তে তাকে সমর্পণ করার প্রস্তাব অনায়াসেই চলে? সন্ধ্যাকে নিগৃহীত করার জন্য যে প্রত্যবায় হয়েছে ব'লে আপনি লিখেছেন, আমি নিজেকে তার অংশভাগী ব'লে মনে করি নে, সে প্রত্যবায়ের ষোল আনাই আমার ব'লে আমি জানি, এবং সমস্ত জীবন-ব্যাপী দুঃখ ও অনুশোচনার দ্বারা তার দণ্ড ভোগ করতে চাই। সাধনাকে বিবাহ করলে সে প্রত্যবায়ের ক্ষয় হবে না, বৃদ্ধিই হবে। সন্ধ্যার প্রতি আমার আচরণের দ্বারা পরোক্ষভাবে আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত অথবা বিপদগ্রস্ত করেছি ব'লে যদি মনে করেন, তা হ'লে অর্থের দ্বারা যদি সম্ভবপর হয় আমি আপনার সে ক্ষতিপূরণ করতে প্রস্তুত আছি; অর্থলোভে বশীভূত ক'রে আপনি

সাধনার জন্য মনোমত পাত্র সংগ্রহ করুন, সে অর্থের ভার রইল আমার উপর। আপনি জানেন, উত্তরাধিকারসূত্রে মাতামহর নিকট হতে আমি কম অর্থ পাই নি, সুতরাং আমার সে অর্থের জন্য বাবার নিকট আবেদন করবার প্রয়োজন হবে না।"

বেণীমাধবের পত্রের সঙ্গে এক ডাকেই জহরলালেরও চিঠি এসেছিল। সে চিঠির মর্ম—দীর্ঘকাল গত হ'ল প্রিয়লাল গৃহ ছাড়া হয়ে আছে, সেজন্য তার পিতামাতার দুঃখ এবং দুশ্চিন্তার অন্ত নেই, সুতরাং আর বিলম্ব না ক'রে অচিরে সে যেন গৃহে প্রত্যাবর্তন করে।

যোগ-সাজসের মৈত্রীর দ্বারা এই দুটি চিঠি যে পরস্পর-আবদ্ধ, এমন একটা সন্দেহ প্রিয়লালের মনে সহজেই দেখা দিলে। উত্তরে সে জহরলালকে লিখলে, ইংলণ্ডে যখন এসেই পড়েছে, তখন বৎসর দুই এখানে যাপন ক'রে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. এইচ-ডি.র ডিগ্রীটার জন্য চেষ্টা করা তার একান্ত ইচ্ছা, সুতরাং এখন গৃহে প্রত্যাগমন করা উচিত হবে না।

কিছুকাল ধ'রে জহরলাল এবং প্রিয়লালের মধ্যে এ বিষয়ে অনেক পত্র-ব্যবহার চলল, কিন্তু অবশেষে জহরলালকেই পরাজয় স্বীকার করতে হ'ল,—পি. এইচ-ডি. ডিগ্রীর জন্য প্রিয়লালের ইংলণ্ডে অবস্থান করাই স্থির হ'ল।

অতঃপর প্রিয়লালের ডক্টরেট্ লাভ করা পযন্ত বৎসর দুয়েকের কথা এ আখ্যায়িকার পক্ষে প্রয়োজনও নয়, কৌতুকাবহও নয়।

পুত্র পি.এইচ.ডি ডিগ্রী অধিকার করেছে অবগত হওয়ার পর জহরলাল এবং মমতাময়ী তাকে গৃহে প্রত্যাগমনের জন্য অনুরোধ ক'রে চিঠি লিখলেন। জহরলাল লিখলেন, শরীর আমার অতিশয় অসুস্থ, তুমি যদি এখনো আসতে বিলম্ব কর, তা হ'লে হয়তো আর দেখা হবে না। মমতাময়ী লিখলেন, কিছুকাল হতে রক্তচাপ রোগে ওঁর শরীরের অবস্থা একেবারেই ভাল নয়; এখনো যদি তুমি অবিলম্বে এসে উপস্থিত হও, তা হ'লে হয়তো সামলে উঠতে পারেন।

এ সংবাদ পাওয়ার পর মাসখানেকের মধ্যে প্রিয়লাল প্রবাসের নিকট বিদায় গ্রহণ ক'রে ভারতবর্ষের জন্য রওয়ানা হ'ল। কিন্তু তিন বৎসর পরে গৃহে উপনীত হয়ে দেখলে, মাত্র পাঁচ দিনের জন্য বিলম্ব ক'রে এসেছে। পাঁচ দিন পূর্বে মৃত্যু এসে জহরলালকে হরণ ক'রে নিয়ে গেছে। জননীর বিধবা-বেশ দেখে প্রিয়লাল উচ্ছ্বসিত হয়ে রোদন করতে লাগল।

শ্রাদ্ধ-শান্তির মাস দুই পরে প্রিয়লাল একদিন মমতাময়ীকে বললে, "মা, দিন কতক একটু ঘুরে আসি।"

বিস্মিত হয়ে মমতাময়ী বললেন, "এরই মধ্যে আবার?"

প্রিয়লাল বললে, "এবার বেশি দিনের জন্যে নয় মা, মাস চারেকের মধ্যেই ফিরে আসব।"

"কোথায় যাবি?"

"প্রথমে দিন পাঁচ-সাতের জন্যে ফয়জাবাদে আমার একটি বন্ধুর কাছে, তার পর লাহোরে পাণ্টু মামার কাছে। সেখান থেকে পাণ্টু মামাকে নিয়ে রাউলপিণ্ডি হয়ে কাশ্মীর, তার পর কাশ্মীর থেকে তোমার কাছে।"

বিষণ্ণ গম্ভীরমুখে মমতাময়ী বললেন, "এটা কি এখন না করলেই নয় প্রিয়?"

এক মুহূর্ত মনে মনে কি চিন্তা ক'রে মমতাময়ীর প্রতি মুখ তুলে প্রিয়লাল বললে, "কিছু ভাল লাগছে না মা।"

"তা তো বুঝলাম, কিন্তু আমারই কি ভাল লাগছে বাবা?"

অপ্রতিভ আর্তকণ্ঠে প্রিয়লাল বললে, "তোমার কি ক'রে ভাল লাগবে মা! তোমার নিশ্চয়ই ভাল লাগছে না। বেশ তো, তুমিও আমার সঙ্গে চল না। তুমি যদি যাও, তা হ'লে আমি ফয়জাবাদ লাহোর কাশ্মীর ছেড়ে দিয়ে তীর্থে তীর্থে তোমাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াই। যাবে আমার সঙ্গে?"

প্রিয়লালের কথা শুনে মমতাময়ীর মুখে অতি ক্ষীণ হাস্য স্ফুরিত হ'ল, কিন্তু

সঙ্গে সঙ্গেই নামল অশ্রুর প্রবল বর্ষণ। অঞ্চলে চোখ মুছে আর্দ্র কণ্ঠে বললেন, "এই সংসারে যে খোঁটায় তিনি আমাকে বেঁধে দিয়ে গেছেন, তা থেকে আমার সহজে মুক্তি নেই প্রিয়। যে কাজের ভার আমাকে দিয়ে গেছেন, তা শেষ ক'রে তবে তীর্থই বল আর যাই বল,—তার আগে চৌধুরী-বংশের এই বাড়িই আমার কাশী বৃন্দাবন হয়ে রইল।"

কথাটা সেদিন আর বেশি দূর অগ্রসর না হয়ে এইখানেই শেষ হ'ল। কিন্তু দিন পাঁচ-সাতের মধ্যে স্থির হয়ে গেল যে, জহরলালের মৃত্যুর জন্য আইন-আদালত সংক্রান্ত যে সামান্য বিধি-ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে তা সম্পন্ন ক'রেই প্রিয়লাল পুনরায় দেশভ্রমণে নির্গত হবে।

ত্রিশ

শ্রাবণ মাস। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হ'য়ে আছে। অপরাহ্ণের দিকে কিছু-ক্ষণের জন্য বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল, কিন্তু পূর্বদিকে পুনরায় মেঘের উপর মেঘ ঘনিয়ে উঠেছে,—মনে হচ্ছে অবিলম্বে প্রবলভাবে বর্ষণ আরম্ভ হবে। কলিকাতা বালিগঞ্জের একটা অপেক্ষাকৃত নিভৃত অঞ্চলে বিস্তৃত কম্পাউণ্ড-সংযুক্ত একটা দ্বিতল গৃহের দোতলার বারান্দায় ব'সে সন্ধ্যা বই পড়ছিল। এমন সময়ে ভৃত্য সাধুচরণ এসে ডাকলে, "মা!"

বই হতে মুখ তুলে সাধুচরণের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "কি সাধুচরণ?"

বিরক্তিভরে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে সাধুচরণ বললে, "মেঘ করছে ব'লে কি বেলা হয় নি মা? বেলা যে গড়িয়ে শেষ পোহোরে পৌঁছল।"

"কটা বাজল?"

অধিকতর মুখ-বিকৃতির সহিত সাধুচরণ বললে, "সে তোমাদের বিশ-পঁচিশটা ঘড়ি আছে—দেখে নাও কটা বাজল, কিন্তু এমন ক'রে পিত্তি পড়িয়ে অত্যেচার করলে শরীর আর কতদিন টেঁকবে বল দেখি? সেই জষ্টি মাসের মতো আবার যদি অসুখে পড়, তা হ'লে আর উঠতে পারবে কি?"

বারান্দার পিছন দিকে একটা ক্লক্ টাঙানো ছিল, পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে সবিস্ময়ে সন্ধ্যা বললে, "ওমা, তাই তো, সাড়ে তিনটে বাজে যে! কিন্তু তিনি না খেয়ে বাইরে রয়েছেন, আমি কি ক'রে খাই সাধু?"

সাধুচরণ ঝঙ্কার দিয়ে উঠল,—"তেনার কথা ছাড় দাও। ছেলেবেলা থেকে তেনাকে নিয়ে আমার হাড় ভাজা-ভাজা হয়ে আছে; তেনার এ সব অত্যাচার বরদাস্তও হয়। কিন্তু তোমার?"

"আমারও তো তা হ'লে বরদাস্ত হওয়া উচিত সাধু? কিন্তু সে কথা যাক, তোমরা সকলে খেয়ে নিয়েছ তো?"

"তোমার আলি-হুকুম জারি আছে, তারা ছেড়েছে কি-না! সব খেয়ে-দেয়ে এতক্ষণ এক ঘুম সেরে নিলে!"

"আর তুমি? তুমি খেয়েছ?"

সাধুচরণ মাথা নাড়া দিয়ে বললে, "আরে, আমার কথা ছাড় দাও। আমি তোমার আর-সব চাকর-বাকরদের সঙ্গে এক গোত্তোর না-কি?"

সন্ধ্যা বললে, "না, তা নও, কিন্তু তুমি বুড়োমানুষ, এই বেলা পর্যন্ত না খেয়ে রয়েছ সাধু?"

তেমনি মাথা নাড়া দিয়ে সাধুচরণ বললে, "বুড়োমানুষের অত ক্ষিদে তেষ্টা লাগে না মা। তুমি সোমোত্থো মেয়ে, তুমি ক্ষিদের লেগে ছটফট করছ,—আর আমি খাব?"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "আমি ছটফট করছি তুমি কি ক'রে জানলে সাধু? কই, আমি তো একটুও ছটফট করছি নে?"

সাধুচরণ বললে, "আরে, তুমি না কর, তোমার আত্মি তো করছে!"

সবিস্ময়ে সন্ধ্যা বললে, "ওমা, সে আবার কি? আত্মি কাকে বলে?"

কিন্তু এ কথার উত্তর দেওয়ার সময় হ'ল না, গেটের দিকে হঠাৎ দৃষ্টি পড়ায় সাধুচরণের মুখ কঠিন হয়ে উঠল। ঝঙ্কার দিয়ে সে বললে, "অই, নাও! ছাতা মাথায় দিয়ে আবার একটা সাধু আসছে! আজকের মতো তোমাদের খাওয়া-দাওয়া সিকেয় তুলে রাখ।"

সন্ধ্যা চেয়ে দেখলে, গৈরিকবসনপরিহিত একজন সন্ন্যাসী বৃষ্টির তাড়না থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে ছাতা দিয়ে দেহের ঊর্ধ্বাংশের প্রায় সবটা প্রচ্ছন্ন ক'রে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছেন। যেটুকু দেখা যাচ্ছে তাতে অনুমানে বুঝলে ভারতী আশ্রমের স্বামী অচলানন্দ।

সাধুচরণ বললে, "মা, বল তো বাবা বাড়ি নেই ব'লে সাধু মহারাজকে বিদেয় ক'রে আসি।"

সন্ধ্যা বললে, "তাতে সুবিধে হবে না সাধু, উনি হয়তো আমার সঙ্গেও দেখা করতে চাইবেন। তার চাইতে আমি গিয়ে ওঁর কাজ সেরে দিয়ে আসি।" তার পর স্মিতমুখে বললে, "কিন্তু সাধু, তুমি নিজে সাধুচরণ হয়ে সাধুদের উপর এত চটা কেন বল দেখি?"

সাধুচরণ চক্ষু কুঞ্চিত ক'রে বললে, "এদের তুমি সাধু বল মা? তুমি জান না, এরা এক-একটি নবাব। চেহারা দেখে বুঝতে পার না যে, দস্তুরমতো দুধ-ঘি-খেকো শরীর? আর ঐ যে গেরুয়া রঙের খদ্দর দেখ, ওর একটি তোমার তিনখানা ধুতিকে হার মানাতে পারে। বড়মানুষের দোরে এসে টাকা আদায় ক'রে নিয়ে যায়, আর এই সব নবাবি করে।"

সন্ধ্যা মাথা নেড়ে বললে, "না সাধু, তুমি জান না, এঁরা সত্যি-সত্যিই সাধু। এঁরা যে টাকা নিয়ে যান তাতে অনেক সৎকার্য করেন। গরিব দুঃখী রোগীর সেবা, দরিদ্র ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো—এই রকম অনেক ভাল কাজ এঁদের দ্বারা হয়।"

তা হয়তো হয়। কিন্তু তথাপি সাধুচরণ সন্ন্যাসীদের ক্ষমা করতে প্রস্তুত নয়। অপ্রসন্ন মুখে বললে, "তা হ'লে বসাব না-কি?"

"হ্যাঁ, বসাওগে, আমি এখনই যাচ্ছি।"

বিড়বিড় ক'রে অস্ফুট কণ্ঠে কি বলতে বলতে সাধুচরণ প্রস্থান করলে। সেটা যে সাধু-সন্ন্যাসীদের পক্ষে অভিলষণীয় মন্তব্য নয় তা সহজেই বোঝা গেল।

সাধুচরণ প্রমথর পিতার আমলের ভৃত্য। প্রমথর যখন চোদ্দ বৎসর বয়স তখন তার বিধবা মাতা মৃত্যু-শয্যায় অপর কোনো যোগ্যতর ব্যক্তির অভাবে বিশ্বস্ত ভৃত্য সাধুচরণের উপর একমাত্র পুত্রের ভার সমর্পণ করেন। সে আজ পনের-ষোল বৎসরের কথা হবে। সাধুচরণ যথাশক্তি সব বিষয়েই প্রমথকে

শাসন ক'রে আসছিল, কিন্তু জ্ঞাতি-গৃহে বিবাহ উপলক্ষে দেশের বাটীতে কিছুদিন একাকী অবস্থানকালে প্রতিবেশিনী বিধবা কন্যা বনমালতীর হাতে ঘটনাচক্রে প্রথম তালিম নিয়ে প্রমথ যে কর্দমাক্ত পথের পথিক হ'ল, সে পথের গতি কিছুতেই সে রোধ করতে সমর্থ হ'ল না। বিপদ দেখে সাধুচরণ প্রমথর বিবাহ দেওয়ার জন্য উঠে-প'ড়ে লাগল। প্রমথর অর্থের প্রভাবে সুন্দরী পাত্রীকে সম্মুখে ফেলে প্রমথকে লুব্ধ করবার ব্যবস্থা কঠিন হ'ল না। কিন্তু কোন মতেই তাকে বশীভূত করা গেল না,—প্রবলভাবে মাথা নেড়ে সে বলে, 'কিছুতেই না সাধু, কিছুতেই না; পায়ে শেকল লাগিয়ে তুই যে আমাকে এক জায়গায় বেঁধে ফেলতে চাস, তা কিছুতেই হবে না। তা ছাড়া, যে লোক চিংড়িমাছ খেতে অভ্যস্থ হয়েছে তাকে মালপোয়া খাওয়ালেই সে যে চিংড়িমাছ খাওয়া ত্যাগ করবে তার কোনো মানে নেই।'

ক্রমশ সাধুচরণেরও মনে সংশয় উপস্থিত হ'ল যে, হয়তো সত্যিই তার কোনো মানে নেই। তখন অগত্যা হতাশ হয়ে সে হাল ছেড়ে দিলে।

তার পর আট-দশ বৎসর কেটে গেছে; এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে বহু বিচিত্র কীর্তিকলাপের দ্বারা প্রমথ তাকে অনেক দুঃখ কষ্ট উদ্বেগ দিয়েছে। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন বৎসর তিনেক দেশে না এসে প্রবাসে অজ্ঞাতবাস ক'রে যেমন দিয়েছে, তার সঙ্গে আর কিছুরই তুলনা হয় না। তাই গত বৎসর বৈশাখের প্রারম্ভে সন্ধ্যাকে নিয়ে প্রমথ যখন তার দীর্ঘ প্রবাসবাসের পর কলিকাতার বাটিতে এসে উপস্থিত হ'ল, তখন প্রথম তিন-চার দিন সাধুচরণ ঘৃণায় বিদ্বেষে, কথা কওয়া তো দূরের কথা, সন্ধ্যার মুখের প্রতি ভাল ক'রে দৃষ্টিপাতও করে নি। তার পর হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার সম্বোধনে বাধ্য হয়ে তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা-বার্তা করার পর বিতৃষ্ণার মূলে প্রবল একটা আঘাত পড়ল,—সন্ধ্যা হয়তো বা ঠিক চিংড়িমাছ-শ্রেণীর জীব নয়, মনের মধ্যে এ সংশয়ও সুস্পষ্টভাবে দেখা দিলে। ক্রমশ দেখতে দেখতে কয়েক দিনের মধ্যে বিতৃষ্ণা রূপান্তরিত হ'ল

সুগভীর আসক্তিতে,—এমন কি পর্যায়ের ক্রমে প্রমথও একদিন সন্ধ্যার কাছে পিছিয়ে পড়ল। এখন সময়ে-সময়ে সাধুচরণের মনে হয়, সন্ধ্যা হয়তো বা প্রমথর বিবাহিত স্ত্রীই। অনুসন্ধান করতে গিয়ে পাছে এ ধারণা ভুল ব'লে প্রমাণিত হয় সেই ভয়ে অনুসন্ধান করে না,—মনে মনে ভাবে, যে চাকে এত মধু সে চাক মৌমাছিরই হবে—বোলতার সম্ভবত নয়।

নীচে এসে অফিস-ঘরে প্রবেশ ক'রে স্বামী অচলানন্দকে নমস্কার ক'রে সন্ধ্যা বললে, "এই বৃষ্টি-বাদলায় কষ্ট ক'রে কেন এলেন, ভারি কষ্ট হয়েছে আপনার!"

প্রতিনমস্কার ক'রে অচলানন্দ বললেন, "না, একটুও কষ্ট হয় নি, ভারি আনন্দে এসেছি। আমাদের আশ্রমে আপনার আশাতীত অর্থসাহায্যের জন্যে অতিশয় কৃতজ্ঞ হয়েছি। সেই কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আজ সকালে আপনাকে একখানা চিঠি লিখলাম। তার পর ভাবলাম, চিঠিখানা বহন ক'রে নিয়ে গিয়ে স্বহস্তে আপনার হাতে দেওয়ার আনন্দ থেকেই বা বঞ্চিত হই কেন!" ব'লে খামে-মোড়া একখানা চিঠি সন্ধ্যার হাতে দিয়ে হাসতে লাগলেন।

চিঠিখানা খুলে পড়তে পড়তে সন্ধ্যার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। চিঠি শেষ ক'রে অচলানন্দের প্রতি অপ্রতিভ মুখ উত্তোলিত ক'রে বললে, "সামান্য সাহায্য, তার জন্যে এত বেশি ক'রে ব'লে লজ্জিত করেছেন—"

মাথা নেড়ে অচলানন্দ বললেন, "সামান্য নিশ্চয়ই নয় মিসেস মুখার্জি। দশ বৎসরের জন্যে মাসে মাসে পঁচাত্তর টাকা, এ সত্যিই সামান্য নয়। এর জন্যে আমাদের আশ্রম চিরকাল আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। কিন্তু আপনাদের লক্ষ্ণৌ যাওয়া কবে স্থির হ'ল? আমরা মনে করছিলাম, শীঘ্রই একদিন আপনাদের দুজনকে আশ্রমে নিয়ে গিয়ে সামান্য একটু অভিনন্দনের উৎসব করব।"

অচলানন্দের কথা শুনে সন্ধ্যা চকিত হয়ে উঠল; বললে, "না না,

কখনো তা করবেন না অচলানন্দজী। আমি তা হ'লে ভারি লজ্জিত হব।"

অচলানন্দ স্মিতমুখে বললেন, "বাইরের কোনো লোককেই তো বলব না। শুধু আশ্রমবাসীদের মধ্যে আপনাদের দুজনকে নিয়ে একটু আনন্দ।" করজোড়ে বললেন, "অনুমতি দিন।"

ব্যস্ত হয়ে আরক্তমুখে সন্ধ্যা বললে, "এ কি করছেন আপনি! আচ্ছা, তা না-হয় হবে। কিন্তু আমরা যে পরশু চ'লে যাচ্ছি।"

"বেশ তো কাল সন্ধ্যা ছটার সময়ে ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে?"

একটু চিন্তা ক'রে সন্ধ্যা বললে, "আচ্ছা। কিন্তু উনি তো এখনো এলেন না, ওঁকে তো বলা হ'ল না!"

অচলানন্দ স্মিতমুখে বললেন, "সে জন্যে কিছু আটকাবে না। আপনাকে বলা হ'লেই তাঁকেও বলা হ'ল।" আসন ত্যাগ ক'রে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "আমরা নিজেদের সন্ন্যাসীমানুষ ব'লে গর্ব করি, লোভকে প্রশ্রয় দেওয়া আমাদের ভাল দেখায় না। কিন্তু তবু একটা কথা বলবার লোভ সামলাতে পারছি নে।"

সকৌতূহলে সন্ধ্যা বললে, "কি কথা বলুন না?"

"আমাদের ইচ্ছে, নারী-কল্যাণ-মন্দিরের চাঁদার খাতাটা আপনাকে দিয়ে আরম্ভ করি।"

অচলানন্দর কথা শুনে যৎপরোনাস্তি অপ্রতিভ হয়ে সন্ধ্যা বললে, "ছি ছি, দেখুন, আমি একেবারে ভুলে গেছি! আপনি একটু বসুন, আমি এখনি এনে দিচ্ছি।" ব'লে সে ত্বরিতপদে উপরে গেল, তার পর একটা হাজার টাকার চেক লিখে এনে অচলানন্দর হাতে দিয়ে বললে, "এইটে প্রথম কিস্তি।"

চেকে টাকার তায়দাদ দেখে অচলানন্দর মুখ হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠল। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, "ধন্যবাদ, শত ধন্যবাদ মিসেস মুখার্জি। আর, আপনার

ভাণ্ডারের দ্বার আমাদের জন্যে এখনো যে খানিকটা খোলা রইল, তার জন্যে সহস্র ধন্যবাদ। কিন্তু লক্ষ্ণৌ থেকে আপনারা ফিরছেন কবে?"

"মাস দুই পরে,—সম্ভবত পুজোর আগেই।"

মনে মনে একটু কি চিন্তা ক'রে অচলানন্দ কতকটা স্বগতই বললেন, "আচ্ছা, তা হ'লেও হবে।"

সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "কি হবে মহারাজ?"

"সে কথা এখন আপনাকে বললে আপনি ভারি আপত্তি করতে থাকবেন।" ব'লে সহাস্যমুখে অচলানন্দ প্রস্থান করলেন।

বৈকালের দিকে আবার সজোরে বৃষ্টি নেমেছিল। দক্ষিণ দিকের বারান্দায় একটা ঈজি-চেয়ারে শয়ন ক'রে প্রমথ বৃষ্টি এবং বাতাসের মাতামাতি উপভোগ করছিল। কম্পাউণ্ডের দক্ষিণ পূর্ব কোণে একটা প্রস্ফুটিত কদমগাছে গোটা দশ-বারো বাদুড় ঝুলছিল আর দুলছিল। কয়েক বৎসর আগে কোন অজ্ঞাত কারণে তাদের পূর্বের বাসা পরিত্যাগ ক'রে এক বাদুড়-দম্পতি এই গাছে এসে আশ্রয় বাঁধে, তার পর ক্রমশ তাদের সন্তান-সন্ততির জন্মের ফলে দল পুষ্ট হয়েছে।

সন্ধ্যা এসে প্রমথর নিকট আর একটা ঈজি-চেয়ারে উপবেশন করলে, তার পর হাত বাড়িয়ে অচলানন্দের চিঠিখানা প্রমথর হাতে দিলে। চিঠিখানা হাতে নিয়ে কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে প্রমথ জিজ্ঞাসা করলে, "এ কি উষা?"

স্মিতমুখে সন্ধ্যা বললে, "আমার কাঁধে চাপানো তোমার যশের বোঝা।" কাশী হতে লক্ষ্ণৌ যাওয়ার পর একত্র জীবন যাপনের জন্য ক্রমশ আত্মীয়তা ঘনীভূত হওয়ার ফলে সন্ধ্যা প্রমথকে 'তুমি' ব'লে সম্বোধন করতে আরম্ভ করেছিল।

সবিস্ময়ে প্রমথ বললে, "আমার যশের বোঝা? দেখি, কি এমন সৎকার্য করলাম যে, আমার যশের বোঝা তোমার কাঁধে চাপল!"

নিরবচ্ছিন্ন আগ্রহের সঙ্গে চিঠিখানা শেষ ক'রে প্রসন্নমুখে প্রমথ বললে, "চমৎকার লিখেছেন।—আর, সমস্তই ঠিক লিখেছেন। লিখবেনই বা না কেন? যেমন অগাধ পাণ্ডিত্য, তেমনি উদার অন্তঃকরণ! এ কথা তুমি নিশ্চয় জেনো উষা, অচলানন্দ ক্যালকাটা ইউনিভারসিটির এম. এ. পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছিলেন, এইটেই তাঁর পাণ্ডিত্যের সব চেয়ে বড় কথা নয়। তাঁর মতো অত বড় বৈদান্তিক বাংলা দেশে আর কেউ আছে কি-না সন্দেহ। কিন্তু সে কথা যাক, তুমি এ চিঠিখানাকে আমার যশের বোঝা বলছিলে কেন?"

সহাস্যমুখে সন্ধ্যা বললে, "টাকা যখন তোমার, যশ তখন তোমার নয় তো কার?"

কপট ক্রোধভরে ক্ষণকাল সন্ধ্যার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে প্রমথ বললে, "মন্ত্র-পড়া বউ নও ব'লে ভারি তোমার দম্ভ হয়েছে দেখছি! চুল-চেরা ভাগ ক'রে অর্ধেক সম্পত্তি লিখে দিয়েছি, তবু টাকা আমার? র'স, জব্দ করছি। একদিন একজন পুরুত ডাকিয়ে কয়েকটা অনুস্বর-বিসর্গের মন্ত্র পড়িয়ে নিচ্ছি, তার পর কার টাকা তুমি বল, দেখা যাবে! নিতান্ত আমাকে ভালমানুষ পেয়েছ, তাই।"

"তাই, কি?"

"তাই এসব কথা বলতে সাহস পাও।"

সহসা সন্ধ্যার কণ্ঠস্বর গভীর হয়ে এল; বললে, "তাই শুধু এ সব কথা বলতেই সাহস পাই নে, আরও অনেক কিছুতেই সাহস পাই।"

সন্ধ্যার পরিবর্তিত কণ্ঠস্বরে কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে প্রমথ বললে, "যথা?"

পশ্চিম আকাশে মেঘের একটা ফাঁক দিয়ে অস্তগামী সূর্যের রক্তাভ আলোক বিচ্ছুরিত হচ্ছিল, সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে সন্ধ্যা বললে, "একটা কথা শুনেছ?"

এটা প্রসঙ্গান্তরের ভূমিকা, সুতরাং এ প্রসঙ্গের পূর্ণচ্ছেদ বুঝতে পেরে প্রমথ বললে, "যদি এ পর্যন্ত না ব'লে থাক, তা হ'লে শুনি নি।"

"কাল সন্ধ্যেবেলা আমার অভিনন্দন।"

"আনন্দের কথা। কিন্তু কোথায়?"

"অচলানন্দজীর আশ্রমে।"

"টাকা যখন আমার, তখন তোমার অভিনন্দন কি রকম?"

"সে কৈফিয়ৎ তাদের কাছে নিয়ো। শুধু আমার নয়, তোমারও।"

সোচ্ছ্বাসে প্রমথ বললে, "যুগলে?—কিন্তু পরশু সকালে লক্ষ্ণৌ যাওয়া, কাল সন্ধ্যায় অতখানি সময় দিলে অসুবিধা হবে না তো?"

"কি করব বল? হাত জোড় করলেন, অস্বীকার করতে পারলাম না।"

"তা ভালই করেছ,—কিছু অসুবিধে হবে না। এখন চল, মিস্ চ্যাটার্জির সঙ্গে সেই কথাটা শেষ ক'রে আসা যাক।"

সন্ধ্যা বললে, "চল।"

একত্রিংশ

পরদিন সকালে চা পানান্তে প্রমথ বললে, "উষা, চল ; ঝাঁ ক'রে কতকগুলো দরকারী জিনিস কিনে নিয়ে আসি।"

দুই হাত যুক্ত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "রক্ষে কর, আর দরকারী জিনিস কিনে কাজ নেই। লক্ষ্ণৌ যাবার জন্যে যে-সব জিনিসপত্র সত্যিই দরকারী, তা তিন দিন হ'ল কেনা হয়ে গেছে। তার 'পর যে রাশখানেক জিনিস কিনেছ সবই অদরকারী।"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে মাথা নেড়ে প্রমথ বললে, "একটিও না। 'বিনা প্রয়োজনে কেনো যাহাকে, প্রয়োজন কালে কাছে সে থাকে'—রবীন্দ্রনাথের কাব্যের পদে ভরা এই সারগর্ভ উপদেশটি সর্বদা মনে রেখো। তুমি ছেলেমানুষ,—দশ বছরের প'ড়ে-থাকা অদরকারী জিনিস হঠাৎ একদিন কি ভীষণ দরকারী হয়ে ওঠে,—সে রহস্য কিছুমাত্র জান না।"

প্রমথর কথা শুনে সন্ধ্যা হাসতে লাগল ; বললে, "তাই ব'লে বেলা চারটে পর্যন্ত না খেয়ে শরীর নষ্ট ক'রে রাজ্যের অদরকারী জিনিস কিনতে হবে ?"

এ কথায় প্রমথর মনোযোগ হঠাৎ বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট হ'ল ; বললে, "কিন্তু আমি তো চুনিলাল-মোতিলালের দোকান থেকে তোমাকে খেয়ে নেবার জন্যে একটার সময়ে ফোন করেছিলাম উষা ! তুমি খেলে না কেন ?"

সন্ধ্যা বললে, "কিন্তু আমি একটার সময়ে খেলে তোমার চারটে পর্যন্ত না খেয়ে থাকার অত্যাচার কাটে কি রকম ক'রে সে কথাটা বল ?"

প্রমথ হাসতে হাসতে বললে, "না, কোনো রকমেই কাটে না। যুক্তি অকাট্য,—হার স্বীকার করছি।"

এমন সময়ে দেখা গেল, অদূরে ধীরপদক্ষেপে সাধুচরণ অগ্রসর হচ্ছে। মনের মধ্যে যে একটা-কিছু বিশেষ মতলব প্রবল হয়েছে, তা তার গতিভঙ্গী থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। প্রমথ সন্ধ্যাকে জিজ্ঞাসা করলে, "আন্দাজ করতে পারছ কিছু উষা?"

সন্ধ্যা বললে, "কতকটা পারছি বইকি।"

"কি?"

"এসে তো পড়েছে। ওর মুখেই শোন না।"

সাধুচরণ নিকটে এসে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল, তার পর একটু ইতস্তত সহকারে বললে, "কিছু নিবেদন আছে বাবা।"

সাধুচরণের দিকে মুখ তুলে প্রমথ বললে, "কি নিবেদন সাধু?"

নিঃশব্দ হাস্যে সাধুচরণের মুখমণ্ডল ভ'রে গেল; বললে, "এবার আমি মার সঙ্গে লখ্‌নো যাব।"

"কেন? কি দরকার?"

মাথা চুলকোতে চুলকোতে সাধুচরণ বললে. "মাকে একটু দেখাশোনা দরকার। মার শরীরে একটুও যত্ন নেই।"

প্রমথ বললে, "সে তো ভাল কথা; কিন্তু আমার শরীরে এমন কি যত্ন দেখেছিলি সাধু, যাতে এতদিনের মধ্যে একবারও আমার সঙ্গে লক্ষ্ণৌ যাবার কথা মনে হয় নি?"

প্রমথর কথায় সাধুচরণ অপ্রতিভ হ'ল; একটু ইতস্তত ক'রে বললে, "আজ্ঞে, তুমি হ'লে বেটাছেলে—"

সাধুচরণকে কথা শেষ করতে না দিয়ে প্রমথ বললে, "আর মা হলেন মেয়েমানুষ। এই তো? এ কথা আমার কতকটা জানা আছে সাধু। কিন্তু কথা হচ্ছে, তুই লক্ষ্ণৌ গেলে এখানকার বাড়ির হেপাজতে থাকবে কে?"

প্রমথর মন্তব্যে সাধুচরণের মনে ক্রোধ সঞ্চারিত হ'ল ; ঈষৎ উষ্মার সহিত বললে, "শোন কথা ! সারাটা জীবন আমি তোমার বাড়ির হেপাজতে থাকব নাকি ? এখন থেকে আমি মার সাথে সাথে থাকব।"

কপট বিদ্রূপের সুরে প্রমথ বললে, "কেন ? এখন থেকে তুমি মার খাস চাকর হ'লে নাকি ?"

ঊর্ধ্বে দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে ঔদাস্যের সুরে সাধুচরণ বললে, "তা তুমি যাই বল বাবা।"

সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে প্রমথ বললে, "তুমি কি বল উষা ? সাধু আমাদের সঙ্গে যাবে না-কি ?"

সন্ধ্যা বললে, "ইচ্ছে যখন হয়েছে চলুক। রামভজন সিংকে বাড়ির চার্জে থাকবার জন্যে ও রাজা করিয়েছে। এখন না গিয়ে সে পূজোর পর বাড়ি যাবে।"

সাধুচরণের প্রতি দৃষ্টি ফিরিয়ে প্রমথ বললে, "গয়লা হ'লে কি হয়, পেটে পেটে কম বুদ্ধি নয় তো ! সব ব্যবস্থা ঠিক ক'রে তার পরে আমার কাছে এসেছ অনুমতি নেবার জন্যে ?"

সাধুচরণের মুখমণ্ডলে পুনরায় নিঃশব্দ হাস্য ফুটে উঠল ; বললে, "তা বাবা, তুমি হ'লে মনিব, তোমাকে একবার না বলা ভাল দেখায় কি ?"

কষ্টে হাস্য রোধ ক'রে কপট বিদ্রূপের সুরে প্রমথ বললে, "উঃ ! কর্তব্যজ্ঞান একেবারে টনটন করছে ! আমি হলাম মনিব, আর মা তোমার মনিব নয় ? তিনি তোমার গুরুঠাকরুন, না ?"

প্রমথর কথা শুনে সাধুচরণ হেসে ফেললে। বললে, "এক হিসেবে মিথ্যে বল নি বাবা ! এই বয়সে ঐটুকু মেয়ের কাছে কম শিক্ষে হ'ল না !" ব'লে হাসতে হাসতে প্রস্থান করলে।

প্রমথ বললে, "আশ্চর্য। অথচ এই লোকটি প্রথম কয়েক দিন ঘৃণায় বিদ্বেষে তোমার মুখদর্শন পর্যন্ত করে নি। মানুষ-বশীকরণের এমন অদ্ভুত

যন্ত্র বিধাতাপুরুষ তোমার দেহের কোন্ জায়গায় বসিয়েছেন বলতে পার উষা, যাতে ক'রে কোনো লোকই তোমার কাছে রক্ষে পায় না?"

সন্ধ্যা বললে, "কোথায় বসিয়েছেন' তা বলতে পারি নে। কিন্তু বসিয়ে যদি থাকেন তো একেবারে অকেজো যন্ত্র বসিয়েছেন, তা বলতে পারি।"

সবিস্ময়ে প্রমথ বললে, "অকেজো কেন?"

একটু চুপ ক'রে থেকে সন্ধ্যা বললে, "যন্ত্রটি আমার শ্বশুরবাড়িতে কি চমৎকার পরিচয় দিয়েছিল সে কথা শুনেছ তো! যার কাছে যাই, সেই করে দূর দূর!"

প্রমথ বললে, "তার দ্বারা যন্ত্রটি এই প্রমাণ করেছিল যে, তারা মানুষ নয়, অমানুষ। আমি মানুষ বশীকরণের যন্ত্রের কথাই বলছিলাম উষা, অমানুষ-বশীকরণের কথা বলি নি। তার পর কিছুদিন পরে একজন সত্যিকার মানুষ যখন সেই যন্ত্রটির সম্মুখে প'ড়ে গেল তার কি অবস্থা হ'ল ভেবে দেখ। দেখতে দেখতে তার পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত সমস্তটা বেমালুম হজম হয়ে গেল, কিছুই বাকি রইল না। সাধে কি তোমাকে মাঝে মাছে রাক্ষুসী ব'লে ডাকতে ইচ্ছে হয়?"

সহাস্যমুখে সন্ধ্যা বললে, "ইচ্ছে যদি হয় তো ডাক না কেন?"

প্রমথ বললে, "কেন ডাকি নে জান? অমন আদরের ডাকটি হঠাৎ খরচ ক'রে ফেলতে ইচ্ছে করে না। ডাকতে গিয়ে ভাবি, আজ থাক্, আর একদিন ডাকব।"

শুনে সন্ধ্যার মুখমণ্ডল ঈষৎ আরক্ত হয়ে উঠল; মনে মনে বললে, "ভারি তো বাকি রইল ডাকতে?"

"উষা!"

"কি, বল?"

"একটা কথা বলি, যদি কিছু মনে না কর।"

"কি কথা ?"

"ডক্টরেট লাভ ক'রে প্রিয়লাল দেশে ফিরে এসেছে, আর তোমার শ্বশুর জহরলাল চৌধুরী মারা গেছেন—এ সংবাদ তোমার জানা আছে ?"

সন্ধ্যা বললে, "হ্যাঁ, তুমি তো খবরের কাগজে এ দুটো খবরই আমাকে দেখিয়েছিলে।"

একটু ইতস্তত ক'রে প্রমথ বললে, "যদি অনুমতি দাও তো লক্ষ্ণৌ যাওয়া উপস্থিত বন্ধ রেখে দু-চার দিন একটু দৌত্য করি।"

সকৌতূহলে সন্ধ্যা বললে, "দৌত্য ? কার কাছে দৌত্য ?"

"প্রিয়লালের কাছে।"

"কেন ? কিসের জন্যে "

প্রমথ বললে, "অবশ্য তোমাদের দুজনের পুনর্মিলনের জন্যে।"

সন্ধ্যা বললে, "ও !" তার পর এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে বললে, "এ কথা কি তুমি আমার মন পরীক্ষা করবার জন্যে বলছ ?"

প্রমথ বললে, "না, তা কেন ?"

"তবে কি তোমার দায়িত্ব কাটাবার জন্যে বলছ ?"

"না, তাই বা কেন ভাবছ ?"

"তবে পরিহাস করছ ?"

মাথা নেড়ে প্রমথ বললে, "না না, পরিহাসও করছি নে।"

"পরিহাসও নয় ?—তবে আজই আমাকে আমার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও। এখন তো আমাকে খুব বড়লোক ক'রে দিয়েছ, এখন বোধ হয় সেখানে স্থান পাওয়া খুব কঠিন হবে না।"

সবিস্ময়ে প্রমথ বললে, "হঠাৎ বাপের বাড়ি যাওয়ার কি দরকার পড়ল ?"

সন্ধ্যা বললে, "একজন অনাত্মীয় পুরুষের বাড়ি থেকে স্বামীর ঘরে ফিরে

যাবার চেষ্টা ক'রে কোনো ফল আছে কি? এখান থেকে তারা আমাকে তাদের ঘরে নিতে চাইবে কেন?"

এক মুহূর্ত সন্ধ্যার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে প্রমথ বললে, "তুমি আমার উপর রাগ করছ উষা!"

সন্ধ্যা বললে, "রাগ আমি করছি নে; কারণ আমি জানি, যে-কথা তুমি বলছ তোমার নিজের কাছেও সে কথার কোনো মানে নেই। কিন্তু রাগ আমি করলে এমন কিছু অন্যায় করা হ'ত কি?"

ঈষৎ ব্যথিতস্বরে প্রমথ বললে, "তোমার মনে কষ্ট দিয়ে অন্যায় করেছি উষা, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।"

প্রমথর কথা শুনে সন্ধ্যা হেসে ফেললে; বললে, "ক্ষমা তা হ'লেই করব, বাজে কথায় যদি আর সময় নষ্ট না ক'রে জিনিসপত্র গুছিয়ে নেবার বিষয়ে মন দাও। আজ ও-বেলা আশ্রম থেকে ফিরতে রাত হয়ে যাবে, কাল সকালে খাওয়া-দাওয়া বাঁধা-ছাঁদা করতেই সময় পাওয়া যাবে না; আজ এখন সমস্ত একেবারে ঠিক ক'রে গুছিয়ে না ফেললে অসুবিধেয় পড়তে হবে।"

প্রমথ বললে, "কিন্তু গোছাবার এমনই বা কি আছে উষা? জিনিস-পত্রগুলো তাড়াতাড়ি প্যাক ক'রে নিলেই তো হ'ল।"

সন্ধ্যা বললে, "সেইখানেই তো' গোল। প্রত্যেকটি জিনিস বিবেচনা ক'রে তবে প্যাক করতে হবে। লক্ষ্ণৌ আর কলকাতা—দুই সংসারের জিনিসপত্র আমি এমন স্বতন্ত্র ক'রে ফেলতে চাই যে, ভবিষ্যতে যাতায়াতের সময় অতি অল্প জিনিস সঙ্গে নিলেই চলবে।"

প্রমথ বললে, "সেই ভাবে গুছিয়ে নেবার জন্যে এবারকার কেনা সমস্ত জিনিস লক্ষ্ণৌ নিয়ে যাওয়া দরকার।"

সন্ধ্যা বললে, "মোটেই নয়। লক্ষ্ণৌয়ে বোধ হয় থান পনের-ষোল তোয়ালে

আছে, তার পর পছন্দ হ'ল পরন্তু একেবারে দু ডজন তোয়ালে কিনে ফেললে। আচ্ছা, দুজন লোকের অতগুলো তোয়ালে কি হবে বল দেখি?

"সময়ে কাজে লাগবে।"

"সে কাজে কলকাতায় লাগবে। ওর আমি একটিও লক্ষ্ণৌ নিয়ে যাব না।"

"আচ্ছা, সে তুমি যেমন ভাল বোঝ 'ক'রো; কিন্তু বাজারে একবার কখন বেরুচ্ছ?"

"লক্ষ্ণৌ থেকে ফিরে এসে তার পর।"

"তার আগে আর নয়?"

হেসে ফেলে সন্ধ্যা বললে, "না।"

একটু চুপ ক'রে থেকে ক্ষুণ্ণমনে প্রমথ বললে, "আচ্ছা, তথাস্তু।"

বত্রিশ

কলিকাতা হতে মাইল আষ্টেক দূরে সুদূরগামী কোনও রাজপথের উপরে ভারতী আশ্রমের আলয়। দুই শতাধিক বিঘা পরিচ্ছন্ন সমতল ভূমির উপর আশ্রম অবস্থিত। চতুর্দিক সুদৃঢ় তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। মধ্যস্থলে সুবৃহৎ প্রধান সৌধ, এবং সুরকি-ঢালা পথের পাশে পাশে দূরে দূরে কাঁচা পাকা ছোট বড় কয়েকটি গৃহ। তোরণ অতিক্রম ক'রে আশ্রম-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলেই দক্ষিণে বামে দুইটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী; একটিতে শ্বেত এবং অপরটিতে রক্তপদ্মের লতা। প্রাঙ্গণের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বিস্তৃত ক্রীড়াভূমি,—আশ্রমের প্রবেশপথ হতে তার কিয়দংশ দৃষ্টিগোচর হয়।

একজন আশ্রম-সদস্যের সমভিব্যাহারে প্রমথ ও সন্ধ্যা যখন তোরণ-সম্মুখে উপনীত হ'ল, তখন ছয়টা বাজতে কয়েক মিনিট মাত্র বাকি। বরেণ্য অতিথি-যুগলের সাদর অভ্যর্থনার জন্য স্বামী অচলানন্দ এগিয়ে এসে তোরণ-পথে অপেক্ষা করছিলেন। তোরণের শীর্ষদেশে পুষ্পস্তবকে রচিত "স্বাগত"; তোরণের উভয় পার্শ্বে কদলী বৃক্ষ, এবং কদলী বৃক্ষের পার্শ্বে নারিকেল ফল সমন্বিত পূর্ণকলস।

অচলানন্দকে দেখতে পেয়ে পূর্বোক্ত সন্ন্যাসী মোটর থেকে তাড়াতাড়ি নেমে পড়লেন। অচলানন্দ সহাস্যমুখে সন্ধ্যাকে এবং প্রমথকে যুক্তকরে নমস্কার ক'রে স্নিগ্ধগভীর কণ্ঠে ক্ষুদ্র একটি অভ্যর্থনা শ্লোক পাঠ করলেন, তার পর মোটরে আরোহণ ক'রে ধীরে ধীরে প্রধান সৌধের অলিন্দপ্রান্তে এসে উপনীত হলেন।

সেখানে আশ্রম-বালিকারা প্রস্তুত হয়ে ছিল, মোটর স্থির হয়ে দাঁড়াতেই শঙ্খধ্বনি হ'ল। সন্ধ্যা এবং প্রমথ গাড়ি থেকে অবতরণ করবামাত্র কয়েকটি

বালিকা তাদের মাথার উপর পুষ্প-বর্ষণ করলে, তার পর জলপূর্ণ ঝারি হস্তে ছুটি বালিকা জল ফেলতে ফেলতে পুষ্পবিকীর্ণ পথে অভ্যাগতদ্বয়কে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

সোপানশ্রেণী অতিক্রম ক'রে, অলিন্দ অতিক্রম ক'রে, হলঘরের মধ্যস্থল দিয়ে সভাবেদী পর্যন্ত লালশালু-ঢাকা পথ। পত্রে পুষ্পে মাল্যে স্তবকে সাজানো হল-ঘরের শেষ প্রান্তে সভাবেদী, তদুপরি একটি সুদৃশ্য আস্তরণ-আচ্ছাদিত টেবিল,—টেবিলের উপরে ছুটি মূল্যবান পিতলের ফুলদানিতে পদ্মগুচ্ছ। টেবিলের সম্মুখে পাশাপাশি রাখা ছুটি কারুকার্য্য-খচিত চেয়ার। তার আশেপাশে কয়েকখানা সাধারণ চেয়ার।

প্রমথ ও সন্ধ্যা হল-ঘরে প্রবেশ করতেই সমাগত ব্যক্তিগণ উঠে দাঁড়াল, এবং চতুর্দিকে হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠের অস্ফুট গুঞ্জন উত্থিত হ'ল। প্রমথ সহাস্যমুখে যুক্ত-করে সকলকে অভিবাদন করলে, তার পর সন্ধ্যাসহ বেদীর উপর উপস্থিত হ'ল।

প্রমথ ও সন্ধ্যা ছুটি সাধারণ চেয়ার অধিকার করতে উদ্যত হ'লে অচলানন্দ বাধা দিয়ে বললেন, "এ আমাদের সাধারণ সভা নয়, সুতরাং এ ক্ষেত্রে সভার সাধারণ নিয়ম মেনে চলবার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনারা অনুগ্রহ ক'রে একেবারে আপনাদের নিজ নিজ আসনে উপবেশন করুন। তার জন্যে প্রস্তাব এবং সমর্থন সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। সে প্রস্তাব কয়েক দিন থেকেই আমাদের সকলের মনে উচ্ছ্বসিত হয়ে রয়েছে।"

প্রমথ এবং সন্ধ্যা আসন গ্রহণ করার পর সভাগৃহে একটা আনন্দধ্বনি উদ্বেল হয়ে উঠল। তার পর এল ছুটি বালিকা বরণের বিবিধ উপচার নিয়ে। ধান্য দূর্বা পুষ্প চন্দন গন্ধদ্রব্য দিয়ে ঘন ঘন শঙ্খধ্বনির মধ্যে তারা তাদের মান্য অতিথিদ্বয়কে প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত বরণ করলে, তার পর একটি পাত্র থেকে ছুটি মালা তুলে উভয়ের কণ্ঠে বিলম্বিত ক'রে দিলে। বাজারে-কেনা তারের কঠিন মালা নয়, সুদৃঢ় রেশমী সূতায় সযত্নে আশ্রমে গাঁথা কমনীয় মালা।

দেখা গেল, ইত্যবসরে কখন অলক্ষিতে সভাবেদীর এক দিকে একটি ক্যামেরা উদ্যত হয়েছে। ফোটো গ্রহণের স্থবিধার জন্য টেবিল-চেয়ারগুলিকে ঈষৎ সরিয়ে ফিরিয়ে নিতে হ'ল। প্রমথ ও সন্ধ্যা পুনরায় আসন গ্রহণ করলে অচলানন্দ নিকটে এসে স্মিতমুখে যুক্তকরে বললেন, "একটু ভুল হয়েছে। অনুগ্রহ ক'রে পাল্টে বসুন।"

সকৌতূহলে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "কেন?"

"স্বামীকে নিজের দক্ষিণ দিকে পাবার স্ত্রীর অধিকার অলঙ্ঘনীয়—ফোটোগ্রাফে তো কথাই নেই।"

এ কথাটা সন্ধ্যার পূর্বে খেয়াল হয় নি। মৃদুস্বরে বললে "ও!" তার পর দাঁড়িয়ে উঠে প্রমথর আসবার জন্য স্থান ক'রে দিয়ে একটু স'রে দাঁড়াল।

উভয়ে আসন পরিবর্তিত ক'রে বসলে পর-পর দুটি ফোটো তোলা হ'ল,—প্রথমটি শুধু প্রমথ এবং সন্ধ্যার, দ্বিতীয়টি আশ্রমের আচার্যগণের সহিত একত্রে।

এর পর সভার কার্যাবলী আরম্ভ হ'ল। পরদিন সকালের গাড়িতে প্রমথ এবং সন্ধ্যার লক্ষ্ণৌ যাত্রার কথা, সুতরাং তাদের যথাসম্ভব শীঘ্র মুক্তি দিতে হবে—এ কথা স্মরণ রেখে সভার কাযসূচী সংক্ষিপ্তই করা হয়েছিল। দু-চারটি গান, দু-তিনটি কবিতা-আবৃত্তি, অচলানন্দর অভিভাষণ, প্রমথ ও সন্ধ্যাকে অভিনন্দন-লিপি প্রদান, প্রমথর প্রতিভাষণ, অচলানন্দর ধন্যবাদ জ্ঞাপন,—এই কার্যসূচী। কিন্তু নির্বিকল্প ঐকান্তিকতা এবং হৃদয়াবেগের মধ্য দিয়ে এই সংক্ষিপ্ত কার্যসূচী দেখতে দেখতে অভিব্যক্তির এমন একটা স্তরে উপনীত হ'ল যে, সমস্ত সভা একটা সুসম্বদ্ধ সঙ্গীত-যন্ত্রের মতো সুরের ঐক্যে অনুরণিত হতে লাগল।

কবিতায় কবিতায়, গানে গানে, অভিনন্দন-লিপিতে সন্ধ্যা এবং প্রমথর প্রতি একই উচ্ছ্বাস, একই নিবেদন। অচলানন্দ তাঁর অভিভাষণে বললেন, "যে মিলনের ভিত্তিতে রুচি এবং সহৃদয়তার ঐক্য বর্তমান, সেই মিলনই যথার্থ মিলন। সহানুভূতি এবং সমবেদনার অভিন্ন বন্ধনে যে স্বামী-স্ত্রী আবদ্ধ, সেই

স্বামী-স্ত্রীই যথার্থ দম্পতি। সেই হিসাবে আমাদের আজ সন্ধ্যার এই বরেণ্য অতিথিদ্বয়কে আমি আদর্শ দম্পতি বলতে পারি। এঁদের রুচি এক, প্রবৃত্তি এক, মত এবং পথ এক, সুতরাং ধর্মও এক। সেই জন্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ শাস্ত্রের অনুশাসন—সস্ত্রীকো ধর্মমাচরেৎ—এত সহজে এবং সুন্দর ভাবে পালন করতে সক্ষম হন। এঁরা পরস্পর পরস্পরকে উজ্জ্বল করেছেন এবং এঁদের সংযুক্ত জীবন উভয়ের দ্বারা উজ্জ্বল হয়েছে। এই সম্পর্কে একটি প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোকের একটি পদ আমার মনে পড়ল, যেটি এঁদের বিষয়ে সুন্দর ভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। সে পদটি এই—শশিনা চ নিশা নিশয়া চ শশী, শশিনা নিশয়া বিভাতি নভঃ—অর্থাৎ শশীর দ্বারা নিশা শোভা পাচ্ছে, এবং নিশার দ্বারা শশী শোভা পাচ্ছে, এবং শশী এবং নিশা উভয়ের দ্বারা নভ শোভা পাচ্ছে। বর্তমান ক্ষেত্রে শশী এবং নিশা কারা এবং নভ কি, আশা করি, সে কথা প্রকাশ ক'রে বলবার প্রয়োজন নেই।"

অভিভাষণের শেষভাগে প্রমথ এবং সন্ধ্যার সমুদার দানশীলতার পুনরুল্লেখ ক'রে অচলানন্দ বললেন, "এঁরা দুজনে চিরদিনের জন্য আমাদের এই আশ্রমের পরমাত্মীয় হয়ে রইলেন। এঁদের দুজনের দানশীলতা সত্যই আমাদের মুগ্ধ করেছে। যে বিপুল অর্থ এঁরা আশ্রমকে দান করেছেন—শুধু তার পরিমাণ মনে ক'রেই এ কথা বলছি নে, এঁদের দুজনের মনে দান করবার প্রবৃত্তির যে বিস্ময়জনক অবলীলা আছে, প্রধানত সেই কথা মনে ক'রেই বলছি। এঁদের কাছে চাওয়া এবং পাওয়া এমন অভেদ্যভাবে এক যে, আমাদের পক্ষে পাওয়ার চেয়ে চাওয়াটাই ক্রমশ অনেক বেশি কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যে গাছকে নাড়া দিলেই ফল পাওয়া যায়, সে গাছকে যখন-তখন নাড়া দিতে কুণ্ঠা বোধ করে না—এমন নির্লজ্জ লোভী মন খুব বেশি নেই।"

অচলানন্দের অভিভাষণ শেষ হ'লে উত্তরে প্রমথ বললে, "আপনারা আমাদের দুজনকে দানশীল ব'লে প্রশংসা করেছেন। তর্কের খাতিরে

যদি ধ'রে নেওয়াই যায় যে, আমরণ নিজেদের দানশীল ব'লে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি, তা হ'লে আপনারই আমাদের নিকট বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ, কারণ আপনারা আমাদের সে খ্যাতি অর্জন করবার সুযোগ দিয়েছেন। দানের উদ্দেশ্য যখন মহৎ, তখন দাতার চেয়ে গ্রহীতার আসন কম উচ্চে নয়। সঞ্চয়ের সার্থকতা সদ্ব্যয়ে। সুখে-দুঃখে ধর্মে-কর্মে যিনি আমার অংশভাগিনী তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার পূর্বে আমার ব্যয় ছিল না সে কথা বলি নে, কিন্তু সে ব্যয় ছিল অপব্যয়। ইনি এঁর অনতিবর্তনীয় প্রভাবের দ্বারা সে ব্যয়ের গতি পরিবর্তিত করেছেন সদ্ব্যয়ে, সুতরাং এই প্রসঙ্গে ইনিও আমার ধন্যবাদার্হ।"

সন্ধ্যার প্রতি অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত ক'রে প্রমথ বললে, "এঁর মুখের পরিবর্তিত আকৃতি দেখে আমি বুঝতে পারছি যে, এঁর সম্পর্কে এই সকল কথা আমি বলতে উদ্যত হয়েছি ব'লে ইনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন; কিন্তু উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত কথা বলবার লোভ সম্বরণ করবার ক্ষমতা আমার নেই, সুতরাং এঁর বিষয়ে আর একটি মাত্র কথা ব'লে আমি আমার আজকের বক্তব্য শেষ করব। দুর্ভাগা, বিপন্না, সমাজ কর্তৃক উৎপীড়িতা নারীদের কল্যাণ-সাধনের জন্য এঁর মনের তীব্র আগ্রহ দেখে আমি এঁকে একটি নারী-কল্যাণ-মন্দির স্থাপন করবার পরামর্শ দিই। ইনি কিন্তু পাছে যথোপযুক্ত শক্তি এবং সামর্থ্যের অভাবে সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল হয় সেই আশঙ্কায়, নিজে ভার গ্রহণ না ক'রে কোনো চলতি প্রতিষ্ঠানের দ্বারা স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের সঙ্কল্প করেন। তার পর কি প্রকারে আপনাদের সঙ্গে এঁর পরিচয় ঘটে এবং নারী-কল্যাণ মন্দিরের পরিকল্পনা গ'ড়ে ওঠে, সে সকল কথা আপনাদের সম্পূর্ণ জানা আছে। আপনাদের পরিকল্পিত নারী-কল্যাণ-মন্দিরের সাহায্যে গতকল্য ইনি কিছু টাকা দিয়েছেন, এবং দ্বিতীয় কিস্তি স্বরূপ আজও একটি চেক এনেছেন। আপনারদের নারী-কল্যাণ-মন্দিরের কার্যের অগ্রগতি দেখে ইনি যদি উৎসাহিত

হন, তা হ'লে এঁর সাহায্যের সমষ্টি কালে লক্ষ টাকা অতিক্রম করতে পারে—এঁর মনের এই সিদ্ধান্তটুকু আমি আপনাদের কাছে আজ প্রকাশ করলাম।"

সভাস্থলে আনন্দসূচক ঘন ঘন করতালি এবং 'সাধু সাধু' রব উত্থিত হ'ল। প্রমথ বললে, "আপনারা আজকে আমাদের দুজনকে এমন সুস্পষ্ট আন্তরিকতা এবং অনুরাগের সঙ্গে অভিনন্দিত ক'রে আমাদের মনে যে আনন্দের হিল্লোল জাগিয়ে তুলেছেন তা প্রকাশ করবার উপযুক্ত ভাষার আমার অভাব। যে বস্তু অনির্বচনীয়, তাকে বচনের দ্বারা প্রকাশ করবার চেষ্টাকে আমি অপরাধ ব'লে মনে করি। সুতরাং আমি সে চেষ্টায় বিরত থেকে শুধু আমাদের দুজনেব চিত্তের ঐকান্তিক কৃতজ্ঞতা আপনাদের কাছে নিবেদন করলাম। যে গভীর অনুভূতি নিয়ে আজকে আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেব, আমার জীবনের শেষ দিন পযন্ত তা আমার চিত্তের অমূল্য সম্পদ হয়ে রইল। আপনারা সাধু, সজ্জন, মানবসমাজের কল্যাণ-সাধনের জন্য সংসারত্যাগী,—আপনাদের শুভ প্রতিষ্ঠান সর্বতোভাবে সাফল্য-মণ্ডিত হোক—এই প্রার্থনা ক'রে আমি বিদায় গ্রহণ করলাম।"

একটু নত হয়ে প্রমথ সন্ধ্যার কাছ থেকে চেকটা চেয়ে নিলে, তার পর সেটা অচলানন্দর হাতে দিয়ে আসন গ্রহণ করলে।

অচলানন্দ দণ্ডায়মান হয়ে বললেন, "যে মহীয়সী নারী আজ আমাদের আশ্রমে পদর্পণ ক'রে আমাদের ধন্য করেছেন, তিনি কাল আমাদের নারী-কল্যাণ-মন্দিরের সাহায্যকল্লে এক হাজার টাকা দান করেছেন তা আপনাবা জানেন, আজ তিনি চার হাজার টাকা দিলেন। তা ছাড়া যে বিপুল অর্থ দান করবার তাঁর অভিপ্রায় আছে, তার কথাও আপনারা শ্রীযুক্ত প্রমথনাথের মুখে শুনছেন। এই মহীয়সী নারী এবং তাঁর মহাপ্রাণ স্বামীকে আমি কি ব'লে অভিনন্দিত করব তা ভেবে পাচ্ছি নে' প্রমথনাথেরই ভাষা ব্যবহার ক'রে আমি বলি—অনির্বচনীয়কে ভাষায় ব্যক্ত করবার চেষ্টা ক'রে কাজ নেই,

যা অনুভূতির বস্তু তা আমাদের অনুভবের মধ্যেই বর্তমান থাকুক। প্রচলিত প্রথায় এঁদের ধন্যবাদ দিতে আমার মন পরিতৃপ্তি মানবে ব'লে মনে হচ্ছে না। আমার সমস্ত অন্তঃকরণ এই শুভক্ষণে এ দুটি তরুণ-তরুণীকে আশীর্বাদ করবার জন্যে উদ্বেল হয়ে উঠেছে। আমার বলতে ইচ্ছে করছে,—তোমরা বেঁচে থাক, তোমরা সুখী হও। তোমাদের মিলন দৃঢ়তর মধুরতর হোক। আর-কোনো অধিকার আমার না থাকলেও আমি বয়োজ্যেষ্ঠ, সেই অধিকারে আমি বিবাহ অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত ঋগ্বেদের একটি শ্লোকের দ্বারা এই পুণ্যচরিত্র দম্পতিকে আশীর্বাদ ক'রে বলি—

সমানি ব আকুতিঃ সমানা হৃদয়াণি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥

—তোমাদের ইচ্ছা একরূপ হোক, তোমাদের হৃদয় একরূপ হোক, তোমরা যাতে পরস্পর সুন্দরভাবে একত্র থাকতে পার তজ্জন্য তোমাদের মন একরূপ হোক।"

অচলানন্দ আসন গ্রহণ করলে প্রমথ সন্ধ্যার কানে কানে কি বলতে সন্ধ্যা উঠে দাঁড়াল, তার পর উভয়ে অচলানন্দর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে মাথা নীচু ক'রে যুক্তকরে প্রণাম করলে।

দক্ষিণ হস্ত উত্তোলিত ক'রে অচলানন্দ বললেন, "দীর্ঘায়ুরস্তু।"

সভা শেষ হ'ল।

প্রমথ বললে, "মহারাজ, এবার আমাদের বিদায় দিন।"

অচলানন্দ বললেন, "কিন্তু একটু মিষ্টিমুখ না করিয়ে তো ছাড়তে পারি নে।"

"একান্ত যদি না ছাড়েন তো যত শীঘ্র এবং সংক্ষিপ্ত ভাবে হয়, অনুগ্রহ ক'রে তার ব্যবস্থা করুন।"

অচলানন্দ বললেন, "ব্যবস্থা নিতান্তই সামান্য,—আর তা প্রস্তুতই আছে। আসুন আমার সঙ্গে।" ব'লে অগ্রসর হলেন।

বিদায়কালে প্রমথ ও সন্ধ্যা মোটরে ওঠার পর অচলানন্দ বললেন, "ফিরে যাবার সময়ে মালা খুলে যাওয়া যদিও সাধারণ আচরণ, কিন্তু এ আমার ঠিক ভাল লাগছে না। আশ্রম ত্যাগ ক'রে যাবার সময়ে আমাদের আদরের চিহ্ন দুটি আপনাদের গলায় ঝুললে আমরা ভারি খুশি হব। আসুন, পরিয়ে দিই।" ব'লে অচলানন্দ সম্মুখের সীট থেকে মালা দুটি তুলে নিয়ে তার মধ্যে একটি প্রমথর কণ্ঠে পরিয়ে দিলেন।

প্রমথ নিজের গলার মালা এবং অচলানন্দর হাতের মালা বার দুই তাড়াতাড়ি লক্ষ্য ক'রে বললে, "মহারাজ, আপনার হাতের ও-মালাটাই কিন্তু আমার।"

সহাস্যমুখে অচলানন্দ বললেন, "তাই না-কি? কেমন ক'রে বুঝলেন?"

"ওঁর মালার মধ্যিখানের ফুল লাল গোলাপ, আর আমার হলদে।"

"এতটা লক্ষ্য ক'রে রেখেছেন? তা হোক, স্বামী-স্ত্রীর মালা যত বদল হয় ততই মঙ্গল।" ব'লে অচলানন্দ হাসতে হাসতে হাতের মালাখানা সন্ধ্যার গলায় পরিয়ে দিলেন।

ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি এবং জয়ধ্বনির মধ্যে প্রমথ ও সন্ধ্যার মোটর চলতে আরম্ভ করলে, এবং দেখতে দেখতে আশ্রম-প্রাঙ্গণ অতিক্রম ক'রে রাজপথে এসে পড়ল।

যদিও শ্রাবণ মাস, আকাশে তেমন মেঘ ছিল না। কৃষ্ণপক্ষের তিথির অনুজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে দুই পাশের অস্পষ্ট দৃশ্যাবলীর মধ্য দিয়ে মোটর দ্রুতবেগে কলিকাতার অভিমুখে ছুটে চলেছে। প্রমথ ও সন্ধ্যা তাদের হৃদয়ের সুগভীর অনুভূতির নির্মল আলস্যে নির্বাক হয়ে পাশাপাশি ব'সে। মুখে কথা নেই, কিন্তু তাই ব'লে মনের মধ্যে এমন-কিছু চিন্তার তরঙ্গ যে আলোড়িত হচ্ছিল, তাও নয়। হিম-শীতল সমুদ্রতটে বিস্তৃত বালুকারাশিকে আচ্ছন্ন ক'রে স্তিমিত জ্যোৎস্না যেমন প'ড়ে থাকে, তেমনি একটা অলস মন্থর

চিন্তা তাদের মনকে ব্যাপ্ত ক'রে ছিল। অভিনন্দন-উৎসবের আকারে যে ব্যাপারটা আজ সহসা ঘ'টে গেল, তা যেন তাদের পক্ষে একটা পুরোদস্তুর বিবাহ অনুষ্ঠানই। শঙ্খধ্বনি, পুষ্পবর্ষণ, বরণ, মাল্য-বদল, এমন কি বিবাহ পদ্ধতির অন্তর্গত আশীর্বাদের শ্লোক পর্যন্ত! কি-ই যে নয়!

কলিকাতার এলাকায় প্রবেশ করবার কিছু পরে প্রমথদের মোটরের পাশ দিয়ে বর এবং বরযাত্রীদের একটা শোভাযাত্রা চ'লে গেল।

সন্ধ্যার দিকে মুখ ফিরিয়ে মৃদুকণ্ঠে প্রমথ বললে, "উষা, আজ দেখছি বিয়ের লগ্নও আছে।"

সন্ধ্যা শুধু একবার প্রমথর মুখের উপর চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে মুখ ফিরিয়ে নিলে, কোনো কথা বললে না।

গৃহে যখন তারা পৌঁছল, তখন সাড়ে আটটা বেজে গেছে। ছাতে গিয়ে পাশাপাশি রাখা দুটো ঈজি-চেয়ারের উপর দুজনে আশ্রয় গ্রহণ করলে। এখনো কোনো কথাবার্তা হ'ল না, উভয়ে নিঃশব্দে পাশাপাশি ব'সে রইল।

ক্ষণকাল পরে প্রমথ বললে, "উষা, আজ এখন তোমার কোনো কাজ সারবার বাকি থাকে তো চল।"

সন্ধ্যা বললে, "যা বাকি আছে, কাল সকালে সেরে নোব। আজ থাক্।"

আর কোনো কথা হ'ল না। তার পরও বহুক্ষণ তারা স্তব্ধ হয়ে পাশাপাশি ব'সে রইল।

তেত্রিশ

পরদিন সকালে যখন প্রমথর নিদ্রাভঙ্গ হ'ল, তখন সাড়ে ছটা বেজে গেছে। ঘণ্টাখানেক হ'ল সূর্যোদয় হয়েছে। বেলা সাড়ে দশটার গাড়িতে লক্ষ্নৌ যেতে হবে, এত দেরি পর্যন্ত নিদ্রিত থাকার জন্য লজ্জিত হয়ে সে তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ ক'রে সন্ধ্যার নিকট উপস্থিত হ'ল। সন্ধ্যা তখন পথে ব্যবহারের উপযোগী বিছানা-পত্র একটা হোল্ড্-অলে বাঁধিয়ে নিচ্ছে।

প্রমথ বললে, "আশা করি, আমার অভাবে কোনো অসুবিধে হয় নি উষা?"

সন্ধ্যা বললে, "নিজেকে হঠাৎ এত খাট ক'রে মনে করছ কেন যে, তোমার অভাবে কোনো অসুবিধে হবে না?"

একটা নিবিড় গাম্ভীর্য অবলম্বন ক'রে প্রমথ বললে, "বিশেষ একটা সাধু উদ্দেশ্যে।"

হাস্যাবরুদ্ধ মুখে সন্ধ্যা বললে, "সাধু উদ্দেশ্যটা কি শুনতে পাই নে?"

"বিনয় প্রকাশ।"

শুনে সন্ধ্যা হাসতে লাগল। বললে, "বুঝতে পারি নি। কিন্তু আপাতত বিনয় প্রকাশ বন্ধ রেখে একটু কাজের লোক হও দেখি।"

উচ্ছ্বাসের সহিত প্রমথ বললে, "অতি অবশ্য। কি করতে হবে বল?"

"মুখ ধুয়ে চা-টা খেয়ে নাও।"

সন্ধ্যার কথা শুনে প্রমথ ক্ষণকাল তার দিকে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চেয়ে রইল, তার পর কপট ক্রোধের ভঙ্গীতে বললে, "বিদ্রূপ! আচ্ছা, এ অপমানের প্রতিশোধ নোব রেল-গাড়িতে উঠে,—তখন করব একেবারে পুরোপুরি নন-কো-অপারেশন। দেখি তুমি কেমন ক'রে লক্ষ্নৌ পৌঁছও!"

সন্ধ্যা বললে, "আচ্ছা, তা ক'রো, শুধু খাওয়ার সময় খেয়ো, আর—" কথা শেষ না ক'রে সে হাসতে লাগল।

প্রমথ জিজ্ঞাসা করলে, "আর কি?"

"তুমিই বল না, কি?"

"ঘুমোবার সময়ে ঘুমিয়ো?"

সন্ধ্যা খিলখিল ক'রে হেসে উঠল; বললে, "ঠিক তাই। কি ক'রে বুঝলে?"

গম্ভীর মুখে প্রমথ বললে, "তা বলব না। আমার যদি আরব দেশের একটা বেগবান সাদা ঘোড়া থাকত, তা হ'লে এ অপমানের প্রতিকারে কি করতাম জান?"

সপুলকে সন্ধ্যা বললে, "কি করতে?"

"তাইতে সওয়ার হয়ে বায়ুবেগে বালিগঞ্জের মাঠ পেরিয়ে গড়ের মাঠ ছাড়িয়ে স্ট্র্যাণ্ড রোড দিয়ে হাওড়া ব্রিজ পার হয়ে দেশান্তরে চ'লে যেতাম। তা যখন নেই, তখন কি করব জান?"

"কি করবে?"

"কক্ষান্তরে গিয়ে চা-পান করব।"

সন্ধ্যা বললে, "সেই কথাই ভাল। আমি ততক্ষণে গাড়ির খাবারগুলো কতদূর এগোলো দেখে আসি।

সন্ধ্যার তাগাদার দাপটে বেলা নয়টার মধ্যে সকল ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেল, এবং কিছুক্ষণ পরেই সকলে হাঁওড়া স্টেশনের দিকে রওনা হ'ল। সঙ্গে চলল সাধুচরণ, পাচক মাধব এবং পরিচারিকা সারদা।

যে সকল দাস-দাসী-দারোয়ান-মালী কলিকাতার বাড়িতে রইল, প্রমথ ও সন্ধ্যাকে প্রণাম করবার জন্য তারা বিদায়কালে গাড়ির কাছে এসে একত্র হ'ল। আসন্ন বিচ্ছেদের করুণতায় রামভজন সিঙের চক্ষু সজল হয়ে এল,

বললে, মা-জীর অভাবে সমস্ত বাড়ি 'শূন' হয়ে যাবে, মন লাগবে 'উদাস'; সুতরাং মা-জী যেন অবিলম্বে প্রত্যাবর্তন করেন।

অর্থে এবং মিষ্টবাক্যে সন্ধ্যা সকলকে পুরস্কৃত করার পর মোটর রওনা হ'ল।

স্টেশনে যখন তারা পৌঁছল, তখন গাড়ি ছাড়তে মিনিট কুড়িক বিলম্ব আছে। ইতিপূর্বে বাড়ির পুরাতন সরকার যোগীন দত্ত জিনিস-পত্র ও বামুন-চাকরদের নিয়ে এসে হাজির ছিল।

একটি ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেণ্টের দুটো তলার বার্থ প্রমথ এবং সন্ধ্যার জন্য রিজার্ভ করা ছিল; এবং উপরের দুটো বার্থের মধ্যে একটা রিজার্ভ করা ছিল কোন ইংরাজ ভদ্রলোকের নামে। রিজার্ভ কার্ডে নাম প'ড়ে সন্ধ্যা বললে, "ই. এ. বেণ্টলি।"

প্রমথ বললে, "তা হ'লে ভালই হয়েছে। আপাতত আমরা দুজনে প্ল্যাট্‌ফর্মের দিকের বেঞ্চটা অধিকার ক'রে বসি, আর দিনের বেলা বসবার জন্যে বেণ্টলিকে ও-দিকের বেঞ্চটা ছেড়ে দেওয়া যাক।"

প্রমথর কথার ধরনে কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে সন্ধ্যা বললে, "বেণ্টলিকে তুমি চেন না কি?"

মৃদু হেসে প্রমথ বললে, "এ পর্যন্ত দেখা-সাক্ষাৎ নেই। তবে কি জান?—উদারচরিতানাম্ভ বসুধৈব কুটুম্বকম্। মনে মনে একটা কুটুম্বিতে পাতিয়ে নিলেই হ'ল।"

সন্ধ্যা হাসতে লাগল; বললে, "তাই বল! আমি ভাবলাম, তোমার কাজ-কারবারের চেনাশোনা কোন সাহেব হয়তো, সারাপথ ভজোর-ভজোর ক'রে গল্প করতে করতে যাবে।"

প্রমথ হেসে উঠে বললে, "ও! সেই শিমলা যাবার সময়কার কথা মনে পড়ল বুঝি? না, এবার আর ভজোর-ভজোরের কোনো ভয় নেই। সারাপথ গুঞ্জন করতে করতেই যাওয়া যাবে।"

প্রমথর প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে সন্ধ্যা মৃদু হাস্য করলে।

মাধব তৎপর লোক। প্রমথর সঙ্গে সে কয়েকবার রেলপথে যাতায়াত করেছে। গাড়িতে উঠে তাড়াতাড়ি হোল্ড্-অল খুলে বেঞ্চের উপর বিছানা পেতে দিলে। অপর বেঞ্চে সন্ধ্যার শয্যা পাততে যাচ্ছিল, প্রমথ মানা করলে, "এখন ওটা থাক্, রাত্রে পেতো।"

কামরার সম্মুখে প্ল্যাট্‌ফর্মে সরকার যোগীন দত্ত অপেক্ষা করছিল, তাকে সম্বোধন ক'রে সন্ধ্যা বললে, "সরকার মশায়, মাঝে মাঝে চিঠিপত্র দিয়ে খবরাখবর জানাবেন।"

"জানাব মা।"

"আর দেখুন, একটু কাছে আসুন তো।"

নিকটে এগিয়ে এসে যোগীন দত্ত বললে, "মা?"

একখানা দশ টাকার নোট যোগীন দত্তর হাতে দিয়ে সন্ধ্যা বললে, "জোড়া দুই শাড়ি সাতুকে কিনে দিবেন।" সাতু যোগীন দত্তর কনিষ্ঠা কন্যা, সম্প্রতি পিত্রালয়ে এসেছে।

উৎফুল্ল মুখে যোগীন দত্ত বললে, "এই সেদিন তো তাকে অমন একটা ভাল শাড়ি দিলেন, আবার শাড়ি কেন মা?"

সন্ধ্যা বললে, "তা হোক, জোড়া দুই সাধারণ শাড়ি তাকে কিনে দেবেন।"

"কিন্তু তাতে এত পয়সা লাগবে না তো মা।"

"যদি কিছু বাঁচে, সাতুর ছেলেকে খেলনা কিনে দেবেন।"

নত হয়ে যুক্তকরে প্রণাম ক'রে যোগীন দত্ত বললে, "যে আজ্ঞে মা।"

গাড়ি ছাড়তে মাত্র মিনিট পাঁচেক বাকি এমন সময়ে বেণ্টলি এসে উপস্থিত হ'ল। দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, মাথার আধখানা জুড়ে টাক। বয়স বৎসর পঞ্চাশের কাছাকাছি। আর্দ্দালীর পালিশ-করা তকমা থেকে বোঝা গেল, তার প্রভু সারভেয়ার জেনারেল অফ ইণ্ডিয়া অফিসের কোন বড় কর্ম্মচারী।

কামরায় প্রবেশ করবার পূর্বে বেণ্টলি গাড়ির হাতলে লটকানো রিজার্ভ কার্ড থেকে তার সীটের সংস্থান বুঝে নিলে, তার পর ভিতরে প্রবেশ ক'রে একটা বেঞ্চ একেবারে খালি রয়েছে দেখে প্রমথর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "আমি যদি উপস্থিত এ বেঞ্চে একটা সীট অধিকার করি, তা হ'লে বোধ করি আপনাদের তেমন অসুবিধা হবে না।"

প্রমথ বললে, "রাত্রি নটা পর্যন্ত আমাদের কোনো অসুবিধে হবে না। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে ব'সে পড়ুন।"

ধন্যবাদ জানিয়ে বেণ্টলি অপর বেঞ্চটা অধিকার ক'রে বসল।

একটু পরেই গাড়ি ছেড়ে দিলে এবং দেখতে দেখতে হাওড়া-বর্ধমান কর্ডে এসে পড়ল।

গাড়ি হু-হু ক'রে ডানকুনির বিস্তৃত প্রান্তর অতিক্রম করছিল। প্রমথ বললে, "ঐ যে দেখছ উষা, একটা পথ সোজা ওদিকে চ'লে গেছে, ওটা দিয়ে গেলে কৃষ্ণপুর নামে একটি গ্রামে যাওয়া যায়। সেখানে একবার জষ্ঠি মাসে আমার এক বন্ধুর বাড়ি এমন আলো-চিঁড়ে আর আমের ফলার করা গিয়েছিল যে, কোথায় লাগে তার কাছে তোমার চপ্ কাটলেট!"

কৌতূহলী হয়ে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "কোন্ স্টেশনে নেমে কৃষ্ণপুর যেতে হয়?"

প্রমথ বললে, "ডানকুনি। এই যে এখনি ডানকুনি পাস ক'রে এলাম। ডানকুনি নামের একটা বেশ গল্প আছে, সে এক সময়ে তোমাকে বলব অখন। কিন্তু এ রকম ক'রে সুবিধে হবে না, এস দস্তুরমতো বাংলা ভাবে পা তুলে তৃতীয় ব্যক্তির দিকে পিছন ফিরে ব'সে দেখতে দেখতে আর গল্প করতে করতে যাওয়া যাক।"

প্রস্তাবটা সন্ধ্যার কাছে এত উৎকৃষ্ট বোধ হ'ল যে, কোন প্রকারে মন্তব্য

প্রকাশ না ক'রে অবিলম্বে সে পা তুলে পিছনে ফিরে বসল। প্রমথও তার পাশে সেইভাবে উপবেশন করল।

প্রমথ বললে, "এবার নিশ্চিন্ত হয়ে একটা কথার বিচার করা যাক উষা।".

ঔৎসুক্যের সহিত সন্ধ্যা বললে, "কি কথা?"

প্রমথ বললে, "এই তো আমি কতবার কত জায়গায় যাতায়াত করেছি। কিন্তু কই, কখনো তো আজকের মতো এমন ক'রে চাকর-বামুন-দারোয়ানরা গাড়ির কাছে এসে দাঁড়িয়ে হা-হুতাশ করে নি! কখনো তো দারোয়ান আমাকে বলে নি যে—বাবু, আপনার অভাবে বাড়ি 'শূন্' আর মন 'উদাস' হয়ে যাবে! অথচ তুমি আসবার আগে আমি তো এ বাড়ির একাধিপতি অধীশ্বর ছিলাম। তোমার সঙ্গে আর আমার সঙ্গে ওদের ব্যবহারের এতটা ভেদ কিসের জন্যে হয় তার একটা বিচার হওয়া উচিত উষা।"

প্রমথর কথা শুনে সন্ধ্যা হাস্যমুখে বললে, "এখনো সে কথা তোমার মনে আছে না-কি?"

গভীর মুখে প্রমথ বললে, "থাকবে না? যে কথা মনের মধ্যে এমন গভীর রেখাপাত করেছিল, সে কথা এরই মধ্যে ভুলে যাব?"

হাসিমুখে সন্ধ্যা বললে, "কিসের রেখাপাত? ঈর্ষার?"

প্রমথ বললে, "ঈর্ষার নয়তো আবার কিসের? দিব্যি ছিলাম, কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না। কোথা থেকে তুমি উড়ে এসে জুড়ে ব'সে এমন করলে যে, মহলের সর্বত্র—অন্দর বার বেদখল হয়ে গেলাম!"

সন্ধ্যা বললে, "নিজে ডেকে এনে এখন আমার দোষ দিলে কি হবে বল!"

প্রমথ বললে, "না, তা কিছুই হবে না; কিন্তু সদা-সর্বদা মনে মনে কি ভাবি, জান উষা?"

"কি ভাব ?"

"ভাবি, ভাগ্যিস ডেকে এনেছিলাম! নইলে তো ভূতপূর্ব প্রমথনাথ ভূতই থেকে যেত। তুমি এসে অজানা শক্তির এমন চাপ দিলে যে দেখতে দেখতে বহুকালের কয়লা হীরে হয়ে গেল। যে তোমাকে মলিন করতে পারত, তাকে তুমি দিলে চকচকিয়ে। তোমার এ ঋণ কি শোধ করতে পারা যায় উষা! আমার সম্পত্তি তোমার সঙ্গে আধা-আধি ভাগ ক'রে নিয়েছি ব'লে তুমি কত সময়ে কত কথা বল, কিন্তু সে ঋণ তো ইচ্ছে করলে ফেলে দেওয়া যায়, ফিরিয়ে দেওয়া য'য়; কিন্তু এ তো যায় না,—এর শেষ নেই, শোধ নেই।"

বেগমপুরের মাঠ বিদীর্ণ ক'রে ট্রেন বায়ুবেগে এগিয়ে চলছিল। প্রমথর রসগভীর কথার উত্তরে কোনো কথা না ব'লে সন্ধ্যা সুদূর দিকৃচক্রবালের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে ব'সে রইল। মনে মনে বললে, তুমি শুধু তোমার টাকাটাই দেখ, কিন্তু টাকা ছাড়া আর যে জিনিসে আমার সমস্ত প্রাণ মন ভরিয়ে দিয়েছ তার কাছে টাকাটা যে কিছুই নয়, সে কথা তো বোঝ না

"উষা!"

সন্ধ্যা ফিরে চেয়ে মৃদুস্বরে বললে, "কি ?"

"তুমি অদৃষ্ট মান ?"

"মানি।"

"আমি সেই অদৃষ্টে তোমাকে পেয়েছি। আশ্চর্য দেখ, কোথাকার ধন কোথায় এসে আটকাল! কাদের গৃহলক্ষ্মী হবার কথা তোমার, হ'লে আমার গৃহলক্ষ্মী! কার হৃদয় আলোকিত করবার কথা, করলে আমার হৃদয় আলোকিত! তাদেরও পক্ষে এ সেই অদৃষ্টের কথা! যে জিনিসের অংশ মাত্র পেয়ে আমার সমস্ত জীবন ধন্য হয়েছে, তার সবটা পেয়েও তারা তা হারাল! এর চেয়ে দুরদৃষ্ট আর কি হতে পারে তা জানি নে।"

এবারও সন্ধ্যা কোনো কথা কইলে না, বাহিরের দ্রুত-অপস্রিয়মাণ দৃশ্যাবলীর দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল। প্রমথ ক্ষণকাল নীরবে ব'সে থেকে পুনরায় কথা আরম্ভ করলে।

"এক দিক থেকে দেখলে আমারও কম দুরদৃষ্টের কথা নয়। আমার কথাটাও একবার ভেবে দেখ। আজকের দুর্বলতা আমার ক্ষমা ক'রো উষা, কথাটা একটু পরিষ্কার ক'রেই বলি। তুমি এলে আমার গৃহের মধ্যে, আমার প্রাণের মধ্যে,—কিন্তু তবু তোমার অনেকখানিই রইল সমাজের অনড় খোঁটায় বাঁধা। সমাজের সঙ্গে বিদ্রোহ ক'রে দুজন বাসা বাঁধলাম সমাজের এলাকার বাইরে; তবু সমাজের অনুশাসন ষোল আনা কাটাতে পারলাম না। আমি জানি, আমার এই অন্তরের মধ্যে তোমার প্রতি যে ভালবাসা বাস করে, তা এত বৃহৎ এত বিরাট যে, কোনো প্রিয়লাল তার কাছে সামান্য একটা বিন্দুর মতোও বড় নয়। কিন্তু তবু তুমি প্রিয়লালের স্ত্রী, আমার স্ত্রী নও; যদিও সমস্ত বিশ্বসংসার জানে, তুমি আমার স্ত্রী। এ কি কম দুঃখের, কম দুরদৃষ্টের কথা!"

ক্ষণকাল নীরব থেকে প্রমথ জিজ্ঞাসা করলে, "ঈশ্বর বিশ্বাস কর উষা? পরজন্ম মানো?"

সন্ধ্যা কোনো কথা বললে না, শুধু প্রমথর প্রতি একবার চকিত দৃষ্টিপাত করলে। সে দৃষ্টি পরিবেদনায় বিহ্বল, সহানুভূতিতে আর্দ্র।

"ঈশ্বর যদি থাকেন আর পরজন্ম যদি সত্যি হয়, তা হ'লে কোনো রকমে কোনোদিন যদি ঈশ্বর ব'লে কাউকে খুঁজে পাই তা হ'লে বলি, এ জন্মে যত মিথ্যা অভিনয় করালে পরজন্মে সমস্ত সত্যি ক'রো, মায় কাল রাত্রের ভারতী আশ্রমের ঘটনা পর্যন্ত। কাঙালকে শুধু লুব্ধ ক'রেই রেখো না, তৃপ্ত ক'রো তাকে।"

প্রমথর অন্তরের এই আকুল কামনার অভিব্যক্তি শুনে দুঃখে, বেদনায়,

আনন্দে সন্ধ্যার চোখ থেকে অশ্রু ঝ'রে পড়ল। বহুকাল প্রমথর সহিত তার এরূপ প্রণয়-সমুদ্বেল কথোপকথন হয় নি। প্রাত্যহিক সাংসারিক জীবনের দীর্ঘকাল একত্র যাপনের ফলে এ কথা অনেক সময়েই তারা ভুলে থাকত যে, তাদের মিলনের মধ্যে কোনো ব্যত্যয় অথবা অপূর্ণতা আছে; সুতরাং অধিকাংশ সময়েই তারা সাধারণ স্বামী-স্ত্রীর মত নিরুদ্বেগ নিশ্চিন্ততায় দিনাতিপাত করত। কিন্তু গত রাত্রের ভারতী আশ্রমের ঘটনার অচিন্তিত আঘাত তাদের দুঃখ-গ্লানির ক্ষতস্থানকে পুনরুন্মোচিত ক'রে তাদের যেন প্রথম মিলনের তরুণতায় টেনে নিয়ে গেছে। তাই আবার নূতন ক'রে তাদের হৃদয়ে দুঃখ-সুখের বান ডেকেছিল, যার অধীরোন্মত্ত তরঙ্গোচ্ছ্বাস কথোপকথনের মধ্যেও উদ্বেল হয়ে উঠছিল।

নির্বাত বর্ষাদিনের আর্দ্র উত্তাপের পরিশ্রান্তিতে বেণ্টলির নিদ্রাকর্ষণ হয়েছিল। দ্রুত-চালিত ইলেক্‌ট্রিক পাখার ক্রুদ্ধ গুঞ্জন অতিক্রম ক'রে মাঝে মাঝে তার নাসিকা-ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। ট্রেন চলেছিল বন-জঙ্গল-প্রান্তর ভেদ ক'রে উন্মত্ত বেগে বর্ধমানের অভিমুখে, সেখানে না পৌঁছতে পারলে তার এই একটানা অবিশ্রান্ত গতির বিরাম নেই। বাহিরে নিসর্গ তার গাছপালা নদীনালা বনবাদাড় নিয়ে দিক্‌চক্রবালের মধ্যবিন্দুকে কেন্দ্র ক'রে ক্ষিপ্ত বেগে আলোড়িত হচ্ছিল। প্রমথ ও সন্ধ্যা বহুক্ষণ ধ'রে তাদের চিন্তা-বিলাসে মগ্ন হয়ে পাশাপাশি নিঃশব্দে ব'সে রইল। বাক্য যেখানে নীরবতার নিকট পরাস্ত হয় সেই অবস্থায় তারা উপনীত হয়েছিল।

হঠাৎ এক সময়ে তন্দ্রাবিমুক্ত হয়ে ব্যস্তভাবে হাতের রিস্টওয়াচ দেখে সন্ধ্যা বললে, "যাঃ! তোমার খাওয়ার দেরি হয়ে গেল! সাড়ে এগারটা বাজে।"

নিজের ঘড়ি দেখে প্রমথ বললে, "এমন কিছু দেরি হয় নি, এখন সওয়া এগারটা, তোমার ঘড়ি কিছু ফাস্ট আছে। বর্ধমান পৌঁছতে এখনো অনেক দেরি।"

সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি একটা বড় প্লেটে নানাবিধ আহার্য সাজিয়ে ফেললে, তারপর বাথরুম থেকে প্রমথ হাতমুখ ধুয়ে এসে বসলে সেই প্লেট ও কাচের গ্লাসে ক'রে এক গ্লাস জল তার সম্মুখে স্থাপিত ক'রে বললে, "খাও, পরে আরও দেব।"

"কিন্তু তোমার ?"

"আমি পরে খাব অখন।"

"কেন ?"

মৃদু হেসে সন্ধ্যা বললে, "প্লেটের অভাব। বড় টিফিন-বাক্সটা মাধব ভুল ক'রে নিজের কাছে রেখেছে।"

প্রমথ বললে, "তা হ'লে পরে কোন্ প্লেটে খাবে ?"

"কেন, তোমার প্লেটে।"

"এঁটো পাতে ?"

মৃদু হেসে সন্ধ্যা বললে, "দোষ কি তাতে ? জাত যাবে নাকি ?"

প্রমথ বললে, "জাতের চেয়েও যে তোমাদের এমন একটা জিনিস আছে যা কথায়-বার্তায় নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে যায়।"

একটু ইতস্তত ক'রে, প্রমথর মুখের উপর একবার চকিত দৃষ্টি বুলিয়ে মৃদুস্বরে সন্ধ্যা বললে "কিন্তু তোমার কাছে তো সে জিনিস যাবার নয়!"

"নয় ?" প্রমথর মুখ উল্লাসে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল; বললে, "এমন ক'রে প্রশ্রয় দিয়ো না উষা। খাবার-দাবার সব মাথায় উঠবে।"

আর একবার প্রমথর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "তবে এসব কথা এখন থাক্,—তুমি খাও।"

প্রমথ বললে, "তুমিও এস না উষা, দুজনে এক প্লেটেই খাওয়া যাক। টিফিন-কেরিয়ারটা কাছে রাখ, তুলে তুলে নিলেই হবে।"

একটু ইতস্তত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "না, তুমিই খাও, আমি পরে খাব এখন।"

প্রমথ বললে, "কেন, একসঙ্গে খেলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে? তুমি পরে খেলে আমাকে তাড়াতাড়ি ক'রে খাওয়া সারতে হয়, কারণ বর্ধমান পৌঁছতে আধ ঘণ্টার বেশি সময় নেই। এস, লক্ষ্মীটি।"

সন্ধ্যা একবার বেণ্টলির দিকে ফিরে চেয়ে দেখলে, তার পর মৃদুস্বরে বললে, "আচ্ছা, আসছি।" ব'লে টিফিন-কেরিয়ারটা নিকটে এনে রাখলে। বেণ্টলি তখন পাশ ফিরে নিদ্রা দিচ্ছিল।

চৌত্রিশ

বেলা সাড়ে তিনটার সময়ে গাড়ি কার্মাটারে পৌঁছল। এ স্টেশনে গাড়ি অতি অল্পক্ষণ অপেক্ষা করে। গার্ড হুইস্‌ল্ দিয়েছে, এমন সময়ে বিলাতী-সুট-পরা একজন বাঙালী যুবক ব্যস্ত হয়ে জিনিসপত্র নিয়ে প্রমথদের কামরার সম্মুখে উপস্থিত হ'ল। কামরার ভিতর স্ত্রীলোক দেখে একটু কুণ্ঠার সহিত প্রমথকে উদ্দেশ ক'রে বললে, "উঠতে পারি? কোনো অসুবিধা হবে না তো?"

তাড়াতাড়ি দ্বার খুলে দিয়ে প্রমথ বললে, "কিচ্ছু না। আসুন, আসুন।"

যুবকটি ক্ষিপ্রগতিতে কামরার মধ্যে প্রবেশ করলে, তার পর জিনিসপত্র তুলতে তুলতেই গাড়ি দিলে ছেড়ে। কুলিরা পয়সার জন্য চলন্ত গাড়ির সঙ্গে দৌড়চ্ছিল, যুবকটি তাড়াতাড়ি একটা টাকা বার ক'রে তাদের মধ্যে একজনের হাতে গুঁজে দিলে। তার পর কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে গাড়ির ভিতর চেয়ে দেখতেই চোখোচোখি হয়ে গেল সন্ধ্যার সঙ্গে। আরক্ত মুখে সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিলে।

প্রমথরা যে বেঞ্চে ব'সে ছিল তার প্রান্তদেশে একটা গদি-মোড়া চেয়ার ছিল, চিন্তাগ্রস্ত হয়ে যুবকটি ধীরে ধীরে তার উপর ব'সে পড়ল। কে এ সুন্দরী রমণী যাকে দেখে মনে হ'ল, সে যেন কতদিনকার পরিচিত জন, যেন কোনো এক সময়ে তার সহিত যথেষ্ট জানা শোনা ছিল! কে এ হতে পারে! তার কোনো বহুদূরসম্পর্কীয়া আত্মীয়া, নয় তো যার সহিত দীর্ঘকাল দেখা-শুনা নেই? কিংবা কোনো বন্ধু-বান্ধবের আত্মীয়া, যার সহিত কোনো কালে অল্পদিনের জন্য আলাপ-পরিচয় হবার সুযোগ হয়েছিল? মুখখানা আর একবার ভাল ক'রে দেখবার জন্য যুবকটি সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে, কিন্তু সন্ধ্যা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল ব'লে দেখা গেল না। যথাসম্ভব মুখখানা মানসচক্ষুর সম্মুখে স্থাপিত ক'রে

নিবিষ্ট চিত্তে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ল বছর চারেক আগেকার দেখা একখানা বিস্মৃতপ্রায় মুখ। কিন্তু ইহলোকের সহিত সকলপ্রকার দেনা-পাওনা মিটিয়ে যে চিরদিনের জন্য মহাকালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে, তার স্মৃতি এর সঙ্গে জড়িত ক'রে কোনো লাভ নেই। কত লোকের সহিত কত লোকের আকৃতির সাদৃশ্য থাকে,—এও নিশ্চয় তাই-ই।

কিন্তু কি অদ্ভুত সুন্দর এই অপরিচিতা স্ত্রীলোকের মুখ! আয়তগভীর দুটি স্নিগ্ধ চক্ষের কি অতলস্পর্শী দৃষ্টি! সমস্ত মুখমণ্ডল পরিব্যাপ্ত ক'রে কি অপার্থিব সুষমা! মুহূর্তের জন্য মুখখানি দৃষ্টিপথে প্রতিভাত হয়েছিল, কিন্তু এখনো যেন সুস্পষ্ট রেখায় জলজ্বল করছে। সে যদি আজ বেঁচে থাকত তা হ'লে হয়তো এই রকমই দেখতে হ'ত। একটি তপ্ত শ্বাস যুবকটির অন্তর ভেদ ক'রে বাহিরের বায়ুমণ্ডলে মুক্তিলাভ করলে।

আগন্তুকের জিনিসপত্র ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে গাড়ির মেঝের উপর প'ড়ে ছিল। প্রমথ বললে, "এর পরের স্টেশনে মধুপুর। সেখানে সময় পাবেন। একটা কুলি ডেকে জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে নেবেন।"

আগন্তুক প্রমথর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই করব।"

"কত দূর যাবেন, জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

"আপাতত ফয়জাবাদ। পরে লাহোর হয়ে কাশ্মীর পর্যন্ত যাবার ইচ্ছে আছে।"

প্রমথ বললে, "ফয়জাবাদ যখন যাবেন তখন সমস্ত রাত তো গাড়িতে কাটাতে হবে। উপরের একটা বার্থ খালি আছে। কিছু কিছু জিনিসপত্র রেখে আগে থাকতেই অধিকার ক'রে রাখলে ভাল হয়।"

"ধন্যবাদ। তাই রাখব।"

আগন্তুকের বড় সুটকেসটার উপর লিখিত নামের প্রতি হঠাৎ দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় প্রমথ চমকে উঠল,—ডক্টর পি. এল. চৌধুরী। সুট্‌কেসের ধারের

দিকে পি. অ্যাণ্ড ও. ষ্টীমার কোম্পানির সবুজ আর বাদামী রঙের লেবেল আঁটা। মনে মনে অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে প্রমথ জিজ্ঞাসা করলে, "কিছু মনে করবেন না, আপনিই কি ডক্টর পি. এল. চৌধুরী ?"

সুটকেসের উপর নামের পরিচয় পেয়ে প্রমথ যে এ কথা বলছে তা বুঝতে পেরে আগন্তুক বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই।"

এই ডক্টর পি. এল. চৌধুরী যে প্রিয়লাল চৌধুরী, সে বিষয়ে প্রমথর মনে বিশেষ কিছু সন্দেহ না থাকলেও যেটুকু ছিল তা সন্ধ্যার দিকে দৃষ্টিপাত করতেই মুহূর্তের মধ্যে অপসৃত হ'ল। সন্ধ্যার মুখ জবাফুলের মতো আরক্ত এবং চক্ষের মধ্যে সুতীব্র দৃষ্টির দ্বারা নিষেধের শাসন,—খবরদার কোনো রকম চপলতা ক'রো না।

এ নিষেধের খুব যে বেশি কিছু প্রয়োজন ছিল তা নয়, কারণ প্রমথ সহসা কখনই আত্মপরিচয় প্রদান করত না, কিন্তু ব্যাপারটা এমনই গুরুত্বপূর্ণ যে নিষেধ না ক'রেও সন্ধ্যার নিশ্চিন্ত থাকবার উপায় ছিল না।

ঘটনার অপরূপত্বে এবং আকস্মিকত্বে প্রমথ ক্ষণকালের জন্য বিমূঢ় হয়ে গেল। যে ব্যক্তির চূড়ান্ত অধিকার হতে বিচিত্র ঘটনাবলীর দ্বারা বিচ্যুত ক'রে নিয়ে নিয়তি সন্ধ্যাকে তার জীবনের পরম বস্তু ক'রে দিয়েছে, এবং যে অদেখা অজানা ব্যক্তি এ পর্যন্ত তার পক্ষে পরম কৌতূহলের এবং অবচেতন মনের মধ্যে কতকটা উৎকণ্ঠার বস্তু হয়ে বিরাজ করছে, সেই প্রিয়লালের সহসা বিনা নোটিশে তাদের একান্ত সান্নিধ্যে প্রবেশ এবং দীর্ঘ পথ একত্রে যাত্রার বিজ্ঞপ্তি প্রমথর মতো শক্ত লোককেও প্রথমটা বিহ্বল ক'রে দিলে। কিন্তু সে নিতান্তই অল্পক্ষণের জন্য, অবিলম্বে তার প্রকৃতির সহজ অবিচলতা এবং কৌতুকপ্রিয়তা ফিরে এল।

প্রিয়লালের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে প্রমথ বললে, "দেখুন ডক্টর চৌধুরী, আপনি যাবেন ফয়জাবাদে, আমরা যাচ্ছি লক্ষ্ণৌ—দীর্ঘ পথ একত্র যেতে হবে।

সুতরাং আপনার সঙ্গে আর একটু ঘনিস্টভাবে পরিচিত হবার জন্যে আমার মধ্যে যদি কৌতূহলের পরিচয় পান তা হ'লে সেটা আমার ভারতবর্ষীয় মনের দুর্বলতা মনে ক'রে ক্ষমা করবেন।"

প্রিয়লাল হাসিমুখে বললে, "সেই ভারতবর্ষীয় মন আমারও তো আছে। সুতরাং আমার দিক থেকেও যদি সে রকম দুর্বলতার পরিচয় পান তা হ'লে আপনিও আমায় ক্ষমা করবেন।"

প্রমথ বললে, "শুধু ক্ষমা করব না, সুখী হব। আমাদের বিষয়ে আপনার কোনোরকম কৌতূহল হ'লে তা নিবৃত্ত করতে নিশ্চয়ই চেষ্টা করবেন। ডক্টর চৌধুরী, আমি সংক্ষেপের পক্ষপাতী নই, বিস্তারের পক্ষপাতী। সুতরাং, ধরুন, যদি জানতে পারি যে আপনার নামের পি. এল. ইংরাজী অক্ষর দুটি আদতে বাংলা প্রদ্যুম্নলাল নামের সংক্ষিপ্তসার, তা হ'লে নিশ্চয়ই দুঃখিত হব না, যদিও প্রদ্যুম্নলাল নামটির ব্যবহার বাংলা দেশের চেয়ে বাংলা দেশের বাইরে, মথুরাবৃন্দাবন অঞ্চলেই বেশি দেখতে পাওয়া যায়। ও-নামের সঙ্গে মাছ-ভাতের চেয়ে ডালরুটির যোগটাই বেশি।"

প্রমথর কৌতুকরসাত্মক কথা শুনে প্রিয়লাল হাসতে লাগল; বললে, "কিন্তু আমার নাম প্রদ্যুম্নলাল নয়, আমার নাম প্রিয়লাল।"

প্রমথ বললে, "প্রিয়লাল? তাই পি. এল.। এখন বুঝলাম।"

মৃদু হেসে প্রিয়লাল বললে, "আপনি তো কিছু কিছু পরিচয় আমার পেলেন, এবার নিজের দিন। প্রথমে আপনার নামটি জানতে পারলে সুখী হব।"

প্রমথ বললে, "আমার নাম প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, অর্থাৎ পি. এন.। আপনি পি. এল. আর আমি পি. এন.।"

যে ব্যক্তি পোস্টকার্ডে সন্ধ্যার মৃত্যু-সংবাদ দিয়েছিল তার নামও যে প্রমথ-নাথ মুখোপাধ্যায় সে কথা প্রিয়লালের আদৌ মনে পড়ল না। সে ভীষণ দুঃসংবাদ সে পোস্টকার্ড বহন ক'রে এনেছিল, তার কাছে লেখকের নাম তুচ্ছ

বস্তু; হয়তো ভাল ক'রে প্রিয়লাল সে নাম লক্ষ্যই করে নি, করলেও হয়তো দুদিনেই ভুলে গিয়েছিল। আজ তো সে প্রায় চার বৎসরের কথা হ'ল। মৃদু হেসে সে বললে, "মন্দ হয় নি তো! আমি পি. এল. আর আপনি পি. এন.। মধ্যে একজন পি. এম. এর অভাব। মধুপুরে পেয়ারীমোহন ব'লে কোনো লোক যদি আমাদের কামরায় এসে ওঠে, তা হ'লে আপনার আর আমার মধ্যে যোগটা সম্পূর্ণ হতে পারে।"

প্রমথ সহাস্যমুখে বললে, "আপনার আর আমার মধ্যে যে যোগ নিয়তি ঘটিয়ে দিয়েছে তাই যথেষ্ট। আর পেয়ারীমোহনকে কামনা ক'রে অকারণ ভিড় বাড়াবেন না।"

প্রমথর এ কথার মধ্যে যে কোনো প্রকার দ্বার্থ থাকতে পারে তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ না ক'রে প্রিয়লাল বললে, "ঠিক বলেছেন, স্থানাভাব। আর যোগ বাড়িয়ে কোনো লাভ নেই।"

প্রমথ বললে, "লাভ নেই শুধু নয়, ক্ষতি আছে। তাতে কেবল গোল-যোগই বাড়বে।"

বাক্যের সহজ অর্থের বাইরে না গিয়ে প্রিয়লাল হাসতে হাসতে বললে, "তা সত্যি।"

ট্রেন মধুপুরের নিকটবর্তী হয়ে এসেছিল; শহরের উপকণ্ঠের দুই-একটা বাড়ি দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। সন্ধ্যা জানলার ভিতর দিয়ে বাহিরের দৃশ্যাবলীর উপর তার অন্যমনস্ক মনের অন্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে স্তব্ধ হয়ে ব'সে ছিল। প্রমথ ও প্রিয়লালের কথোপকথনের কিছু কিছু অংশ তার কানে আসছিল, কিন্তু সেদিকে তার বিশেষ মনোযোগ ছিল না। মনের মধ্যে তার এই দুশ্চিন্তা তীব্রভাবে দংশন করছিল যে, মর্মান্তিক হীনতা এবং গ্লানির মধ্যে দিয়ে যে-ব্যক্তির সহিত চিরদিনের মতো সকল সম্পর্ক সকল বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে, তার এই অনীপ্সিত এবং অপরিজ্ঞাত পুনঃপ্রবেশ ভবিতব্যের বিধান না

হয়, এবং নূতন ক'রে নিকৃষ্টতর দুঃখ গ্লানি এবং সমস্যার সৃষ্টি না করে! মনে মনে সন্ধ্যা একান্তভাবে প্রার্থনা করছিল যে, প্রিয়লালকে নিয়ে তার এই তৃতীয় বারের কাহিনী যেন ফয়জাবাদেই নিরুপদ্রবে শেষ হয়।

দেখতে দেখতে ট্রেন মধুপুরের স্টেশনে এসে স্তব্ধ হ'ল। জিনিস-পত্রগুলো গুছিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে প্রিয়লাল একজন কুলি ডাকবার জন্য উদ্যত হতে প্রমথ বাধা দিয়ে বললে, "আর কুলির দরকার নেই, মাধব এসে পড়েছে, ও-ই সব ক'রে দিচ্ছে।" তখন মাধব বড় টিফিন-বাস্কেটটা নিয়ে দ্বার ঠেলে কামরায় প্রবেশ করছে।

প্রিয়লাল বললে, "মাধব তো আপনাদের খাবারের ব্যবস্থা করবে।"

প্রমথ বললে, "খাবারের ব্যবস্থাও করবে, জিনিসের ব্যবস্থাও করবে। সর্বকার্যেষু মাধবঃ।" তার পর মাধবের দিকে চেয়ে বললে, "মাধব, টিফিন-বাস্কেটটা মার জিম্মা ক'রে দিয়ে তুমি সায়েবের জিনিস-পত্রগুলো ঠিক ক'রে গুছিয়ে রেখে দাও।"

টিফিন-বাস্কেটটা সন্ধ্যার কাছে রেখে মাধব এগিয়ে আসতেই প্রিয়লাল উঠে দাঁড়িয়ে মাধবকে সাহায্য করতে উদ্যত হ'ল।

প্রমথ বাধা দিয়ে বললে, "আপনি ব্যস্ত হবেন না ডক্টর চৌধুরী, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে ব'সে ব'সে দেখুন, আমি মাধবকে দিয়ে আপনার সমস্ত জিনিস-পত্র গুছিয়ে দেওয়াচ্ছি। যদি পছন্দ না হয় পাল্টে নেবেন।"

প্রিয়লাল কুণ্ঠিত স্বরে বললে, "না না, পছন্দ হবে না কেন! কিন্তু আপনি কেন অনর্থক—"

প্রমথ বললে, "অনর্থক কিছুই নয় ডক্টর চৌধুরী, সব জিনিসেরই অর্থ আছে—ব্যক্ত কিংবা গূঢ়—আমরা সব সময়ে ধরতে পারি নে।"

প্রিয়লাল বললে, "এখানে কিছু কিছু ধরতে পারা যাচ্ছে।"

প্রমথর দৃষ্টি ছিল মাধবের প্রতি এবং কান ছিল প্রিয়লালের প্রতি; বললে,

"না না, ও হ'ল'না মাধব, হোল্ডল থেকে বিছানা বার ক'রে একেবারে পেতে দাও। অধিকার বিস্তার ক'রে রাখা ভাল।" তার পর প্রিয়লালের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "ধরতে পারা যাচ্ছে ডক্টর চৌধুরী?"

প্রিয়লাল বললে, "ধরতে পারা যাচ্ছে যে, আপনি যে রকম ক'রেই হোক বুঝেছেন যে, আমি একটি মহা অপটু লোক, আর তাই বুঝে আপনার করুণার উদ্রেক হয়েছে।"

প্রমথ একটু হেসে বললে, "ঠিক তা নয় ডক্টর চৌধুরী, আপনি হচ্ছেন সেই শ্রেণীর লোক সৌভাগ্য যাদের ব্যবস্থা আগে থাকতে ক'রে রাখে। এমন তো কত লোক নিয়ত ট্রেন ফেল করছে, কিন্তু প্রিয়লাল-শ্রেণীর লোকদের জন্যে প্রমথনাথ-শ্রেণীর লোকেরা সর্বদা হাজির থাকে এবং ট্রেন ছাড়বার হুইসল্ দিলে প্রিয়লাল-শ্রেণীর লোকেরা প্ল্যাট্‌ফর্মে দাঁড়িয়ে যখন অবান্তর কথা তোলে তখন প্রমথনাথ-শ্রেণীর লোকেরা তাড়াতাড়ি গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে তাদের পথ ক'রে দেয়।"

প্রমথর কথা শুনে প্রিয়লাল হাসতে লাগল; বললে, "এ কথা কিন্তু ঠিক বলেছেন।"

ট্রেন ছাড়বার সময় হয়ে এসেছিল। মাধব বললে, "মা, খাবার তো দেওয়া হ'ল না?"

সন্ধ্যা বললে, "আমি দেব অখন, তুমি যাও।"

গার্ডের হুইসল্ শুনে মাধব তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে দৌড় দিলে।

প্রিয়লাল বললে, "দেখুন মিস্টার মুখার্জি, মাধবকে দিয়ে আমার জিনিস-পত্র গোছানোতে আপনাদের অসুবিধেয় পড়তে হ'ল।"

প্রমথ বললে, "কিছু অসুবিধেয় পড়তে হয় নি। যিনি ভার নিলেন, দেখবেন, তিনি সুচারুরূপে কার্য সমাধা করবেন।"

"মিস্টার মুখার্জি!"

"আজ্ঞে ?"

ঈষৎ নিম্নস্বরে প্রিয়লাল বললে, "উনি নিশ্চয়ই মিসেস্ মুখার্জি—অর্থাৎ আপনার স্ত্রী ?"

এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে একটু চিন্তা ক'রে মৃদু হেসে প্রমথ বললে, "কেন ? আপনার কি অন্য রকম মনে করবার কোনো কারণ ঘটেছে ?"

ব্যস্ত হয়ে প্রিয়লাল বললে, "না না, নিশ্চয় নয়। আমিও তাই অনুমান করেছিলাম।" প্রমথর উক্তি যে 'ইতি গজ' সে কথা মনে করবার কোনো কারণই তার ছিল না।

প্রমথ বললে, "আসুন, আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।" তার পর সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "উষা, আপাতত আমাদের ক্ষণিকের অতিথি—ডক্টর প্রিয়লাল চৌধুরী।"

সন্ধ্যা প্রিয়লালের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে যুক্ত কর উত্তোলন ক'রে বললে, "নমস্কার।"

সাগ্রহে প্রিয়লাল বললে, "নমস্কার মিসেস্ মুখার্জি, নমস্কার।"

কিন্তু দ্বিতীয়বার পরিপূর্ণভাবে সন্ধ্যার মুখ নিরীক্ষণ ক'রে প্রিয়লাল পুনরায় গভীরভাবে চমকিত হ'ল। দুশ্ছেদ্য যবনিকার অন্তরাল ভেদ ক'রে মনে পড়ল পরলোকবাসিনী অভাগিনী সন্ধ্যার মুখ।

তার পর বারম্বার মিসেস্ মুখার্জির মুখ দেখতে দেখতে ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে আসতে লাগল সন্ধ্যার মুখের স্তিমিত স্মৃতি। অবশেষে এমন হ'ল যে, মনে মনে সন্ধ্যার মুখ মনে করতে গেলে তৎস্থলে ভেসে ওঠে মিসেস্ মুখার্জির মুখ। প্রদীপ্ত সূর্যকরে নিমজ্জিত হয়ে গেল দুর্বল দীপশিখা।

পঁয়ত্রিশ

প্রমথ এবং প্রিয়লালের মধ্যে কথোপকথন জ'মে উঠেছিল। সন্ধ্যা প্রমথর দিকে মুখটা একটু এগিয়ে নিয়ে গিয়ে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলে, "এখন খাবার দোব?"

সন্ধ্যার দিকে ফিরে চেয়ে প্রমথ তেমনি মৃদুস্বরে বললে, "দাও।" তার পর প্রিয়লালের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, "ডক্টর চৌধুরী, সামান্য একটু খাবার দিলে আশা করি আপত্তি করবেন না?"

প্রমথর প্রস্তাব শুনে প্রিয়লাল ব্যস্ত হয়ে পড়ল; বললে, "না না, মিস্টার মুখার্জি, অনেক উপদ্রব আপনাদের ওপর করেছি,—তার ওপর খাবারেও ভাগ বসাতে চাই নে।"

মাথা নেড়ে সহাস্যমুখে প্রমথ বললে, "ভুল, ডক্টর চৌধুরী, আপনার ভুল। এত সহজে কেউ কারো জিনিসে ভাগ বসাতে পারে না, যতক্ষণ না ভাগ্য নিজে তার ব্যবস্থা করে।"

প্রিয়লাল বললে, "ভাগ্য এতটা করতে পারে ব'লে আপনি মনে করেন মিস্টার মুখার্জি?"

প্রমথ বললে, "নিশ্চয় মনে করি। ভাগ্য যখন প্রসন্ন হয় তখন আর সীমা-পরিসীমা থাকে না, একেবারে অখিল ভ'রে দিয়ে যায়,—তখন ফকিরকে বানিয়ে দেয় আমীর।"

প্রমথর কথা শুনে প্রিয়লালের মুখমণ্ডলে দুঃখের একটা ক্ষীণ ছায়াপাত হ'ল; বিষণ্ণ মুখে সে বললে, "ভাগ্যকেও সব সময়ে খুব নিরাপদ বন্ধু ব'লে মনে করবেন না মিস্টার মুখার্জি। সে যখন বিরূপ হয়, তখন সর্বস্ব অপহরণ ক'রে আমীরকে ফকির বানিয়েও ছাড়ে!"

প্রমথ বললে, "কিন্তু সে ভাগ্য নয়, দুর্ভাগ্য।"

প্রিয়লাল বললে, "দুর্ভাগ্য সৌভাগ্যেরই বৈমাত্র ভাই। ওরা দুজনে পাশাপাশি বাস করে, আর কে যে কখন আমাদের কাঁধে সওয়ার হয় তা কিছুই বলা যায় না। কিন্তু সে যাই হোক, এখনো আমার খাবার সময় হয় নি, অনেক বেলায় আজ খেয়েছি।"

মাথা নেড়ে প্রমথ বললে, "তা হ'লে 'খাবার সর্বোৎকৃষ্ট সময় কখন, সে বিষয়ে জগতের একজন অতি বিচক্ষণ লোকের উপদেশ কি তা আপনি নিশ্চয় জানেন না।"

প্রিয়লাল সহাস্যমুখে বললে, "না, তেমন তো কিছু জানি ব'লে মনে পড়ছে না।"

প্রমথ বললে, "তাঁর উপদেশ, খাবারটা যদি নিজের পয়সায় হয় তা হ'লে যখন ক্ষিদে পাবে তখন, আর যদি পরের পয়সায় হয় তা হ'লে যখনই হাতে পাওয়া যাবে তখন।"

আহারের সর্বোৎকৃষ্ট সময়ের সূত্র শুনে প্রিয়লাল হাসতে লাগল; বললে, "তা হ'লে আপনার বিচক্ষণ লোকের উপদেশই পালন করব। অসময়ে না খেয়ে প্রমাণ করব যে, আপনারা আমার পর নন, আপনার।"

এই অসংশয়িত পরিহাস-বাণীর মধ্যে দৈবক্রমে যে মর্মন্তুদ সত্য প্রচ্ছন্ন ছিল তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত থেকে প্রিয়লাল হাসতে লাগল; কিন্তু কমলানেবুর খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে সন্ধ্যার চক্ষু সজল হয়ে এল এবং কৌতুক-বাক্যের সফেন জলরাশির মধ্যে সহসা নির্মল সত্যের কঠিন পাথর দেখতে পেয়ে প্রমথ নির্বাক হয়ে গেল। ট্রেন তখন রোহিণীর লেভেল ক্রসিঙের উপর দিয়ে শড়াক শড়াক শব্দে দ্রুতবেগে অদূরবর্তী জসিডি স্টেশনের অভিমুখে ধাবিত হচ্ছে।

প্রমথকে নিরুত্তর থাকতে দেখে প্রিয়লাল সহাস্যমুখে বললে, "কি

মিস্টার মুখার্জি; নিজের জালে নিজেই ধরা পড়লেন না-কি? মুখে কথা নেই যে!”

শুনে প্রমথ নিজের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে হাসতে লাগল; বললে, “ধরা প’ড়ে যদি এই প্রমাণ ক’রে থাকি যে, আপনি আমাদের পর নন, আপনার,—তা হ’লে ধরা পড়ার জন্যে একটুও দুঃখিত নই। কিন্তু আপনি যে আমাদের আপনার, তার এই সামান্য প্রমাণ পেয়েই সন্তুষ্ট, থাকব না ডক্টর চৌধুরী, এর খুব জোরালো রকমের প্রমাণ ভবিষ্যতে আপনাকে দিতে হবে।”

“কিন্তু প্রমাণের দায়িত্ব আপনারা তো আমার উপর দিচ্ছেন না, প্রমাণ তো আপনাদেরই দিক থেকে আসছে।” ব’লে প্রিয়লাল হাসতে লাগল।

প্রিয়লালের পিছন দিকে ইঙ্গিত ক’রে প্রমথ বললে, “ফিরে দেখুন, পিছন দিক থেকেও আসছে।”

পশ্চাতে দৃষ্টিপাত ক’রে প্রিয়লাল দেখলে, দুই হাতে দুটি খাবারের প্লেট নিয়ে সন্ধ্যা উঠে দাঁড়িয়েছে। একটিতে ফল এবং মিষ্ট,—অপরটিতে কচুরি চপ কাটলেট প্রভৃতি নোনতা খাবার। তাড়াতাড়ি সন্ধ্যার হাত থেকে প্লেট নিয়ে প্রিয়লাল বললে, “এ দুটি নিশ্চয়ই আপনার স্বামীর জন্যে মিসেস মুখার্জি?”

নিমেষের জন্য দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলিত হ’ল, কিন্তু পর-মুহূর্তেই দৃষ্টি অবনত ক’রে সন্ধ্যা বললে, “না, এ আপনার জন্যে।”

“আমার জন্যে? কিন্তু আমি তো—” সন্ধ্যার বিরুদ্ধে ঠিক কি প্রতিবাদ করবে ভেবে না পেয়ে প্রিয়লাল তার কথার মধ্যে অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় থেমে গেল।

উঠে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যার হাত থেকে খাবারের আরো দুখানা প্লেট নিয়ে প্রমথ

বললে, "উচ্চ আদালতে আপনার মামলা টি'কল না ডক্টর চৌধুরী, অতএব খাবারের সদ্ব্যবহার করুন।"

চিন্তিতমুখে প্রিয়লাল বললে, "টি'কল না তা তো বুঝতে পারছি, কিন্তু—"

"কিন্তু কি ?"

প্রমথর প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে প্রিয়লাল বললে, "আপনার খাবার তো দেখছি নে মিসেস মুখার্জি ? নিজের খাবারটাই বুঝি আমাকে দিলেন ?"

ঘাড় নেড়ে সন্ধ্যা বললে, "না, খাবার যথেষ্ট আছে।"

"তবে এখন আপনি নিলেন না কেন ?"

"পরে নোব অখন।"

"কিন্তু সে রকম ইচ্ছে তো আমারও ছিল মিসেস মুখার্জি, তবে আমাকেই বা এখন কেন দিলেন ?"

এ কথার উত্তর দিলে প্রমথ, বললে, "হয়তো ওঁদের মেয়েলী শাস্ত্রের নিগূঢ় কোনো কারণে, হয়তো অতিথি সৎকারের নিয়মে অতিথিকে খাওয়ানো শেষ হওয়া পর্যন্ত অভুক্ত থাকলে পুণ্যের অঙ্কটা একটু বেশি ফুলে ওঠে।"

প্রিয়লাল বললে, "কিন্তু অতিথি সৎকারের উদ্দেশ্য যদি অতিথিকে আনন্দ দান করাই হয়, তা হ'লে আমার মনে হয় অভুক্ত না থাকলেই বেশি ফোলে।"

প্রমথ বললে, "অন্তত আমাদের পুরুষদের শাস্ত্রমতে তো সেই কারণেই ফোলা উচিত।"

সমস্যার সমাধান হ'ল জসিডি স্টেশনে। গাড়ি থামতেই মাধব ছুটে এল, তার পর গাড়ির ভিতর দৃষ্টিপাত ক'রেই বললে, "মা, প্লেট তো কম পড়ছে, আর দুখানা প্লেট এনে দিই ?"

সন্ধ্যা বললে, "দুখানার দরকার নেই, একখানা নিয়ে এস, তা হলেই হবে।"

প্রমথ বললে, "ব্যাপারটা তা হ'লে এতক্ষণে বোঝা গেল ডক্টর চৌধুরী।"

প্রিয়লাল বললে, "কিন্তু এ কথা একটুও বোঝা গেল না যে, ওঁর যখন একখানা প্লেটেই চলে, তখন চারখানা প্লেটের মধ্যে তিনখানাতে আমাদের তিন জনের কেন চলত না!"

প্রমথ বললে, "ওঁদের বোধ হয় এই রকম কিছু ধারণা আছে যে, নিজেদের একখানা ক'রে প্লেট নিতে হ'লে আমাদের দু'খানা ক'রে না দিলে সৌজন্যের ত্রুটি হয়। ওঁদের সঙ্গে আমাদের রেশিয়োটা অন্তত ওয়ান্ টু টু হওয়া উচিত ব'লে ওঁরা বোধ হয় মনে করেন।"

প্রমথর কথা শুনে প্রিয়লাল হাসতে লাগল; বললে, "সত্যিই তাই।" তার পর সন্ধ্যার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে সবিনয়ে বললে, "আমার অনধিকার-চর্চা ক্ষমা করবেন মিসেস মুখার্জি, কিন্তু এর জন্য প্রধানত আপনারাই দায়ী। পুরুষদের সুবিধার জন্য নিজেদের বঞ্চিত ক'রে ক'রে আপনারা আমাদের এত ডিমরালাইজ্‌ড্ ক'রে দিয়েছেন যে, স্বেচ্ছায় আপনারা যা আমাদের দান করছেন তা আমরা আমাদের ন্যায্য পাওনা ব'লে মনে করি। আপনাদের আত্মসঙ্কোচকে আমরা আপনাদের অধিকার করবার শক্তির খর্বতা ব'লে ধ'রে নিই।"

প্রমথ বললে, "কিন্তু স্থলবিশেষে ওঁদের আবার এমন আত্মস্ফীতি আছে যে, তার মধ্যে গোটা দশ-বারো আত্মসঙ্কোচ ডুব মারতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, ওঁর কানের অলঙ্কারের একখানার দামে আমার ঘড়ি চেন আংটি বোতাম অন্তত দশ সেট কেনা যেতে পারে। অপরাপর অলঙ্কারের কা কথা!"

প্রিয়লাল বললে, "কিন্তু বাঙালী মেয়ের গহনা তো অধিকাংশ স্থলেই 'রিজার্ভ ফাণ্ড, যা সংসারের সঙ্কটের সময়ে কাজে লাগে।"

প্রমথ বললে, "সে হয়তো কখনো কোনোদিন লাগলে পারে, কিন্তু সেই রিজার্ভ ফাণ্ডকে পুষ্ট করতে নিত্যকার কারেণ্ট অ্যাকাউণ্ট এত বিশীর্ণ

হয়ে ওঠে যে, সংসারের খরচ চালানোই দুষ্কর হয়। কিন্তু এ প্রসঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে উপস্থিত আমরা আহারে মন দিতে পারি, কারণ মাধব দু-খানা প্লেটই দিয়ে গেছে, সুতরাং প্লেট-সঙ্কোচের কোনো অভিযোগ এখন আর নেই।"

প্রমথর কথা শুনে প্রিয়লাল হাসতে লাগল ; বললে, "মাধবকে ধন্যবাদ।"

শিমূলতলা থেকে গাড়ি হুড় হুড় ক'রে ঝাঝার দিকে নেমে চলেছিল। উভয় পার্শ্বে তরুগুল্মমণ্ডিত ঘননিবদ্ধ পর্বতশ্রেণী, মাঝখান দিয়ে সঙ্কীর্ণ রেলপথ অতিকায় সরীসৃপের মতো এঁকেবেঁকে চ'লে গেছে। কিছু পূর্বে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় সমস্ত গাছপালা একটা আর্দ্র স্নিগ্ধ মূর্তি ধারণ করেছে। প্রিয়লাল, প্রমথ এবং সন্ধ্যা প্রকৃতির এই অপূর্ব স্তিমিত সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে ছিল। দেখতে দেখতে গাড়ি এসে ঝাঝা স্টেশনে দাঁড়াল।

ত্রিশ-বত্রিশ বৎসর বয়সের একজন আরোহী যুবক কুলির মাথায় সুটকেস এবং বেডিং চাপিয়ে ঈষৎ বিবর্ণ মুখে ইণ্টার ক্লাসের দিকে চলেছিল, হঠাৎ প্রমথর উপর দৃষ্টি পড়ায় থমকে দাঁড়াল, তার পর নিকটবর্তী ইণ্টারক্লাস কামরায় তাড়াতাড়ি জিনিস-পত্র রেখে কুলির পয়সা চুকিয়ে দিয়ে আবার ফিরে এল প্রমথর গাড়ির সম্মুখে। ভাল ক'রে প্রমথকে নিরীক্ষণ ক'রে গাড়ির কাছে এসে বললে, "প্রমথ না?"

যুবকের দিকে তাকিয়ে দেখে ঔৎসুক্যভরে প্রমথ বললে, "প্রমথই। কিন্তু আমি তো ঠিক—" তার পর সহসা উল্লসিত হয়ে জানলা দিয়ে যুবকের প্রতি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে, "আরে, আরে সুরেশ যে! কতদিন পরে তোর সঙ্গে দেখা রে সুরেশ!"

সুরেশ প্রমথর হাত নিজ হাতের মধ্যে ধারণ ক'রে স্মিতমুখে বললে, "তা হ'লে চিনতে পেরেছিস? আমি ভেবেছিলাম হয়তো চিনতেই পারবি নে।"

প্রমথ বললে, "এমন কিছু অন্যায় ভাবিস নি। সেই তো বি. এ. পরীক্ষার

পর ছাড়াছাড়ি, তার পর এই বারো-তেরো বছর আর দেখা নাই। কোথায় যাচ্ছিস ?”

“মুঙ্গের।”

“মুঙ্গের ? তবে তো এ গাড়িতে মোটে কিউল পর্যন্ত। উঠে আয় না, গল্প করতে করতে যাই।”

মৃদু হেসে সুরেশ বললে, “আমি লাল টিকিটের যাত্রী, আমাকে এ গাড়িতে উঠতে দেবে কেন ? তার চেয়ে তুই আয় না আমার গাড়িতে। তার পর সন্ধ্যার দিকে দৃষ্টিপাত ক’রে বললে, “মেয়েরা আছেন, অসুবিধে হবে হয়তো, থাক্ না হয়।” ট্রেনের পিছন দিকে দেখে প্রমথর হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, “গাড়ি ছাড়বার সময় হয়েছে, চললাম প্রমথ।”

ব্যস্ত হয়ে প্রমথ বললে, “দাঁড়া সুরেশ, আমিও যাচ্ছি।” তার পর সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে বললে, “সুরেশের সঙ্গে একটু গল্প করতে চললাম ঊষা।” প্রিয়লালকে বললে, “আপনারা গল্প-টল্প করুন ডক্টর চৌধুরী, কিউলে ফিরে এসে ভাল ক’রে গল্প জমানো যাবে।” তার পর গাড়ির দরজা খুলে লাফিয়ে প’ড়ে ছুটে গিয়ে যখন সুরেশের পিছনে পিছনে ইণ্টার ক্লাসে উঠে পড়ল, তখন ট্রেন চলতে আরম্ভ করেছে।

উদ্বিগ্নচিত্তে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সন্ধ্যা দেখছিল, প্রমথ নির্বিঘ্নে গাড়িতে উঠতে পারে কি-না। প্রমথ গাড়িতে প্রবেশ করলে সে মুখ ভিতরে ক’রে নিয়ে সোজা হয়ে বসল।

প্রিয়লাল বললে, “কি চমৎকার মানুষ আপনার স্বামী মিসেস মুখার্জি! এই অল্পক্ষণের মধ্যে আমাকে এমন আপনার ক’রে নিয়েছেন যে, আমার মনে হচ্ছে, আপনারা আমার একটুও পর নন, পরম আত্মীয়। এমন সহৃদয় মিশুক লোক জীবনে আমি আর একটি দেখি নি! আমার লাহোর যাওয়ার

পথে এইবারই আমাকে লক্ষ্ণৌয়ে আপনাদের বাড়িতে কয়েকদিন কাটিয়ে যাবার জন্যে এর মধ্যে তিনবার অনুরোধ করেছেন। আপনি তার কিছু শুনতে পেয়েছিলেন ?"

সন্ধ্যা বললে, "হ্যাঁ, কিছু কিছু শুনতে পাচ্ছিলাম।"

প্রিয়লাল বললে, "এবার হবে না, তাড়া আছে; কিন্তু কাশ্মীর থেকে ফেরবার পথে একদিনের জন্যে আপনাদের দর্শন ক'রে যাব।"

এ কথার উত্তরে সন্ধ্যা কোনো কথা বললে না, শুধু ক্ষণিকের জন্য একবার প্রিয়লালের মুখের উপর দৃষ্টিপাত ক'রে চুপ ক'রে রইল। তার পক্ষ হতে যথোচিত আগ্রহ এবং সহযোগিতার অভাবে কথোপকথন ভাল ক'রে অগ্রসর হতে পারছিল না; অগত্যা প্রিয়লালকেও চুপ করতে হ'ল। সন্ধ্যার স্তব্ধ মূর্তি এবং স্বল্পভাষিতা লক্ষ্য ক'রে তাকে স্বভাবত লাজুক এবং গম্ভীরপ্রকৃতির স্ত্রীলোক ব'লেই প্রিয়লালের মনে হয়েছিল; তা ছাড়া, এ কথাও সে মনে মনে বিচার ক'রে দেখলে যে, তার সহিত সন্ধ্যার পরিচয়ই বা কতটুকু এবং সে পরিচয়ের ভিত্তিই বা কি এমন, যাতে ক'রে তার সহিত নিরবচ্ছিন্ন কথোপ-কথন চালানো সন্ধ্যার পক্ষে অসুবিধাজনক মনে না হতে পারে। নিজের দিক থেকেও সে ভেবে দেখলে যে, আত্মীয়তার অতিরিক্ত মনোযোগ প্রয়োগ শুধু অনাবশ্যকই নয়, সুরুচি-বিগর্হিতও।

গাড়ি তখন গিধৌড় স্টেশন ছেড়ে জামুইয়ের দিকে ছুটে চলেছিল, প্রিয়লাল তার এটাসি কেস্ থেকে একখানা ইংরাজী ম্যাগাজিন বার ক'রে একটা অর্ধ-সমাপ্ত প্রবন্ধে মনোনিবেশ করলে।

কিন্তু মৌবনের এরূপ পাকাপাকি অবস্থাও সন্ধ্যার নিকট বেশ স্বাভাবিক অথবা শোভন মনে হ'ল না;—বিশেষত সে যখন বুঝলে যে, এ মৌনের জন্য একমাত্র তার নিস্পৃহতার আচরণই দায়ী। প্রিয়লাল না হয়ে অপর কোনো ব্যক্তি হ'লে এ অবস্থায় যে একটা সহজ সাধারণ কথাবার্তার ধারা চলত,

সে কথা মনে হওয়া মাত্র সন্ধ্যা নিজেই কথা আরম্ভ করলে; বললে, "মিস্টার চৌধুরী, কতদিন আপনি কাশ্মীরে থাকবেন?"

সন্ধ্যার কথা শুনে প্রিয়লাল বইখানা মুড়ে বেঞ্চের উপর রাখলে, তার-পর সন্ধ্যার দিকে ফিরে ব'সে বললে, "ইচ্ছে আছে মাস দুই থাকব। ফিরতে কিন্তু মাস তিনেকের কম হবে না।" তার পর সহসা আগ্রহের সহিত বললে, "মিসেস মুখার্জি, চলুন না আপনারা দুজনে আমার সঙ্গে কাশ্মীর ভ্রমণে। অনুগ্রহ ক'রে যদি যান তা হ'লে কাশ্মীর-ভ্রমণটা কি যে আনন্দের হয়, তা রেল-পথের এইটুকু অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পারছি। যাবেন?"

মৃদু হেসে সন্ধ্যা বললে, "সম্ভব হবে ব'লে তো মনে হচ্ছে না।"

"কেন? সম্ভব হবে না কেন?"

একটু ইতস্তত ক'রে মাথা নেড়ে তেমনি মৃদু হেসে সন্ধ্যা বললে, "না, বোধ হয় হবে না।"

আর অনুরোধ ক'রে বিশেষ কোনো ফল নেই বুঝতে পেরে ক্ষুণ্ণকণ্ঠে প্রিয়লাল বললে, "হ'লে কিন্তু ভারি খুসি হ'তাম।" তার পর একটু চুপ ক'রে থেকে হঠাৎ বললে, "মিসেস মুখার্জি, সময়ে সময়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের আকৃতির অদ্ভুত মিল থাকে, এ আপনি জানেন?"

প্রিয়লালের এ প্রশ্নের গতি কোন্ দিকে অগ্রসর হবে তা বুঝতে পেরে সন্ধ্যা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল; বললে, "শুনেছি, থাকে।"

প্রিয়লাল বললে, "সত্যিই থাকে। আমার একটি আত্মীয়ার সঙ্গে আপনার আকৃতির এমন অদ্ভুত মিল আছে যে, মৃত্যু যদি মনে করবার পক্ষে বাধা না হ'ত তা হ'লে মনে করতাম, আপনিই তিনি।"

নিরুদ্ধ নিশ্বাসে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "মৃত্যু বাধা কেন?"

প্রিয়লাল বললে, "মৃত্যু বাধা এই জন্যে যে, আমি যাঁর কথা মনে করছি বছর চারেক হ'ল তাঁর ইহলোকের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে।"

প্রিয়লালের কথা শুনে সন্ধ্যার বিস্ময়ের অবধি রইল না। দ্বিধাজড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, "মারা গেছেন তিনি? কি হয়েছিল তাঁর?"

একটু ইতস্তত ক'রে প্রিয়লাল বললে, "কাশীতে তাঁর একজন আত্মীয়ের কাছে ছিলেন, সেইখানে কলেরা হয়ে মারা যান।"

সন্ধ্যা বুঝতে পারলে, বিশেষ কোনো অভীষ্ট সাধনের জন্য কেউ প্রিয়লালকে মিথ্যা মৃত্যু-সংবাদ দিয়েছিল, এবং এখনো প্রিয়লাল জানে যে সন্ধ্যা জীবিত নেই। এ কথা জানতে পেরে সে মনে মনে অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'ল।

"মিস্টার চৌধুরী!"

"আজ্ঞে?"

"আপনাকে এখন চা দেব কি? ফ্লাস্কে গরম চা আছে।"

ধীরে ধীরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ ক'রে প্রিয়লাল বললে, "এখন থাক্, কিউলে মিস্টার মুখার্জি এলে একসঙ্গে খাওয়া যাবে অখন।"

কিন্তু আধ ঘণ্টাটাক পরে গাড়ি যখন কিউল স্টেশনে পৌছল তখন সহসা এমন একটা গুরুতর ব্যাপার উপস্থিত হ'ল, যার জন্য চা খাওয়ার কথা কারও মুহূর্তের জন্য মনেও পড়ল না, আসন্ন বিপদের ঘন ছায়াপাতে সকলের মন তমসাবৃত হয়ে গেল।

সন্ধ্যাদের গাড়ির সামনে উপস্থিত হয়ে বিশুষ্ক মুখে প্রমথ বললে, "সর্বনাশ হয়েছে উষা।"

সন্ত্রস্ত হয়ে উদ্বিগ্নমুখে সন্ধ্যা বললে, "কি হয়েছে?"

"সুরেশের কলেরা হয়েছে।"

"ওমা, সে কি কথা!"

"ঝাঝাতেই রোগের সূত্রপাত হয়। ওদের পাড়ায় কলেরা হচ্ছিল, দুবার দাস্ত হতেই ও ভয় পেয়ে মুঙ্গেরের জন্যে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু এই ঘণ্টা খানেকের মধ্যে রোগ এত বেড়ে গেছে যে, সুরেশ বাঁচবে ব'লে আমার ভরসা

হয় না। এরই মধ্যে নাড়ী ছেড়ে এসেছে, গলা ভেঙে গেছে। কুলির জিম্মায় প্ল্যাট্‌ফর্মের একটা লুকোনো জায়গায় তাকে শুইয়ে রেখে এসেছি, রেলের লোক জানতে পারলে আর গাড়িতে উঠতে দেবে না। কোনো রকমে এখন মুঙ্গেরে ওকে পৌঁছে দিতে পারলে বুঝি।"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "তুমি ওঁর সঙ্গে যাবে না-কি?"

"তা না গেলে আর কে যাবে বল? আর কি কেউ আছে?"

"না, তা কিছুতে হবে না, তুমি যেতে পাবে না। অন্য কোনো ব্যবস্থা কর।"

ভর্ৎসনার স্বরে প্রমথ বললে, "ছিঃ উষা! এ কি কথা বলছ! জীবনটা তুচ্ছ নয় বটে, কিন্তু তাই ব'লে এত বড়ও নয় যে, এই বিপদে সুরেশকে পরিত্যাগ করতে পারব।"

"মুঙ্গেরের গাড়িতে তুলে দিলে উনি যেতে পারবেন না?"

"ওর অবস্থা দেখলে এ কথা আর জিজ্ঞাসা করতে না। ও কি পুরোপুরি বেঁচে আছে, এখন সে আধ মরা মানুষ। হয়তো মুঙ্গের পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। হাত জোড় ক'রে আমার মুখের দিকে করুণভাবে তাকিয়ে যখন বললে, 'ভাই প্রমথ, মুঙ্গেরে গিয়ে অন্তত যাতে স্ত্রী পুত্র-পরিবারের সামনে মরতে পারি দয়া ক'রে এইটুকু ক'রে দাও,' তখন বুকখানা যেন ফেটে গেল।" প্রমথর চক্ষু সজল হয়ে এল।

সন্ধ্যা দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "তাড়াতাড়ি জিনিস-পত্তর নামাও, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে প্রমথ বললে, "কি বলছ উষা? তুমি আমার সঙ্গে যাবে? তাতে সুবিধে তো কিছুই হবে না, অত্যন্ত অসুবিধেই হবে। ছেলে-মানুষি ক'রো না, তা কিছুতেই হতে পারে না।" তার পর প্রিয়লালের দিকে তাকিয়ে বললে, "ডক্টর চৌধুরী, এ বিপদে আপনার কাছ থেকে যতটুকু

সাহায্য পাওয়া দরকার, আশা করি তা পাব। উষার সঙ্গে আপনি লক্ষ্ণৌ পর্যন্ত যাবেন এবং আমি না ফেরা পর্যন্ত আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন।"

প্রিয়লাল মাথা নেড়ে বললে, "এ আমি নিশ্চয় করব; আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

প্রমথ বললে, "আমার জন্যে ভেবো না উষা, আমি সাবধানে থাকব। পরশু কোনো সময় আমি লক্ষ্ণৌ পৌঁছব। আমার না যাওয়া পর্যন্ত ডক্টর চৌধুরীকে কিছুতেই ছেড়ো না।"

গাড়ির সামনে এসে মাধব দাঁড়িয়ে ছিল, সন্ধ্যা বললে, "মাধব, শীগগির ভেতরে এস।" মাধব ভিতরে এলে তাড়াতাড়ি একটা স্যুটকেসে কতকগুলো প্রয়োজনীয় জিনিস ভ'রে দিয়ে মাধবকে বললে, "মাধব, তুমি বাবুর সঙ্গে বরাবর থাকবে।"

প্রমথ বললে, "আঃ, মাধব আবার কেন?"

সন্ধ্যা বললে, "না, নিশ্চয়ই মাধব তোমার সঙ্গে যাবে। মাধবের মতো একজন চালাক লোক তোমার সঙ্গে থাকলে তোমার সুবিধে হবে, অসুবিধে হবে না।"

প্রমথ আর কোনো আপত্তি করলে না। গাড়ির ঘণ্টা পড়েছিল, মাধব তাড়াতাড়ি নেবে গেল। সন্ধ্যার টিকিটটা প্রিয়লালের হাত দিয়ে প্রমথ বললে, "যা বললাম, মনে রেখো প্রিয়লাল। আমি না যাওয়া পর্যন্ত চ'লে যেয়ো না ভাই।"

বিপদের চরম মুহূর্তে এক আকস্মিক আত্মীয়তার সম্বোধনে হর্ষান্বিত হয়ে তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে প্রমথর হাত ধ'রে প্রিয়লাল বললে, "নিশ্চয়ই তোমার জন্যে অপেক্ষা করব।"

গাড়ি ছেড়ে দিলে। যতক্ষণ প্রমথকে দেখা গেল সন্ধ্যা ও প্রিয়লাল

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তাকে দেখতে লাগল। অদৃশ্য হ'লে মুখ ভিতরে ক'রে নিয়ে তারা সোজা হয়ে বসল।

প্রিয়লাল বললে, "মিসেস মুখার্জি, আপনার স্বামী একজন উদার ব্যক্তি তা পূর্বেই বুঝেছিলাম, কিন্তু এত মহৎ তা জানতাম না।"

সন্ধ্যা একটু পিছন ফিরে ব'সে ছিল, কোনো উত্তর দিলে না। প্রমথর জন্য মনটা উদ্বেল হওয়ায় সে কথা কইতে পারছে না বুঝতে পেরে প্রিয়লালও আর কিছু বললে না।

গাড়ি তখন লক্ষ্মীসরাইয়ের পুলের উপর দিয়ে মহা কলরব করতে করতে ছুটে চলেছিল।

ছত্রিশ

রাত্রি গভীর। বেনারস ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট স্টেশন ছাড়িয়ে এসে ট্রেন তখন শিউপুরের প্রান্তর ভেদ ক'রে হু-হু শব্দে ছুটে চলেছে। একটা দুঃস্বপ্ন দেখে সন্ধ্যার ঘুম ভেঙে গেল। প্রথম দু-চার সেকেণ্ড নিদ্রা ও স্বপ্নের প্রভাব কাটিয়ে নিজের যথার্থ অবস্থা এবং অবস্থান নির্ণয় করতে কাটল, তার পর পাশ ফিরে তাকিয়ে দেখলে, বেঞ্চের উপর বেণ্টলি নেই, অগোচরে কখন কোন্‌ স্টেশনে জিনিসপত্র নিয়ে নেবে গেছে। অপর দিকের বেঞ্চে প্রিয়লাল শুয়ে আছে—সম্ভবত নিদ্রিতই। তারা দুজন ব্যতীত সে কামরায় তৃতীয় ব্যক্তি আর কেউ নেই।

চিন্তামগ্ন অবস্থায় কিছুক্ষণ সন্ধ্যা স্তব্ধ হয়ে প'ড়ে রইল। ভাবতে ভাবতে এক সময়ে সত্যিই তার মনে মনে হাসি পেল। আশ্চর্য! এও হয়! সময়ে সময়ে অদৃষ্টকে যখন খেয়ালে পেয়ে বসে, তখন বোধ হয় এই রকমই হয়। Truth is stranger than fiction ব'লে ইংরেজীতে একটা যে কথা আছে, তা হ'লে সব সময়ে তা মিথ্যে নয়! সাধারণ পরিবারের একজন সাধারণ মেয়ে সে; সাধারণ ভাবে জীবন অতিবাহিত করবে, মনে মনে এই কথাই জানত; বিয়ে হ'ল এক আশাতীত ধনীর গৃহে; তার পর জীবন যে প্রবাহে বেয়ে চলল তাকে অসাধারণ বললেও খাটো ক'রেই বলা হয়। চূড়ান্ত হ'ল তার আজকে। যে স্বামীর আশ্রয় পাবার জন্যে একদিন সমস্ত দেহ-মন পণ ক'রে উন্মত্ত হয়ে ছুটে গিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল, আজ সেই ব্যক্তির সঙ্গে রেলগাড়ির একই কক্ষে একাকী আবদ্ধ হয়ে ছুটে চলেছে! আইনের চক্ষে এখনও হয়তো সে তার স্বামীই অথচ—

সহসা সন্ধ্যা সে-দিককার মনের কবাটটা বন্ধ ক'রে দিলে। মনে প'ড়ে

গেল প্রমথর কথা। কি অদ্ভুত মানুষই না তিনি! নীচু হয়েই সর্বদা আছেন, অথচ ধরতে গেলে নাগাল পাওয়া যায় না, এতই উঁচু! মারাত্মক সংক্রামক রোগে পীড়িত বন্ধুর সেবার জন্যে অনেকেই হয়তো ছুটে যায়, কিন্তু এমন অব-লীলার সঙ্গে কেউ যায় না। সন্ধ্যার নিষেধে প্রমথর ভর্ৎসনার কথা মনে প'ড়ে গেল, 'ছি ঊষা! এ কি কথা বলছ! জীবনটা তুচ্ছ নয় বটে; কিন্তু তা ব'লে এত বড়ও নয় যে, এই বিপদে সুরেশকে পরিত্যাগ করতে পারব!—এ-ই হ'ল প্রমথর মনের সহজ সরল পরিচয়। এর মধ্যে পরহিতৈষণার কৃত্রিম আস্ফালন নেই, বাহাদুরি নেই। স্বার্থপরতার সঙ্কীর্ণতায় সে প্রমথর কত পিছনে প'ড়ে আছে; অথচ কথায় কথায় প্রমথ বলে, সন্ধ্যার সংস্পর্শে এসে সে মানুষ হয়ে গেছে! আশ্চর্য মানুষ যা হোক!....প্রমথর চিন্তায় সন্ধ্যার মন বিষণ্ণ হয়ে উঠল। জানলার দিকে মুখ ক'রে পাশ ফিরে শুয়ে মনে মনে বিশ্বনাথকে স্মরণ ক'রে বললে, ঠাকুর, ভালয় ভালয় নিরাপদে ঘরে ফিরিয়ে এনো।

ভাবতে ভাবতে কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, হঠাৎ কার কণ্ঠস্বরে নিদ্রা ভেঙে গেল। ধড়মড় ক'রে শয্যার উপর উঠে ব'সে দেখলে, দপ দপ ক'রে আলো জ্বলছে আর সম্মুখেই প্রিয়লাল দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি আমাকে ডাকছিলেন?"

প্রিয়লাল বললে, "হ্যাঁ, বোধ হয় স্বপ্ন-টপ্ন দেখছিলেন।"

লজ্জিত-স্মিত মুখে সন্ধ্যা বললে, "কেন, চেঁচাচ্ছিলাম বুঝি?"

মৃদু হেসে প্রিয়লাল বললে, "হ্যাঁ, কাছাকাছি দুবার।" তার পর নিজের শয্যায় ফিরে গিয়ে ব'সে বললে, "প্রথমবার অল্পক্ষণ, শীঘ্রই ঘুমিয়ে পড়লেন। দ্বিতীয়বার বেশ খানিকক্ষণ, কাজেই না ডেকে থাকতে পারলাম না।"

অপ্রতিভ হয়ে সন্ধ্যা বললে, "ছি ছি, দেখুন দেখি, অসময়ে আপনার ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম!"

ব্যস্তভাবে প্রিয়লাল বললে, "না না, একটুও নয়। ঘুমিয়ে থাকলে আমি

আপনার শব্দ কখনই শুনতে পেতাম না। আমি তখন জেগে ছিলাম। কিন্তু মিসেস মুখার্জি, হয় অল্পক্ষণের জন্যে জেগে ব'সে থাকুন, নয় অন্য দিকে মাথা রেখে পাশ ফিরে ভাল ক'রে শোন। সময়ে সময়ে এক-একটা স্বপ্ন, বিশেষত দুঃস্বপ্ন, এমন পেছনে লেগে থাকে যে, ঘুমিয়েছেন কি অমনি আবার তার হাতে পড়েছেন।"

সন্ধ্যা বললে, "একটু জেগেই ব'সে থাকি, আপনি শুয়ে পড়ুন।" হাতের রিস্ট-ওয়াচ দেখে বললে, "প্রায় চারটে বাজে। কতদূর এলাম জানেন কি?"

প্রিয়লাল বললে, "কতদূর এলাম তা ঠিক বলতে পারি নে, তবে জৌনপুর ছেড়ে এসেছি অনেকক্ষণ।" মাথার শিয়র থেকে টাইম-টেবল নিয়ে দেখে বললে, "এবার শাগঞ্জ আসছে।"

সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "সাহেবটি কখন নেবে গেল জানেন?"

প্রিয়লাল বললে, "জানি। রাত তখন দেড়টা হবে, মোগলসরাইয়ে নেবে গেল। কিন্তু আপনি শুয়ে পড়ুন মিসেস মুখার্জি, স্বপ্নে স্বপ্নে আপনার ঘুম ভাল ক'রে হতে পারে নি, অথচ রাতও আর বেশি নেই।"

সন্ধ্যা বললে, "আপনিও তো সমস্ত রাতই জেগে আছেন, আপনিও শুয়ে পড়ুন।"

প্রিয়লাল বললে, "সমস্ত রাত জেগে আছি' তা ঠিক নয়, তবে ঘুম ভাল হয় নি। ট্রেনে আমার ভাল ঘুম হয় না। তা ছাড়া—" কথা শেষ না ক'রে প্রিয়লাল হাসতে লাগল।

ঔৎসুক্যভরে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "তা ছাড়া কি?"

"একটু পাহারা দিয়েছি আপনাকে।" ব'লে প্রিয়লাল ঈষৎ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে হেসে উঠল।

সন্ধ্যা বললে, "তা হ'লে এবার আপনি ঘুমোন, আমি জেগে থাকি। আমি যথেষ্ট ঘুমিয়েছি, আর ঘুমোবার দরকার নেই, রাতও শেষ হয়ে এসেছে।"

সন্ধ্যার কথা শুনে প্রিয়লাল হাসতে লাগল; বললে, "না, মিসেস মুখার্জি. অনুগ্রহ ক'রে আপনি আর আমার ও-অপবাদের কারণ হবেন না। একেই তো আপনার স্বামী আমাকে সেই শ্রেণীর লোকের মধ্যে ফেলেছেন যাদের হাঙ্গামা অপরে সহ্য করে, তার ওপর যদি শোনেন যে খানিকটা পথ আপনি আমাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে গেছেন, তা হ'লে আর কোনোদিনই তাঁর সেই শ্রেণী থেকে মুক্তি পাবার আশা থাকবে না। তার চেয়ে আপনি শুয়ে পড়ুন, আমিও একটু গড়াবার চেষ্টা দেখি, যদিও এ আমি নিশ্চয় জানি যে ঘুম আর হবে না।"

অগত্যা সন্ধ্যা জানলার দিকে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল, এবং রাত্রিশেষের সুশীতল স্নিগ্ধতার প্রভাবে নিদ্রাগত হতে বিলম্ব হ'ল না। ঘুম যখন ভাঙল, তখন ট্রেন একটা স্টেশনে এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমস্ত কক্ষ উজ্জ্বল সূর্যকিরণে প্লাবিত। শয্যার উপর উঠে ব'সে অপ্রতিভ মুখে সন্ধ্যা বললে, "ঈস, এত বেলা হয়ে গেছে তবু ঘুম ভাঙে নি!"

প্রিয়লাল তার বেঞ্চে ব'সে একটা ইংরেজী ম্যাগাজিনের পাতা উল্টাচ্ছিল; বললে, "ঘুম ভেঙেছে তো মিসেস মুখার্জি, আপনি তো নিজেই উঠেছেন।"

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "এটা কোন্ স্টেশন ডক্টর চৌধুরী?"

প্রিয়লাল বললে, "অযোধ্যা। অভাগিনী সীতার শ্বশুরবাড়ি।"

ক্ষণকাল নির্বাক থেকে মনে মনে কি চিন্তা ক'রে সন্ধ্যা বললে, "অভাগিনী বলছেন কেন সীতাকে?"

প্রিয়লাল বললে, "কেন বলব না মিসেস মুখার্জি? দুর্বলচিত্ত স্বামীর হাতে প'ড়ে কি অবিচারটাই না বারম্বার তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল! অবশেষে এই অযোধ্যা নগরীতে বসুন্ধরার গর্ভে প্রবেশ ক'রে তিনি নিদারুণ অপমান আর মনস্তাপের হাত থেকে নিষ্কৃতি পান।"

সন্ধ্যা বললে, "কিন্তু তাই ব'লে রামচন্দ্রকে 'দুর্বলচিত্ত' বলছেন কেন? আমার তো মনে হয়, তিনি দুর্বলচিত্ত ছিলেন না ব'লেই সম্পূর্ণ নিরপরাধ জেনেও প্রজার মনোরঞ্জনের জন্যে সীতার সঙ্গে ও-রকম আচরণ করতে পেরেছিলেন। প্রজারঞ্জক রাজা ব'লে পৃথিবীজোড়া খ্যাতিও তো তাঁর আছে।"

সন্ধ্যার প্রতি একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত ক'রে প্রিয়লাল বললে, "এ আপনি মুখে বলছেন বটে, কিন্তু এ আপনার মনের কথা নয় মিসেস মুখার্জি,—এ আপনি শ্লেষ ক'রে বলছেন। আমি জানি, আমাদের বাংলা দেশের প্রত্যেক আত্মসম্মানে সচেতন মেয়ের মনে রামচন্দ্রের প্রতি গভীর অভিমান আছে। রামায়ণের কবি শুধু একজন রামচন্দ্র আর একজন সীতার কাহিনী লিখেই খালাস, কিন্তু সেই রামায়ণের দিন থেকে আজ পর্যন্ত কত রামচন্দ্র আর কত সীতা যে এল গেল, তার খবর কেউ রাখে কি?"

প্রিয়লালের কথা শুনে সন্ধ্যার মুখ সহসা আরক্ত হয়ে উঠল; বললে, "মিছিমিছি এ আক্ষেপ কেন করছেন ডক্টর চৌধুরী? এই অদৃষ্টবাদের দেশে সে খবর রেখে কোনো লাভ আছে কি? যত অবিচারই রামচন্দ্র করুন না কেন, সীতার অদৃষ্ট দিয়ে তার সমস্তটার কাটান হয়ে যাবে। সীতা দুঃখ পেলে তাতে রামচন্দ্রের অপরাধ কোথায়?—তিনি তো শুধু নিমিত্তের ভাগী। শুধু কি তাই? পত্নীপীড়ন করার মহত্ত্বে তিনি সকলের কাছে বাহাদুরিই পাবেন,—কেউ বলবে এমন প্রজারঞ্জক রাজা আর হয় না, কেউ বা বলবে আর কিছু।"

সন্ধ্যার এই সুতীক্ষ্ণ ভর্ৎসনার আঘাতে প্রিয়লালের মুখ কালো হয়ে উঠল। এ তিরস্কার তার প্রতি কতখানি প্রযোজ্য তা উপলব্ধি ক'রে সন্ধ্যা সাধারণভাবে তার মন্তব্য প্রকাশ করছে, এই ভ্রান্ত ধারণাও তাকে কোনো সান্ত্বনা দিতে পারলে না। ক্ষণকাল নির্বাক থেকে দুঃখার্ত কণ্ঠে সে বললে, "আপনার অনুযোগের একটি কথারও আমি প্রতিবাদ করি নে মিসেস মুখার্জি, কারণ

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি আপনার তিরস্কারের সবটা মাথায় পেতে নিতে বাধ্য। কথাটা সবিস্তারে বলবার প্রয়োজনও নেই, বললে হয়তো অশোভনও হবে, তবে এটুকু আপনাকে বলতে আপত্তি নেই যে, আমার কাহিনী শুনলে আপনি বুঝতে পারতেন, আমি নিজেও আপনাদের এই বাংলা দেশের একজন অত্যাচারী রামচন্দ্র।"

সহসা প্রিয়লালের এই নির্মুক্ত আত্মস্বীকৃতি এবং আত্মপ্রকাশে সন্ধ্যা বিমূঢ় হয়ে গেল। প্রিয়লালের কাহিনী যে তারই হৃদয়ের রক্তাক্ষরে লেখা কাহিনী তা তো প্রিয়লাল জানে না, সুতরাং তার বিবৃতি কোন্ পথে কি ভাবে অগ্রসর হয়ে তাকে বিপন্ন করবে সেই দুশ্চিন্তায় মনে মনে চঞ্চল হয়ে সে বললে, "থাক্ ডক্টর চৌধুরী, এ-সব কথার আলোচনায় কোনো ফল নেই,—এ শুধু আপনাকে অকারণ কষ্ট দেবে।"

বিষণ্ণমুখে প্রিয়লাল বললে, "সত্যিই কোনো ফল নেই, কারণ আমার সীতাও নিজেকে এমনভাবে বিলুপ্ত করেছেন যে, কোনোদিন দেখা হয়ে যে মার্জনা ভিক্ষা করবার সৌভাগ্য পাব সে পথ আর নেই।" তার পর সন্ধ্যা হয়তো এ-সব ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ পছন্দ করছে না আশঙ্কা ক'রে অপ্রতিভ মুখে বললে, "আমাকে ক্ষমা করবেন মিসেস মুখার্জি, সাধারণ কথাবার্তার মধ্যে এমন ক'রে ব্যক্তিগত দুঃখ-দুর্ভাগ্যের কথা টেনে আনা আমার পক্ষে অন্যায় হয়েছে। সময়ে সময়ে মানুষের এমন দুর্বলতার মুহূর্ত আসে, যখন সে কোনোমতেই নিজেকে সংযত ক'রে রাখতে পারে না। আমার বোধ হয় ঠিক সেইরকম একটা মুহূর্ত এসেছিল,—নইলে পূর্বে তো আর কখনো কারুর কাছে এ সব কথা বলবার প্রবৃত্তি হয় নি।"

এক মুহূর্ত নির্বাক থেকে মৃদু ব্যথিত কণ্ঠে সন্ধ্যা বললে, "আপনার কথা শুনে দুঃখিত হলাম ডক্টর চৌধুরী, কিন্তু এ-সব প্রসঙ্গে আর কাজ নেই। আপনি স্থির হোন।"

ট্রেন তখন অযোধ্যার ডিস্ট্যাণ্ট সিগ্‌নাল অতিক্রম ক'রে ছুটে চলেছিল। ক্ষণকাল সন্ধ্যা ও প্রিয়লাল উভয়ে নিজ নিজ চিন্তায় মগ্ন হয়ে নীরবে ব'সে রইল। অবশেষে মৌনভঙ্গ ক'রে সন্ধ্যা ডাকলে, "ডক্টর চৌধুরী!"

সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে প্রিয়লাল বললে, "আজ্ঞে?"

"ফয়জাবাদ আর কটা স্টেশন পরে?"

"এর পরে ফয়জাবাদ সিটি, তার পরে ফয়জাবাদ জংশন।"

"আমি বলি ডক্টর চৌধুরী, ফয়জাবাদে না নাবলে আপনার যদি কাজের ক্ষতি হয় অথবা অন্য কোনো অসুবিধা হয়, তা হ'লে আমার সঙ্গে আপনার লক্ষ্ণৌ পর্যন্ত গিয়ে কাজ নেই। এটুকু পথ দিনে দিনে অনায়াসে একা যেতে পারব। চিঠি গেছে, কাল হাওড়া স্টেশন থেকে তার করা হয়েছে, স্টেশনে গাড়ি নিয়ে লোকজন আসবে, কোনো অসুবিধে হবে না।"

প্রিয়লাল বললে, "একটি বন্ধুর জন্যে আমার ফয়জাবাদে নাবা। সে যদি এর মধ্যে লাহোর চ'লে গিয়ে থাকে, তা হ'লে ফয়জাবাদে নাবার কোনো প্রয়োজনই থাকবে না।"

"তিনি ফয়জাবাদে আছেন কি চ'লে গেছেন—সে খবর আপনি স্টেশনে পাবেন?"

"নিশ্চয়ই পাব। থাকলে সে আমাকে নাবিয়ে নিতে স্টেশনে আসবে।"

সন্ধ্যা বললে, "তা হ'লে অবশ্য কোনো অসুবিধে নেই, ফয়জাবাদ স্টেশনেই কথাটা বোঝা যাবে।"

কিন্তু ফয়জাবাদ স্টেশনে যখন গাড়ি গিয়ে দাঁড়াল, তখন কথাটা খুব সহজে বোঝা গেল না, একটু জটিল হয়েই দেখা দিলে। প্রিয়লালের বন্ধু গোপিকারমণ প্ল্যাট্‌ফর্মে দাঁড়িয়ে উন্নয়নে ফার্স্ট সেকেণ্ড ক্লাস গাড়িগুলো লক্ষ্য করছিল, প্রিয়লালকে জানলার ধারে দেখতে পেয়ে হাসিমুখে তাড়াতাড়ি প্রিয়লালের কামরার পাশে এসে দাঁড়াল।

প্রিয়লাল বললে, "কি গোপি, খবর সব ভাল তো ?"

গোপিকারমণ বললে, "ভাল। কিন্তু নেবে পড প্রিয়।"

প্রিয়লাল আদৌ সে-বিষয়ে কোনো লক্ষণ প্রকাশ না ক'রে বললে, "ব'সো, একটু ভেবে দেখি।"

বিস্মিতকণ্ঠে গোপিকারমণ বললে, "ভেবে দেখবে আবার কি হে ?"

কণ্ঠস্বর একটু নীচু ক'রে প্রিয়লাল বললে, "সঙ্গে যিনি রয়েছেন তিনি আমার বন্ধুপত্নী, তাঁকে লক্ষ্ণৌ পৌঁছে দেবার জন্যে আমি প্রতিশ্রুত।"

মৃদুস্বরে বললেও কথাটা সন্ধ্যা স্পষ্টই শুনতে পেয়েছিল; প্রিয়লালের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "সমস্ত রাত তো আপনি হেপাজৎ ক'রে নিয়ে এলেন, এখন এটুকু পথ আমি অনায়াসে যেতে পারব। আপনি আপনার বন্ধুর সঙ্গে যেতে পারেন ডক্টর চৌধুরী।"

সন্ধ্যার কথা শুনে উৎফুল্ল হয়ে গোপিকারমণ বললে, "ঐ তো উনি অনুমতি দিচ্ছেন, তবে আর কি, চল।"

প্রিয়লাল বললে, "উনি ভদ্রতা ক'রে অনুমতি দিচ্ছেন ব'লেই আমি অভদ্রতা ক'রে আমার প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করতে পারি কি-না তাই ভাবছি। উনি এ কথা অনেক আগে থেকেই বলছেন, কিন্তু লক্ষ্ণৌ এখান থেকে তিন ঘণ্টার পথ। এত আগে ওঁকে একা ছেড়ে দিলে প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন হবে না কি ?"

ক্ষুণ্ণ হয়ে গোপিকারমণ বললে, "সে কথা তুমি ভেবে দেখ। কিন্তু কাশ্মীর আমার যাওয়া হ'ল না—এ কথাও তোমাকে ব'লে দিলাম।"

"কেন ?"

"কেন ? একা আমি তৎপর হয়ে ফয়জাবাদ থেকে লাহোর গিয়ে তোমাদের সঙ্গে একত্র হব—এই পরিচয় তুমি আমার জানো ?"

গোপিকারমণের কথা শুনে প্রিয়লাল হাসতে লাগল, বললে, "আচ্ছা,

তার ব্যবস্থা আমি করব। লক্ষ্ণৌ থেকে ফয়জাবাদ এসে তোমাকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে যাব।"

গোপিকারমণ বললে, "একমাত্র সেই রকম বন্দী অবস্থাতেই যদি হয়,—স্বেচ্ছায় স্বচেষ্টায় যে হবে না তা নিশ্চয়। কিন্তু এ রকম ভবঘুরে হয়ে আর কতদিন কাটাবে প্রিয় ?"

স্মিতমুখে প্রিয়লাল বললে, "যতদিন না ভবলীলা সাঙ্গ হয় ততদিন।"

"বাজে কথা রাখ,—কথার উত্তর দাও।"

প্রিয়লাল বললে, "তা তুমি কি করতে বল ? বাড়িতে ব'সে বন্দী হয়ে কাটাতে বল না-কি ?"

গোপিকারমণ বললে, "নিশ্চয় বলি। ভাল রকম একটি খোঁটা গেড়ে।"

গোপিকারমণের কথা শুনে প্রিয়লাল এক মুহূর্ত চুপ ক'রে রইল ; তার পর মৃদুস্বরে বললে, "খোঁটা তো উপড়ে গেছে গোপি। জীবনে দুবার খোঁটা গাড়া যায় না-কি ?"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গোপিকারমণ বললে, "দুবার ? তুমি যদি ফয়জাবাদে নাবতে তা হ'লে এমন একজন লোক দেখাতে পারতাম, যার উপস্থিত পাঁচ নম্বরের খোঁটা চলছে।

শুনে প্রিয়লাল হাসতে লাগল ; বললে, "পূর্বজন্মের অনেক পুণ্য না থাকলে অতটা সৌভাগ্য হয় না ভাই। আমরা পাপিষ্ঠ পামর মানুষ, আমাদের এক নম্বর খোঁটার বেশি ওঠবার সাধ্য নেই।"

প্রিয়লালের কথা শুনে গোপিকারমণও হাসতে লাগল।

ট্রেন ছেড়ে দিলে ট্রেনের সঙ্গে চলতে চলতে গোপিকারমণ বললে, "তা হ'লে লক্ষ্ণৌ থেকে ফিরছ তো ?"

প্রিয়লাল বললে, "নিশ্চয় ফিরছি।"

ট্রেনটা একটু এগিয়ে গেলে সন্ধ্যা বললে, "অনর্থক এ কষ্টটা না ক'রে এখানেই নাবতে পারতেন ডক্টর চৌধুরী।"

সন্ধ্যার এই পৌনঃপুনিক নির্বন্ধে মনে মনে ঈষৎ বিরক্ত হয়ে প্রিয়লাল বললে, "জীবনে এমন অনেক-কিছু করতে পারতাম মিসেস মুখার্জি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক'রে উঠতে পারি নি। বুঝতেই তো পারছেন দুর্বলচিত্ত ব্যক্তি।" তার পর সন্ধ্যাকে কোনো কথা বলবার অবসর না দিয়ে বললে, "এক কাজ করলে হয়—লক্ষ্ণৌয়ে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে স্টেশন থেকেই ফয়জাবাদ ফিরলে হয়। রসুন, টাইম-টেবলটা দেখি।" টাইম-টেবল দেখে বললে, "চমৎকার ট্রেন আছে। লক্ষ্ণৌয়ে আমরা পৌঁছচ্ছি নটার সময়, আর একটার কাছাকাছি লক্ষ্ণৌ থেকে একটা ট্রেন ছেড়ে ফয়জাবাদ পৌঁছবে বেলা চারটের একটু পরে।"

সন্ধ্যা বললে, "লক্ষ্ণৌয়ে যখন অতক্ষণ সময় পাচ্ছেন, তখন স্টেশন থেকেই ফেরবার দরকার কি ডক্টর চৌধুরী,—বাড়ি গিয়ে অনায়াসে স্নানাহার ক'রে তো আসতে পারেন।"

প্রিয়লাল কিন্তু কিছুতেই সে প্রস্তাবে স্বীকৃত হ'ল না; বললে, স্টেশনে যখন রিফ্রেশ্‌মেণ্ট রুম আছে তখন স্নানাহারের কোনো অসুবিধাই হবে না, বাড়ি গেলেই বরং সন্তোপনীতা সন্ধ্যাকে নূতন অতিথির সেবা-সৎকারের দ্বারা অসুবিধায় ফেলা হবে।

লক্ষ্ণৌয়ে পৌঁছে দেখা গেল, মোটর এবং একজন ভৃত্য সঙ্গে নিয়ে গৃহরক্ষক বসন্ত চৌবে স্টেশনে এসেছে।

সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "কি চৌবেজী, সব ভাল তো?"

আনত হয়ে সন্ধ্যাকে নমস্কার ক'রে চৌবে বললে, "আপ্‌কা দোয়াসে সব কুশল মা-জী!" তার পর প্রমথকে দেখতে না পেয়ে বিস্মিত হয়ে বললে "বাবুসাহেব কাঁহা মা-জী?"

সন্ধ্যা বললে, "তিনি পথে নেবেছেন, কাল পৌঁছবেন।"

প্ল্যাট্‌ফর্মে অবতরণ ক'রে সন্ধ্যা প্রিয়লালকে জিজ্ঞাসা করলে, "তা হ'লে কি স্থির করেছেন ডক্টর চৌধুরী ?"

প্রিয়লাল বললে, "আমাকে ক্ষমা করবেন মিসেস মুখার্জি, এ ব্যবস্থা আমার পক্ষে খুবই সুবিধের হচ্ছে,—কোনো অসুবিধে হবে না।"

যুক্তকরে সন্ধ্যা বললে, "আপনি আমার জন্যে অনেক কষ্ট করলেন ডক্টর চৌধুরী। যদি কিছু ত্রুটি অপরাধ হয়ে থাকে, অনুগ্রহ ক'রে ক্ষমা করবেন।"

শুনে প্রিয়লাল হাসতে লাগল ; বললে, "যে অপরাধ আপনি করেছেন তা আমার চিরকাল মনে থাকবে মিসেস মুখার্জি, কিন্তু আমার কথায়-বার্তায় যদি কিছু অশিষ্টতা প্রকাশ পেয়ে থাকে অনুগ্রহ ক'রে তা ভুলে যাবেন। আচ্ছা, নমস্কার।"

"নমস্কার।"

জিনিসপত্র নিয়ে সন্ধ্যা প্ল্যাট্‌ফর্মের বাইরে চ'লে গেলে প্রিয়লাল ওয়েটিং-রুমে উপস্থিত হ'ল। মনটার একটা দিক বিষণ্ণতার মেঘে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। কারণ কিন্তু তার ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

যথাকালে স্নানাহার সমাপন ক'রে একটা দৈনিক সংবাদপত্র নিয়ে প্রিয়লাল প্ল্যাট্‌ফর্মে একটা ঈজি-চেয়ারে আশ্রয় গ্রহণ করলে। পড়তে পড়তে হঠাৎ খানিকক্ষণের জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে গেল, তার পর কি ভেবে একটা কুলিকে ডেকে বললে, "চিজ উঠাও।" প্ল্যাট্‌ফর্মের বাইরে এসে একটা ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলে, "বাট্‌লারগঞ্জ মুখার্জি সাহেবকা কোঠি মালুম হ্যায় ?"

ড্রাইভার সাগ্রহে বললে, "মালুম হ্যায় সাহেব।"

জিনিসপত্র নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে প্রিয়লাল বললে, "চলো।"

অর্ধপথ এসে কিন্তু সহসা মনটা একটা অপরিমেয় বিরক্তিতে তিক্ত হয়ে

উঠল। ছি ছি, এ তো ঠিক প্রতিশ্রুতি-পালনের সঙ্কল্প নয়! এ কিসের আকর্ষণ! কিসের মোহ! অন্যায়, ভারি অন্যায়! পাঞ্জাবী ড্রাইভারের দিকে মুখ এগিয়ে প্রিয়লাল বললে, "রোকো।"

পথপার্শ্বে গিয়ে গাড়ি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল।

"স্টেশন ওয়াপস্ চলো।"

সবিস্ময়ে ড্রাইভার প্রিয়লালের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করলে।

আরও একটু দৃঢ়স্বরে প্রিয়লাল তার পূর্বাদেশের পুনরুক্তি করলে। তখন গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে ড্রাইভার স্টেশনের অভিমুখে ছুটে চলল।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হয়েই কিন্তু পুনরায় মন গেল বদলে। স্টেশনে উপনীত হয়ে ড্রাইভারের হাতে একটা টাকা দিয়ে বললে, "একঠো বড়া টাইম-টেবল খরিদ করকে লাও।"

অনাবশ্যক দ্বিতীয় টাইম-টেবল খরিদ হয়ে এলে প্রিয়লাল বললে, "চলো বাটুলারগঞ্জ।"

প্রিয়লালের ভ্রান্তিশীল খেয়ালী মনকে ধন্যবাদ দিতে দিতে ড্রাইভার বাটুলারগঞ্জের দিকে ধাবিত হ'ল।

সাঁইত্রিশ

বাটলারগঞ্জের একটি অপেক্ষাকৃত নিভৃত অংশে প্রমথর গৃহ। বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডের মধ্যস্থলে সদ্য-সংস্কৃত সুবৃহৎ বাংলো-ছাঁদের বাড়িটি ঝক্‌ঝক্ করছে। রাজপথ থেকে বাংলোর সম্মুখ দিকের বারান্দা পর্যন্ত ঘুটিং-ঢালা পথ, তার দুই পার্শ্বে মূল্যবান অ্যারকেরিয়ার বীথি, বাংলোর সম্মুখে পথ শেষ হয়েছে একটি প্রশস্ত চক্রাবর্তে, সেই আবর্তের মধ্যস্থলে একটি সুবৃহৎ প্রস্ফুটিত ম্যাগ্‌নোলিয়া বৃক্ষ; পথের দুই দিকে এবং কম্পাউণ্ডের স্থানে স্থানে যত্নবিন্যস্ত বিচিত্র আকারের পুষ্পোদ্যান, তাতে ক্যামেলিয়া, ম্যাগ্‌নোলিয়া, গন্ধরাজ, কাঁটালী চাঁপা, গোলন-চাঁপা, জুঁই, চামেলী, রজনীগন্ধা, জবা প্রভৃতি দেশী ও বিদেশী ফুলের গাছ; কম্পাউণ্ডের চতুঃসীমায় মেহগনি এবং ইউক্যালিপ্‌টস তরুশ্রেণী, এবং তার কাছে কাছে বহুপ্রকারের মূল্যবান এবং দুর্লভ ফলের গাছ, পশ্চিম দিকের কোণে গ্রীন হাউস, তাতে ফার্ন, অর্কিড এবং বহুবিচিত্র লতাগুল্ম। কম্পাউণ্ডের এক দিকে সহস্রাধিক টবে টিকিট-মারা বিবিধ প্রকারের চন্দ্রমল্লিকার চারা সযত্নে বর্ধিত হচ্ছে, শীতকালে যখন প্রস্ফুটিত হবে বাগানের সেই দিকটা আলোকিত ক'রে রাখবে। সন্ধ্যা চন্দ্রমল্লিকা ভালবাসে তাই প্রমথ এবার চন্দ্রমল্লিকার এই বিপুল আয়োজন করিয়েছে, চন্দ্রমল্লিকার মরশুমটা সন্ধ্যাকে নিয়ে লক্ষ্ণৌয়ে বাস করবে এই তার মনের বাসনা।

বাংলোটি একতলা, কিন্তু বৃহদায়তন,—তা ছাড়া, আধুনিক জীবন যাপনের যত কিছু সুখ-সম্ভোগের ব্যবস্থা সকলই তার মধ্যে সুলভ।

বেলা তখন দেড়টা। সন্ধ্যা তার বসবার ঘরে টেবিল-চেয়ারে ব'সে প্রমথকে চিঠি লিখছিল। গৃহে পৌঁছবার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সে মুঙ্গের

থেকে প্রমথর টেলিগ্রাম পেয়েছে। টেলিগ্রামের মর্ম,—সুরেশের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন, সুতরাং লক্ষ্ণৌ পৌঁছতে প্রমথর তিন-চার দিন বিলম্ব হবে, সন্ধ্যা যেন প্রত্যহ চিঠি এবং টেলিগ্রামে তাদের সংবাদ পাঠায় এবং তার লক্ষ্ণৌ পৌঁছবার পূর্বে কিছুতেই প্রিয়লালকে না ছাড়ে।

এরূপভাবে প্রমথ মুঙ্গেরে আটকে পড়ায় সন্ধ্যা অতিশয় চিন্তিত হয়ে তাকে চিঠি লিখছিল। চিঠি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময়ে সাধুচরণ এসে বললে, "মা, সেই ডাক্তার সাহেব এসেছে।"

চিঠি লেখবার তন্ময়তার মধ্যে একবার যেন একটা মোটর আসার শব্দ কানে পৌঁছেছিল, কিন্তু তখন কৌতূহল সে তন্ময়তাকে পরাস্ত করতে পারে নি। সাধুচরণের কথা শুনে বিস্মিত হয়ে সন্ধ্যা বললে, "এরই মধ্যে ডাক্তার সাহেব আবার কে এল সাধু?"

সাধুচরণ বললে, "ঐ যে গো, ইজের-পরা সাহেবের মতো চেহারা ইষ্টিশানে তোমার সঙ্গে কথা ক'য়ে জিনিস-পত্তোর নিয়ে চ'লে গেল! এখন এসে বলতেছে, তোমাদের মাঠাকরুনকে বল—কি-যেন-ভাল ডাক্তার এসেছে।"

সন্ধ্যা বুঝতে পারলে প্রিয়লাল এসেছে, এবং সাধুচরণের কাছে ডক্টর চৌধুরী ব'লে নিজের পরিচয় দিয়েছে। তার পরিধানের 'ইজের' এবং নামের 'ডক্টর'—এই দুইকে সংযুক্ত ক'রে সাধুচরণ তাকে ডাক্তার সাহেব ব'লে সাব্যস্ত করেছে। জিজ্ঞাসা করলে, "জিনিসপত্র নিয়ে এসেছেন?"

সুদীর্ঘ রেলপথ অতিক্রম ক'রে বন্ধুবান্ধবহীন অবাঙালীর দেশে এসে সাধুচরণের মেজাজটা খুব মসৃণ ছিল না, রুক্ষস্বরে বললে, "শোন কথা! নিয়ে আসবে না তো কি ফেলে আসবে? নিয়ে এসেছে।"

মনটা অপ্রসন্ন হয়ে উঠল। গোলাযোগটা কিছুতেই তা হ'লে সহজে মিটবে না না-কি! প্রমথ আসবার আগেই এই অপ্রীতিকর অভিনয়ের যবনিকা-

পাত হ'লে ভাল ছিল, কারণ রহস্যপ্রিয় প্রমথ কি করতে কি ক'রে ফেলে তার আশঙ্কা যথেষ্ট আছে। মনে মনে একটুখানি চিন্তা ক'রে সন্ধ্যা স্থির করলে, সে যাই হোক না কেন, নিজগৃহে নিষ্ঠার সহিতেই আতিথ্যধর্ম পালন করবার চেষ্টা করবে,—আচরণের মধ্যে এমন-কিছুই করবে না যা অতিথিকে ক্ষুব্ধ করতে পারে।

চিঠি লেখা আপাতত স্থগিত রেখে বাইরে এসে প্রিয়লালকে দেখে সন্ধ্যা বললে, "আসুন ডক্টর চৌধুরী, আসুন।"

দুই হাত যুক্ত ক'রে প্রিয়লাল বললে, "কোনো রকম কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা না ক'রে অকপটে স্বীকার করছি, আমি একজন অব্যবস্থিতচিত্ত ব্যক্তি।"

মৃদুস্মিত মুখে সন্ধ্যা বললে, "সে তবু ভাল। সময়ে সময়ে দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তিদের নিয়ে আমাদের কম হাঙ্গামা পোয়াতে হয় না।"

প্রিয়লাল বললে, "কিন্তু আপাতত আমি দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তিই। স্টেশন থেকে দৃঢ়পণ ক'রে এসেছি, প্রমথর সঙ্গে কিছুতেই চুক্তিভঙ্গ করব না, সে ফেরা পর্যন্ত আপনার বাড়িতে অপেক্ষা করবই।"

সন্ধ্যা বললে, "বেশ তো, তাই করুন। বাড়ি পৌঁছে ওঁর একখানা টেলিগ্রাম পেয়েছি। তাতেও উনি লিখেছেন যে, উনি লক্ষ্মৌ পৌঁছবার আগে আপনাকে যেন ছাড়া না হয়।"

শুনে প্রিয়লালের মনের কুণ্ঠা অনেকখানি কেটে গেল; প্রফুল্লমুখে বললে, "আত্মসমর্পণ করলাম, ছাড়বেন না। উপস্থিত তা হ'লে যেখানে হোক একটা আস্তানা বেঁধে দিন।" তার পর হঠাৎ একটা কথা মনে প'ড়ে লজ্জিত হয়ে বললে, "কি রকম স্বার্থপর লোক দেখুন, নিজের কথাটুকু নিয়েই ব্যস্ত রয়েছি, অথচ প্রথমেই যে কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল এ পর্যন্ত তা করি নি! প্রমথ কেমন আছে, কবে আসছে? তার বন্ধু কেমন আছেন?"

সংক্ষেপে প্রিয়লালের প্রশ্নত্রয়ের উত্তর দিয়ে সন্ধ্যা বললে, "আসুন, আপনার থাকবার ঘরটা দেখিয়ে দিই।"

বাংলোর পূর্বপ্রান্তে প্রমথ ও সন্ধ্যার ঘর। ঠিক তার বিপরীত পশ্চিম প্রান্তের ঘরে সন্ধ্যা প্রিয়লালের শয়নের ব্যবস্থা ক'রে দিলে। কক্ষসংলগ্ন ড্রেসিং-রুম, তার পরেই বাথরুম। শয়ন-কক্ষের পাশের ঘরটা স্থির করলে প্রিয়লালের বসবার, লেখাপড়া করবার জন্য। অবসরকালে বারান্দায় বসবার জন্য একটা প্রশস্ত ঈজি চেয়ার রাখালে, তার পাশে গোটা তিন-চার আর্মলেস্ চেয়ার আর একটা ছোট চারকোণো টেবিল,—বই খবরের কাগজ অ্যাশ ট্রে ইত্যাদি ছোট ছোট জিনিস রাখবার জন্য।

হরিয়া নামে একজন চতুর ভৃত্যকে ডেকে প্রিয়লালের ঘর ঝেড়ে মুছে পালঙ্কে শয্যা রচনা এবং অন্যান্য ব্যবস্থা ক'রে দেবার আদেশ দিলে। সংসারের আর সব কাজ থেকে তাকে একেবারে মুক্তি দিয়ে নিরন্তর প্রিয়লালের পরিচর্যায় মোতায়েন করলে।

দাঁড়িয়ে থেকে সব ব্যবস্থা করিয়ে দিয়ে সন্ধ্যা প্রিয়লালের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "কাল রাত্রে গাড়িতে আপনার ঘুম হয় নি, এখন একটু বিশ্রা'ম করুন। আমিও ওঁর চিঠিটা শেষ ক'রে ডাকে পাঠিয়ে দিই। আবার একটু পরে দেখা হবে অখন।"

হৃষ্টমুখে প্রিয়লাল বললে, "আচ্ছা।"

"কষ্ট হবে. কোন রকমে এরই মধ্যে কাজ চালিয়ে নেবেন।"

সজোরে মাথা নেড়ে প্রিয়লাল বললে, "না, না, মিসেস মুখার্জি, এখন যখন আপনার আশ্রয়ে এসে আপনার অতিথি হলাম, তখন ভদ্রতার এ-রকম সাজানো কথা বললে চলবে না, একেবারে খাঁটি আন্তরিকতার সোজা কথা বলতে হবে। আমি সত্যি এমন অপদার্থ লোক নই যে, এমন সুব্যবস্থায় আমার কষ্ট হবে।"

মৃদুহাস্যের সহিত সন্ধ্যা বললে, "তা হ'লে যখন যা দরকার হবে অসঙ্কোচে চেয়ে নেবেন।"

"নিশ্চয়ই নোব।"

"আপনার খাওয়া হয়েছে তো ডক্টর চৌধুরী ?"

সন্ধ্যার কথা শুনে প্রিয়লাল হাসতে লাগল, বললে, "অনেকক্ষণ। অর্ধ-জীর্ণ হয়ে এল।"

"এখন সামান্য কিছু খাবেন ?"

"কিচ্ছু না।"

"একটু শরবৎ আর ফল ?"

"তাও না।"

"চা খাবেন কখন ?"

"পাঁচটার সময়ে।"

"আচ্ছ, এখন তা হ'লে একটু বিশ্রাম করুন, আমিও চিঠিখানা শেষ করি গিয়ে।"

চিঠিতে সন্ধ্যা প্রিয়লালের বিষয়ে এইটুকু যোগ করলে,—তোমার আসা পর্যন্ত আমাদের বাড়িতে অপেক্ষা করবেন—এই স্থির ক'রে ডক্টর চৌধুরী কিছুক্ষণ হ'ল স্টেশন থেকে এসেছেন। সুতরাং তুমি অনর্থক যে গোলযোগের সৃষ্টি করেছ আমার দ্বারা তার শেষ হ'ল না। তুমি অবিলম্বে এসে এ থেকে আমাকে মুক্তি না দিলে আমার প্রতি সত্যই অন্যায় করা হবে। আশা করি, এর চেয়ে বেশি কিছু বলবার প্রয়োজন নেই।

আটত্রিশ

বৈকালে চা পানের পর সন্ধ্যা প্রিয়লালকে মোটর ক'রে বেড়াতে পাঠিয়েছিল। গোমতীর তীরে খানিকটা সময় অতিবাহিত ক'রে এবং দু-চার জন পরিচিত ব্যক্তির খোঁজ-খবর নিয়ে প্রিয়লাল যখন বাড়ি ফিরে এল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে।

ড্রইং-রুমে আলো জ্বলছিল। কথোপকথনের শব্দে সন্ধ্যা ব্যতীত অপর ব্যক্তির উপস্থিতি বুঝতে পেরে প্রিয়লাল সেখানে প্রবেশ না ক'রে বারান্দায় একটু দূরে একটা ঈজি-চেয়ারে শুয়ে পড়ল।

মোটরের হর্নের শব্দ সন্ধ্যার কানে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে হরিয়া এসে বললে, "মা, ডাক্তার সাহেব এসেছেন।"

সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করলে, "কি করছেন? মুখ-হাত ধুয়েছেন? কাপড় বদলেছেন?"

"হ্যাঁ। বারান্দায় ব'সে আছেন।"

"আমাকে ডাকছেন?"

"না, আমি নিজেই আপনাকে খবর দিতে এলাম।"

আগন্তুকের নিকট অল্পক্ষণের জন্য অবকাশ গ্রহণ ক'রে প্রিয়লালের কাছে উপস্থিত হয়ে সন্ধ্যা বললে, "এরই মধ্যে ফিরলেন ডক্টর চৌধুরী? বন্ধু-বান্ধবদের দেখা পেলেন না বুঝি?"

প্রিয়লাল বললে, "সে কথা আর বলবেন না। দুজন গেছেন দেশান্তরে, আর একজন গৃহান্তরে। বিরক্ত হয়ে ফিরে এলাম।"

"গোমতীর ধারে যান নি?"

"গেছলাম, তাও একা একা বেশিক্ষণ ভাল লাগল না।"

সন্ধ্যা বললে, "চলুন, ঘরে চলুন, চৌবেজীর সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিই। মথুরানাথ চৌবে, লক্ষ্ণৌর একজন বিখ্যাত গাইয়ে। চমৎকার লোক।"

প্রিয়লাল বললে, "আনন্দের সঙ্গে যাচ্ছি, কিন্তু আমার পক্ষ থেকে তো হবে বাক্য-ছন্দের আলাপ, চৌবেজীর পক্ষ থেকেই আসল আলাপটা হওয়া উচিত।"

প্রিয়লালের কথার তাৎপর্য বুঝতে পেরে সন্ধ্যা স্মিতমুখে বললে, "বেশ তো, সে তো আনন্দের কথা। কিন্তু হিন্দী ওস্তাদী গান আপনার ভাল লাগবে তো?"

প্রিয়লাল বললে, "লাগবে, যদি না সেই উপলক্ষে রাগ রাগিণীর নাম-গোত্র সম্বন্ধে বিদ্যের পরিচয় দিতে হয়। সে যা একবার জব্দ হয়েছিলাম, তাই থেকে শিক্ষা হয়ে গেছে।"

সহাস্যমুখে সন্ধ্যা বললে, "কি হয়েছিল?"

প্রিয়লাল বললে, "একটা গানের বড় আসরে দুর্বুদ্ধিক্রমে গাইয়ের কাছাকাছি গিয়ে ব'সে ছিলাম। হঠাৎ এক সময়ে আমাকে সমঝদার বিবেচনা ক'রে গাইয়ে ব'লে বস্‌ল, 'এবার কোন্ রাগিণী গাইব ফরমাশ করুন। কতক-গুলো রাগ রাগিণীর নাম জানা ছিল, কিন্তু হঠাৎ একটা জমকালো নাম মনে পড়ল; বললাম, 'একটা সুরফাঁকতাল গান।' শুনে গাইয়ে তো অবাক। মুখে বিহ্বলতার ছায়া। চেয়ে দেখি, অনেকেই মুখ টিপে টিপে হাসছে। গৃহস্বামী, আমার বন্ধু, জোড় হাত ক'রে বললেন—ওস্তাদজী, মাফ করবেন, সুরফাঁকতাল শব্দের দ্বারা আমার বন্ধু এই কথাই বলতে চাচ্ছেন যে, সুর আর তাল দিয়ে এমন একটা জমাটি গান করুন যার মধ্যে একটুও ফাঁক অর্থাৎ ফাঁকি না থাকে।' একটা প্রচণ্ড হাসিতে আসরটা গর্জন ক'রে উঠল। তবলার আসরে সুরফাঁকতাল গাইতে ব'লে কি বিপর্যয়ের অবতারণা করেছিলাম তা অবশ্য আমার বন্ধুরই কাছ থেকে পরে বুঝে নিয়েছিলাম।

কিন্তু যে কথার সুরু হ'ল 'সুর' দিয়ে সে কথা যে সুরের নাম নয়—তালের নাম, এ কি ক'রে জানব বলুন ?"

সন্ধ্যা হাসিমুখে বললে, "কিন্তু শেষ হয়েছে তো 'তাল' দিয়ে ?"

প্রিয়লাল বললে, "অতাল পাতাল নৈনিতাল—এমন অনেক কথা তো শেষ হয়েছে 'তাল' দিয়ে, কিন্তু তাই ব'লে তো আর ওগুলো তালের নাম নয়।"

প্রিয়লালের যুক্তিতে পরাজিত হয়ে সন্ধ্যা হাসতে হাসতে বললে, "তা বটে।"

ড্রয়িং-রুমে যেতে যেতে প্রিয়লাল বললে, "মিসেস মুখার্জি, ঝাঁপতালটা কিন্তু একটা তাল। কি বলুন ?"

প্রিয়লালের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে স্মিতমুখে সন্ধ্যা বললে, "আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে চলুন, চৌবেজীর কাছে আপনার এসব বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে না।"

মথুরানাথ চৌবের বয়স পঞ্চাশের উর্ধ্বে দু-চার বৎসর হবে। সুগঠিত বলিষ্ঠ গৌরবর্ণ দেহ, মাথার চুলে খামখেয়ালীভাবে স্থানে স্থানে পাক ধরেছে, মুখে প্রসন্ন হাসি,—দেখে মনে হয় তার উৎপত্তিস্থল মনের আকাশও নির্মল।

মথুরা চৌবের নিকট সন্ধ্যা প্রিয়লালের পরিচয় দিলে। বললে, "ইনি কলকাতার একজন প্রসিদ্ধ বড়লোক, মস্ত বিদ্বান ব্যক্তি, সম্প্রতি বিলাত থেকে খুব সম্মানজনক উপাধি নিয়ে এসেছেন।" মথুরা চৌবের কথা বললে, 'ইনি লক্ষ্ণৌর একজন শ্রেষ্ঠ গায়ক, কণ্ঠস্বরের মাধুর্যে ইনি এখানকার সকল ওস্তাদকে পরাজিত করেছেন। ধার্মিক, সাত্ত্বিক প্রকৃতির নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। আমি এঁকে আমার অতি নিকট আত্মীয় ব'লে মনে করি।'

বহু বাঙালী মেয়েদের গান শেখাবার সুযোগে মথুরা চৌবে বাংলা ভাষাটা এমন আয়ত্ত ক'রে নিয়েছে যে, বুঝতে প্রায় কিছুই আটকায় না, কাজ-চলা-গোছ বলতেও কতকটা পারে। সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "বাবু-সাহেব তোমার কে আছে উষামায়ী ?"

সহসা এই প্রশ্নে সন্ধ্যার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। কি ভাবে উত্তর দেবে ভেবে সে কতকটা বিমূঢ় হয়ে পড়েছে, এমন সময়ে প্রিয়লাল তাকে সে অবস্থা থেকে উদ্ধার করলে; বললে, "আমি ওঁর স্বামীর বন্ধু হই।"

প্রসন্নতাব্যঞ্জক শিরশ্চালনা ক'রে মথুরা চৌবে বললে, "ঠিক আছে।"

আলাপ-পরিচয়ের পর প্রিয়লালকে গান শোনাবার জন্য সন্ধ্যা মথুরানাথকে অনুরোধ করলে। এ অনুরোধে মথুরানাথ আনন্দিতই হ'ল, কারণ প্রথমত, এই তার জীবিকা অর্জনের কাজ; দ্বিতীয়ত, গানের একটা তানও মেরে যেতে পারলে সন্ধ্যার কাছে যে মোটা মাসহারার ব্যবস্থা আছে আজ থেকেই তার গোড়াপত্তন হয়। পূর্বদিকের একটা ঘরে গানবাজনার যন্ত্রাদির ব্যবস্থা ছিল, মথুরা চৌবের তবলা-বাদকও সেই ঘরে অপেক্ষা করছিল। ফরাস এবং সোফা-চেয়ার উভয় প্রকারের ব্যবস্থাই তথায় বর্তমান। সন্ধ্যা, প্রিয়লাল এবং মথুরা চৌবে সেই ঘরে এসে আসন গ্রহণ করলে।

তবলা এবং তানপুরা বাঁধা হ'লে মথুরানাথ গান আরম্ভ করলে, 'এরি অব গুঁথ লায়োরি মালনিয়াঁ'—সুলতান সালেমের একটি বিখ্যাত খেয়াল। দেখতে দেখতে কামোদের গভীর-করুণ ধ্বনিতে সমস্ত ঘরখানা ভ'রে উঠল,—এমন অপূর্ব একটা সঙ্গীত-পরিবেশ স্থাপিত হ'ল, মনে হ'ল, যার মধ্যে যন্ত্র, কণ্ঠ এবং শ্রোতাদের মন একই বেদনার আনন্দে মিশ্রিত হয়ে স্পন্দিত হচ্ছে। দীর্ঘকালব্যাপী নানাবিধ কর্তব-কৌশলের মধ্য দিয়ে গান শেষ হ'ল।

প্রিয়লাল মুগ্ধ হয়ে মথুরানাথের স্বরমাধুর্যের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিল, গান শেষ হ'লে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে প্রশংসা ক'রে আরও দুই-একটি গান গাইবার জন্য তাকে অনুরোধ করলে।

আর দুখানা গান গেয়ে মথুরানাথ বললে, "বাবুজী, হামার তিনখানা গান শুনলেন, এবার হামার সকেরিদ উষামায়ীর একখানা গান শুনুন। এ হামি জোরসে বলতে পারি বাবুজী, সারা লখনউ শহরমে উষামায়ীর মাফিক্ সুরেলা

কণ্ঠ দুসরা না আছে। মায়ী তো রেওয়াজ করে না, শুধু হামার গান শোনে। রেওয়াজ করলে মায়ী সারা হিন্দুস্থানকে পরাস্ত্‌ করতে পারে।"

প্রিয়লাল বললে, "মনে মনে তা হ'লে ঠিকই ভাবছিলাম যে, যে-বাড়িতে গানবাজনার এত ব্যবস্থা সেখানে তার একটা গুরুতর কারণ না থেকে যায় না।" তার পর অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সন্ধ্যাকে গান গাইবার জন্য অনুরোধ করলে।

আরক্তমুখে সন্ধ্যা বললে, "না না, আমি গাইব না। ওস্তাদজী আমাকে ভালবাসেন তাই ও সব কথা বললেন। ও-সব কথা ঠিক নয়।"

সন্ধ্যার কথা শুনে মথুরনাথ হাসতে লাগল, বললে, "আমি তোমাকে ভাল-বাসি মায়ী, সে বাত্‌ ঠিক আছে। লেকিন তোমার বারে যা সব বাত বলেছি সে-ভি ঠিক আছে।"

প্রিয়লাল বললে, "আপনি যে গান গাইতে পারেন, আর ভাল গাইতে পারেন—চৌবেজীর কথা থেকে এ বিশ্বাস আমার হয়েছে। এর পর আপনি যদি না গান তা হ'লে এই বুঝব যে, যে-আনন্দ আপনি আপনার অতিথিকে অনায়াসে দিতে পারতেন তা ইচ্ছে ক'রেই দিলেন না,—সুতরাং আপনার আতিথ্যধর্মে দোষ পড়ল।" মথুরানাথের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "কি বলুন চৌবেজী, ঠিক কি না?"

হো-হো ক'রে হেসে উঠে মথুরানাথ বললে, "বহুৎ ঠিক আছে।"

অনেক ওজর আপত্তির পর সন্ধ্যা যখন দেখলে যে একটা গান না গাইলে প্রিয়লাল সত্যি ক্ষুণ্ণ হবে, তখন অগত্যা সে গাইবার জন্য প্রস্তুত হ'ল।

প্রায় চার বৎসর সন্ধ্যা মথুরানাথের নিকট গান শিখছে। কাশীতেই প্রমথ সন্ধ্যার গান গাইবার অসাধারণ শক্তির পরিচয় পেয়েছিল। প্রমথ নিজেও সঙ্গীতের বিশেষ অনুরাগী এবং একজন শিক্ষিত গায়ক। লক্ষ্ণৌয়ে এসেই সে তথাকার প্রসিদ্ধ ওস্তাদ মথুরানাথকে নিযুক্ত করে। চার বৎসর মথুরানাথের

নিকট সন্ধ্যা গান শিক্ষা করছে বটে, কিন্তু এই চার বৎসরের মধ্যে যতক্ষণ সময় সে মথুরানাথের মুখে গান শুনেছে, তার এক-চতুর্থ অংশও নিজে গানের চর্চা করে নি। গানের ঘরে তার জন্য একটি অর্ধ-হেলা আরাম-কেদারা ছিল, তাইতে উপবেশন ক'রে মুদিত নেত্রে নিমজ্জিত মনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে মথুরানাথের গান শ্রবণ করত। সে সময়ে তার মনে হ'ত, সুরের সচল স্রোতে অবগাহন করতে করতে তার পরিক্লিন্ন আত্মা নির্মল হয়ে উঠছে, নিরাময় হয়ে আসছে। সঙ্গীতকে সে বিলাস-বস্তুর মতো গ্রহণ করে নি, আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় স্বরূপ গ্রহণ করেছিল। তাই একমাত্র প্রমথ ভিন্ন অপর কারও অনুরোধে সহজে সে গান গাইত না।

সন্ধ্যা চেয়ার পরিত্যাগ ক'রে ফরাসের উপর উঠে বসল। তার পর দু-চার মোচড়ে তার ছোট তানপুরাটা ঠিক ক'রে নিয়ে মথুরানাথের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "কি গাইব আদেশ করুন ওস্তাদজী।"

মনে মনে একটু চিন্তা ক'রে মথুরানাথ বললে, "সেই ভূপালীটা গাও মায়ী, সে গানটা খুব সুন্দর আছে—'মেরে ঘর বাজে'।"

সে গানের অর্থ, বিশেষত অন্তরা-অংশের অর্থ, স্মরণ ক'রে সন্ধ্যার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। এ পর্যন্ত যা কোনো দিন করে নি তাই করল— প্রতিবাদ ক'রে বললে, "ও-গানটা ভাল হবে না। অন্য কোনো গান বলুন ওস্তাদজী।"

সন্ধ্যার আপত্তির প্রকৃত কারণের কাছ দিয়েও না গিয়ে মথুরানাথ সবেগে বললে, "না না, খুব ভাল হবে, তুমি গাও। এখন ভূপালীর লগন আছে, ও-গান খুব জমবে।"

আর আপত্তি করলে আপত্তির নিগূঢ় কারণটিকেই হয়তো প্রকট ক'রে তোলা হবে আশঙ্কা ক'রে সন্ধ্যা তানপুরাটা তুলে নিয়ে তার উপর মাথার বাম দিকটা স্থাপন ক'রে একাগ্র মনে সুর ছাড়তে লাগল; তার পর মাত্র দু-চার

মিনিট ভূপালীর স্বরগ্রামটা একটু ভেঙে নিয়ে হঠাৎ এক মুহূর্তে গাইতে আরম্ভ করলে—

মেরে ঘর বাজে
সরস সুন্দর বীণা মৃদঙ্গ।
বহুত দিনন পর পিযা ঘর আযে
সব মিলি গাযে রসকি তান॥

অর্থাৎ,

আমার গৃহে সরস সুন্দর
বীণা মৃদঙ্গ বাজে।
বহুদিন পরে প্রিযতম ঘরে এসেছেন,
সকলে মিলে গাও সরস তানে॥

গান তো এইটুকু, এই তো এক ফোঁটা তার অর্থ, কিন্তু তান বাঁট সার্গম বিস্তার দিয়ে এই গান সন্ধ্যা আধ ঘণ্টা ধ'রে গায়। আজ কিন্তু সে তেমন কিছুই করলে না। দু-চারটে ছোট ছোট তান দিয়ে বার তিনেক গানটা গেয়ে অল্পক্ষণেই শেষ করলে। কিন্তু কোথা থেকে তার মধ্যে এল এমন-একটা প্রাণস্পর্শী দরদ যে, গান যখন থামল তখন শুধু সন্ধ্যারই নয়, দেখা গেল প্রিয়লালেরও চোখ সজল হয়ে এসেছে।

এই বাঁট-বিস্তারহীন গান ওস্তাদ মথুরানাথকেও এত মুগ্ধ করলে যে, সে তার দক্ষিণ হস্ত উত্তোলিত ক'রে বললে, "ধন্য বেটী, ধন্য! আশ্চর্য। এ গান তুমি এত ভাল কোনোদিন গাও নি।"

প্রিয়লাল বললে, "মিসেস মুখার্জি, চৌবেজী বলছেন আপনি ধন্য, কিন্তু আমি বলছি, আমিই ধন্য! কি অদ্ভুত গান আপনি গাইলেন। অদ্ভুত ছাড়া একে আমি আর কিছুই বলব না।"

প্রিয়লালের কথা শুনে মথুরানাথ হাসতে লাগল, বললে, "আর গান শুনবেন বাবুজী?"

প্রিয়লাল বললে, "আজ আর না চৌবেজী, আজ মন ভ'রে গেছে, অন্য দিন আবার হবে।"

"ঠিক বাত।" ব'লে মথুরানাথ তানপুরার খোলটা টেনে নিয়ে তানপুরায় পরাতে শুরু করলে।

মথুরানাথ এবং তার তবলচী প্রস্থান করলে প্রিয়লাল বারান্দায় গিয়ে ঈজি-চেয়ারে বসল। সন্ধ্যা গেল প্রিয়লালের আহারের তত্ত্বাবধানে। অল্পক্ষণ পরে ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করলে, "ডক্টর চৌধুরী, আপনার খাবার এখন দেবে?"

"এখনি না দিলে এমন কোনো অসুবিধে হবে কি?"

সন্ধ্যা বললে, "কিচ্ছু না, যখন আপনার ইচ্ছে হবে তখনি দেবে।"

"তা হ'লে আধঘণ্টাটাক পরে দিলেই হবে। কিন্তু আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন মিসেস মুখার্জি? বসুন।"

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে সন্ধ্যা বসল। তার পর ক্রমশ নানা বিষয়ে কথা উঠল,—সন্ধ্যার গানের কথা; লক্ষ্ণৌর স্বাস্থ্যের কথা; সেখানকার বাঙালী সমাজের কথা; অবশেষে প্রমথর কথা।

প্রিয়লাল বললে, "প্রমথর উদার অন্তঃকরণের যতটুকু পরিচয় আমি পেয়েছি তাতে আমি তাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তাকে ভালবাসি কেন জানেন মিসেস মুখার্জি?"

মৃদুকণ্ঠে সন্ধ্যা বললে, "না, তা জানি নে।"

"সে আপনার স্বামী ব'লে। মহাভাগ্যবান পুরুষ সে। আমি তার সৌভাগ্যের পরিমাণ আমার দুর্ভাগ্য দিয়ে চমৎকার মাপতে পারি। যে সম্পদ লাভ করেছে ব'লে আমি তাকে ভাগ্যবান বলছি, আমি ঠিক সেই জিনিস হারিয়েছি মিসেস মুখার্জি।"

"মিসেস মুখার্জি!"

এক মুহূর্ত বিলম্ব ক'রে মৃদু-কম্পিত কণ্ঠে সন্ধ্যা বললে, "আজ্ঞে?"

"আমি হয়তো আমার ব্যক্তিগত সুখদুঃখের কথা দিয়ে আপনাকে বিরক্ত করছি, হয়তো আপনাকে 'অফেন্স' দিচ্ছি, কিন্তু একটা কথা যদি অনুগ্রহ ক'রে স্মরণ রাখেন, তা হ'লে বোধ হয় আপনার মনে আমার প্রতি একটু সহানুভূতিও জাগতে পারে। সে কথাটা একবার গাড়িতে কতকটা আপনাকে বলেছিলাম, আর একবার ভাল ক'রে বলবার আগে একটা গল্প বলি, তা হ'লে বোধ হয় আমার মনের অবস্থা অনেকটা বুঝতে পারবেন। আমাদের পাড়াতে মানিকের মা নামে একটি বিধবা স্ত্রীলোক ছিল, তার একমাত্র সন্তান ছিল মানিক। সেই সতেরো আঠার বৎসরের ছেলে মানিক, বিধবার নয়নের মণি, হঠাৎ একদিন তিন দিনের জ্বরে মার কোলে মাথা রেখে মারা গেল। দুঃখে শোকে মানিকের মা তো একেবারে পাগল হয়ে গেল। কিন্তু সে সত্য-সত্যই পাগল হ'ল মাস ছয়েক পরে একদিন, যেদিন তাদের পাশের বাড়িতে একটি সতেরো-আঠার বৎসরের আত্মীয়ের ছেলে এসে উপস্থিত হ'ল। মানিকের সঙ্গে সে ছেলেটির আশ্চর্য রকমের মিল,—বয়সের মিল, আকৃতির মিল, এমন কি কণ্ঠস্বরেরও মিল। একদিন হঠাৎ সে ছেলেটিকে দেখতে পেয়ে মানিকের মা পাগলের মতো তাকে জড়িয়ে ধরলে, তার পর 'ওরে আমার মানিক রে!' ব'লে সে কী কান্না! ছেলেটি তো অবাক! তার পর তাকে কী আদর-যত্ন, কী খাওয়ানো-দাওয়ানো, কী জিনিস পত্র উপহার দেওয়া! তার পর মাসখানেক পরে যেদিন মানিকের মার কাছে বিদায় নিয়ে ছেলেটি নিজের বাড়ি চ'লে গেল, সেদিন মানিকের মার কি নিদারুণ কান্না! সেদিন যেন আবার নতুন ক'রে মানিকের মৃত্যু হ'ল, এমনি ব্যাপার! বুদ্ধি দিয়ে মানিকের মা বেশ জানে যে, ও-ছেলেটি মানিক নয়, মানিক ছ মাস হ'ল তারই কোলে মাথা রেখে মারা গেছে—তবু মনের দিক দিয়ে তার ওপর মানিকেরই মতো প্রবল আকর্ষণ। আপনাকে নিয়ে আমারও হয়েছে মানিকের মার অবস্থা। বুদ্ধি দিয়ে বেশ জানি যে আপনি সে নন, অপর লোক; কিন্তু কর্মাটারে গাড়িতে উঠে আপনাকে হঠাৎ

দেখে যে চমকান্টা চমকে উঠেছিলাম তার বেগ তো এখনও থামল না! অহেতুক হ'লেও সেই বেগ থেকে আপনার ওপর এমন একটা প্রবল আকর্ষণ জন্মেছে, যার জন্যে সত্যিই বিব্রত হয়ে আছি। সেই আকর্ষণের উপদ্রবে যদি মাঝে মাঝে আমার কথায় বা ব্যবহারে একটু অসংযম দেখতে পান, তা হ'লে মানিকের মার গল্প মনে ক'রে আমাকে ক্ষমা করবেন মিসেস মুখার্জি। বাস্তবিক, আমার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার আশ্চর্য রকম মিল। শুধু বয়সে আর আকৃতিতেই নয়, নামেও। আপনার নাম উষা, আর আমার স্ত্রীর নাম ছিল সন্ধ্যা; বেশি তফাত নয়, মাত্র ঘণ্টা বারোর তফাত!" ব'লে প্রিয়লাল হাসতে লাগল।

"মা!"

চমকিত হয়ে সন্ধ্যা চেয়ে দেখলে, পিছনে সাধুচরণ দাঁড়িয়ে।

"কি সাধু?"

"ডাক্তার সাহেবের খেতে যদি দেরি থাকে তো তুমি খেয়ে নাও না। তোমার আবার পিত্তি পড়লে মাথা ধরে।"

সাধুচরণের কথা শুনে যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হয়ে সন্ধ্যা বললে, "আচ্ছা আচ্ছা, তুমি যাও। তোমার ও-সব ভাবতে হবে না।"

প্রিয়লাল বললে, "তা বেশ তো এবার আমারও খাবার দিক, রাত হয়েছে অনেক।

দুর্বোধ্যভাবে ভন্ ভন্ ক'রে কি বকতে বকতে সাধুচরণ প্রস্থান করলে। স্পষ্ট বোঝা গেল, তার সহৃদেশ্যের প্রতি অবিচারের জন্য সে প্রসন্ন হয় নি।

সকৌতূহলে প্রিয়লাল জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা, সাধুচরণ আমাকে ডাক্তার সাহেব ব'লে সাব্যস্ত কেন করলে বলতে পারেন মিসেস মুখার্জি?"

মৃদু হেসে সন্ধ্যা বললে, "আপনি সাহেবের পোশাক প'রে এসে তার কাছে ডাক্তার চৌধুরী ব'লে পরিচয় দিয়েছিলেন, বোধ হয় সেই জন্যে।"

শুনে প্রিয়লাল হাসতে লাগল।

খাবার টেবিলে একজনের খাবার দেখে প্রিয়লাল বললে, "শুধু আমার কেন?—আপনার?"

"আমি পরে খাব অখন।"

"কেন মিসেস মুখার্জি?—বিলম্ব ক'রে লাভ কি? আপনারও দিতে বলুন না।"

সন্ধ্যা কিন্তু স্বীকৃত হ'ল না, যত্নপূর্বক প্রিয়লালকে খাইয়ে তাকে বাথরুমের দ্বার পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে দ্রুতপদে প্রিয়লালের শয়ন-কক্ষের দিকে প্রস্থান করলে।

বাথরুম থেকে ফিরে এসে প্রিয়লাল দেখলে, হরিয়া নিকটে দাঁড়িয়ে আছে, আর সন্ধ্যা তার বিছানায় মশারি গুঁজে দিচ্ছে। ব্যগ্রস্বরে বললে, "আপনি কেন নিজে করছেন মিসেস মুখার্জি? হরিয়া তো রয়েছে।"

সন্ধ্যা বললে, "তা হোক, ওরা হয়তো কোনো দিকে ফাঁক রেখে দেবে, মশা ঢুকবে।"

"মশা আছে নাকি?"

"যথেষ্ট।"

"কিন্তু মশারি তো আমার ছিল না।"

"এটা এখানকার মশারি। বিছানার সঙ্গে কিন্তু সর্বদা জুটো ক'রে মশারি রাখবেন।"

মশারি গোঁজা হয়ে গেলে সন্ধ্যা বললে, "কুঁজোয় জল আছে, আর টেবিলের উপর গেলাস রইল। রাত হয়েছে, এবার আপনি শুয়ে পড়ুন। কোনো দরকার হ'লে হরিয়াকে বলবেন বারান্দায় সে শুয়ে থাকবে।"

প্রিয়লাল বললে, "আপনার অনেক কষ্ট হ'ল, এবার গিয়ে খেতে বসুন। আচ্ছা, নমস্কার।"

"নমস্কার!"—বারান্দার আলো-ছায়ার মধ্য দিয়ে সন্ধ্যা নিজের ঘরের দিকে চ'লে গেল।

উনচল্লিশ

বেলা আটটা বাজে। চা পানের পর বারান্দায় ঈজি-চেয়ারে ব'সে প্রিয়লাল সেদিনকার সংবাদপত্র পাঠ করছিল। হঠাৎ এক সময়ে উপলব্ধি করলে, যে বিষয়টা তখন পড়ছিল তার আট-দশ ছত্র পড়া হয়ে গেছে বটে, কিন্তু কী যে পড়েছে তার বিন্দুমাত্র চেতনা নেই। মন যতক্ষণ বিনা নোটিসে বিষয়ান্তরে ডুব মেরেছিল, চক্ষু ততক্ষণ শ্রেণীবদ্ধ অক্ষরগুলোর উপর নিরর্থক বিচরণ ক'রে বেড়িয়েছে, সামান্য মাত্রও তার মর্মগ্রহণ করতে পারে নি। বিরক্ত হয়ে প্রিয়লাল কাগজখানা ভাঁজ ক'রে পাশের টেবিলে রেখে দিলে। মনটা হয়ে উঠল উৎকণ্ঠিত, অপ্রসন্ন।

আজ আট দিন হ'ল সে লক্ষ্ণৌ পৌঁছেছে, কিন্তু আট দিন পূর্বে লক্ষ্ণৌ স্টেশন থেকে মনের যে চাঞ্চল্য নিয়ে এসেছিল তা উপশমিত হওয়া তো দূরের কথা, উত্তরোত্তর প্রবলতরই হয়েছে। এই চঞ্চলতা যে শুধু চিত্তের গোপন মহলেই নিবদ্ধ নয়, বাহিরেও তার কিছু প্রকাশ আছে—তা সে বুঝতে পারে, কিন্তু তাকে রোধ করতে পারে না। বাহিরে তার যতটুকু প্রকাশ, তার আকৃতি এবং পরিমাণ হয়তো এমন যা অপর পক্ষের মনে বিরক্তি এবং বিস্ময় উদ্রেক করতে পারে, কিন্তু যা নিয়ে স্পষ্ট প্রতিবাদ করা চলে না। হয়তো আতিথ্যধর্ম পালনের অনুরোধে সহৃদয়া মিসেস মুখার্জি সেটুকু তিতিক্ষার সহিত পরিপাক করেন, কিন্তু মনে মনে তাকে কামিনীপরায়ণ বিশ্বাসহন্তা ব্যক্তির শ্রেণীতে স্থান দেন। অথচ, বস্তুত সে যে একেবারেই তা নয়, এ সে কেমন ক'রে বোঝাবে! কেমন ক'রে বোঝাবে যে, মিসেস মুখার্জির প্রতি তার আকর্ষণ কামজ নয়, সে আকর্ষণের সহিত মিসেস মুখার্জির দেহের কোনো সম্পর্ক নেই, একমাত্র যে বস্তুর সহিত আছে তা তার পরলোকগতা স্ত্রীর আকৃতির সহিত মিসেস মুখার্জির আকৃতির বিস্ময়জনক সাদৃশ্য।

প্রিয়লাল স্থির করলে, যে প্রকারে হোক সেই দিনেই প্রকৃত কথাটা সন্ধ্যার নিকট স্পষ্টতর করবে, নচেৎ তার পক্ষ থেকে অতিথির ধর্ম হয়তো পদে পদে ক্ষুণ্ণ হতেই থাকবে।

"হরিয়া!"

হরিয়া প্রিয়লালের ধৌত বস্ত্রাদি রৌদ্রে দেবার জন্য নিয়ে যাচ্ছিল, নিকটে এসে বললে, "হজুর?"

"তোমার মা কোথায় আছেন?"

অনুসন্ধান ক'রে এসে হরিয়া জানলে, সন্ধ্যা কম্পাউণ্ডে চন্দ্রমল্লিকার চারাগুলি পর্যবেক্ষণ করছে। ঘরে গিয়ে স্যুট্‌কেস থেকে একটা কি বার ক'রে পকেটে পুরে প্রিয়লাল সন্ধ্যার নিকট উপস্থিত হ'ল। সন্ধ্যা তখন ভূমিতলে হাঁটু গেড়ে ব'সে ছোট একটা কাঁচি দিয়ে সযত্নে একটি চন্দ্রমল্লিকার চারার পাতা ছাঁটছিল, প্রিয়লালকে দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে স্মিতমুখে বললে, "আসুন।"

প্রিয়লাল বললে, "স্বহস্তে পরিচর্যা করছেন মিসেস মুখার্জি?"

সন্ধ্যা বললে, "এতগুলি গাছের মধ্যে দশ রকমের দশটি গাছ আমার নিজের পরিচর্যায় আছে, বাকি মালীর পরিচর্যায়। কার গাছের ফুল বড় হয়, তা নিয়ে মনে মনে মালীর সঙ্গে একটা প্রতিযোগিতা নেই তা বলতে পারি নে; যদিও এ কথাও মনে মনে বেশ জানি যে, মালীর কাছে আমার হার সুনিশ্চিত।" ব'লে হাসতে লাগল।

প্রিয়লাল সহাস্যমুখে বললে, "আমি যদি আপনার দশটি গাছের মধ্যে একটি গাছ হতাম মিসেস মুখার্জি, তা হ'লে আপনার কাঁচির আঘাত খেয়ে এমন একটি অদ্ভুত ফুল আপনাকে উপহার দিতাম যাতে শুধু আপনার নিজের মালীই নয়, সারা লক্ষ্ণৌ শহরের মালী আপনার কাছে হার মানত।"

সন্ধ্যা এ কথার কোনো উত্তর দিলে না, শুধু তার মুখখানা ঈষৎ আরক্ত হয়ে উঠল।

"মিসেস মুখার্জি!"

নিঃশব্দে সন্ধ্যা প্রিয়লালের, প্রতি দৃষ্টিপাত করলে।

"আমি বুঝতে পারছি মিসেস মুখার্জি, মানিকের মার গল্পটা আজকাল আপনার একটু বেশি বেশি মনে করবার দরকার হচ্ছে, কিন্তু আমার মনের প্রকৃত অবস্থাটা একবার যদি আপনি একটু ভাল ক'রে বুঝে নেন, তা হ'লে আর আপনার মনে কোনোরকম সঙ্কোচ আসে না, এ আমি নিশ্চয় বলতে পারি। অনুগ্র২ ক'রে এখন যদি আপনি মিনিট দশ পনরো সময় আমাকে দিতে পারেন, তা হ'লে আমরা ওই বাদামগা'ছতলায় বেঞ্চিতে গিয়ে একটু বসি।"

মৃদুস্বরে সন্ধ্যা বললে, "কিন্তু আমি তো আপনার মনের কথা জানি ডক্টর চৌধুরী।"

প্রিয়লাল বললে, "জানেন। কিন্তু আজ আপনার কাছে আমি তার একটা প্রমাণ দিতে চাই,—একটা ট্যান্‌জিব‌ল্‌ প্রমাণ।"

"প্রমাণের কোনো দরকার আছে কি?"

"একটু আছে। শুধু মুখের কথা, আর প্রমাণাশ্রিত কথা—এ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ আছেই। প্রমাণটা পেলে আপনি একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারবেন।"

নিশ্চিন্ত হওয়া তো দূরের কথা, প্রিয়লালের কথায় আপাতত সন্ধ্যা উদ্বিগ্নই হয়ে উঠল, কটিদেশে নিবদ্ধ চামড়ার ব্যাগে কাঁচিটা রেখে মৃদুস্বরে বললে, "আচ্ছা, চলুন।"

উভয়ে বেঞ্চে গিয়ে উপবেশন করলে প্রিয়লাল বললে, "এ কথা বললে কোনো দিক দিয়ে যদি রূঢ়তা প্রকাশ পায় তা হ'লে আমাকে অনুগ্রহ ক'রে ক্ষমা করবেন মিসেস মুখার্জি। কিন্তু এ কথা প্রথমেই বলা দরকার যে, বন্ধুর স্ত্রীর প্রতি বন্ধুর একান্ত সঙ্গত যেটুকু আকর্ষণ থাকতে পারে, আপনার প্রতি আমার তার বেশি এক বিন্দু আকর্ষণ নেই। মাঝে মাঝে যদি কিছু অতিরিক্ত

আকর্ষণের পরিচয় পেয়ে থাকেন, নিশ্চয় জানবেন সে আকর্ষণের লক্ষ্য আপনি নন, আপনি তার উপলক্ষ্য ; তার একমাত্র লক্ষ্য আমার স্বর্গীয়া স্ত্রী সন্ধ্যা। এ কথা আপনি বিশ্বাস করেন তো মিসেস মুখার্জি ?"

ভূমিতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে মৃদুস্বরে সন্ধ্যা বললে, "করি।"

"করেন জানি, কিন্তু যে প্রমাণটা এখনি আপনাকে আমি দিচ্ছি, সেটা পেলে আপনার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হবে।" ব'লে পকেট থেকে সেই কাগজটা বার ক'রে সন্ধ্যাব অনুৎসুক হাতে দিয়ে বললে, "এটা আমার স্ত্রী সন্ধ্যার ফোটোগ্রাফ। আচ্ছা, একটা আরসির সামনে দাঁড়িয়ে আপনার আকৃতির সঙ্গে এই ফোটোগ্রাফটা মিলিয়ে দেখে সত্যি ক'রে বলুন দেখি, কর্মাটারে গাড়িতে আপনাকে দেখে যে চমকে উঠেছিলাম সেটা বিশেষ অন্যায় হয়েছিল কি-না!" ব'লে প্রিয়লাল নিজের প্রতিপাদ্য বিষয়ের অখণ্ডনীয়তার প্রত্যয়ে হাসতে লাগল।

নিরুদ্ধ নিশ্বাসে সন্ধ্যা ক্ষণকাল ফোটোটার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে রইল। এ সেই ফোটো যা তার বিবাহের প্রস্তাবকালে প্রিয়লালদের গৃহে প্রেরিত হয়েছিল। প্রিয়লাল ফোটোটা হস্তগত করেছিল এবং বিবাহের তিন-চার দিন পরে সন্ধ্যাকে দিয়ে ফোটোর তলায় নাম লিখিয়ে নিয়েছিল। সন্ধ্যা শুধু দুটি কথা লিখে দিয়েছিল, "তোমার সন্ধ্যা।" এতদিন পরেও লেখাটা সদ্য টাটকা লেখার মতো জ্বলজ্বল করছে। কম্পিত হস্তে সন্ধ্যা ফোটোখানা প্রিয়লালকে ফিরিয়ে দিলে।

"মিলিয়ে দেখলেন না মিসেস মুখার্জি ?"

মৃদুকণ্ঠে সন্ধ্যা বললে, "মেলাবার দরকার নেই, বুঝতে পারছি।"

প্রসন্নমুখে প্রিয়লাল বললে, "তা হ'লে এ কথাও বুঝতে পারছেন যে, আপনি আমার পক্ষে এমন অদ্ভুত একটি মিডিয়াম যার মধ্যে দিয়ে আমি অনায়াসে সন্ধ্যার, অন্তত সন্ধ্যার স্মৃতির, নাগাল পেতে পারি। মূর্তিপূজো

ক'রে মানুষে যেমন ভগবানকে পাবার চেষ্টা করে, আমিও ঠিক তেমনি ভাবে আপনার দ্বারা সন্ধ্যাকে পাবার চেষ্টা করি। আপনি তো জানেন মিসেস মুখার্জি, শুধু ফিজিক্যাল পাওয়াই পাওয়া নয়, স্পিরিচুয়্যাল পাওয়াও খুব একটা বড় রকমের পাওয়া।"

এ কথার উত্তরে সন্ধ্যা কোনো কথা বললে না, স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল। অদূরে মেহগিনি গাছে একটা ঘুঘু নিরবসর ডেকে চলেছিল। তার একটানা করুণ স্বরের পীড়নে বাগানের সে অঞ্চলটা আর্ত হয়ে উঠেছিল।

"মিসেস মুখার্জি!"

মুখ তুলে প্রিয়লালের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "আজ্ঞে?"

"সন্ধ্যার ফোটো দেখার পর এখন যখন আপনি অবস্থাটা সম্পূর্ণ বুঝতে পেরেছেন তখন আপনার কাছে একটা প্রার্থনা করব কি? এ কিন্তু এমন অদ্ভুত খেয়ালের কথা যে, শুনে হয়তো আপনি আমাকে পাগল ব'লে মনে করবেন। মনে করলে অবশ্য এমন কিছু অন্যায় করা হবে না, কারণ নিজের স্ত্রীর প্রতি যে আমার মতো গভীর অত্যাচার করতে পারে তার তো পাগল হওয়াই উচিত। যদি ধৃষ্টতা মার্জনা করেন, তা হ'লে আমার প্রার্থনাটা নিবেদন করি।" ব'লে প্রিয়লাল উৎসুক নেত্রে সন্ধ্যার দিকে চেয়ে রইল।

বিহ্বলভাবে প্রিয়লালের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "কি বলুন।"

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে প্রিয়লাল বললে, "আমার প্রার্থনা,—একদিনের জন্যে—শুধু একদিনের জন্যে অনুগ্রহ ক'রে আমাকে ভাবতে অনুমতি দিন যে, আপনি যেন মিসেস মুখার্জি নন,—আপনি যেন সন্ধ্যা। কালকের দিনই সেই দিন করা যাক। কাল সকালে উঠে প্রথম দর্শনে আপনাকে বলব 'সুপ্রভাত সন্ধ্যা!' আপনি অবশ্য কোনো উত্তর দেবেন না, চুপ ক'রে

থাকবেন। আপনার হবে মূক অভিনয়, আমার হবে মুখর। আমি বলব, 'ওগো, কথা কও, কথা কও। তোমার পাষাণের মতো অভিমানের অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এসে অপরাধী স্বামীকে দণ্ড দাও, তিরস্কার কর। শুধু তাকে উপেক্ষা ক'রে দূরে রেখো না।' এই রকম দুঃখে খেদে আরাধনায় সমস্ত দিনটা আমার কেটে যাবে অস্থিরতার চঞ্চলতার মধ্যে। আপনি কিন্তু তার মধ্যে থাকবেন প্রতিমার মতো স্তব্ধ অনড়। ক্রমশ আমিও নিশ্চল নীরব হয়ে আসব। অবশেষে গভীর রাত্রের কোনো-এক মুহূর্তে অতি সংক্ষেপে বিদায়ের পালা শেষ হবে। শুধু বলব, 'বিদায় সন্ধ্যা, বিদায়!' সেই বিসর্জনের অনুষ্ঠানের মধ্যে পুনরাগমনের কোনো প্রার্থনা থাকবে না। তার পরদিন সকালে আপনি আবার যে-মিসেস মুখার্জি সেই মিসেস মুখার্জি। কি বলুন? আমার প্রার্থনা—"

সন্ধ্যার মুখে হঠাৎ দৃষ্টিপাত ক'রে প্রিয়লাল উৎকণ্ঠিত স্বরে বললে, "ও কি মিসেস মুখার্জি! অমন করছেন কেন?" তারপর সাড়া না পেয়ে তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে সন্ধ্যার দুই কাঁধ ধ'রে সজোরে নাড়া দিয়ে উচ্চকণ্ঠে ডাকলে, "মিসেস মুখার্জি! মিসেস মুখার্জি!"

চকিত হয়ে সন্ধ্যা তার নিমীলিতপ্রায় চক্ষু উন্মীলিত ক'রে চেয়ে দেখলে, তার পর রক্তশূন্য ওষ্ঠাধরে অতি ক্ষীণ হাস্যরেখা স্ফুরিত হ'ল।

চিন্তিতমুখে প্রিয়লাল বললে, "একটু ভাল বোধ করছেন কি?"

অপ্রতিভ হয়ে সন্ধ্যা বললে, "ও কিছু নয়। নিশ্বাসটা কেমন চেপে এসেছিল, তাই শরীরটা একটু বেভাব হয়েছিল।"

"আগে কখনও এ রকম হয়েছিল?"

সন্ধ্যা বললে, "হ্যাঁ, আর একবার হয়েছিল।" জামসেদপুর থেকে পিতৃগৃহে যেদিন যায় সেদিনকার কথা তার মনে পড়ল।

"ডাক্তার ডাকাব মিসেস মুখার্জি?"

হাত নেড়ে সন্ধ্যা বললে, "না, কিছু দরকার নেই।"

"তা হ'লে একটু বিশ্রাম নেবেন চলুন।"

বিশ্রাম নেবার প্রস্তাব কিন্তু আর বেশি দূর অগ্রসর হ'ল না, পদশব্দে উভয়ে চেয়ে দেখলে সাধুচরণ আসছে, চক্ষে ভ্রূকুটির তীক্ষ্ণতা, মুখমণ্ডলে অপ্রসন্নতার অন্ধকার। অজ্ঞাত কারণ বশত প্রথম থেকেই প্রিয়লালকে সাধুচরণের ভাল লাগে নি, সন্ধ্যার সহিত তার এই কয়েক দিনের ক্রম-বর্ধমান ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য ক'রে সেই অপ্রসন্নতা সবিশেষ বর্ধিত হয়েছিল; তার পর আজ দূর থেকে সন্ধ্যার দুই স্কন্ধে প্রিয়লালের হস্তার্পণ দেখে তার পিত্ত জ্ব'লে গিয়েছিল। নিকটে এসে রুক্ষ স্বরে সে ডাকলে, "মা!"

"কি সাধু।"

"টেলিগেরাম এসেছে যে।"

পদান্তের এই 'যে' শব্দটি নিরর্থক নয়, প্রিয়লালের চপল আচরণ অপ্রতিবাদে সহ্য করবার জন্য তা সন্ধ্যার প্রতি অনুক্ত তিরস্কারের সংজ্ঞা।

আগ্রহভরে সন্ধ্যা বললে, "কই, দেখি?"

নিকটে ছিল ব'লে প্রিয়লাল সাধুচরণের হাত থেকে টেলিগ্রামটা নিতে গেল, সাধুচরণ কিন্তু হাত 'সরিয়ে নিয়ে প্রিয়লালকে অতিক্রম ক'রে সেটা সন্ধ্যার হাতে পৌঁছে দিলে।

সাধুচরণের এই সুস্পষ্ট অশিষ্টতায় সন্ধ্যা মনে মনে রুষ্ট হ'ল, কিন্তু টেলিগ্রামটা খুলে পাঠ ক'রে সে এত খুশি হয়ে গেল যে, নিমেষের মধ্যে সমস্ত রোষ বিস্মৃত হয়ে সে সাধুচরণকেই বললে, "সাধু, উনি এখনি আসছেন।"

শুনে সাধু উৎফুল্ল হয়ে উঠল; একটু খাড়া হয়ে উঠে বললে, "দেখ দেখি, বাবু আসছেন, আর তুমি—!"

এই 'আর তুমি' কথা দুটিও পূর্বোক্ত 'যে' শব্দের সগোত্র।

প্রমথর আগমনের এই আকস্মিক সংবাদ প্রিয়লালের বোধ হয় খুব ভাল

লাগল না; মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে সন্ধ্যাকে জিজ্ঞাসা করলে, "কোন্ গাড়িতে প্রমথ আসছেন মিসেস মুখার্জি?"

প্রিয়লালের হাতে টেলিগ্রামটা দিয়ে সন্ধ্যা বললে, "নটার গাড়িতে,—যে গাড়িতে আমরা এসেছিলাম।" তার পর সাধুচরণকে সম্বোধন ক'রে বললে, "সাধু, সময় একেবারেই নেই, শীগগির মোটর বার করতে বল, আমি দু মিনিটে তয়ের হয়ে আসছি।" ব'লে তার কক্ষের দিকে অগ্রসর হ'ল। যেতে যেতে মনে হ'ল, প্রিয়লালকে স্টেশনে যাবার কথা একবার বলা উচিত। ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "ডক্টর চৌধুরী, আপনি স্টেশনে যাবেন?"

প্রিয়লাল বললে, "আনন্দের সঙ্গে।"

"বেশ, তা হ'লে আপনিই যান।"

"কেন? আপনি তা হ'লে যাবেন না না কি?"

"না। আমি তা হ'লে আর যাই নে।"

"কেন মিসেস মুখার্জি, দুজনেই যাই, চলুন না।"

সন্ধ্যা বললে, "আপনি গেলে আমার যাবার দরকার নেই। আমি বরং বাড়িতে থেকে ওঁর চা-টার ব্যবস্থা ঠিক ক'রে রাখি। আপনি একাই যান,—কেমন?"

একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে প্রিয়লাল বললে, "আচ্ছা, তাই না হয় যাই।"

প্রিয়লাল যখন স্টেশনে পৌঁছল, তখন গাড়ি ধীরে ধীরে প্ল্যাট্‌ফর্মে প্রবেশ করছে। দূর থেকেই দেখতে পেলে, প্রমথ জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চেয়ে আছে।

গাড়ি থামলে প্রমথ তাড়াতাড়ি নেবে প'ড়ে দুই হাত দিয়ে প্রিয়লালের দুই হাত সজোরে চেপে ধ'রে সহাস্যমুখে বললে, "কেমন আছ বল?"

"ভাল আছি। তুমি?"

"ভাল আছি। উষা কেমন আছে?"

কিছু পূর্বে সন্ধ্যার যে মোহাবেশের মতো হয়েছিল, সে কথা উল্লেখ না করাই সমীচীন মনে ক'রে প্রিয়লাল বললে, "ভালই আছেন। তোমার বন্ধুর খবর কি?"

প্রমথ বললে, "বন্ধুর খবর ভাল। এ যাত্রা সুরেশটা ভারি বেঁচে গিয়েছে।"

পথে যেতে যেতে প্রমথ জিজ্ঞাসা করলে, "উষার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় এ কয়েক দিনে একটু ঘনিষ্ঠ হ'ল তো প্রিয়লাল?"

সহাস্যমুখে প্রিয়লাল বললে, "একটু নয়, বিশেষ রকমই হয়েছে। এত বেশি হয়েছে যে, তিনি আমার বন্ধুর স্ত্রী, না, তুমি আমার বান্ধবীর স্বামী—সে বিষয়ে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে!"

মুখে কপট আতঙ্কের ছায়া লেপন ক'রে প্রমথ বললে, "ভাগ্যিস আরো দেরি ক'রে আসি নি! আরো পাঁচ-সাত দিন দেরি ক'রে এলে হয়তো আরো কঠিন কোনো প্রশ্ন তোলা যেতে পারত! কি বল প্রিয়লাল?"

প্রিয়লাল বললে, "তা হয়তো পারত। কারণ তা হ'লে ক্রমশ তাঁর সঙ্গে আমার এমন একটা আত্মীয়তা স্থাপিত হ'ত যে, প্রশ্নটা তখন দাঁড়াতে পারত—তিনি আমার বন্ধুর স্ত্রী, না, তুমি আমার আত্মীয়ার স্বামী।" ব'লে প্রিয়লাল হাসতে লাগল।

আর কোনো উত্তর না দিয়ে প্রমথও হাসতে লাগল।

গৃহে পৌঁছে অল্পক্ষণ সন্ধ্যা এবং প্রিয়লালের সহিত কথাবার্তার পর প্রমথ স্নান করবার জন্য বাথরুমে প্রবেশ করলে। স্নানান্তে চা পান করতে ব'সে সে সন্ধ্যাকে জিজ্ঞাসা করলে, "প্রিয়লাল কোথায় উষা?"

সন্ধ্যা বললে, "বাদামতলায় বেঞ্চে ব'সে বই পড়ছেন।"

সকৌতূহলে প্রমথ জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা, তোমার প্রতি ওর একটুও সন্দেহ হয় নি কি?"

সন্ধ্যা বললে, "সে কথা পরে বলছি, কিন্তু তার আগে আর একটা কথা

জিজ্ঞাসা করি। তুমি এই আট দিন আমাকে এভাবে ফেলে রেখেছিলে কেমন ক'রে? সুরেশবাবুকে একটু ভাল দেখার পর এলেও অন্তত তিন চার দিন আগে আসতে পারতে। আমাকে এইরকম একটা অত্যন্ত গোল-মেলে·অবস্থায় ফেলে রাখা তোমার উচিত হয়েছে কি?"

সহাস্যমুখে প্রমথ বললে, "আহা-হা! বুঝতে পারছ না? তোমাকে একটু পরীক্ষে করছিলাম।"

সন্ধ্যা বললে, "আর একটু বেশি পরীক্ষে করলে হয়তো ফেল করতাম।"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে প্রমথ বললে, "সর্বনাশ! আমার যে যা-কিছু সম্বল সবই তোমার ব্যাঙ্কে জমা! তুমি ফেল করলে আমি একেবারে দেউলে হ'তাম।"

"তবে?"

কপট অনুতাপের ভঙ্গীতে প্রমথ বললে, "স্বীকার করছি, গোঁয়ার্তুমি করা হচ্ছিল। তবে কি-না—" সন্ধ্যার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রমথ কথাটা চেপে গেল।

সন্ধ্যা কিন্তু কথাটাকে উপেক্ষা করলে না; বললে, "'তবে কি-না' কি বল?"

ভয়ে ভয়ে প্রমথ বললে, "তবে কি-না গোঁয়ার্তমির ফলে ব্যাঙ্ক ফেল হ'লে একেবারে মন্দও হ'ত না।"

"কি ভাল হ'ত শুনি?"

"ভাল আর এমন কি হ'ত, চিরকেলে বৈরিগী মানুষ আবার বৈরিগী হ'ত।"

"কেন, তুমি কি আমাকে তোমার বাঁধন ব'লে মনে কর?"

তাড়াতাড়ি এক চুমুক চা গলাধঃকরণ ক'রে সজোরে মাথা নেড়ে প্রমথ বললে, "আরে রাম রাম, তাও কখনো করি! তবে একেবারে করিও নে যে, তাও বলতে পারি নে। এক এক সময়ে বাঁধন ব'লেই মনে হয়, কিন্তু

পর-মুহূর্তেই মনে হয় বাঁধনটা আর একটু চেপে বসলেও মন্দ হয় না। মনের এই রকম একটা হ-য-ব-র ল অবস্থা আর কি!”

সন্ধ্যা বললে, “এই হ-য ব-র-ল অবস্থা থেকে তোমাকে মুক্তি দেবার উপায় আমার আছে, জানো?”

সন্ত্রস্ত মুখে প্রমথ বললে, “না, তা তো জানি নে। আছে না-কি? কি উপায় আছে?”

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে উচ্ছলোচ্ছ্বত হাস্যের আভাসকে গোপন ক'রে সন্ধ্যা বললে, “কেন, নবদ্বীপে গোঁসাইজীর আশ্রম?”

প্রমথ বললে, “সর্বনাশ! ও-কথাটা এখনো একেবারে ভোলো নি দেখছি! কিন্তু আশ্রমেই সেই যদি প্রবেশ করলে উষা, তা হ'লে বেচারা আমি কি অপরাধ করলাম বল? তবে আশ্রমের পরিবর্তে যদি অন্য কোনো উপায়ের আশ্রয় নিতে তা হ'লে না হয়—” কথা সমাপ্ত না ক'রে প্রমথ বিহ্বল নেত্রে সোজাসুজি সন্ধ্যার দিকে চেয়ে রইল।

সন্ধ্যা বললে, “চুপ ক'রে রইলে কেন? 'তা হ'লে না হয়' কি বল?”

প্রমথ বললে, “বলা অত্যন্ত কঠিন।” তার পর ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা ক'রে বললে, “তা হ'লে না হয় নিজেকে বেশ খানিকটে—”

কথাটা শেষ করবার সময় পাওয়া গেল না। বারান্দায় উঠবার সিঁড়ির নিকট হতে প্রিয়লালের প্রশ্ন শোনা গেল, “আসতে পারি?”

“নিশ্চয় পার। তোমার কথাই তো এতক্ষণ হচ্ছিল। এস, এস।” ব'লে প্রমথ প্রিয়লালকে সাগ্রহে আহ্বান করলে।

নিকটে এসে একটা চেয়ারে আসন গ্রহণ ক'রে প্রিয়লাল বললে, “বিশ্রম্ভালাপে কিন্তু বিঘ্ন উৎপাদন করলাম।”

প্রমথ বললে, “উৎপাদন যদি ক'রেই থাক তা হ'লে গুরুতর অপরাধ কর নি,

কারণ বিশ্রম্ভালাপ ক্রমশ বাদানুবাদে পরিণত হয়ে কলহের আকার ধারণ করছিল।"

সহাস্যমুখে প্রিয়লাল বললে, "কিন্তু দাম্পত্য-কলহটা উপাদেয় জিনিস ব'লেই শোনা আছে। সেই জিনিস থেকে তো আমি তোমাদের বঞ্চিত করলাম।"

প্রমথ বললে, "এ কথার আলোচনা পরে কোনো সময়ে করা যাবে, আপাতত তুমি যে আসন্ন কলহ নিবারিত ক'রে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছ, সেই কৃতজ্ঞতার বশীভূত হয়ে ঊষা তোমাকে এক পেয়ালা গরম চা অফার করেন কি-না দেখা যাক।"

"এ রকম কায়দা ক'রে কথা বললে, মিসেস মুখার্জির পক্ষে অফার করাও শক্ত, না করাও শক্ত।" ব'লে প্রিয়লাল হাসতে লাগল।

প্রমথর কথার ভণিতায় সন্ধ্যাও হেসে ফেলেছিল, বললে, "এক পেয়ালা চা দেব না-কি ডক্টর চৌধুরী?

প্রিয়লাল বললে, "স্টেশন থেকে আসার পর তো বড় এক গ্লাস শরবৎ দিয়েছেন, আবার এরই মধ্যে অসময়ে চায়ের দরকার নেই।"

প্রমথ বললে, "চায়ের সময়-অসময় নেই, সব সময়েই তার সুসময়। তখন তুমি শরবৎ না খেয়ে এক পেয়ালা চা খেলে আরও ভাল করতে। চায়ের বিষয়ে গ্লাড্‌স্টন্ কি বলতেন জান তো?"

স্মিতমুখে প্রিয়লাল বললে, "না।"

"গ্লাড্‌স্টন্ বলতেন, 'If you are too hot, it will cool you. If you are too cold, it will warm you. If you are depressed, it will cheer you. If you are to excited, it will calm you.' বৃদ্ধ ভদ্রলোক চায়ের এত অনুরাগী ছিলেন যে, যে-কোনো সময়ে অথবা যে-কোনো স্থানে হোক না কেন, এক পেয়ালা চা কেউ দিলে কখনো অস্বীকার করতেন না।"

সহাস্যমুখে প্রিয়লাল বললে, "চা যদি এতই উৎকৃষ্ট বস্তু, তা হ'লে না হয় এক পেয়ালা খাওয়াই যাক।"

টি-পট থেকে সুতপ্ত চা ঢেলে একটা খালি পেয়ালা পূর্ণ ক'রে সন্ধ্যা প্রিয়লালের সম্মুখে স্থাপিত করলে।

চা পান করতে করতে প্রিয়লাল বললে, "আমি তো আমার প্রতিশ্রুতি পালন করলাম প্রমথ,—এবার আমাকে বিদায় দাও।"

প্রমথ বললে, "বেশ কথা; কিন্তু তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি পালন করলেই আমি তোমাকে বিদায় দোব—এখন কোনো প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছিলাম কি? তা ছাড়া, উপস্থিত তো তুমি ভবঘুরের জীবন যাপন করছ, কিছুদিনের জন্যে না হয় আমাদের এখানেই ডেরা-ডাণ্ডা বাঁধলে?"

এ কথার উত্তর দিলে সন্ধ্যা। প্রমথর দিকে চেয়ে বললে, "কিন্তু দেখ, ডক্টর চৌধুরীর কথাই তো শুধু নয়, ফয়জাবাদে ওঁর একটি বন্ধু ওঁকে নাবিয়ে নেবার জন্যে স্টেশনে এসেছিলেন। ডক্টর চৌধুরী ফয়জাবাদে গিয়ে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে লাহোরে যাবেন, তার পর সেখান থেকে আরও কয়েক জনে মিলে কাশ্মীর রওনা হবেন,—এই ওঁদের কথা আছে। এ অবস্থায় ডক্টর চৌধুরীকে আর আটকে রাখা বোধ হয় উচিত হবে না।"

এ কথার উত্তর দিলে প্রিয়লাল, বললে, "না, ঠিক তা নয়। কাশ্মীর যাওয়া কিছুদিন পেছিয়ে দিলে অথবা একেবারে পরিত্যাগ করলেও এমন কিছু ক্ষতি হবে না, তবে—"

প্রিয়লালের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে প্রমথ বললে, "তবে এ কথার মীমাংসা পরে যা হয় করলেই হবে, উপস্থিত যতক্ষণ না খাবার তয়ের হচ্ছে, চল, বাদামগাছতলায় গিয়ে তিনজনে মিলে আড্ডা জমানো যাক।"

সন্ধ্যা বললে, "তোমরা যাও। আমি ওদিকে তোমাদের খাবারের তাগিদে একটু যাই।"

প্রিয়লাল বললে "যে খাবারের তাগিদে যাওয়ার জন্যে আপনার সঙ্গ থেকে আমাদের বঞ্চিত হতে হচ্ছে, সে খাবারকে কিন্তু আমরা অখাদ্য ব'লে মনে করব মিসেস মুখার্জি।"

প্রথম বললে, "অতিশয় সারবান কথা। কাটাবার বৃথা চেষ্টা ক'রো না উষা। হরিয়া!"

হরিয়া নিকটেই অপেক্ষা করছিল, সম্মুখে এসে বললে, "হুজুর?"

"বাদামতলায় তিনটে বেতের চৌকি দে।"

প্রভুর আদেশ পালনের জন্য হরিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করলে।

চল্লিশ

প্রমথর আসার পর আট দিন অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু এ পর্যন্ত প্রিয়লালের যাওয়া হয়ে ওঠে নি। এর মধ্যে কয়েকবারই সে যাওয়ার কথা তুলেছে বটে, কিন্তু তাকে নিরস্ত করতে প্রমথর বিশেষ বেগে পেতে হয় নি ; স্তিমিত উত্তাপের অগ্নি সামান্য জলসিঞ্চনেই নিবে গেছে। বিদায়ের প্রস্তাবে সন্ধ্যাও আরো বার দুই প্রিয়লালের পক্ষ অবলম্বন ক'রে দেখছে যে, আলোচনার মধ্যে যে ব্যক্তি ক্রমশ প্রতিপক্ষের দিকে গিয়ে দাঁড়ায়, তার পক্ষ অবলম্বন ক'রে তর্ক করা পণ্ডশ্রম মাত্র। সে জন্য সেও বিশেষ কিছু আর বলে না। তা ছাড়া, প্রমথ আসার পর থেকে গৃহকর্মের অছিলায় দূরে দূরে থাকবার সুযোগও অনেকটা সে পেয়েছে।

একজন প্রতিবেশিনীর গৃহে সামান্য একটা উৎসব ছিল, সন্ধ্যা গিয়েছিল সেখানে নিমন্ত্রিত হয়ে। প্রিয়লালও বাড়ি ছিল না, কোনও একটা বিশেষ প্রয়োজনে তার এক বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিল। একাকী প্রমথর ভাল লাগছিল না,—একটা চিঠি লিখলে ; সন্ধ্যার এসরাজটা নিয়ে কয়েকটা টাং-টুং দিলে ; অবশেষে একটা মোটা চুরুট ধরিয়ে বারান্দায় ঈজি-চেয়ারে শুয়ে একটা ইংরেজী উপন্যাসে মগ্ন হ'ল। কিছুক্ষণ পরে পদশব্দে চেয়ে দেখলে, সাধুচরণ এসে নিকটে দাঁড়িয়েছে। বললে, "কি সাধু, কোনো কথা বলবি না-কি ?"

মাথা চুলকে একটু ইতস্তত ক'রে সাধুচরণ বললে, "বলতেই তো এসেছি, কিন্তু তুমি রাগ করবে না তো ?"

উপন্যাসের একটা পাতা উল্টে প্রমথ বললে, "রাগ করব কেন ? কি কথা বল্ না।"

আর একটু প্রমথর সম্মুখে এসে কণ্ঠের স্বর ঈষৎ নিম্ন ক'রে সাধুচরণ বললে, "ডাক্তার সাহেব যেতে চাইলে আটকো নি বাবা, তোমার ও ডাক্তার সাহেব ভাল লোক নয়।"

প্রমথ বললে, "কেন রে, ডাক্তার সাহেব কি দোষ করলে? তোকে বকসিস্-টকসিস্ পয়সা-টয়সা দেয় না বুঝি?"

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে মুখ বিকৃত ক'রে সাধুচরণ বললে, "আরে, রেখে দাও তোমার বকসিস্ আর পয়সা! তোমার মতো দেনেওয়ালা মুনিব থাকতে আমি কারো পয়সার তোয়াক্কা করি কি-না! তোমার কাছে চেয়ে কখনো কোনো জিনিস পাই নি, বলতে পার?"

নিবে-যাওয়া চুরুটটা ধরিয়ে নিয়ে প্রথম বললে, "তা আসল কথাটা কি খুলে বল্ না?"

কি ভাবে কথাটা প্রকাশ করবে মনে মনে একটু চিন্তা ক'রে সাধুচরণ বললে, "ডাক্তার সাহেবের চরিত্তির ভাল নয়।"

সাধুচরণের দিকে দৃষ্টি উত্তোলিত ক'রে প্রমথ জিজ্ঞাসা করলে, "তা তুই কি ক'রে জানলি?"

বিস্ময়বিস্ফারিত মুখে সাধুচরণ বললে, "শোন কথা! দিবারাত্তির বাড়িতে রয়েছি আর জানব না আমি! দিন নেই রাত্তির নেই, সকাল নেই সন্ধ্যে নেই, খালি মায়ের পাছে পাছে ঘুরফির ঘুরফির! কানে কানে ফিস্‌ফাস্ ফিসফাস্! কেন রে বাপু, তুই বেটাছেলে, বাড়িতে এত বই রয়েছে, দু-চারখানা নিয়ে লেখাপড়া কর্ না! তা নয়, ফিস্‌ফাস্ ফিস্‌ফাস্! তার পর সেদিন দেখি, মার দুই কাঁধে দু হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একবার ভাবলাম, পিছন দিক দিয়ে গিয়ে দিই এক ঘা বসিয়ে। তার পর ভাবলাম, আমি চাকর, কাজ কি আমার অত দাপটে! চাকরের মতোই থাকা ভাল। হাতে তোমার টেলিগেরাম ছিল, সেইটে গিয়ে মাকে দিলাম।"

শুনে প্রমথর মুখ মলিন হয়ে উঠল; গম্ভীর মুখে বললে, "আচ্ছা সাধু, তুই যা।"

খানিকটা চ'লে গিয়ে পুনরায় ফিরে এসে সাধুচরণ বললে, "মার কি দোষ বল? একে মেয়েমানুষ, তায় বাড়িতে দোসরা বেটাছেলে নেই, কি করবে সে ছেলেমানুষে? তুমি আসার পর তবু একটু কমিয়েছিল, আবার দুদিন থেকে লাগিয়েছে ফিস্‌ফাস্ ফিস্‌ফাস্! তুমি ডাক্তার সাহেবকে বিদায় কর বাবা; আমি তোমাকে পষ্টো বলছি, ও লোক ভাল নয়।"

প্রমথ বললে, "আচ্ছা, হয়েছে সাধু, তুই এখন যা।"

ভন্‌ভন্ ক'রে কি বলতে বলতে সাধুচরণ প্রস্থান করলে।

চুরুটটা বোধ হয় ভাল ক'রে তখন ধরে নি, পুনরায় নিবে গিয়েছিল—কি ভাবতে ভাবতে প্রমথ সেটা ছাইদানির মধ্যে ফেলে দিলে, বইটা মুড়ে পাশের তেপায়ায় রাখলে, তার পর চেয়ারের হাতলে পা দুটো লম্বা ক'রে ছড়িয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল।

মনের একটা দিক অন্ধকার হয়ে এসেছে,—দুঃখে, না নৈরাশ্যে, না অভিমানে, না অপমানে, তা ঠিক বোঝা যায় না। অভিমানেই বোধ হয় বেশি। যতই বল 'না কেন, দুধের সাধ ঘোলে মেটে না! শাঁষ পেলে কে আর খোসা চিবুতে চায় বল! তাই-না তার আট দিনের অনুপস্থিতির কাছে দীর্ঘ চার বৎসরের একত্র বাস পরাস্ত হ'ল! মেকির বিরুদ্ধে খাঁটি চক্ষের নিমেষে জয়লাভ করলে!

তার পর কিন্তু প্রমথ ধীরে ধীরে তার সবল উদার অন্তঃকরণকে স্বার্থপরতার স্তূপের ভিতর থেকে টেনে বার করলে। মনে মনে সে বলতে লাগল, আহা, হাজার হোক স্বামী তো! রূপে-গুণে অর্থে-বিদ্যায় অমন স্বামীকে কি সহজে প্রত্যাখ্যান করা চলে! দুর্বলতার বশে না-হয় একটা অপরাধই ক'রে ফেলেছিল, কিন্তু তার প্রায়শ্চিত্তও তো কম করে নি! অনুশোচনার দুঃখ-

বেদনায় প্রিয়লাল এখন নির্মল হয়ে গেছে, এখন তাকে গ্রহণ করলে সন্ধ্যাকে কোন দোষই দেওয়া যায় না। এ মিলন যাতে সংঘটিত হয় সে বিষয়ে সে প্রাণপণ চেষ্টা করবে। নিজের এক বিন্দু স্বার্থপরতা দিয়ে অপরের বৃহৎ মঙ্গলকে বাধা দেবে না। সযত্নে প্রমথ তার অন্তরের একটি প্রচ্ছন্ন তন্ত্রীকে উপচিকীর্ষার সমুদার স্বরে বেঁধে নিলে,—অপবের কল্যাণসাধনের মধ্যে নিজের সমস্ত কুটিল স্বার্থকে নিমজ্জিত কর, লুপ্ত কর।

রাত্রে আহারাদির পর শয়ন-কক্ষে গিয়ে প্রমথ সন্ধ্যার কাছে কথাটা উত্থাপিত করলে। বললে, উষা, তোমার সঙ্গে আমার একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা আছে। আমার একান্ত অনুরোধ গভীর মনোযোগের সঙ্গে তুমি কথাটা শোন।"

প্রমথর মুখের দিকে তাকিয়ে সন্ধ্যা বিস্মিত হ'ল। সদানন্দ প্রমথর মুখে কৌতুকের নামগন্ধ নেই, তৎপরিবর্তে তথায় একটা সুনিবিড় আন্তরিকতার স্তব্ধ প্রশান্তি। বুঝলে কথাটা নিতান্ত সামান্য নয়, জিজ্ঞাসা করলে, "কি কথা?"

কোনো প্রকার ভূমিকা না ক'রে প্রমথ সোজাসুজি বললে, "প্রিয়লাল আর তুমি মিলিত হও। উষা, আমি সব দিক বিবেচনা ক'রে দেখেছি, উপস্থিত অবস্থায় এর চেয়ে মঙ্গলের আর কিছুই হতে পারে না। প্রিয়লালের সঙ্গে এই আট দিনেব কথাবার্তায় বেশ বুঝতে পেরেছি, তোমার অভাবে সে পাগল হয়ে আছে। তোমার যথার্থ পরিচয় পেলে সে যে আকাশের চাঁদ হতে পাবে—এ আমি নিশ্চয় বলতে পারি। একদিন দুর্বলতার বশবর্তী হয়ে সে তোমার প্রতি একটা অপরাধ করেছিল বটে, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, বাংলা দেশের স্বামীদের পক্ষে সে যে খুব একটা অমার্জনীয় অপরাধ, তা নয়। কিন্তু বস্তুত যত বড় অপরাধই করুক না কেন, তার প্রায়শ্চিত্তও সে যথেষ্ট করেছে,—এখন যদি তুমি তাকে গ্রহণ কর, তা হ'লে ন্যায়ত ধর্মত তোমার কোনো অপরাধই হয় না। আমার কথা যদি তোলো, আমি চিরদিনই তোমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ

আত্মীয় হয়ে থাকব। তোমার আমার মধ্যে যে আত্মীয়তা, তা আর কিছুতেই যাবার নয়। কখনো আমি তোমাদের কাছে গিয়ে বাস করব, কখনো বা তোমরা দু জনে এসে আমার কাছে বাস ক'রো। কোনো দিকই তোমার হারাতে হবে না উষা। এর জন্যে আমার পক্ষ থেকে যা কিছু বলবার বা করবার দরকার, তার কোনো ত্রুটি হবে না; কিন্তু প্রথমটা তোমার সঙ্গে কথাবার্তা হ'লেই ভাল হয়। কাল বেলা এগারটার ট্রেনে আমি অভয়ের সঙ্গে দেখা করতে রায়বেরিলী যাব, ফিরব সন্ধ্যা সাতটার গাড়িতে। তুমি তার মধ্যে সুবিধেমতো কোনো সময়ে প্রিয়লালকে তোমার যথার্থ পরিচয় দিয়ো। এ ছাড়া তোমাকে কিছুই করতে হবে না, আর যা করবার সবই সে করবে। কেমন, রাজী তো?—উষা!"

একবার চকিতে প্রমথর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "আচ্ছা।"

উত্তর শুনে প্রমথ মুখে বললে, "বেশ, বেশ, ভারি খুশি হলাম।" কিন্তু মনের মধ্যে এমন প্রবল একটা আঘাত পেলে যার তুলনায় সাধুচরণের অভিযোগ শুনে কিছু পূর্বে যে আঘাত পেয়েছিল, তা বিশেষ কিছু নয়। এত শীঘ্র, এত সহজে 'আচ্ছা'? তার আগে চক্ষুলজ্জার দুটো চারটে দুর্বল 'না'-ও নয়? কেন রে বাপু, পালিয়ে তো যাচ্ছিল না! আমি তো নিজেই হাতে তুলে দিচ্ছিলাম! আশ্চর্য মেয়েমানুষের কঠিন আত্মপরায়ণ মন!

আর বিশেষ কিছু কথাবার্তা হ'ল না, প্রমথ তার শয্যায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

সমস্ত রাত্রি কাটল খণ্ডিত নিদ্রায়। ঘুম আসে না শীঘ্র, এলেও ভেঙে যায় শীঘ্র। কিসের যেন একটা দুর্নিবার অস্বস্তি নিদ্রার জন্য মনকে স্তব্ধ হতে দেয় না। বিরক্ত হয়ে প্রমথ যখন শয্যা ত্যাগ করলে তখন প্রত্যুষের আলো সবে মাত্র ঘরে প্রবেশ করেছে। নিদ্রিতা সন্ধ্যার সম্মুখে গিয়ে সেই নিষ্প্রভ আলোকে চেয়ে দেখলে, তার মুখে পরিপূর্ণ নিশ্চিন্ততার প্রশান্তি। মনে মনে বললে, বল কি চার বৎসরের অবরুদ্ধ দুঃখের আজ অবসান! এ কি সহজ কথা!

নিজের কথাটা মনে হতে বললে, তা কি করা যাবে! সুখ-সৌভাগ্য তো আর নিজের তালুকের ফসল নয় যে, পেয়াদা পাঠিয়ে আমদানি করলেই হ'ল! তবু অবুঝ মনের মধ্যে রিক্ততার একটা মর্মন্তুদ গ্লানি থেকে থেকে মোচড় দিয়ে ওঠে।

আর একবার সন্ধ্যার দিকে দৃষ্টিপাত করতে চোখে জল ভ'রে এল। এই স্বর্ণপ্রতিমাকে আজ নিজের হাতে বিসর্জন দিতে হবে! একটা রুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস বাতাসে মুক্তিলাভ করলে। টেবিলের উপর থেকে সিগারেট-কেস্ আর দেশলাইয়ের বাক্স নিয়ে প্রমথ বারান্দায় গিয়ে বসল।

একচল্লিশ

অপরাহ্নে চা-পানের পর প্রিয়লাল বললে, "গোমতীর ধারে একটু বেড়াতে যাবেন মিসেস মুখার্জি? তার পর সাতটার সময়ে একেবারে স্টেশন থেকে প্রমথকে নিয়ে ফিরলেই হবে।"

একটু ইতস্তত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "আমি মনে করছিলাম, বাগানে বাদাম-গাছতলায় গিয়ে একটু বসলে হয়,—আপনাকে একটা কথা বলবার আছে।"

সকৌতূহলে প্রিয়লাল জিজ্ঞাসা করলে, "কথা?—কি কথা?"

সন্ধ্যা বললে, "আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখনি আসছি।" ব'লে সে নিজের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলে, তার পর দেরাজ খুলে ছোট একটা বাক্সের ভিতর থেকে একটা আংটি বার ক'রে বস্ত্রাঞ্চলে বেঁধে নিলে। এ সেই প্ল্যাটিনামের অভিজ্ঞান আংটি—বিবাহের কয়েকদিন পরে যা সে প্রিয়লালের কাছে পেয়েছিল। চিত্রাঙ্কিত ব'লে এবং রৌপ্যনির্মিত মনে ক'রে অলঙ্কার ভাগের সময়ে এ আংটি আর কেউ গ্রহণ করতে স্বীকৃত না হওয়ায় গফুরই গ্রহণ করে, এবং খুব সম্ভবত সন্ধ্যার স্বামীর চিত্র মনে ক'রে পরে আমিনা গফুরের কাছ থেকে আংটিটা চেয়ে নিয়ে নিজের কাছে রেখে দেয়। বৎসর দুই পূর্বে দৈবযোগে দিল্লী স্টেশনে আমিনার দেওর নাসিরউদ্দীন একটি গাড়িতে সন্ধ্যাকে দেখতে পেয়ে তার সঙ্গে আলাপ করে, এবং কথায় কথায় লক্ষ্ণৌর ঠিকানা জেনে নেয়। তার কিছুদিন পরে আমিনার নিকট হতে সন্ধ্যা ডাকযোগে এই আংটি এবং একটি চিঠি পায়। সেই থেকে এ পর্যন্ত এ আংটি বাক্সে বন্ধ হয়ে ছিল।

প্রিয়লালের কাছে উপস্থিত হয়ে সন্ধ্যা বললে, "চলুন ডক্টর চৌধুরী।"

সন্ধ্যার আদেশে পূর্ব থেকেই বাদামগাছতলায় দুটো বেতের চেয়ার ছিল, উভয়ে গিয়ে তথায় উপবেশন করলে।

প্রিয়লালের ঔৎসুক্য বিরতি মানছিল না; ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, "কি কথা মিসেস মুখার্জি?"

একটু চুপ ক'রে থেকে ইতস্ততভাবে সন্ধ্যা বললে, "কথাটা বড়ই অভদ্র, ভারি রূঢ়। আজ সমস্ত দিন ধ'রে ভেবেছি কি ক'রে আপনাকে বলি,—অথচ না ব'লেও উপায় নেই।"

অধীর উৎকণ্ঠায় প্রিয়লাল বললে, "নিশ্চয় বলবেন। অসঙ্কোচে বলুন।"

মনে মনে সন্ধ্যা নিজেকে কতকটা প্রস্তুত ক'রে নিলে, তার পর প্রিয়লালের প্রতি করুণ দৃষ্টি স্থাপিত ক'রে বললে, "দেখুন, আপনি আমাদের মান্য অতিথি, আপনার প্রতি কোন রকম অসম্মান অথবা অবহেলা দেখানো আমাদের পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ। কিন্তু তবুও অবস্থার অনুরোধে আপনাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমাদের বাড়িতে আপনার আর না থাকাই ভাল। একমাত্র সংসারের কল্যাণের দিকে তাকিয়ে যে রূঢ় কথা আপনাকে বলতে হ'ল, আপনি আপনার সহৃদতায় অনুগ্রহ ক'রে তা ক্ষমা করবেন।"

দারুণ বিস্ময়ে এবং দুশ্চিন্তায় প্রিয়লালের মুখ একেবারে পাংশু হয়ে গেল। বিহ্বলভাবে বললে, "কেন মিসেস মুখার্জি, আমার কোনো আচরণ কি আপনার প্রতি গর্হিত হয়েছে?"

মাথা নেড়ে সন্ধ্যা বললে, "না না,—একেবারেই না। আপনার আচরণের মধ্যে অন্যায়ের নামগন্ধ নেই।"

"তবে?"

উত্তর না দিয়ে সন্ধ্যা অন্য দিকে চেয়ে নিঃশব্দে কি চিন্তা করতে লাগল।

প্রিয়লাল বললে, "এ কথা অবশ্য আমি বুঝতে পারি যে, অকারণে এ রকম ক'রে আপনাদের বাড়ি প'ড়ে থাকা আমার উচিত হচ্ছে না। কিন্তু অন্য

লোকে যা-ই ভাবুক না কেন, আপনি তো ভাল ক'রেই জানেন যে, অকারণ এ একেবারেই নয়। আপনার মধ্যে আমার এমন হারানো জিনিসের সন্ধান পেয়েছি, যা থেকে দূরে থাকা আমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠেছে। সেই জন্যে স্থির করেছি, এখানে আমার থাকবার মতো ছোট-খাটো একটা বাড়ি ক'রে নোব। কাল বিকেলবেলা আমার এক বন্ধুর সাহায্যে একটা জমি প্রায় স্থির ক'রেও এসেছি। কলকাতায় তো আমার বাড়ি আছেই, এখানেও একটা হ'লে আর কোনো অসুবিধে থাকবে না। আপনাদের আরও পাঁচজন বন্ধুবান্ধব যেমন মাঝে মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ করতে আসেন, আমিও তেমনি এক আধ ঘণ্টার জন্যে আসব। আশা করি, তাতে এমন-কিছু আপত্তি হবে না মিসেস্ মুখার্জি!"

নিরন্তর কাছে কাছে বাস করবার প্রিয়লালের এমন পাকা ব্যবস্থার সঙ্কল্প শুনে সন্ধ্যা চিন্তিত হয়ে উঠল। অনুনয়ের গভীরকণ্ঠে সে বললে, "আমার একটা অনুরোধ রাখবেন ডক্টর চৌধুরী?"

"কি অনুরোধ বলুন?"

"যে জিনিস একেবারে চিরদিনের জন্যে শেষ হয়ে চুকে গেছে ব'লে আপনি জানেন, তার স্মৃতি দিয়ে নিজেকে এতটা পীড়ন করবেন না। আপনি সন্ধ্যাকে ভুলতে চেষ্টা করুন, আর সে জন্যে আমার আকৃতি যদি বাধা মনে হয় তা হ'লে আমার নিকটেও আর আসবেন না। আমাকে দিয়ে আপনার এ কষ্টকর স্মৃতি এমন ক'রে জাগিয়ে রেখে কোনো লাভ নেই। যে জীবনের সমস্তটাই আপনার প'ড়ে রয়েছে, তা এমন ক'রে নষ্ট করবার জিনিস নয়।"

সন্ধ্যার এ কথাকে একান্তই অবান্তর এবং অসার বিবেচনা ক'রে শুধু সামান্য একটু হাস্যের দ্বারা প্রিয়লাল এর উত্তরের সমাপ্তি করলে; তার পর ব্যগ্রকণ্ঠে বললে, "কিন্তু আপনি তো আসল কথা স্পষ্ট ক'রে এ পর্যন্ত বললেন না মিসেস মুখার্জি?"

স্তব্ধ হয়ে সন্ধ্যা এক মুহূর্ত নীরবে ব'সে রইল ; তার পর মৃদু ব্যথিতকণ্ঠে, কতকটা যেন নিজের মনেই, বললে, "দরকার না হ'লে যে কথাটা বলব না মনে করেছিলাম, এখন দেখছি না ব'লে উপায় নেই। কথাটা চিরদিনের মতো শেষ ক'রে নেওয়াই ভাল।"

"কী-সে এমন কথা মিসেস মুখার্জি ?"

সহসা সন্ধ্যার মুখ জবাফুলের মতো আরক্ত হয়ে উঠল ; চকিত বিহ্বলনেত্রে সে একবার প্রিয়লালের দিকে চেয়ে দেখলে ; তার পর কঠিন কশাঘাতে নিজের চিত্তকে উদ্দীপ্ত ক'রে নিয়ে বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধা আংটিটা খুলে প্রিয়লালের হাতে দিয়ে বললে, "এ আংটিটা আপনার মনে পড়ে ?"

আংটিতে দৃষ্টিপাত ক'রেই প্রিয়লাল চমকে উঠল ; মনে পড়তে এক মুহূর্তও বিলম্ব হ'ল না ; ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, "এ আপনি কোথায় পেলেন ?"

"একদিন আপনার কাছেই পেয়েছিলাম।"

"আমার কাছে পেয়েছিলেন ?" তার পর তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু নেত্রে সন্ধ্যার মুখে দৃষ্টিপাত ক'রে প্রিয়লাল চিৎকার ক'রে উঠল, "কিঃ !—তুমি সন্ধ্যা ?"

"আমি সন্ধ্যা।"

"কিন্তু আমি যে জানি, সে বেঁচে নেই।"

"না থাকলেই ভাল ছিল, কিন্তু এখনো বোধ হয় অনেক দুঃখ দিতে আর পেতে বাকি আছে, তাই সে হতভাগিনী আজও বেঁচে রয়েছে।"

উত্তেজনায় প্রিয়লালের দুই চক্ষু হতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হতে লাগল। দুই হাত দিয়ে সজোরে সন্ধ্যার একটা হাত চেপে ধ'রে বললে, "বাজে কথা বন্ধ কর। সত্যি ক'রে বল, তুমি সন্ধ্যা কি-না ?"

"হ্যাঁ, সত্যিই আমি সন্ধ্যা।"

বার কয়েক সন্ধ্যার হাতটায় প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে দিয়ে প্রিয়লাল বললে, "তবে মিথ্যে কথা রটিয়ে আমাকে পাগল ক'রে দিয়েছিলে কেন? কী আমি এত বড় অপরাধ করেছিলাম তোমার কাছে?"

দুঃখার্ত নেত্রে প্রিয়লালের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "আমি তো ও-কথা রটাই নি। আপনার মুখেই আমি প্রথমে ও-কথা শুনি।"

"তার আগে তুমি কিছু জানতে না?"

"কিচ্ছু না।"

বাষ্পের অত্যধিক চাপে বয়লার যেমন ক'রে কাঁপে, বিস্ময়-বেদনা-দুঃখ-আনন্দের যুক্ত তাড়নায় তেমনি ভাবে প্রিয়লালের সমস্ত দেহ কাঁপতে লাগল। সহসা সন্ধ্যার হাত ছেড়ে দিয়ে সজোরে সে নিজের বুকখানা চেপে ধরলে, তার পর চেয়ারের হাতলে দুই বাহুর মধ্যে মাথা স্থাপিত ক'রে বহুক্ষণ প'ড়ে রইল। অবরুদ্ধ ক্রন্দনের তাড়নায় মাঝে মাঝে পিঠখানা কেঁপে উঠছিল। অবশেষে অতি কষ্টে উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগকে কতকটা সংযত ক'রে মুখ তুলে আর্তকণ্ঠে ডাকলে, "সন্ধ্যা!"

আর্দ্র জিজ্ঞাসু নেত্রে সন্ধ্যা প্রিয়লালের দিকে চেয়ে দেখলে।

"তুমি কি তোমার হতভাগ্য স্বামীকে ক্ষমা করতে পারবে সন্ধ্যা?"

সন্ধ্যা বললে, "ক্ষমা করবার তো কিছু আর নেই; যদিই বা কিছু ছিল, আপনার সঙ্গে এই পনেরো-যোলো দিনের পরিচয়ে তা একেবারে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে।"

"তবে তুমি আজ রাত্রেই আমার সঙ্গে কলকাতায় চল।"

"কেন?"

"আমার লক্ষ্মীহীন গৃহে লক্ষ্মীপ্রতিষ্ঠা করব। মা তোমাকে পেয়ে হাতে স্বর্গ পাবেন।"

এক মুহূর্ত সন্ধ্যা চুপ ক'রে রইল, তার পর ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললে,

"না, তা হয় না। তা কেমন ক'রে হবে? এঁকে ছেড়ে আর কোথাও যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

প্রিয়লালের মুখ মলিন হয়ে উঠল; বললে, "বুঝেছি। এ কথাটা আমার আগে মনে হয় নি। তুমি কি এখন তা হ'লে প্রমথর বিবাহিত স্ত্রী?"

সন্ধ্যা বললে, "না।"

"কোনো প্রচলিত পদ্ধতিতে তার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয় নি?"

"না, তা হয় নি।"

উৎফুল্ল মুখে প্রিয়লাল বললে, "তবে আমার সঙ্গে যেতে তোমার বাধা কোথায় সন্ধ্যা?"

সন্ধ্যা বললে, "বিয়ে না হ'লেই বাধা থাকতে নেই—এ আপনি কেমন ক'রে বলছেন?"

সন্ধ্যার এই সুদৃঢ় প্রশ্নে সহসা ধৈর্য হারিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রিয়লাল বললে, "প্রমথর সঙ্গে তোমার যখন কোনো সামাজিক বন্ধন নেই, তখন তাকে ছেড়ে যাওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব নয়, তাই বা কেমন ক'রে বলছ?"

মনে মনে সন্ধ্যা একটু ভেবে নিলে, তার পর শান্ত সংযত কণ্ঠে বললে, "সামাজিক বন্ধন বলতে কি বোঝায় আমি তা ঠিক জানি নে, কিন্তু ওঁর সঙ্গে আমার যে বন্ধন, কোনো বন্ধনেরই চেয়ে তা যে কম দৃঢ় নয়—এ আমি নিশ্চয় বলতে পারি। কি দুর্দিনে দুঃসময়ে উনি আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, আপনি হয়তো তার সবটা জানেন না। সামান্য একটা সতেরো-আঠারো বৎসরের মেয়ে,—কিন্তু বাপ-মা শ্বশুর শাশুড়ী স্বামীর কাছে দাসী হয়ে থাকবারও আশ্রয় পেলাম না। অগত্যা মুখুজ্জে মশাইয়ের সঙ্গে আবার জামসেদপুরেই ফিরে গেলাম। কিন্তু কী যে মিথ্যা সন্দেহ সবিতাদিদির মনের মধ্যে ঢুকল, সমস্ত বাড়িটা অশান্তিতে বিষিয়ে গেল। অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। আত্মহত্যা যে অবস্থায় আর পাপ থাকে না, সেই অবস্থা হ'ল আমার। ঠিক সেই সময়ে

আমার জীবনের সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণা অনুভব ক'রে স্বয়ং উপযাচক হয়ে ইনি আমাকে আশ্রয় দিলেন। সে কি সহজ আশ্রয় দেওয়া! আদরে যত্নে শ্রদ্ধায় সম্মানে এমন ক'রে তুললেন যেন নিজেই একটা আশ্রয় পেলেন; মুখে বলতেনও সেই রকম কথা। মানুষের ওপর অশ্রদ্ধা হয়ে আসছিল, এমন সময়ে মানুষ যে এত বড়ও হয় দেখতে পেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। তার পর এই দীর্ঘ চার বৎসরের মধ্যে একদিনের জন্যেও তাঁর সে ভাবের ব্যতিক্রম হয় নি। কি মর্যাদা যে আমাকে দিয়েছেন, তা আপনাকে কি বলব! আজ আমি তাঁকে ছেড়ে যাই কেমন ক'রে? ন্যায় নেই? বিশ্বাস নেই? ধর্ম নেই?—আপনিই বলুন।"

কলহের লঘু কণ্ঠে প্রিয়লাল বললে, "ধর্মের কথা বলছ, কিন্তু ধর্ম তো আমারই দিকে। তোমার সঙ্গে যে একদিন আমার বিয়ে হয়েছিল, সে কথা ভুলে যাচ্ছ কেন?"

সন্ধ্যা বললে, "ভুলি নি, সে কথা পরে বলছি। আচার অনুষ্ঠান পালনের একটা ধর্ম আছে তা অস্বীকার করছি নে, কিন্তু আমি যে ধর্মের কথা বলছিলাম তা আরও অনেক বড়। সে ধর্ম মানুষের অন্তরের আদিম ধর্ম, যার প্রভাবে ক্রমশ মানুষের যা-কিছু আচার অনুষ্ঠান সমস্তই সৃষ্টি লাভ করেছে। তার প… বিয়ের কথা আপনি তুলেছেন, কিন্তু বিয়েকে তো আমরা একটা সত্যিকারের বন্ধন ব'লে মানি নে।"

"কেন মানি নে?"

"আমি তো সেই বন্ধনের দাবিতেই আপনার কাছে আশ্রয়ের জন্যে গিয়েছিলাম, কিন্তু আপনি তো আমার সে দাবি অগ্রাহ্য করেছিলেন।"

"অগ্রাহ্য করি নি, স্থগিত করেছিলাম।"

"দরকারের সময়ে স্থগিত করা মানেই অগ্রাহ্য করা নয় কি?"

যুক্তিতে সন্ধ্যার নিকট পরাজিত হয়ে প্রিয়লালের ক্রোধ গেল বেড়ে; যুক্তি-তর্কের পথ পরিত্যাগ ক'রে তীব্র কণ্ঠে সে বললে, "তুমি তো প্রমথর

বিবাহিত স্ত্রী নও, তবে 'মিসেস মুখার্জি সম্বোধনে সাড়া দাও কেন? এ পরিচয় কি তোমার মিথ্যে পরিচয় নয়?"

সন্ধ্যা বললে, "এ পরিচয় আমার যতটা মিথ্যে পরিচয় তার চেয়েও অনেক বেশি সত্যি। উনি আমাকে এমন আপনার ক'রে নিয়েছেন যে, আমাকে মিসেস মুখার্জি ব'লে ডাকলে বিশেষ-কিছু অন্যায় করা হয় না। মিসেস মুখার্জির ষোল আনা মর্যাদা উনি আমাকে দিয়েছেন।"

প্রিয়লালের ক্রোধ জ্ব'লে উঠল। বললে, "মর্যাদা—মর্যাদা—তো তুমি তখন থেকে খুব করছ, কিন্তু প্রমথ তোমাকে কি মর্যাদা দিয়েছে জানো?—রক্ষিতার মর্যাদা সে তোমাকে দিয়েছে। তুমি প্রমথর রক্ষিতার একবিন্দু বেশি কিছু নও।"

শান্ত কণ্ঠে সন্ধ্যা বললে, "সত্যিই তা নয় তো আর কি? কিন্তু তিনি এত উদার, এত মহৎ যে, আমি তাঁর রক্ষিতা শুনে একটুও অপমানিত বোধ করছি নে। তিনি আমাকে না রাখলে, কি দুর্গতি যে আমার হ'ত তা কে জানে!"

ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে প্রিয়লাল বললে, "আমার সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ তুমি যখন অস্বীকার করেছ, তখন তোমার মাথায় সিঁদুর কেন, হাতে লোহা কেন? এ সব পরিহাস কিসের জন্যে?"

সন্ধ্যা বললে, "এ সব বাংলা দেশের মেয়েদের ভারি গোলমেলে কথা, এ আপনি বুঝতে পারবেন না। আমিও হয়তো আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারব না। এ সব আলোচনা না করাই ভাল।"

দুঃখে, নৈরাশ্যে, অপমানে, অভিমানে পীড়িত হয়ে প্রিয়লাল কিছুক্ষণ যে-দিক থেকে পারলে সন্ধ্যার সহিত এই ভাবে বচসা করলে। তার পর কিছু-কাল স্তব্ধ হয়ে নীরবে ব'সে রইল। অবশেষে মর্মন্তুদ দুঃখটা আর একবার প্রবল হয়ে উঠল। বললে, "তা হ'লে কি আমার কোনো আশাই নেই সন্ধ্যা? আমার অনুরোধে প্রমথ যদি স্বেচ্ছায় তোমাকে ছেড়ে দেয়, তা হ'লে?"

সন্ধ্যা বললে, "এই যে এতক্ষণ এ সব আলোচনা হ'ল—এ তো তাঁরই নির্দেশ অনুরোধে। আপনার কাছে আমার যথার্থ পরিচয় দিয়ে আপনার সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে বিশেষভাবে অনুরোধ ক'রে তিনি রায়বেরিলী গেছেন।"

"তবে?"

"তবে—কি?"

"তবে তুমি আমার সঙ্গে যাবে না কেন?"

সন্ধ্যা বললে, "দেখুন, তিনি যা ভাল বুঝেছেন তাই করেছেন ব'লে আমি যা ভাল বুঝব তা করব না, তা তো আর হয় না। তা ছাড়া, যে জিনিস একেবারে অন্যের হয়ে গিয়েছে, তা আর আপনার কোন্ কাজে লাগবে বলুন?"

ক্ষণকাল নীরবে অবস্থান ক'রে প্রিয়লাল বললে, "বুঝেছি। আর আমার বিশেষ কিছু বলবার নেই। তুমি আমাকে আজ যে প্রচণ্ড আঘাত দিলে, আমি তা ক্ষমা ক'রে গেলাম এই মনে ক'রে যে, একদিন আমিও তোমাকে নিশ্চয় এমনি আঘাতই দিয়েছিলাম, সুতরাং তোমার প্রতিশোধ নেওয়ায় আমি আপত্তি করতে পারি নে।"

বেদনায় সন্ধ্যার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল; দুঃখার্ত কণ্ঠে বললে, "একেবারেই নয়। প্রতিশোধের কোনো কথা এর মধ্যে নেই। আপনি বিশ্বাস করুন, আলোচনার অনুরোধে যেটুকু বলতে বাধ্য হয়েছি, শুধু তাই বলেছি, তার বেশি কিছুই বলি নি। তবু নিজের বাড়ি ব'সে আপনাকে যে এই ব্যথা দিতে হ'ল তার জন্যে আমার মনে দুঃখের শেষ নেই। আপনি আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করুন। আপনার ওপর আমার মনে বিন্দুমাত্র রাগ, দুঃখ বা অভিমান নেই। আপনি শান্ত হোন, সুখী হোন, একান্ত মনে সেই প্রার্থনাই করি।"

"ধন্যবাদ।" ব'লে প্রিয়লাল উঠে দাঁড়াল; তার পর পুনরায় চেয়ারে ব'সে

প'ড়ে বললে, "আজ রাত্রে এগারোটার গাড়িতে আমি এলাহাবাদ যাব। আমার খাওয়ার জন্যে যেটুকু ব্যবস্থার দরকার তা ক'রে দিয়ো।"

সন্ধ্যা বললে, "আজই তাড়াতাড়ি যাবার এমন কি দরকার আছে, সুবিধে মতো যে কোনো একদিন গেলেই হবে।"

প্রিয়লাল বললে, "না, আজ আমার কোনো অসুবিধে নেই।"

সন্ধ্যা আর কিছু বললে না, চুপ ক'রে রইল।

প্রিয়লাল বললে, "আর একটা কথা। এ বিষয়ে আর আলোচনার প্রয়োজনও নেই, আমার পক্ষে তা রুচিকরও হবে না। প্রমথ এলে এ প্রসঙ্গটা আর একবার ওঠবার সম্ভাবনা আছে। সেটা যদি আর না ওঠে, আমি তোমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হব।"

সন্ধ্যা বললে, "নিশ্চয়ই উঠবে না, আমি ওঁকে মানা ক'রে দোব।"

প্রিয়লাল বললে, "এবার আমি আমার ঘরে গিয়ে একটু বিশ্রাম নিতে চললাম। তোমাকে আবার 'তুমি' আর 'সন্ধ্যা' বলছি ব'লে অন্যায় করছি—এমন যদি মনে কর, তা হ'লে যতক্ষণ তোমাদের বাড়িতে আছি, তোমাকে 'মিসেস মুখার্জি' ব'লে ডাকতে প্রস্তুত আছি।"

সন্ধ্যা একটু চুপ ক'রে রইল। তার পর মৃদুকণ্ঠে বললে, "না, আপনি আমাকে 'সন্ধ্যা' ব'লেই ডাকবেন।"

আর কিছু না ব'লে প্রিয়লাল চেয়ার ছেড়ে উঠে ধীরে ধীরে চ'লে গেল।

বিয়াল্লিশ

অভিনয় হয়ে গেল শেষ।

বেচারা সন্ধ্যার উপর দিয়ে যে ঝড় ব'য়ে গেল, তাতে যদি সে একটু নুয়ে প'ড়ে থাকে, সুধী পাঠক, তাকে ক্ষমা ক'রো। কল্পিত অভিনয় দেখে আমরা কেঁদে আকুল হই, আর এ তো সে করলে নিজের বাস্তবজীবনের মধ্যে প্রধান ভূমিকার মর্মান্তিক অভিনয়! যে স্বামীকে পাবার জন্য একদিন সে উন্মাদিনী হয়েছিল, আজ তাকে হাতের মধ্যে পেয়েও নিজের হাতেই বিদায় করলে। এ কাজ যে কত-বড় কঠিন কাজ, তা জগতের সমস্ত সৌভাগ্যশালিনী স্ত্রীলোক অনুভব করবে।

স্বীকার করি, এ হয়তো সে করলে তার ন্যায়নিষ্ঠ বিশ্বাসপরায়ণ বিচারশীল মনের দৃঢ়তায়; কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষের যে আর-একটা অবুঝ দুর্বল মন আছে, যার ধর্ম দুঃখে কষ্ট পাওয়া, আঘাতে অনুভব করা, সমবেদনায় বিহ্বল হওয়া, তা-ও অস্বীকার করতে পারি নে। কর্তব্য আমরা করি, কিন্তু সময়ে সময়ে তার মূল্যও এমনি ক'রেই পরিশোধ করতে হয়। প্রমথর প্রতি বিশ্বাসপরায়ণতার মহিমায় কাল হয়তো এ ব্যাপার লঘু হয়ে যাবে, কিন্তু আজ যে এর আঘাত প্রচণ্ড, তা কেমন ক'রে অস্বীকার করি!

রায়বেরিলী থেকে প্রমথ যখন প্রত্যাবর্তন করলে তখন প্রিয়লাল তার নিজের ঘরে আর সন্ধ্যা বাদামগাছতলায়। মাত্র দুটি লোক তো দুদিকে স্তব্ধ হয়ে আছে, কিন্তু সমস্ত বাড়িটা যেন নিঃশব্দতার চাপে থমথম করছে। হরিয়ার কাছে প্রমথ অবগত হ'ল, প্রায় ঘণ্টা খানেক প্রিয়লাল দ্বার বন্ধ ক'রে ঘরের মধ্যে অবস্থান করছে। সন্ধ্যাও অনেকক্ষণ বাদামগাছতলায় একাকী ব'সে আছে—এ কথাও হরিয়া বললে। শুনে প্রমথ এই অনুমানই করলে যে, সন্ধ্যা এবং প্রিয়লালের মধ্যে অনতিপূর্বে একটা বোঝাপড়া হয়েছে, কিন্তু তার

পরিণতি সন্ধি এবং মিলনের অনুকূল হতে পারে নি। চিত্তের ভিতর স্বার্থপরতার গাপন মহলে কয়েকটা দীপ প্রজ্বলিত হয়ে উঠল।

প্রিয়লালকে বিরক্ত করতে প্রমথ সাহস করলে না, সন্ধ্যার উদ্দেশ্যে বাদাম-গাছতলার দিকে খানিকটা অগ্রসর হ'তেই দেখলে, সন্ধ্যা আসছে। মোটরের শব্দ পেয়ে প্রমথ এসেছে বুঝতে পেরে সে আসছিল।

সন্ধ্যা নিকটে আসতে প্রমথ বললে, "চল, ওখানে গিয়েই একটু বসি।"

সন্ধ্যা বললে, "চল।"

দুজনে গিয়ে বাদামগাছতলায় দুটো চেয়ারে উপবেশন করলে।

কথাটা অনেকখানিই বোঝা গিয়েছিল, তথাপি প্রমথ জিজ্ঞাসা করলে, "প্রিয়লালকে তোমার পরিচয় দিয়েছিলে উষা ?"

"দিয়েছিলাম।"

"কি বললে সে ?"

"উনি আজ রাত্রে লক্ষ্ণৌ ছেড়ে চ'লে যাচ্ছেন।"

"তুমি কি তা হ'লে প্রিয়লালকে গ্রহণ করলে না ?"

"না।"

'প্রিয়লাল কি বললে ?"

"সে অনেক কথা, আর একদিন বলব অখন।"

এক নিমেষেই প্রমথ সন্ধ্যার অন্তরের সমস্ত বেদনাটা অনুভব করলে। বললে, "তাই ব'লো।" মনের মধ্যে নিজের দিক দিয়ে যে তীব্র আনন্দটা জেগে উঠল, আপাতত তা প্রিয়লালের প্রতি দুঃখ এবং সমবেদনার মধ্যে বাসা বাঁধলে।

বহুক্ষণ দুজনে স্তব্ধ হয়ে পাশাপাশি ব'সে রইল। সতেরো-আঠারো দিন পূর্বে আর একদিন তারা ভারতী-আশ্রম থেকে ফিরে ঠিক এমনি ক'রেই ব'সে ছিল। সেদিন যেন ছিল তাদের বিবাহ অনুষ্ঠান, আজ যেন সেই বিবাহের কুশণ্ডিকা। কিন্তু কি করুণ, কি মর্মভেদী !

মাধব এসে বললে, "মা, খাবার দেওয়া হয়েছে।"

প্রমথর দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে সন্ধ্যা বললে, "খাবে চল।"

যেতে যেতে সন্ধ্যা বললে, "দেখ, এ প্রসঙ্গ আর ওঁর কাছে একেবারে তুলো না। উনি নিজেই এ বিষয়ে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন।"

শুনে প্রমথ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলে। অনির্বচনীয় বেদনার বস্তুকে কোন্ বচন দিয়ে প্রকাশ করবে, মনে মনে তা ভেবে তার মত বাক্পটু ব্যক্তিও শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। বললে, "না, তুলব না।"

প্রিয়লালের ঘরের কাছে উপস্থিত হয়ে প্রমথ ডাকলে, "প্রিয়লাল, খাবার দিয়েছে, খাবে এস।"

টেবিলে প্রমথ এবং প্রিয়লালের খাবার দিয়েছিল, গভীর বৈরাগ্যের স্তব্ধতার সহিত প্রিয়লাল আহারে উপবেশন করলে। সে বিষয়ে কোনো প্রকার আপত্তি অথবা বাদানুবাদ করবার মতো চিত্তের যথেষ্ট সচেতনতা তার ছিল না। অখণ্ড মৌনের মধ্য দিয়ে অবিলম্বে আহার সমাপ্ত হ'ল। আন্তরিক আগ্রহ এবং যত্নের সহিত অল্প কথার অনুরোধে-উপরোধে সন্ধ্যা যতটা পারলে প্রিয়লালকে খাওয়াবার চেষ্টা করলে, কিন্তু কী যে সে খেলে, আর কী যে খেলে না তা কিছুই বোঝা গেল না,—আহার-সামগ্রী নিয়ে অন্যমনস্কভাবে খানিকটা নাড়াচাড়া ক'রে উঠে পড়ল।

তার পর বারান্দায় এসে তিনজনে তিনটে চেয়ারে উপবেশন করলে। তখনো তাদের মধ্যে কথাবার্তা কিছুই হ'ল না। যে বেদনা যে অনুভূতি সম্পূর্ণরূপে বাক্যের অতীত, তা তিনজনেরই মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে আটকে রইল। এইরূপ নিঃশব্দতার মধ্যে বহুক্ষণ কেটে গেল।

যথাকালে মোটর এসে বারান্দার সম্মুখে দাঁড়াল। কিছু পূর্বে বসন্ত চৌবে ঘোড়ার গাড়ি ক'রে প্রিয়লালের জিনিসপত্র নিয়ে স্টেশনে গিয়েছে। বারান্দা থেকে নেমে তিনজনে মোটরের নিকট উপস্থিত হ'ল।

মোটরের দরজা খুলে প্রমথ বললে, "ওঠ প্রিয়লাল।" প্রিয়লাল উঠে বসলে সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে বললে, "তুমি ওঠ।" তার পর নিজে সন্ধ্যার পাশে উঠে বসল। তিনজনে পাশাপাশি ব'সে অনড় অবিচল নীরবতার মধ্য দিয়ে সমস্ত পথটা অতিক্রম ক'রে স্টেশনে এসে উপস্থিত হ'ল।

—এ ট্রেনটা লক্ষ্ণৌ থেকেই ছাড়ে। একটা ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেণ্টে প্রিয়লালের জিনিসপত্র তুলে দিয়ে বসন্ত চৌবে নিকটে দাঁড়িয়ে ছিল। এলাহাবাদের একটা টিকিট কিনে আনবার জন্য প্রিয়লাল তাকে অর্থ প্রদান করিলে।

ট্রেন ছাড়বার একটু আগে গাড়িতে উঠে প্রিয়লাল দরজার সামনে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। দৃষ্টি তার সম্মুখ দিকে প্রসারিত, কিন্তু কী যে দেখছে তা বোঝা যায় না। নীচে প্ল্যাট্‌ফর্মে সন্ধ্যা এবং প্রমথ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে।

গার্ড হুইস্‌ল্ দিলে, সবুজ বাতি দেখালে; ড্রাইভার হুইস্‌ল্ দিলে, গাড়ি ন'ড়ে উঠল। তখনো প্রিয়লাল সেইভাবে তাকিয়ে রয়েছে।

নিকটে এসে প্রমথ প্রিয়লালের দিকে দক্ষিণ বাহু প্রসারিত ক'রে বললে, "যখনিই ইচ্ছে হবে, আমাদের কাছে এসো প্রিয়লাল।"

প্রিয়লাল কিছু বললে না, শুধু প্রমথর হাতখানা ধ'রে ধীরে ধীরে বার দুই নাড়া দিলে। তার পর ঠিক তেমনি ভাবেই সামনের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, একবারও সন্ধ্যা অথবা প্রমথর দিকে ফিরে চেয়ে দেখলে না।

যতক্ষণ দেখা গেল, সন্ধ্যা এবং প্রমথ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল; তার পর অন্ধকারের মধ্যে ট্রেনখানা অদৃশ্য হয়ে গেলে প্রমথ বললে, "চল উষা, এবার ফেরা যাক।"

প্ল্যাট্‌ফর্ম দিয়ে যেতে যেতে এক সময়ে প্রমথ হঠাৎ দেখতে পেলে, সন্ধ্যার দুটি চক্ষু চক্‌চকিয়ে উঠেছে। মুখে কিছু বললে না, কিন্তু অন্তরের সুগভীর সমবেদনায় একটা দীর্ঘশ্বাস বায়ুতে মিশে গেল।

॥ শেষ ॥